রবীন্দ্র রচনাবলী

নবম খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

নবম খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

শিশু

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার 'পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা।

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল-'পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী
আপন হাতে হেলায় গড়ি
পাতায়-গাঁথা ভেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।

জানে না তারা সাঁতার দেওয়া,
জানে না জাল ফেলা।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,
বণিক ধায় তরণী বেয়ে,
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা।
রতন ধন খোঁজে না তারা,
জানে না জাল ফেলা।

ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে,
হাসে সাগর-বেলা।
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রচিছে গাথা তরল তানে,
দোলনা ধরি যেমন গানে
জননী দেয় ঠেলা।
সাগর খেলে শিশুর সাথে,
হাসে সাগর-বেলা।

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ-দূত উড়িয়া চলে,
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা।

রবীন্দ্রনাথের কন্যাগণ ও কনিষ্ঠ পুত্র

মধ্যস্থলে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা, পশ্চাতে দণ্ডায়মান মধ্যমা কন্যা রেণুকা
দক্ষিণে কনিষ্ঠা কন্যা মীরা, বামে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সৌজন্যে

জন্মকথা

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে—
'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।

ছিলি আমার পুতুল-খেলায়,
প্রভাতে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।

আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালোবাসায়,
আমার মায়ের দিদিমায়ের পরানে—
পুরানো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের 'পরে
কতকাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দ-স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি।

নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝি নে রে,
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।
ওই দেহে এই দেহ চুমি
মায়ের খোকা হয়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে।

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখতে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।
জানি না কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে।’

খেলা

তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া।
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙিন আঙিয়া।
বিহানবেলা আঙিনাতলে
এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণ ছুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া।
তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া।

কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি,
দুয়ার-পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি।
তাথেই থেই তালির সাথে
কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাঁচনি।
কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি।

ভিখারি ওরে, অমন ক'রে
শরম ভুলিয়া
মাগিস কী বা মায়ের গ্রীবা
আঁকড়ি ঝুলিয়া।

ওরে রে লোভী, ভুবনখানি
গগন হতে উপাড়ি আনি
ভরিয়া দুটি ললিত মুঠি
দিব কি তুলিয়া।
কী চাস ওরে অমন ক'রে
শরম ভুলিয়া।

নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা।
নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।

ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী,
গায়ের 'পরে কোমল করে
পরশ-বুলানী।
মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি
জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে
ভুবন-ভুলানী।
ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী।

খোকা

খোকার চোখে যে ঘুম আসে
সকল-তাপ-নাশা—
জান কি কেউ কোথা হতে যে
করে সে যাওয়া-আসা।
শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল-কুঁড়ি,
তাহারি মাঝে বাসা—
সেখান থেকে খোকার চোখে
করে সে যাওয়া-আসা।

খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে—
কোন্ দেশে যে জনম তার
কে কবে তাহা মোরে।
শুনেছি কোন্ শরৎ-মেঘে
শিশু-শশীর কিরণ লেগে
সে হাসিরুচি জনমি ছিল
শিশিরশুচি ভোরে—
খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে।

খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা—
জান কি সে যে এতটা কাল
লুকিয়ে ছিল কোথা।

মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তারি পরান ছেয়ে
মাধুরীরূপে মুরছি ছিল
কহে নি কোনো কথা—
খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা।

আশিস আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে—
জান কি কেহ কোথা হতে সে
বরষে তার শিরে।
ফাগুনে নব মলয়শ্বাসে,
শ্রাবণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্যদলে,
আষাঢ়ে নব নীরে—
আশিস আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে।

এই-যে খোকা তরুণতনু
নতুন মেলে আঁখি—
ইহার ভার কে লবে আজি
তোমরা জান তা কি।
হিরণময় কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন-দোলা
তপন-শশী-তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি—
এই-যে খোকা তরুণতনু
নতুন মেলে আঁখি।

ঘুমচোরা

কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া।
মা তখন জল নিতে ও পাড়ার দিঘিটিতে
গিয়াছিল ঘট কাঁখে করিয়া।—
তখন রোদের বেলা সবাই ছেড়েছে খেলা,
ও পারে নীরব চখা-চখীরা ;
শালিক থেমেছে ঝোপে, শুধু পায়রার খোপে
বকাবকি করে সখা-সখীরা ;
তখন রাখাল ছেলে পাঁচনি ধুলায় ফেলে
ঘুমিয়ে পড়েছে বটতলাতে ;
বাঁশ-বাগানের ছায়ে এক-মনে এক পায়ে
খাড়া হয়ে আছে বক জলাতে।
সেই ফাঁকে ঘুমচোর ঘরেতে পশিয়া মোর
ঘুম নিয়ে উড়ে গেল গগনে,
মা এসে অবাক রয়, দেখে খোকা ঘর-ময়
হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে সঘনে।

আমার খোকার ঘুম নিল কে।
যেথা পাই সেই চোরে বাঁধিয়া আনিব ধরে,
সে লোক লুকাবে কোথা ত্রিলোকে।
যাব সে গুহার ছায়ে কালো পাথরের গায়ে
কুলু কুলু বহে যেথা ঝরনা।
যাব সে বকুলবনে নিরিবিলি যে বিজনে
ঘুঘুরা করিছে ঘর-করনা।
যেখানে সে বুড়া বট নামায়ে দিয়েছে জট,
ঝিল্লি ডাকিছে দিনে দুপুরে,
যেখানে বনের কাছে বনদেবতারা নাচে
চাঁদিনিতে রুনুঝুনু নূপুরে,

যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেণুবন-মাঝে
আলো যেথা রোজ জ্বালে জোনাকি—
শুধাব মিনতি করে, 'আমাদের ঘুমচোরে
তোমাদের আছে জানাশোনা কি।'

কে নিল খোকার ঘুম চুরায়ে।
কোনোমতে দেখা তার পাই যদি একবার
লই তবে সাধ মোর পুরায়ে।
দেখি তার বাসা খুঁজি কোথা ঘুম করে পুঁজি,
চোরা ধন রাখে কোন্ আড়ালে।
সব লুঠি লব তার, ভাবিতে হবে না আর
খোকার চোখের ঘুম হারালে।
ডানা দুটি বেঁধে তারে নিয়ে যাব নদীপারে,
সেখানে সে ব'সে এক কোণেতে
জলে শরকাঠি ফেলে মিছে মাছ-ধরা খেলে
দিন কাটাইবে কাশবনেতে।
যখন সাঁঝের বেলা ভাঙিবে হাটের মেলা
ছেলেরা মায়ের কোল ভরিবে,
সারা রাত টিটি-পাখি টিটকারি দিবে ডাকি—
'ঘুমচোরা কার ঘুম হরিবে।'

অপযশ

বাছা রে, তোর চক্ষে কেন জল।
কে তোরে যে কী বলেছে
আমায় খুলে বল্।
লিখতে গিয়ে হাতে মুখে
মেখেছ সব কালী?

নোংরা ব'লে তাই দিয়েছে গালি?
ছি ছি, উচিত এ কি।
পূর্ণশশী মাখে মসী—
নোংরা বলুক দেখি।

বাছা রে, তোর সবাই ধরে দোষ।
আমি দেখি সকল-তাতে
এদের অসন্তোষ।
খেলতে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে
তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।
ছি ছি, কেমন ধারা।
ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে,
সে কি লক্ষ্মীছাড়া।

কান দিয়ো না তোমায় কে কী বলে।
তোমার নামে অপবাদ যে
ক্রমেই বেড়ে চলে।
মিষ্টি তুমি ভালোবাস
তাই কি ঘরে পরে
লোভী বলে তোমার নিন্দে করে।
ছি ছি, হবে কী।
তোমায় যারা ভালোবাসে
তারা তবে কী।

বিচার

আমার খোকার কত যে দোষ
সে সব আমি জানি,
লোকের কাছে মানি বা নাই মানি।
দুষ্টামি তার পারি কিম্বা
নারি থামাতে,
ভালোমন্দ বোঝাপড়া
তাতে আমাতে।
বাহির হতে তুমি তারে
যেমনি কর দুষী
যত তোমার খুশি,
সে বিচারে আমার কী বা হয়।
খোকা ব'লেই ভালোবাসি,
ভালো ব'লেই নয়।

খোকা আমার কতখানি
সে কি তোমরা বোঝ।
তোমরা শুধু দোষ গুণ তার খোঁজ।
আমি তারে শাসন করি
বুকেতে বেঁধে,
আমি তারে কাঁদাই যে গো
আপনি কেঁদে।
বিচার করি, শাসন করি,
করি তারে দুষী
আমার যাহা খুশি।
তোমার শাসন আমরা মানি নে গো।
শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো।

চাতুরী

আমার খোকা করে গো যদি মনে
এখনি উড়ে পারে সে যেতে
পারিজাতের বনে।
যায় না সে কি সাধে।
মায়ের বুকে মাথাটি থুয়ে
সে ভালোবাসে থাকিতে শুয়ে,
মায়ের মুখ না দেখে যদি
পরান তার কাঁদে।

আমার খোকা সকল কথা জানে।
কিন্তু তার এমন ভাষা,
কে বোঝে তার মানে।
মৌন থাকে সাধে?
মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তার কী আকুলতা,
তাকায় তাই বোবার মতো
মায়ের মুখচাঁদে।

খোকার ছিল রতনমণি কত—
তবু সে এল কোলের 'পরে
ভিখারিটির মতো।
এমন দশা সাধে?
দীনের মতো করিয়া ভান
কাড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ,
তাই সে এল বসনহীন
সন্ন্যাসীর ছাঁদে।

খোকা যে ছিল বাঁধন-বাধা-হারা—
যেখানে জাগে নূতন চাঁদ
ঘুমায় শুকতারা।
ধরা সে দিল সাধে?
অমিয়মাখা কোমল বুকে
হারাতে চাহে অসীম সুখে,
মুকতি চেয়ে বাঁধন মিঠা
মায়ের মায়া-ফাঁদে।

আমার খোকা কাঁদিতে জানিত না,
হাসির দেশে করিত শুধু
সুখের আলোচনা।
কাঁদিতে চাহে সাধে?
মধুমুখের হাসিটি দিয়া
টানে সে বটে মায়ের হিয়া,
কান্না দিয়ে ব্যথার ফাঁসে
দ্বিগুণ বলে বাঁধে।

নির্লিপ্ত

বাছা রে মোর বাছা,
ধূলির 'পরে হরষভরে
লইয়া তৃণগাছা
আপন মনে খেলিছ কোণে,
কাটিছে সারা বেলা।
হাসি গো দেখে এ ধূলি মেখে
এ তৃণ লয়ে খেলা।

আমি যে কাজে রত,
লইয়া খাতা ঘুরাই মাথা
হিসাব কষি কত,
আঁকের সারি হতেছে ভারী
কাটিয়া যায় বেলা—
ভাবিছ দেখি মিথ্যা একি
সময় নিয়ে খেলা।

বাছা রে মোর বাছা,
খেলিতে ধূলি গিয়েছি ভুলি
লইয়ে তৃণগাছা।
কোথায় গেলে খেলেনা মেলে
ভাবিয়া কাটে বেলা,
বেড়াই খুঁজি করিতে পুঁজি
সোনারুপার ঢেলা।

যা পাও চারি দিকে
তাহাই ধরি তুলিছ গড়ি
মনের সুখটিকে।
না পাই যারে চাহিয়া তারে
আমার কাটে বেলা,
আশাতীতেরই আশায় ফিরি
ভাসাই মোর ভেলা।

কেন মধুর

রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রঙ খেলে মেঘে, জলে রঙ ওঠে জেগে,
কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয়-মাঝে বুঝি রে তবে,
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে,
ঢেউ বহে নিজমনে তরল রবে,
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে।

যখন নবনী দিই লোলুপ করে
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,
তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে।

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে,
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি—
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি।

খোকার রাজ্য

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে—
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।
তার রবি শশী তারা
জানি নে কেমনধারা
সভা করে আকাশের তলে,

আমার খোকার সাথে
গোপনে দিবসে রাতে
শুনেছি তাদের কথা চলে।
শুনেছি আকাশ তারে
নামিয়া মাঠের পারে
লোভায় রঙিন ধনু হাতে,
আসি শালবন-'পরে
মেঘেরা মন্ত্রণা করে
খেলা করিবারে তার সাথে।
যারা আমাদের কাছে
নীরব গম্ভীর আছে,
আশার অতীত যারা সবে,
খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে।

খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁষে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টিশেষে
সকল-উদ্দেশ-হারা
সকল-ভূগোল-ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে—
যেথা আসে রাত্রিদিন
সর্ব-ইতিহাস-হীন
রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া,
তারি যদি এক ধারে
পাই আমি বসিবারে
দেখি কারা করে আসা-যাওয়া।
তাহারা অদ্ভুত লোক,
নাই কারো দুঃখ শোক,
নেই তারা কোনো কর্মে কাজে,

চিন্তাহীন মৃত্যুহীন
চলিয়াছে চিরদিন
খোকাদের গল্পলোক-মাঝে
সেথা ফুল গাছপালা
নাগকন্যা রাজবালা
মানুষ রাক্ষস পশু পাখি,
যাহা খুশি তাই করে,
সত্যেরে কিছু না ডরে,
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি।

ভিতরে ও বাহিরে

খোকা থাকে জগৎ-মায়ের
অন্তঃপুরে—
তাই সে শোনে কত যে গান
কতই সুরে।
নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে
আকাশ পাতাল
মা রচেছেন খোকার খেলা-
ঘরের চাতাল।
তিনি হাসেন, যখন তরু-
লতার দলে
খোকার কাছে পাতা নেড়ে
প্রলাপ বলে।
সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য শশী
খোকার সাথে হাসে, যেন
এক-বয়সী।

সত্য বুড়ো নানা রঙের
মুখোশ প'রে
শিশুর সনে শিশুর মতো
গল্প করে।
চরাচরের সকল কর্ম
ক'রে হেলা
মা যে আসেন খোকার সঙ্গে
করতে খেলা।
খোকার জন্যে করেন সৃষ্টি
যা ইচ্ছে তাই—
কোনো নিয়ম কোনো বাধা-
বিপত্তি নাই।
বোবাদেরও কথা বলান
খোকার কানে,
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন
চেতন প্রাণে।
খোকার তরে গল্প রচে
বর্ষা শরৎ,
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে
বিশ্বজগৎ।
খোকা তারি মাঝখানেতে
বেড়ায় ঘুরে,
খোকা থাকে জগৎ-মায়ের
অন্তঃপুরে।

আমরা থাকি জগৎ-পিতার
বিদ্যালয়ে—
উঠেছে ঘর পাথর-গাঁথা
দেয়াল লয়ে।

জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে চলে
সূর্য শশী,
নিয়ম থাকে বাগিয়ে ল'য়ে
রশারশি।
এম্‌নি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে
বৃক্ষ লতা,
যেন তারা বোঝেই নাকো
কোনোই কথা।
চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে
এম্‌নি ভানে
যেন তারা সাত ভায়েরে
কেউ না জানে।
মেঘেরা চায় এম্‌নিতরো
অবোধ ভাবে,
যেন তারা জানেই নাকো
কোথায় যাবে।
ভাঙা পুতুল গড়ায় ভুঁয়ে
সকল বেলা,
যেন তারা কেবল শুধু
মাটির ঢেলা।
দিঘি থাকে নীরব হয়ে
দিবারাত্র,
নাগকন্যের কথা যেন
গল্পমাত্র।
সুখদুঃখ এম্‌নি বুকে
চেপে রহে,
যেন তারা কিছুমাত্র
গল্প নহে।
যেমন আছে তেম্‌নি থাকে
যে যাহা তাই—

আর যে কিছু হবে এমন
ক্ষমতা নাই।
বিশ্বগুরু-মশায় থাকেন
কঠিন হয়ে,
আমরা থাকি জগৎ-পিতার
বিদ্যালয়ে।

প্রশ্ন

মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল্,
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে ব'সে
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।
তুমি বলছ দুপুর এখন সবে,
নাহয় যেন সত্যি হল তাই,
একদিনও কি দুপুরবেলা হলে
বিকেল হল মনে করতে নাই?
আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে
সুয্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে,
বাগ্‌দি-বুড়ি চুবড়ি ভরে নিয়ে
শাক তুলেছে পুকুর-ধারে এসে।
আঁধার হল মাদার-গাছের তলা,
কালী হয়ে এল দিঘির জল,
হাটের থেকে সবাই এল ফিরে,
মাঠের থেকে এল চাষির দল।
মনে কর্-না উঠল সাঁঝের তারা,
মনে কর্-না সন্ধে হল যেন।
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন।

সমব্যথী

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা—
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা ?
সত্যি করে বল্‌
আমায় করিস নে মা ছল—
বলতে আমায় 'দূর দূর দূর।
কোথা থেকে এল এই কুকুর' ?
যা মা, তবে যা মা,
আমায় কোলের থেকে নামা।
আমি খাব না তোর হাতে,
আমি খাব না তোর পাতে।

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে,
তবে পাছে যাই মা, উড়ে
আমায় রাখতে শিকল দিয়ে ?
সত্যি করে বল্‌
আমায় করিস নে মা, ছল—
বলতে আমায় 'হতভাগা পাখি
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি' ?
তবে নামিয়ে দে মা,
আমায় ভালোবাসিস নে মা।
আমি রব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চলে।

বিচিত্র সাধ

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরিওলা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।
'চুড়ি চা—ই, চুড়ি চাই' সে হাঁকে,
চীনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তার খুশি,
যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে,
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অম্‌নি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।

আমি যখন হাতে মেখে কালী
ঘরে ফিরি, সাড়ে চারটে বাজে,
কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালী
বাবুদের ওই ফুলবাগানের মাঝে।
কেউ তো তারে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের 'পরে।
গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো,
কেউ তো এসে বকে না তার কাজে।
মা তারে তো পরায় না সাফ জামা,
ধুয়ে দিতে চায় না ধুলোবালি।
ইচ্ছে করে আমি হতেম যদি
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মালী।

একটু বেশি রাত না হতে হতে
মা আমাদের ঘুম পাড়াতে চায়।
জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে
পাগড়ি প'রে পাহারওলা যায়।
আঁধার গলি, লোক বেশি না চলে,
গ্যাসের আলো মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে,
লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরজায়।
রাত হয়ে যায় দশটা এগারোটা
কেউ তো কিছু বলে না তার লাগি।
ইচ্ছে করে পাহারওলা হয়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি।

মাস্টারবাবু

আমি আজ কানাই মাস্টার,
পোড়ো মোর বেড়ালছানাটি।
আমি ওকে মারি নে মা, বেত,
মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।
রোজ রোজ দেরি করে আসে,
পড়াতে দেয় না ও তো মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই
যত আমি বলি 'শোন্ শোন্'।
দিনরাত খেলা খেলা খেলা,
লেখায় পড়ায় ভারি হেলা।
আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ'।

প্রথম ভাগের পাতা খুলে
　　আমি ওরে বোঝাই মা, কত—
চুরি করে খাস নে কখনো,
　　ভালো হোস গোপালের মতো।
যত বলি সব হয় মিছে,
　　কথা যদি একটিও শোনে—
মাছ যদি দেখেছে কোথাও
　　কিছুই থাকে না আর মনে।
চড়াই পাখির দেখা পেলে
　　ছুটে যায় সব পড়া ফেলে।
যত বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ'
　　দুষ্টুমি ক'রে বলে 'মিয়োঁ'।

আমি ওরে বলি বার বার,
　　'পড়ার সময় তুমি পোড়ো—
তার পরে ছুটি হয়ে গেলে
　　খেলার সময় খেলা কোরো।'
ভালোমানুষের মতো থাকে,
　　আড়ে আড়ে চায় মুখপানে,
এম্‌নি সে ভান করে যেন
　　যা বলি বুঝেছে তার মানে।
একটু সুযোগ বোঝে যেই
　　কোথা যায় আর দেখা নেই।
আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
　　ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ'।

বিজ্ঞ

খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুস।
আমি যখন খাওয়া-খাওয়া খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে
মুঠো ক'রে মুখে দেয় মা, পুরি।
সামনেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি, 'খুকি, পড়া করো'
দু হাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে—
তোমার খুকির পড়া কেমনতরো।
আমি যদি মুখে কাপড় দিয়ে
আস্তে আস্তে আসি গুড়িগুড়ি
তোমার খুকি অম্‌নি কেঁদে ওঠে,
ও ভাবে বা এল জুজুবুড়ি।
আমি যদি রাগ ক'রে কখনো
মাথা নেড়ে চোখ রাঙিয়ে বকি—
তোমার খুকি খিল্‌খিলিয়ে হাসে।
খেলা করছি মনে করে ও কি।
সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে
তবু যদি বলি 'আসছে বাবা'
তাড়াতাড়ি চার দিকেতে চায়—
তোমার খুকি এম্‌নি বোকা হাবা।
ধোবা এলে পড়াই যখন আমি
টেনে নিয়ে তাদের বাচ্ছা গাধা,
আমি বলি 'আমি গুরুমশাই',
ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকে 'দাদা'।

তোমার খুকি চাঁদ ধরতে চায়,
গণেশকে ও বলে যে মা গাহুশ।
তোমার খুকি কিচ্ছু বোঝে না মা,
তোমার খুকি ভারি ছেলেমানুষ।

ব্যাকুল

অমন করে আছিস কেন মা গো,
খোকারে তোর কোলে নিবি না গো?
পা ছড়িয়ে ঘরের কোণে
কী যে ভাবিস আপন মনে,
এখনো তোর হয় নি তো চুল বাঁধা।
বৃষ্টিতে যায় মাথা ভিজে,
জানলা খুলে দেখিস কী যে—
কাপড়ে যে লাগবে ধুলোকাদা।
ওই তো গেল চারটে বেজে,
ছুটি হল ইস্কুলে যে—
দাদা আসবে মনে নেইকো সিটি।
বেলা অম্‌নি গেল বয়ে,
কেন আছিস অমন হয়ে—
আজকে বুঝি পাস নি বাবার চিঠি।
পেয়াদাটা ঝুলির থেকে
সবার চিঠি গেল রেখে—
বাবার চিঠি রোজ কেন সে দেয় না।
পড়বে ব'লে আপনি রাখে,
যায় সে চলে ঝুলি-কাঁখে,
পেয়াদাটা ভারি দুষ্টু স্যায়না।

মা গো মা, তুই আমার কথা শোন্,
ভাবিস নে মা, অমন সারা ক্ষণ।
কালকে যখন হাটের বারে
বাজার করতে যাবে পারে
কাগজ কলম আনতে বলিস ঝিকে।
দেখো ভুল করব না কোনো—
ক খ থেকে মূর্ধন্য ণ
বাবার চিঠি আমিই দেব লিখে।
কেন মা, তুই হাসিস কেন।
বাবার মতো আমি যেন
অমন ভালো লিখতে পারি নেকো,
লাইন কেটে মোটা মোটা
বড়ো বড়ো গোটা গোটা
লিখব যখন তখন তুমি দেখো।
চিঠি লেখা হলে পরে
বাবার মতো বুদ্ধি ক'রে
ভাবছ দেব ঝুলির মধ্যে ফেলে ?
কক্‌খনো না, আপনি নিয়ে
যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে,
ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে।

ছোটোবড়ো

এখনো তো বড়ো হই নি আমি,
ছোটো আছি ছেলেমানুষ ব'লে
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে।

দাদা তখন পড়তে যদি না চায়,
পাখির ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তারে এমনি বকে দেব!
বলব, 'তুমি চুপটি ক'রে পড়ো।'
বলব, 'তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে'—
যখন হব বাবার মতো বড়ো।
তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
ভালো ভালো পুষব পাখির ছানা।

সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে
নাবার জন্যে করব না তো তাড়া।
ছাতা একটা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে
চটি পায়ে বেড়িয়ে আসব পাড়া।
গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বলব ঘরে,
তিনি যদি বলেন 'সেলেট কোথা?
দেরি হচ্ছে, বসে পড়া করো'
আমি বলব, 'খোকা তো আর নেই,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।'
গুরুমশায় শুনে তখন কবে,
'বাবুমশায়, আসি এখন তবে।'

খেলা করতে নিয়ে যেতে মাঠে
ভুলু যখন আসবে বিকেল বেলা,
আমি তাকে ধমক দিয়ে কব,
'কাজ করছি, গোল কোরো না মেলা।'
রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়
একলা যাব, করব না তো ভয়—
মামা যদি বলেন ছুটে এসে
'হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়ো'

বলব আমি, 'দেখছ না কি মামা,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।'
দেখে দেখে মামা বলবে, 'তাই তো,
খোকা আমার সে খোকা আর নাই তো।'

আমি যেদিন প্রথম বড়ো হব
মা সেদিনে গঙ্গাস্নানের পরে
আসবে যখন খিড়কি-দুয়োর দিয়ে
ভাববে 'কেন গোল শুনি নে ঘরে।'
তখন আমি চাবি খুলতে শিখে
যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝিকে,
মা দেখে তাই বলবে তাড়াতাড়ি,
'খোকা, তোমার খেলা কেমনতরো।'
আমি বলব, 'মাইনে দিচ্ছি আমি,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।
ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
যত চাই মা, এনে দেব আবার।'

আশ্বিনেতে পুজোর ছুটি হবে,
মেলা বসবে গাজনতলার হাটে,
বাবার নৌকো কত দূরের থেকে
লাগবে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে।
বাবা মনে ভাববে সোজাসুজি,
খোকা তেমনি খোকাই আছে বুঝি,
ছোটো ছোটো রঙিন জামা জুতো
কিনে এনে বলবে আমায় 'পরো'।
আমি বলব, 'দাদা পরুক এসে,
আমি এখন তোমার মতো বড়ো।
দেখছ না কি যে ছোটো মাপ জামার—
পরতে গেলে আঁট হবে যে আমার।'

সমালোচক

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে।
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে।
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি ?— বল্‌ মা সত্যি ক'রে।
এমন লেখায় তবে
বল্‌ দেখি কী হবে।
তোর মুখে মা, যেমন কথা শুনি,
তেমন কেন লেখেন নাকো উনি।
ঠাকুরমা কি বাবাকে কক্‌খনো
রাজার কথা শোনায় নিকো কোনো।
সে-সব কথাগুলি
গেছেন বুঝি ভুলি ?

স্নান করতে বেলা হল দেখে
তুমি কেবল যাও মা, ডেকে ডেকে—
খাবার নিয়ে তুমি বসেই থাকো,
সে কথা তাঁর মনেই থাকে নাকো।
করেন সারা বেলা
লেখা-লেখা খেলা।
বাবার ঘরে আমি খেলতে গেলে
তুমি আমায় বল, 'দুষ্টু ছেলে !'
বক আমায় গোল করলে পরে—
'দেখছিস নে লিখছে বাবা ঘরে !'
বল্‌ তো, সত্যি বল্‌,
লিখে কী হয় ফল।

আমি যখন বাবার খাতা টেনে
লিখি বসে দোয়াত কলম এনে—
ক খ গ ঘ ঙ হ য ব র,
আমার বেলা কেন মা, রাগ কর।
বাবা যখন লেখে
কথা কও না দেখে।
বড়ো বড়ো রুল কাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ।
আমি যদি নৌকো করতে চাই
অম্‌নি বল, নষ্ট করতে নাই।
সাদা কাগজ কালো
করলে বুঝি ভালো?

বীরপুরুষ

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূধূ করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,

অশ্বপৃষ্ঠে শমীন্দ্রনাথ

পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে,'
আমি বলি, 'দেখো না চুপ করে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে',
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে—
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল!
কী দুর্দশাই হত তা না হলে।'

রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে,
দাদা বলত, 'কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে'
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।'

রাজার বাড়ি

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো ;
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত।
রুপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে সাদা হাতির দাঁত।
সাত-মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরানী,
সাত রাজার ধন মানিক-গাঁথা গলার মালাখানি।
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসি গাছের টব আছে যেইখানে।

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাত সাগরের পারে
আমি ছাড়া আর কেহ তো পায় না খুঁজে তারে।
দু হাতে তার কাঁকন দুটি, দুই কানে দুই দুল,
খাটের থেকে মাটির 'পরে লুটিয়ে পড়ে চুল।
ঘুম ভেঙে তার যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে
হাসিতে তার মানিকগুলি পড়বে ঝ'রে ভুঁয়ে।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসি গাছের টব আছে যেইখানে।

তোমরা যখন ঘাটে চল স্নানের বেলা হলে
আমি তখন চুপি চুপি যাই যে ছাদে চলে।
পাঁচিল বেয়ে ছায়াখানি পড়ে মা, যেই কোণে
সেইখানেতে পা ছড়িয়ে বসি আপন মনে।
সঙ্গে শুধু নিয়ে আসি মিনি বেড়ালটাকে,
সেও জানে নাপিত ভায়া কোন্খানেতে থাকে।
জানিস নাপিতপাড়া কোথায় ? শোন্ মা, কানে কানে-
ছাদের পাশে তুলসি গাছের টব আছে যেইখানে।

মাঝি

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ঐ পারে—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে;
জাল টেনে নেয় জেলে,
গোরু মহিষ সাঁৎরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধে হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে
শুধু রাতদুপুরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙাটার 'পরে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মতো।
বর্ষা হলে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়
চখাচখী যত।
তারি ধারে ঘন হয়ে
জন্মেছে সব শর;
মানিক-জোড়ের ঘর,

কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের 'পর।
সন্ধ্যা হলে কত দিন মা,
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি একমনে—
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

এ-পার ও-পার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।
যত ছেলেমেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখবে চেয়ে চেয়ে।
সূর্য যখন উঠবে মাথায়
অনেক বেলা হলে—
আসব তখন চলে
'বড়ো খিদে পেয়েছে গো—
খেতে দাও মা' বলে।
আবার আমি আসব ফিরে
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে।
বাবার মতো যাব না মা,
বিদেশে কোন্ কাজে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

নৌকাযাত্রা

মধু মাঝির ঐ যে নৌকোখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে,
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো,
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা—
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাকো হাটে।
আমি কেবল যাই একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

তখন তুমি কেঁদো না মা, যেন
বসে বসে একলা ঘরের কোণে—
আমি তো মা, যাচ্ছি নেকো চলে
রামের মতো চোদ্দ বছর বনে।
আমি যাব রাজপুত্র হয়ে
নৌকো-ভরা সোনামানিক বয়ে,
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে,
আমরা শুধু যাব মা তিন জনে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

ভোরের বেলা দেব নৌকো ছেড়ে,
দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে
দুপুরবেলা তুমি পুকুর-ঘাটে,
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।

পেরিয়ে যাব তিরপুর্নির ঘাট,
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে,
গল্প বলব তোমার কোলে এসে
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

ছুটির দিনে

ঐ দেখো মা, আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এল আলো,
আজকে আমার ছুটোছুটি
লাগল না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন,
অনেক হল বেলা।
তোমায় মনে পড়ে গেল,
ফেলে এলেম খেলা।
আজকে আমার ছুটি, আমার
শনিবারের ছুটি।
কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা তোর পায়ে লুটি।
দ্বারের কাছে এইখানে বোস,
এই হেথা চৌকাঠ—
বল্ আমারে কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

ঐ দেখো মা, বর্ষা এল
ঘনঘটায় ঘিরে,
বিজুলি ধায় এঁকেবেঁকে
আকাশ চিরে চিরে।

দেব্‌তা যখন ডেকে ওঠে
থর্‌থরিয়ে কেঁপে
ভয় করতেই ভালোবাসি
তোমায় বুকে চেপে।
ঝুপ্‌ঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন
বাঁশের বনে পড়ে
কথা শুনতে ভালোবাসি
বসে কোণের ঘরে।
ঐ দেখো মা, জানলা দিয়ে
আসে জলের ছাট—
বল্‌ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

কোন্‌ সাগরের তীরে মা গো,
কোন্‌ পাহাড়ের পারে,
কোন্‌ রাজাদের দেশে মা গো,
কোন্‌ নদীটির ধারে।
কোনোখানে আল বাঁধা তার
নাই ডাইনে বাঁয়ে?
পথ দিয়ে তার সন্ধেবেলায়
পৌঁছে না কেউ গাঁয়ে?
সারা দিন কি ধূ ধূ করে'
শুকনো ঘাসের জমি?
একটি গাছে থাকে শুধু
ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমী?
সেখান দিয়ে কাঠকুড়ুনি
যায় না নিয়ে কাঠ?
বল্‌ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

এমনিতরো মেঘ করেছে
সারা আকাশ ব্যেপে,
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে
একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তার
বুকের 'পরে নাচে—
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ পেলে কার কাছে।
মেঘে যখন ঝিলিক মারে
আকাশের এক কোণে
দুয়োরানী-মায়ের কথা
পড়ে না তার মনে?'
দুখিনী মা গোয়াল-ঘরে
দিচ্ছে এখন ঝাঁট,
রাজপুত্তুর চলে যে কোন্‌
তেপান্তরের মাঠ।

ঐ দেখো মা, গাঁয়ের পথে
লোক নেইকো মোটে,
রাখাল-ছেলে সকাল করে
ফিরেছে আজ গোঠে।
আজকে দেখো রাত হয়েছে
দিন না যেতে যেতে,
কৃষাণেরা বসে আছে
দাওয়ায় মাদুর পেতে।
আজকে আমি লুকিয়েছি মা,
পুঁথিপত্তর যত—
পড়ার কথা আজ বোলো না।
যখন বাবার মতো

বড়ো হব তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ—
আজ বলো মা, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

বনবাস

বাবা যদি রামের মতো
পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারি নে কি
তুমি ভাবছ মনে ?
চোদ্দ বছর ক' দিনে হয়
জানি নে মা ঠিক,
দণ্ডক বন আছে কোথায়
ঐ মাঠে কোন্ দিক।
কিন্তু আমি পারি যেতে,
ভয় করি নে তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়
বেঁধে নিতেম ঘর—
সামনে দিয়ে বইত নদী,
পড়ত বালির চর।
ছোটো একটি থাকত ডিঙি
পারে যেতেম বেয়ে—
হরিণ চ'রে বেড়ায় সেথা,
কাছে আসত ধেয়ে।

গাছের পাতা খাইয়ে দিতেম
আমি নিজের হাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

কত যে গাছ ছেয়ে থাকত
কত রকম ফুলে,
মালা গেঁথে পরে নিতেম
জড়িয়ে মাথার চুলে।
নানা রঙের ফলগুলি সব
ভুঁয়ে পড়ত পেকে,
ঝুড়ি ভরে ভরে এনে
ঘরে দিতেম রেখে ;
খিদে পেলে দুই ভায়েতে
খেতেম পদ্মপাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

রোদের বেলায় অশথ-তলায়
ঘাসের 'পরে আসি
রাখাল-ছেলের মতো কেবল
বাজাই বসে বাঁশি।
ডালের 'পরে ময়ূর থাকে,
পেখম পড়ে ঝুলে—
কাঠবিড়ালি ছুটে বেড়ায়
ন্যাজটি পিঠে তুলে।
কখন আমি ঘুমিয়ে যেতেম
দুপুরবেলার তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

সন্ধেবেলায় কুড়িয়ে আনি
শুকোনো ডালপালা,
বনের ধারে বসে থাকি
আগুন হলে জ্বালা।
পাখিরা সব বাসায় ফেরে,
দূরে শেয়াল ডাকে,
সন্ধেতারা দেখা যে যায়
ডালের ফাঁকে ফাঁকে।
মায়ের কথা মনে করি
বসে আঁধার রাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

ঠাকুরদাদার মতো বনে
আছেন ঋষি মুনি,
তাঁদের পায়ে প্রণাম করে
গল্প অনেক শুনি।
রাক্ষসেরে ভয় করি নে,
আছে গুহক মিতা—
রাবণ আমার কী করবে মা,
নেই তো আমার সীতা।
হনুমানকে যত্ন করে
খাওয়াই দুধে-ভাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

মা গো, আমায় দে-না কেন
একটি ছোটো ভাই—
দুইজনেতে মিলে আমরা
বনে চলে যাই।

আমাকে মা, শিখিয়ে দিবি
রাম-যাত্রার গান,
মাথায় বেঁধে দিবি চুড়ো,
হাতে ধনুক-বাণ।
চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই
এম্‌নি বরষাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র

আমি শুধু বলেছিলেম—
'কদম গাছের ডালে
পূর্ণিমা-চাঁদ আটকা পড়ে
যখন সন্ধেকালে
তখন কি কেউ তারে
ধরে আনতে পারে।'
শুনে দাদা হেসে কেন
বললে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাইকো বোকা।
চাঁদ যে থাকে অনেক দূরে
কেমন করে ছুঁই।'
আমি বলি, 'দাদা, তুমি
জান না কিচ্ছুই।
মা আমাদের হাসে যখন
ঐ জানলার ফাঁকে
তখন তুমি বলবে কি, মা
অনেক দূরে থাকে।'
তবু দাদা বলে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।'

দাদা বলে, 'পাবি কোথায়
অত বড়ো ফাঁদ।'
আমি বলি, 'কেন দাদা,
ঐ তো ছোটো চাঁদ,
দুটি মুঠোয় ওরে
আনতে পারি ধরে।'
শুনে দাদা হেসে কেন
বললে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।
চাঁদ যদি এই কাছে আসত
দেখতে কত বড়ো।'
আমি বলি, 'কী তুমি ছাই
ইস্কুলে যে পড়।
মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নিচু,
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড়ো কিছু।'
তবু দাদা বলে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।'

বৈজ্ঞানিক

যেম্‌নি মা গো গুরু গুরু
মেঘের পেলে সাড়া
যেম্‌নি এল আষাঢ় মাসে
বৃষ্টিজলের ধারা,
পুবে হাওয়া মাঠ পেরিয়ে
যেম্‌নি পড়ল আসি

বাঁশ-বাগানে সোঁ সোঁ ক'রে
বাজিয়ে দিয়ে বাঁশি—
অম্‌নি দেখ্‌, মা, চেয়ে—
সকল মাটি ছেয়ে
কোথা থেকে উঠল যে ফুল
এত রাশি রাশি।

তুই যে ভাবিস ওরা কেবল
অম্‌নি যেন ফুল,
আমার মনে হয় মা, তোদের
সেটা ভারি ভুল।
ওরা সব ইস্‌কুলের ছেলে,
পুঁথি-পত্র কাঁখে
মাটির নীচে ওরা ওদের
পাঠশালাতে থাকে
ওরা পড়া করে
দুয়োর-বন্ধ ঘরে,
খেলতে চাইলে গুরুমশায়
দাঁড় করিয়ে রাখে।

বোশেখ-জষ্ঠি মাসকে ওরা
দুপুর বেলা কয়,
আষাঢ় হলে আঁধার ক'রে
বিকেল ওদের হয়।
ডালপালারা শব্দ করে
ঘন বনের মাঝে,
মেঘের ডাকে তখন ওদের
সাড়ে চারটে বাজে।

অমনি ছুটি পেয়ে
আসে সবাই ধেয়ে,
হলদে রাঙা সবুজ সাদা
কত রকম সাজে

জানিস মা গো, ওদের যেন
আকাশেতেই বাড়ি,
রাত্রে যেথায় তারাগুলি
দাঁড়ায় সারি সারি।
দেখিস নে মা, বাগান ছেয়ে
ব্যস্ত ওরা কত!
বুঝতে পারিস কেন ওদের
তাড়াতাড়ি অত?
জানিস কি কার কাছে
হাত বাড়িয়ে আছে।
মা কি ওদের নেইকো ভাবিস
আমার মায়ের মতো?

মাতৃবৎসল

মেঘের মধ্যে মা গো, যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।
বলে, 'আমরা কেবল করি খেলা,
সকাল থেকে দুপুর সন্ধেবেলা।
সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,
রুপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধরে।'
আমি বলি, 'যাব কেমন করে।'
তারা বলে, 'এসো মাঠের শেষে।

সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে,
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে।'
আমি বলি, 'মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে।'
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ,
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ—
দু হাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে,
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ।

ঢেউয়ের মধ্যে মা গো যারা থাকে,
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।
বলে, 'আমরা কেবল করি গান
সকাল থেকে সকল দিনমান।'
তারা বলে, 'কোন্ দেশে যে ভাই,
আমরা চলি ঠিকানা তার নাই।'
আমি বলি, 'কেমন করে যাই।'
তারা বলে, 'এসো ঘাটের শেষে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে চোখ বুজে,
আমরা তোমায় নেব ঢেউয়ের দেশে।'
আমি বলি, 'মা যে চেয়ে থাকে,
সন্ধে হলে নাম ধরে মোর ডাকে,
কেমন ক'রে ছেড়ে থাকব তাকে।'
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা, আমি হব ঢেউ,
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ।
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে,
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ।

লুকোচুরি

আমি যদি দুষ্টুমি ক'রে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মা গো, ডালের 'পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি,
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিনতে আমায় পারো।
তুমি ডাক, 'খোকা কোথায় ওরে।'
আমি শুধু হাসি চুপটি করে।

যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে
সবই আমি দেখব নয়ন মেলে।
স্নানটি করে চাঁপার তলা দিয়ে
আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে;
এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে—
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে।

দুপুর বেলা মহাভারত-হাতে
বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে,
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে,
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোর বইয়ের 'পরে আনি—
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে।

সন্ধেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়ালঘরে

তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ্ করে মা, পড়ব ভুঁয়ে ঝরে।
আবার আমি তোমার খোকা হব,
'গল্প বলো' তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বলবে, 'দুষ্টু, ছিলি কোথা।'
আমি বলব, 'বলব না সে কথা।'

দুঃখহারী

মনে করো, তুমি থাকবে ঘরে,
আমি যেন যাব দেশান্তরে।
ঘাটে আমার বাঁধা আছে তরী,
জিনিসপত্র নিয়েছি সব ভরি—
ভালো করে দেখ্ তো মনে করি
কী এনে মা, দেব তোমার তরে।

চাস কি মা, তুই এত এত সোনা—
সোনার দেশে করব আনাগোনা।
সোনামতী নদীতীরের কাছে
সোনার ফসল মাঠে ফ'লে আছে,
সোনার চাঁপা ফোটে সেথায় গাছে—
না কুড়িয়ে আমি তো ফিরব না।

পরতে কি চাস মুক্তো গেঁথে হারে—
জাহাজ বেয়ে যাব সাগর-পারে।
সেখানে মা, সকালবেলা হলে
ফুলের 'পরে মুক্তোগুলি দোলে,
টুপটুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে—
যত পারি আনব ভারে ভারে।

দাদার জন্যে আনব মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা দুটি ঘোড়া।
বাবার জন্যে আনব আমি তুলি
কনক-লতার চারা অনেকগুলি—
তোর তরে মা, দেব কৌটা খুলি
সাত-রাজার-ধন মানিক একটি জোড়া

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা বলে,
বলব আমি, 'নাই সে খোকা নাই।'
মা গো, যাই।

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে
যাব মা, তোর বুকে বয়ে,
ধরতে আমায় পারবি নে তো হাতে।
জলের মধ্যে হব মা, ঢেউ,
জানতে আমায় পারবে না কেউ—
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।

বাদলা যখন পড়বে ঝরে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝর্‌ঝরানি গান গাব ঐ বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক মেরে যাব দেখে,
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে।

খোকার লাগি তুমি মা গো,
অনেক রাতে যদি জাগ
তারা হয়ে বলব তোমায়, 'ঘুমো!'
তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো।

স্বপন হয়ে আঁখির ফাঁকে
দেখতে আমি আসব মাকে,
যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে।
জেগে তুমি মিথ্যে আশে
হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে—
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে।

পুজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বলবে 'খোকা নেই রে ঘরের মাঝে'।
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে।

পুজোর কাপড় হাতে ক'রে
মাসি যদি শুধায় তোরে,
'খোকা তোমার কোথায় গেল চলে।'
বলিস 'খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।'

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

দিনের আলো নিবে এল,
　　　　সুয্যি ডোবে-ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
　　　　চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে—
　　　　রঙের উপর রঙ,
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
　　　　বাজল ঠঙ ঠঙ।
ও পারেতে বিষ্টি এল,
　　　　ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায়
　　　　একশো মানিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে
　　　　ছেলেবেলার গান—
'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
　　　　নদেয় এল বান।'

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা,
　　　　কোথায় বা সীমানা।
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়,
　　　　কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে
　　　　বিষ্টি দিয়ে যায়,
পলে পলে নতুন খেলা
　　　　কোথায় ভেবে পায়।

মেঘের খেলা দেখে কত
খেলা পড়ে মনে,
কত দিনের লুকোচুরি
কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান।'

মনে পড়ে ঘরটি আলো
মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে
গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের 'পরে দৌরাত্মি সে
না যায় লেখাজোখা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে—
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলেম গান—
'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান।'

মনে পড়ে সুয়োরানী
দুয়োরানীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা।

মনে পড়ে ঘরের কোণে
মিটিমিটি আলো,
একটা দিকের দেয়ালেতে
ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে
একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘলা দিনের গান—
'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান।'

কবে বিষ্টি পড়েছিল,
বান এল সে কোথা।
শিবঠাকুরের বিয়ে হল,
কবেকার সে কথা।
সেদিনও কি এম্‌নিতরো
মেঘের ঘটাখানা।
থেকে থেকে বাজ বিজুলি
দিচ্ছিল কি হানা।
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে
কী হল তার শেষে।
না জানি কোন্ নদীর ধারে,
না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান।'

সাত ভাই চম্পা

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে,
সাতটি চাঁপা ভাই—
রাঙা-বসন পারুলদিদি,
তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে
সাতটি সোনা মুখ,
পারুলদিদির কচি মুখটি
করতেছে টুক্‌টুক।
ঘুমটি ভাঙে পাখির ডাকে,
রাতটি যে পোহালো—
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে
চাঁপার মতো আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে
মুখখানি বের ক'রে
কী দেখছে সাত ভায়েতে
সারা সকাল ধ'রে।

দেখছে চেয়ে ফুলের বনে
গোলাপ ফোটে-ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে,
চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায়
দুষ্টু ছেলের মতো,
লতায় পাতায় হেলাদোলা
কোলাকুলি কত।
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে
ছায়াটি কাঁপে জলে—

ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে
শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখতেছে ভাই বোন-
দুখিনী এক মায়ের তরে
আকুল হল মন।

সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে
পাতার ঝুরুঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন
বুকের দুরুদুরু।
কেবল শুনি কুলুকুলু
একি ঢেউয়ের খেলা।
বনের মধ্যে ডাকে ঘুঘু
সারা দুপুরবেলা।
মৌমাছি সে গুন্‌গুনিয়ে
খুঁজে বেড়ায় কাকে,
ঘাসের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ ক'রে
ঝিঁঝি পোকা ডাকে।
ফুলের পাতায় মাথা রেখে
শুনতেছে ভাই বোন-
মায়ের কথা মনে পড়ে,
আকুল করে মন।

মেঘের পানে চেয়ে দেখে—
মেঘ চলেছে ভেসে,
রাজহাঁসেরা উড়ে উড়ে
চলেছে কোন্ দেশে।

প্রজাপতির বাড়ি কোথায়
জানে না তো কেউ,
সমস্ত দিন কোথায় চলে
লক্ষ হাজার ঢেউ।
দুপুর বেলা থেকে থেকে
উদাস হল বায়,
শুকনো পাতা খ'সে প'ড়ে
কোথায় উড়ে যায়।
ফুলের মাঝে দুই গালে হাত
দেখতেছে ভাই বোন—
মায়ের কথা পড়ছে মনে,
কাঁদছে পরান মন।

সন্ধে হলে জোনাই জ্বলে
পাতায় পাতায়,
অশথ গাছে দুটি তারা
গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হল,
স্তব্ধ পাখির ডাক,
থেকে থেকে করছে কা-কা
দুটো-একটা কাক।
পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি,
পুবে আঁধার করে—
সাতটি ভায়ে গুটিসুটি
চাঁপা ফুলের ঘরে।
'গল্প বলো পারুলদিদি'
সাতটি চাঁপা ডাকে,
পারুলদিদির গল্প শুনে
মনে পড়ে মাকে।

প্রহর বাজে, রাত হয়েছে,
ঝাঁ ঝাঁ করে বন —
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল
আটটি ভাই বোন।
সাতটি তারা চেয়ে আছে
সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের
মুখের 'পরে লাগে।
ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে
সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে
সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে
স্বপ্ন দেখে মাকে—
সকাল বেলা 'জাগো জাগো'
পারুলদিদি ডাকে।

নবীন অতিথি

গান

ওহে নবীন অতিথি,
তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সংগোপন।
যতনে কত কী আনি বেঁধেছিনু গৃহখানি,
হেথা কে তোমারে বলো করেছিল নিমন্ত্রণ।
কত আশা ভালোবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে, কত হাসি অশ্রুজলে!
একটি না কহি বাণী তুমি এলে মহারানী,
কেমনে গোপন মনে করিলে হে পদার্পণ।

অস্তসখী

রজনী একাদশী
　　পোহায় ধীরে ধীরে,
রঙিন মেঘমালা
　　উষারে বাঁধে ঘিরে।
আকাশে ক্ষীণ শশী
　　আড়ালে যেতে চায়,
দাঁড়ায়ে মাঝখানে
　　কিনারা নাহি পায়।

এ-হেন কালে যেন
　　মায়ের পানে মেয়ে
রয়েছে শুকতারা
　　চাঁদের মুখে চেয়ে।
কে তুমি মরি মরি
　　একটুখানি প্রাণ।
এনেছ কী না জানি
　　করিতে ওরে দান।

মহিমা যত ছিল
　　উদয়-বেলাকার
যতেক সুখসাথি
　　এখনি যাবে যার,
পুরানো সব গেল—
　　নূতন তুমি একা
বিদায়-কালে তারে
　　হাসিয়া দিলে দেখা।
ও চাঁদ যামিনীর
　　হাসির অবশেষ,

ও শুধু অতীতের
সুখের স্মৃতিলেশ।
তারারা দ্রুতপদে
কোথায় গেছে সরে—
পারে নি সাথে যেতে,
পিছিয়ে আছে পড়ে।

তাদেরই পানে ও যে
নয়ন ছিল মেলি,
তাদেরই পথে ও যে
চরণ ছিল ফেলি,
এমন সময়ে কে
ডাকিলে পিছু-পানে
একটি আলোকেরই
একটু মৃদু গানে।

গভরী রজনীর
রিক্ত ভিখারিকে
ভোরের বেলাকার
কী লিপি দিলে লিখে।
সোনার-আভা-মাখা
কী নব আশাখানি
শিশির-জলে ধুয়ে
তাহারে দিলে আনি।

অস্ত-উদয়ের
মাঝেতে তুমি এসে
প্রাচীন নবীনেরে
টানিছ ভালোবেসে—

বধূ ও বর -রূপে
করিলে এক-হিয়া
করুণ কিরণের
গ্রন্থি বাঁধি দিয়া।

হাসিরাশি

নাম রেখেছি বাব্‌লারানী,
একরত্তি মেয়ে।
হাসিখুশি চাঁদের আলো
মুখটি আছে ছেয়ে।
ফুট্‌ফুটে তার দাঁত কখানি,
পুট্‌পুটে তার ঠোঁট।
মুখের মধ্যে কথাগুলি সব
উলোটপালোট।
কচি কচি হাত দুখানি,
কচি কচি মুঠি,
মুখ নেড়ে কেউ কথা ক'লে
হেসেই কুটি-কুটি।
তাই তাই তাই তালি দিয়ে
দুলে দুলে নড়ে,
চুলগুলি সব কালো কালো
মুখে এসে পড়ে।
'চলি চলি পা পা'
টলি টলি যায়,
গরবিনী হেসে হেসে
আড়ে আড়ে চায়।
হাতটি তুলে চুড়ি দুগাছি
দেখায় যাকে তাকে,

হাসির সঙ্গে নেচে নেচে
নোলক দোলে নাকে।
রাঙা দুটি ঠোঁটের কাছে
মুক্তো আছে ফ'লে,
মায়ের চুমোখানি যেন
মুক্তো হয়ে দোলে।
আকাশেতে চাঁদ দেখেছে,
দু হাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে দুলে দুলে
ডাকে 'আয় আয়'।
চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল
তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোত্থেকে এল
চাঁদের মতো মেয়ে।
কচি প্রাণের হাসিখানি
চাঁদের পানে ছোটে,
চাঁদের মুখের হাসি আরো
বেশি ফুটে ওঠে।
এমন সাধের ডাক শুনে চাঁদ
কেমন করে আছে—
তারাগুলি ফেলে বুঝি
নেমে আসবে কাছে।
সুধামুখের হাসিখানি
চুরি ক'রে নিয়ে
রাতারাতি পালিয়ে যাবে
মেঘের আড়াল দিয়ে।
আমরা তারে রাখব ধরে
রানীর পাশেতে।
হাসিরাশি বাঁধা রবে
হাসিরাশিতে।

পরিচয়

একটি মেয়ে আছে জানি,
পল্লীটি তার দখলে,
সবাই তারি পুজো জোগায়
লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমায়
কথায় যদি মন দেহ—
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে
আছে আমার সন্দেহ।
ভোরের বেলা আঁধার থাকে,
ঘুম যে কোথা ছোটে ওর—
বিছানাতে হুলুস্থুলু
কলরবের চোটে ওর।
খিল্‌খিলিয়ে হাসে শুধু
পাড়াসুদ্ধ জাগিয়ে,
আড়ি করে পালাতে যায়
মায়ের কোলে না গিয়ে।

হাত বাড়িয়ে মুখে সে চায়,
আমি তখন নাচারই,
কাঁধের 'পরে তুলে তারে
ক'রে বেড়াই পাচারি।
মনের মতো বাহন পেয়ে
ভারি মনের খুশিতে
মারে আমায় মোটা মোটা
নরম নরম ঘুষিতে।
আমি ব্যস্ত হয়ে বলি—
'একটু রোসো রোসো মা।'

মুঠো করে ধরতে আসে
আমার চোখের চশমা।
আমার সঙ্গে কলভাষায়
করে কতই কলহ।
তুমুল কাণ্ড! তোমরা তারে
শিষ্ট আচার বলহ?

তবু তো তার সঙ্গে আমার
বিবাদ করা সাজে না।
সে নইলে যে তেমন ক'রে
ঘরের বাঁশি বাজে না।
সে না হলে সকালবেলায়
এত কুসুম ফুটবে কি।
সে না হলে সন্ধেবেলায়
সন্ধেতারা উঠবে কি।
একটি দণ্ড ঘরে আমার
না যদি রয় দুরন্ত
কোনোমতে হয় না তবে
বুকের শূন্য পূরণ তো।
দুষ্টুমি তার দখিন-হাওয়া
সুখের তুফান-জাগানে
দোলা দিয়ে যায় গো আমার
হৃদয়ের ফুল-বাগানে।

নাম যদি তার জিগেস কর
সেই আছে এক ভাবনা,
কোন্ নামে যে দিই পরিচয়
সে তো ভেবেই পাব না।
নামের খবর কে রাখে ওর,
ডাকি ওরে যা-খুশি—

দুষ্টু বল, দস্যি বল,
পোড়ারমুখী, রাক্ষুসি।
বাপ-মায়ে যে নাম দিয়েছে
বাপ মায়েরই থাক্ সে নয়।
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
তুলে রাখুন বাক্সে নয়।

একজনেতে নাম রাখবে
কখন অন্নপ্রাশনে,
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে—
ভারী বিষম শাসন এ।
নিজের মনের মতো সবাই
করুন কেন নামকরণ—
বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার,
খুড়ো ডাকুন রামচরণ।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
সংস্কৃত নামটা ওই।
এতে কারো দাম বাড়ে না
অভিধানের দামটা বই।
আমি বাপু, ডেকেই বসি
যেটাই মুখে আসুক না—
যারে ডাকি সেই তা বোঝে,
আর সকলে হাসুক-না—
একটি ছোটো মানুষ তাহার
একশো রকম রঙ্গ তো।
এমন লোককে একটি নামেই
ডাকা কি হয় সংগত।

বিচ্ছেদ

বাগানে ওই দুটো গাছে
ফুল ফুটেছে কত যে,
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
ছিল ফুলের মতো যে।
ফুল যে দিত ফুলের সঙ্গে
আপন সুধা মাখায়ে,
সকাল হত সকাল বেলায়
যাহার পানে তাকায়ে,
সেই আমাদের ঘরের মেয়ে
সে গেছে আজ প্রবাসে,
নিয়ে গেছে এখান থেকে
সকাল বেলার শোভা সে
একটুখানি মেয়ে আমার
কত যুগের পুণ্য যে,
একটুখানি সরে গেছে
কতখানিই শূন্য যে।

বিষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর,
মেঘ করেছে আকাশে,
উষার রাঙা মুখখানি আজ
কেমন যেন ফ্যাকাশে।
বাড়িতে যে কেউ কোথা নেই,
দুয়োরগুলো ভেজানো,
ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন।
ময়নাটি ওই চুপটি করে
ঝিমোচ্ছে সেই খাঁচাতে,

ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তার নাচাতে।
ঘরের কোণে আপন-মনে
শূন্য প'ড়ে বিছানা,
কার তরে সে কেঁদে মরে—
সে কল্পনা মিছা না।
বইগুলো সব ছড়িয়ে আছে,
নাম লেখা তায় কার গো।
এম্‌নি তারা রবে কি হায়,
খুলবে না কেউ আর গো।
এটা আছে সেটা আছে,
অভাব কিছু নেই তো—
স্মরণ করে দেয় রে যারে
থাকে নাকো সেই তো।

উপহার

স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই,
কী যে দেব তাই ভাবনা—
যত দিতে সাধ করি মনে মনে
খুঁজে-পেতে সে তো পাব না।
আমার যা ছিল ফাঁকি দিয়ে নিতে
সবাই করেছে একতা,
বাকি যে এখন আছে কত ধন
না তোলাই ভালো সে কথা।
সোনা রুপো আর হীরে জহরত
পোঁতা ছিল সব মাটিতে,
জহরি যে যত সন্ধান পেয়ে
নে গেছে যে যার বাটীতে।

টাকাকড়ি মেলা আছে টাঁকশালে,
নিতে গেলে পড়ি বিপদে।
বসনভূষণ আছে সিন্দুকে,
পাহারাও আছে ফি পদে।

এ যে সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড়ো বিষম দেশ রে।
ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চ'লে গিয়ে
ভুলে গিয়ে সব শেষ রে।
ভয়ে ভয়ে তাই স্মরণচিহ্ন
যে যাহারে পারে দেয় যে।
তাও কত থাকে, কত ভেঙে যায়,
কত মিছে হয় ব্যয় যে।
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত,
চোখে যদি দেখা যেত রে,
কতগুলো তবে জিনিস-পত্র
বল্ দেখি দিত কে তোরে।
তাই ভাবি মনে কী ধন আমার
দিয়ে যাব তোরে লুকিয়ে,
খুশি হবি তুই, খুশি হব আমি,
বাস্, সব যাবে চুকিয়ে।

কিছু দিয়ে-থুয়ে চিরদিন-তরে
কিনে রেখে দেব মন তোর—
এমন আমার মন্ত্রণা নেই,
জানি নে ও হেন মন্তর।
নবীন জীবন, বহুদূর পথ
পড়ে আছে তোর সুমুখে;
স্নেহরস মোরা যেটুকু যা দিই
পিয়ে নিস এক চুমুকে।

সাথিদলে জুটে চলে যাস ছুটে
নব আশে নব পিয়াসে,
যদি ভুলে যাস, সময় না পাস,
কী যায় তাহাতে কী আসে।
মনে রাখিবার চির-অবকাশ
থাকে আমাদেরই বয়সে,
বাহিরেতে যার না পাই নাগাল
অন্তরে জেগে রয় সে।

পাষাণের বাধা ঠেলেঠুলে নদী
আপনার মনে সিধে সে
কলগান গেয়ে দুই তীর বেয়ে
যায় চলে দেশ-বিদেশে—
যার কোল হতে ঝরনার স্রোতে
এসেছে আদরে গলিয়া
তারে ছেড়ে দূরে যায় দিনে দিনে
অজানা সাগরে চলিয়া।
অচল শিখর ছোটো নদীটিরে
চিরদিন রাখে স্মরণে—
যতদূর যায় স্নেহধারা তার
সাথে যায় দ্রুতচরণে।
তেম্‌নি তুমিও থাক না'ই থাক,
মনে কর মনে কর না,
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া
আমার আশিস-ঝরনা॥

পাখির পালক

খেলাধুলো সব রহিল পড়িয়া,
ছুটে চ'লে আসে মেয়ে—
বলে তাড়াতাড়ি, 'ওমা, দেখ্ দেখ্,
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে।'
আঁখির পাতায় হাসি চমকায়,
ঠোঁটে নেচে ওঠে হাসি—
হয়ে যায় ভুল, বাঁধে নাকো চুল,
খুলে পড়ে কেশরাশি।
দুটি হাত তার ঘিরিয়া ঘিরিয়া
রাঙা চুড়ি কয়গাছি,
করতালি পেয়ে বেজে ওঠে তারা,
কেঁপে ওঠে তারা নাচি।
মায়ের গলায় বাহু দুটি বেঁধে
কোলে এসে বসে মেয়ে।
বলে তাড়াতাড়ি, 'ওমা, দেখ্ দেখ্,
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে।'

সোনালি রঙের পাখির পালক
ধোওয়া সে সোনার স্রোতে-
খসে এল যেন তরুণ আলোক
অরুণের পাখা হতে।
নয়ন-ঢুলানো কোমল পরশ
ঘুমের পরশ যথা—
মাখা যেন তায় মেঘের কাহিনী,
নীল আকাশের কথা।
ছোটোখাটো নীড়, শাবকের ভিড়,
কতমত কলরব,

প্রভাতের সুখ, উড়িবার আশা—
মনে পড়ে যেন সব।
লয়ে সে পালক কপোলে বুলায়,
আঁখিতে বুলায় মেয়ে,
বলে হেসে হেসে, 'ওমা, দেখ্ দেখ্,
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে।'

মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে,
'কিবা জিনিসের ছিরি!'
ভূমিতে ফেলিয়া গেল সে চলিয়া,
আর না চাহিল ফিরি।
মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল,
মাটিতে রহিল বসি।
শূন্য হতে যেন পাখির পালক
ভূতলে পড়িল খসি।
খেলাধুলো তার হল নাকো আর,
হাসি মিলাইল মুখে,
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল
দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে
গোপনের ধন তার—
আপনি খেলিত, আপনি তুলিত,
দেখাত না কারে আর।

পূজার সাজ

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি,
পূজার সময় এল কাছে।
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই,
আনন্দে দু-হাত তুলি নাচে।

পিতা বসি ছিল দ্বারে, দুজনে শুধালো তারে,
'কী পোশাক আনিয়াছ কিনে।'
পিতা কহে, 'আছে আছে তোদের মায়ের কাছে,
দেখিতে পাইবি ঠিক দিনে।'

সবুর সহে না আর— জননীরে বার বার
কহে, 'মা গো, ধরি তোর পায়ে,
বাবা আমাদের তরে কী কিনে এনেছে ঘরে
একবার দে না মা, দেখায়ে।'

ব্যস্ত দেখি হাসিয়া মা দুখানি ছিটের জামা
দেখাইল করিয়া আদর।
মধু কহে, 'আর নেই ?' মা কহিল, 'আছে এই
একজোড়া ধুতি ও চাদর।'

রাগিয়া আগুন ছেলে, কাপড় ধুলায় ফেলে
কাঁদিয়া কহিল, 'চাহি না মা,
রায়বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি,
ফুলকাটা সাটিনের জামা।'

মা কহিল, 'মধু, ছি ছি, কেন কাঁদ মিছামিছি,
গরিব যে তোমাদের বাপ।
এবার হয় নি ধান, কত গেছে লোকসান,
পেয়েছেন কত দুঃখতাপ।

তবু দেখো বহু ক্লেশে তোমাদের ভালোবেসে
সাধ্যমত এনেছেন কিনে।
সে জিনিস অনাদরে ফেলিলি ধুলির 'পরে—
এই শিক্ষা হল এতদিনে !'

বিধু বলে, 'এ কাপড় পছন্দ হয়েছে মোর,
এই জামা পরাস আমারে।'
মধু শুনে আরো রেগে ঘর ছেড়ে দ্রুতবেগে
গেল রায়বাবুদের দ্বারে।

সেথা মেলা লোক জড়ো, রায়বাবু ব্যস্ত বড়ো;
দালান সাজাতে গেছে রাত।
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইল ম্লান মনে
চোখে তাঁর পড়িল হঠাৎ।

কাছে ডাকি স্নেহভরে কহেন করুণ স্বরে
তারে দুই বাহুতে বাঁধিয়া,
'কী রে মধু, হয়েছে কী। তোরে যে শুকনো দেখি।'
শুনি মধু উঠিল কাঁদিয়া।

কহিল, 'আমার তরে বাবা আনিয়াছে ঘরে
শুধু এক ছিটের কাপড়।'
শুনি রায়মহাশয় হাসিয়া মধুরে কয়,
'সেজন্য ভাবনা কিবা তোর।'

ছেলেরে ডাকিয়া চুপি কহিলেন, 'ওরে গুপি,
তোর জামা দে তুই মধুকে।'
গুপির সে জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় ধেয়ে,
হাসি আর নাহি ধরে মুখে।

বুক ফুলাইয়া চলে— সবারে ডাকিয়া বলে,
'দেখো কাকা! দেখো চেয়ে মামা!
ওই আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা।'

মা শুনি কহেন আসি লাজে অশ্রুজলে ভাসি
কপালে করিয়া করাঘাত,
'হই দুঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋণ,
কারো কাছে পাতি নাই হাত।

তুমি আমাদেরই ছেলে ভিক্ষা লয়ে অবহেলে
অহংকার কর ধেয়ে ধেয়ে!
ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশি দাম তার
ভিক্ষা-করা সাটিনের চেয়ে।

আয় বিধু, আয় বুকে, চুমো খাই চাঁদমুখে।
তোর সাজ সব চেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।'

মা-লক্ষ্মী

কার পানে মা, চেয়ে আছ
মেলি দুটি করুণ আঁখি।
কে ছিঁড়েছে ফুলের পাতা,
কে ধরেছে বনের পাখি।
কে কারে কী বলেছে গো,
কার প্রাণে বেজেছে ব্যথা—
করুণায় যে ভরে এল
দুখানি তোর আঁখির পাতা।
খেলতে খেলতে মায়ের আমার
আর বুঝি হল না খেলা।
ফুলের গুচ্ছ কোলে প'ড়ে—
কেন মা এ হেলাফেলা।

অনেক দুঃখ আছে হেথায়,
এ জগৎ যে দুঃখে ভরা—
তোমার দুটি আঁখির সুধায়
জুড়িয়ে গেল নিখিল ধরা।
লক্ষ্মী আমার বল্ দেখি মা,
লুকিয়ে ছিলি কোন্ সাগরে।
সহসা আজ কাহার পুণ্যে
উদয় হলি মোদের ঘরে।
সঙ্গে করে নিয়ে এলি
হৃদয়-ভরা স্নেহের সুধা,
হৃদয় ঢেলে মিটিয়ে যাবি
এ জগতের প্রেমের ক্ষুধা।

থামো, থামো, ওর কাছেতে
কোয়ো না কেউ কঠোর কথা,
করুণ আঁখির বালাই নিয়ে
কেউ কারে দিয়ো না ব্যথা।
সইতে যদি না পারে ও,
কেঁদে যদি চলে যায়—
এ ধরণীর পাষাণ প্রাণে
ফুলের মতো ঝরে যায়।
ও যে আমার শিশিরকণা,
ও যে আমার সাঁঝের তারা—
কবে এল কবে যাবে
এই ভয়েতে হই রে সারা।

কাগজের নৌকা

ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ-নৌকাখানি।
লিখে রাখি তাতে আপনার নাম
লিখি আমাদের বাড়ি কোন্ গ্রাম
বড়ো বড়ো ক'রে মোটা অক্ষরে,
যতনে লাইন টানি।
যদি সে নৌকা আর-কোনো দেশে
আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি
কার কাছ হতে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ-নৌকাখানি।

আমার নৌকা সাজাই যতনে
শিউলি বকুলে ভরি।
বাড়ির বাগানে গাছের তলায়
ছেয়ে থাকে ফুল সকালবেলায়,
শিশিরের জল করে ঝলমল
প্রভাতের আলো পড়ি।
সেই কুসুমের অতি ছোটো বোঝা
কোন্ দিক-পানে চলে যায় সোজা,
বেলাশেষে যদি পার হয়ে নদী
ঠেকে কোনোখানে যেয়ে—
প্রভাতের ফুল সাঁঝে পাবে কূল
কাগজের তরী বেয়ে।

আমার নৌকা ভাসাইয়া জলে
চেয়ে থাকি বসি তীরে।

ছোটো ছোটো ঢেউ ওঠে আর পড়ে,
রবির কিরণে ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখি চলে যায় ডাকি,
বায়ু বহে ধীরে ধীরে।
গগনের তলে মেঘ ভাসে কত
আমারি সে ছোটো নৌকার মতো—
কে ভাসালে তায়, কোথা ভেসে যায়,
কোন্ দেশে গিয়ে লাগে।
ঐ মেঘ আর তরণী আমার
কে যাবে কাহার আগে।

বেলা হলে শেষে বাড়ি থেকে এসে
নিয়ে যায় মোরে টানি ;
আমি ঘরে ফিরি, থাকি কোণে মিশি,
যেথা কাটে দিন সেথা কাটে নিশি—
কোথা কোন্ গাঁয় ভেসে চলে যায়
আমার নৌকাখানি।
কোন্ পথে যাবে কিছু নাই জানা,
কেহ তারে কভু নাহি করে মানা,
ধরে নাহি রাখে, ফিরে নাহি ডাকে—
ধায় নব নব দেশে।
কাগজের তরী, তারি 'পরে চড়ি
মন যায় ভেসে ভেসে।

রাত হয়ে আসে, শুই বিছানায়,
মুখ ঢাকি দুই হাতে—
চোখ বুজে ভাবি— এমন আঁধার,
কালী দিয়ে ঢালা নদীর দু ধার
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে।

আকাশের তারা মিটি মিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি।
ঘুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে
ঘুমপাড়ানিয়া মাসি।

শীত

পাখি বলে 'আমি চলিলাম',
ফুল বলে 'আমি ফুটিব না',
মলয় কহিয়া গেল শুধু
'বনে বনে আমি ছুটিব না'।
কিশলয় মাথাটি না তুলে
মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি,
সায়াহ্ন ধূমলঘন বাস
টানি দিল মুখের উপরি।
পাখি কেন গেল গো চলিয়া,
কেন ফুল কেন সে ফুটে না।
চপল মলয় সমীরণ
বনে বনে কেন সে ছুটে না।
শীতের হৃদয় গেছে চলে,
অসাড় হয়েছে তার মন,
ত্রিবলিবলিত তার ভাল
কঠোর জ্ঞানের নিকেতন।
জ্যোৎস্নার যৌবন-ভরা রূপ,
ফুলের যৌবন পরিমল,
মলয়ের বাল্যখেলা যত,
পল্লবের বাল্য-কোলাহল—

সকলি সে মনে করে পাপ,
মনে করে প্রকৃতির ভ্রম,
ছবির মতন বসে থাকা
সেই জানে জ্ঞানীর ধরম।
তাই পাখি বলে 'চলিলাম',
ফুল বলে আমি ফুটিব না',
মলয় কহিয়া গেল শুধু
'বনে বনে আমি ছুটিব না'।
আশা বলে বসন্ত আসিবে',
ফুল বলে 'আমিও আসিব',
পাখি বলে 'আমিও গাহিব',
চাঁদ বলে 'আমিও হাসিব'।

বসন্তের নবীন হৃদয়
নূতন উঠেছে আঁখি মেলে—
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে,
যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে।
মনে তার শত আশা জাগে,
কী যে চায় আপনি না বুঝে—
প্রাণ তার দশ দিকে ধায়
প্রাণের মানুষ খুঁজে খুঁজে।
ফুল ফুটে, তারো মুখ ফুটে—
পাখি গায়, সেও গান গায়—
বাতাস বুকের কাছে এলে
গলা ধ'রে দুজনে খেলায়।
তাই শুনি 'বসন্ত আসিবে'
ফুল বলে 'আমিও আসিব',
পাখি বলে 'আমিও গাহিব',
চাঁদ বলে 'আমিও হাসিব'।

শীত, তুমি হেথা কেন এলে।

উত্তরে তোমার দেশ আছে—

পাখি সেথা নাহি গাহে গান,

ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।

সকলি তুষারমরুময়,

সকলি আঁধার জনহীন –

সেথায় একেলা বসি বসি

জ্ঞানী গো, কাটায়ো তব দিন।

শীতের বিদায়

বসন্ত বালক মুখ-ভরা হাসিটি,

বাতাস ব'য়ে ওড়ে চুল—

শীত চলে যায়, মারে তার গায়

মোটা মোটা গোটা ফুল।

আঁচল ভ'রে গেছে শত ফুলের মেলা,

গোলাপ ছুঁড়ে মারে টগর চাঁপা বেলা—

শীত বলে, 'ভাই, এ কেমন খেলা,

যাবার বেলা হল, আসি।'

বসন্ত হাসিয়ে বসন ধ'রে টানে,

পাগল ক'রে দেয় কুহু কুহু গানে,

ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের 'পরে হানে—

হাসির 'পরে হানে হাসি।

ওড়ে ফুলের রেণু, ফুলের পরিমল,

ফুলের পাপড়ি উড়ে করে যে বিকল—

কুসুমিত শাখা, বনপথ ঢাকা,

ফুলের 'পরে পড়ে ফুল।

দক্ষিনে বাতাসে ওড়ে শীতের বেশ,

উড়ে উড়ে পড়ে শীতের শুভ্র কেশ ;

কোন্ পথে যাবে না পায় উদ্দেশ,
হয়ে যায় দিক ভুল।
বসন্ত বালক হেসেই কুটিকুটি,
টলমল করে রাঙা চরণ ছুটি,
গান গেয়ে পিছে ধায় ছুটি ছুটি—
বনে লুটোপুটি যায়।
নদী তালি দেয় শত হাত তুলি,
বলাবলি করে ডালপালাগুলি,
লতায় লতায় হেসে কোলাকুলি—
অঙ্গুলি তুলি চায়।
রঙ্গ দেখে হাসে মল্লিকা মালতী,
আশেপাশে হাসে কতই জাতী যূথী,
মুখে বসন দিয়ে হাসে লজ্জাবতী—
বনফুলবধূগুলি।
কত পাখি ডাকে কত পাখি গায়,
কিচিমিচিকিচি কত উড়ে যায়,
এ পাশে ও পাশে মাথাটি হেলায়—
নাচে পুচ্ছখানি তুলি।
শীত চলে যায়, ফিরে ফিরে চায়,
মনে মনে ভাবে 'এ কেমন বিদায়'—
হাসির জ্বালায় কাঁদিয়ে পালায়,
ফুলঘায় হার মানে।
শুকনো পাতা তার সঙ্গে উড়ে যায়,
উত্তরে বাতাস করে হায়-হায়—
আপাদমস্তক ঢেকে কুয়াশায়
শীত গেল কোন্‌খানে।

ফুলের ইতিহাস

বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
প্রথম হেরিল চারি ধার।

মধুকর গান গেয়ে বলে,
'মধু কই, মধু দাও দাও।'
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে, 'এই লও লও।'
বায়ু আসি কহে কানে কানে,
'ফুলবালা, পরিমল দাও।'
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল,
'যাহা আছে সব লয়ে যাও।'

তরুতলে চ্যুতবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।

মধুকর কাছে এসে বলে,
'মধু কই, মধু চাই চাই।'
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে, 'কিছু নাই নাই।'
'ফুলবালা, পরিমল দাও।'
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে।
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে, 'আর কী বা আছে।'

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
　　ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন
　　একটি সে তো পরতে পেল না।
ফুল যে ফোটে, ফুল যে ঝরে যায়—
　　ফুল নিয়ে যে আর-সকলে পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
　　একটিও যে রইবে না তার তরে।

খেলত যারা তারা খেলতে গেছে,
　　হাসত যারা তারা আজো হাসে,
তার তরে তো কেহই বসে নেই,
　　মা যে কেবল রয়েছে তার আশে।
হায় রে বিধি, সব কি ব্যর্থ হবে -
　　ব্যর্থ হবে মায়ের ভালোবাসা।
কত জনের কত আশা পুরে,
　　ব্যর্থ হবে মার প্রাণেরই আশা।

পুরোনো বট

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা,
ঘন পাতার গহন ঘটা,
হেথা হোথায় রবির ছটা,
　　পুকুর-ধারে বট।
দশ দিকেতে ছড়িয়ে শাখা
কঠিন বাহু আঁকাবাঁকা
স্তব্ধ যেন আছে আঁকা,
　　শিরে আকাশ-পট।

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন
একটি সে তো পরতে পেল না।
ফুল যে ফোটে, ফুল যে ঝরে যায়—
ফুল নিয়ে যে আর-সকলে পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
একটিও যে রইবে না তার তরে।

খেলত যারা তারা খেলতে গেছে,
হাসত যারা তারা আজো হাসে,
তার তরে তো কেহই বসে নেই,
মা যে কেবল রয়েছে তার আশে।
হায় রে বিধি, সব কি ব্যর্থ হবে -
ব্যর্থ হবে মায়ের ভালোবাসা।
কত জনের কত আশা পুরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণেরই আশা।

পুরোনো বট

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা,
ঘন পাতার গহন ঘটা,
হেথা-হোথায় রবির ছটা,
পুকুর-ধারে বট।
দশ দিকেতে ছড়িয়ে শাখা
কঠিন বাহু আঁকাবাঁকা
স্তব্ধ যেন আছে আঁকা,
শিরে আকাশ-পট।

নেবে নেবে গেছে জলে
শিকড়গুলো দলে দলে,
সাপের মতো রসাতলে
আলয় খুঁজে মরে।
শতেক শাখা-বাহু তুলি
বায়ুর সাথে কোলাকুলি,
আনন্দেতে দোলাদুলি
গভীর প্রেমভরে।
ঝড়ের তালে নড়ে মাথা,
কাঁপে লক্ষকোটি পাতা,
আপন-মনে গায় সে গাথা,
দুলায় মহাকায়া।
তড়িৎ পাশে উঠে হেসে,
ঝড়ের মেঘ ঝটিৎ এসে
দাঁড়িয়ে থাকে এলোকেশে,
তলে গভীর ছায়া।

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট।
কতই পাখি তোমার শাখে
বসে যে চলে গেছে,
ছোটো ছেলেরে তাদেরই মতো
ভুলে কি যেতে আছে।
তোমার মাঝে হৃদয় তারি
বেঁধেছিল যে নীড়।
ডালেপালায় সাধগুলি তার
কত করেছে ভিড়।

মনে কি নেই সারাটা দিন
বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে
অবাক দুনয়নে ?
তোমার তলে মধুর ছায়া,
তোমার তলে ছুটি,
তোমার তলে নাচত বসে
শালিখ পাখি দুটি।
ভাঙা ঘাটে নাইত কারা,
তুলত কারা জল,
পুকুরেতে ছায়া তোমার
করত টলমল।
জলের উপর রোদ পড়েছে
সোনা-মাখা মায়া,
ভেসে বেড়ায় দুটি হাঁস
দুটি হাঁসের ছায়া।
ছোটো ছেলে রইত চেয়ে,
বাসনা অগাধ—
মনের মধ্যে খেলাত তার
কত খেলার সাধ।
বায়ুর মতো খেলত যদি
তোমার চারি ভিতে,
ছায়ার মতো শুত যদি
তোমার ছায়াটিতে,
পাখির মতো উড়ে যেত
উড়ে আসত ফিরে,
হাঁসের মতো ভেসে যেত
তোমার তীরে তীরে।

মনে হত, তোমার ছায়ে
কতই যে কী আছে,
কাদের যেন ঘুম পাড়াতে
ঘুঘু ডাকত গাছে।
মনে হত, তোমার মাঝে
কাদের যেন ঘর।
আমি যদি তাদের হতেম!
কেন হলেম পর।
ছায়ার মতো ছায়ায় তারা
থাকে পাতার 'পরে,
গুন্‌গুনিয়ে সবাই মিলে
কতই যে গান করে।
দূরে লাগে মূলতানে তান,
পড়ে আসে বেলা,
ঘাটে বসে দেখে জলে
আলোছায়ার খেলা।
সন্ধে হলে খোঁপা বাঁধে
তাদের মেয়েগুলি,
ছেলেরা সব দোলায় ব'সে
খেলায় ছুলি ছুলি।
গহিন রাতে দখিন বাতে
নিঝুম চারি ভিত,
চাঁদের আলোয় শুভ্র তনু,
ঝিমি ঝিমি গীত।
ওখানেতে পাঠশালা নেই,
পণ্ডিতমশাই—
বেত হাতে নাইকো বসে
মাধব গোসাঁই।
সারাটা দিন ছুটি কেবল,
সারাটা দিন খেলা—

পুকুর-ধারে আঁধার-করা
বটগাছের তলা।

আজকে কেন নাইকো তারা।
আছে আর সকলে,
তারা তাদের বাসা ভেঙে
কোথায় গেছে চলে।
ছায়ার মধ্যে মায়া ছিল
ভেঙে দিল কে।
ছায়া কেবল রইল প'ড়ে,
কোথায় গেল সে।
ডালে ব'সে পাখিরা আজ
কোন্ প্রাণেতে ডাকে।
রবির আলো কাদের খোঁজে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে।
গল্প কত ছিল যেন
তোমার খোপে-খাপে,
পাখির সঙ্গে মিলে-মিশে
ছিল চুপে-চাপে,
দুপুর বেলা নূপুর তাদের
বাজত অনুক্ষণ,
ছোটো দুটি ভাই-ভগিনীর
আকুল হত মন।
ছেলেবেলায় ছিল তারা,
কোথায় গেল শেষে।
গেছে বুঝি ঘুম-পাড়ানি
মাসিপিসির দেশে।

আশীর্বাদ

ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,
ইহাদের করো আশীর্বাদ।

ছোটো ছোটো হাসিমুখ জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি কৌতুকেতে দুলি দুলি
চেয়ে চেয়ে দেখে চারি ধারে।
সোনার রবির আলো কত তার লাগে ভালো,
ভালো লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি, ধূলিরে জানে না ধূলি,
সবই তার আপনার ধন।
কোলে তুলে লও এরে— এ যেন কেঁদে না ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ।
বুকের মাঝারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের করো আশীর্বাদ।

নূতন প্রবাসে এসে সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারি ভিতে।
এত শত লোক আছে, এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।
যেথা তুমি লয়ে যাবে কথাটি না কয়ে যাবে,
সাথে যাবে ছায়ার মতন,
তাই বলি, দেখো দেখো, এ বিশ্বাস রেখো রেখো,
পাথারে দিয়ো না বিসর্জন।

ক্ষুদ্র এ মাথার 'পর রাখো গো করুণ কর,
ইহারে কোরো না অবহেলা।
এ ঘোর সংসার-মাঝে এসেছে কঠিন কাজে,
আসে নি করিতে শুধু খেলা।
দেখে মুখশতদল চোখে মোর আসে জল,
মনে হয় বাঁচিবে না বুঝি—
পাছে সুকুমার প্রাণ ছিঁড়ে হয় খান্‌-খান্‌
জীবনের পারাবারে যুঝি।

এই হাসিমুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ!
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে কোলে রেখে
তোমরা করো গো আশীর্বাদ।
বলো, 'সুখে যাও চ'লে ভবের তরঙ্গ দ'লে,
স্বর্গ হতে আসুক বাতাস।
সুখদুঃখ কোরো হেলা, সে কেবল ঢেউ-খেলা
নাচিবে তোদের চারি পাশ।'

নাটক ও প্রহসন

প্রায়শ্চিত্ত

বিজ্ঞাপন

বউঠাকুরানীর হাট নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যীকৃত হইল। মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।

৩১শে বৈশাখ
সন ১৩১৬ সাল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটকের পাত্রগণ

প্রতাপাদিত্য	যশোহরের রাজা
উদয়াদিত্য	যশোহরের যুবরাজ
বসন্তরায়	প্রতাপাদিত্যের খুড়া, রায়গড়ের রাজা
রামচন্দ্ররায়	প্রতাপাদিত্যের জামাতা, চন্দ্রদ্বীপের রাজা
রমাই	রামচন্দ্রের ভাঁড়
রামমোহন	রামচন্দ্ররায়ের মল্ল
ফর্নাণ্ডিজ	রামচন্দ্ররায়ের পোর্টুগীজ সেনাপতি
ধনঞ্জয়	একজন বৈরাগী
সীতারাম	প্রতাপাদিত্যের গৃহরক্ষক
পীতাম্বর	প্রতাপাদিত্যের অনুচর
প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী	
প্রতাপাদিত্যের মহিষী	
সুরমা	উদয়াদিত্যের স্ত্রী
বিভা	প্রতাপাদিত্যের কন্যা, রামচন্দ্ররায়ের মহিষী
বামী	প্রতাপাদিত্যের মহিষীর পরিচারিকা

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম অঙ্ক

১

উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ

উদয়াদিত্য ও সুরমা

উদয়াদিত্য। যাক চুকল!

সুরমা। কী চুকল?

উদয়াদিত্য। আমার উপর মাধবপুর পরগনা শাসনের ভার মহারাজ রেখেছিলেন। জান তো, দু বৎসর থেকে সেখানে কিরকম অজন্মা হয়েছে— আমি তাই খাজনা আদায় বন্ধ করেছিলুম। মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, যেমন করে হোক টাকা চাই।

সুরমা। আমি তো তোমাকে আমার গহনাগুলো দিতে চেয়েছিলুম।

উদয়াদিত্য। তোমার গহনা টাকা দিয়ে কেনে এত বড়ো বুকের পাটা এ রাজ্যে আছে কার? মহারাজার কানে গেলে কি রক্ষা আছে?— আমি মহারাজকে বললুম, মাধবপুর থেকে টাকা আমি কোনোমতেই আদায় করতে পারব না। শুনে তিনি মাধবপুর আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তিনি এখন সৈন্য বাড়াচ্ছেন, টাকা তাঁর চাই।

সুরমা। পরগনা তো কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চলে এলে প্রজারা যে মরবে।

উদয়াদিত্য। আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক তাদের পেটের ভাতটা জোগাব। শুনতে পেলে মহারাজ খুশি হবেন না— দয়া জিনিসটাকে তিনি মেয়েমানুষের লক্ষণ বলেই জানেন।— কিন্তু তোমার ঘরে আজ এত ফুলের মালার ঘটা কেন?

সুরমা। রাজপুত্রকে রাজসভায় যখন চিনল না, তখন যে তাকে চিনেছে সে তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।

উদয়াদিত্য। সত্যি নাকি! তোমার ঘরে রাজপুত্র আসা-যাওয়া করেন? তিনি কে শুনি? এ খবরটা তো জানতুম না।

সুরমা। রামচন্দ্র যেমন ভুলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা হয়েছে। কিন্তু ভক্তকে ভোলাতে পারবে না।

উদয়াদিত্য। রাজপুত্র! রাজার ঘরে কোনো জন্মে পুত্র জন্মাবে না, বিধাতার এই অভিশাপ।

সুরমা। সে কী কথা?

উদয়াদিত্য। হাঁ, রাজার ঘরে উত্তরাধিকারীই জন্মায়, পুত্র জন্মায় না।

সুরমা। এ তুমি মনের ক্ষোভে বলছ।

উদয়াদিত্য। কথাটা কি আমার কাছে নূতন যে ক্ষোভ হবে? যখন এতটুকু ছিলুম তখন থেকে মহারাজ এইটেই দেখেছেন যে, আমি তাঁর রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না। কেবলই পরীক্ষা, স্নেহ নেই।

সুরমা। প্রিয়তম, দরকার কী স্নেহের! খুব কঠোর পরীক্ষাতেও তোমার জিত হবে। তোমার মতো রাজার ছেলে কোন্ রাজা পেয়েছে?

উদয়াদিত্য। বল কী? পরীক্ষক তোমার পরামর্শ নিয়ে বিচার করবেন না, সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

সুরমা। কারও পরামর্শ নিয়ে বিচার করতে হবে না— আগুনের পরীক্ষাতেও সীতার চুল পোড়ে নি। তুমি রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত নও, এ কথা কি বললেই হল? এতবড়ো অবিচার কি জগতে কখনো টিকতে পারে?

উদয়াদিত্য। রাজ্যভারটা নাই-বা ঘাড়ের উপর পড়ল, তাতেই বা দুঃখ কিসের?

সুরমা। না না, ও কথা তোমার মুখে আমার সহ্য হয় না। ভগবান তোমাকে রাজার ছেলে করে পাঠিয়েছেন, সে কথা বুঝি অমন করে উড়িয়ে দিতে আছে? না-হয় দুঃখই পেতে হবে— তা বলে—

উদয়াদিত্য। আমি দুঃখের পরোয়া রাখি নে। তুমি আমার ঘরে এসেছ, তোমাকে সুখী করতে পারি নে, আমার পৌরুষে সেই ধিক্কার বাজে।

সুরমা। যে সুখ দিয়েছ তাই যেন জন্ম-জন্মান্তর পাই।

উদয়াদিত্য। সুখ যদি পেয়ে থাক তো সে নিজের গুণে, আমার শক্তিতে নয়। এ ঘরে আমার আদর নেই বলে তোমারও যে অপমান ঘটে। এমন-কি, মাও যে তোমাকে অবজ্ঞা করেন!

সুরমা। আমার সব সম্মান যে তোমার প্রেমে, সে তো কেউ কাড়তে পারে নি।

উদয়াদিত্য। তোমার পিতা শ্রীপুররাজ কিনা যশোরের অধীনতা স্বীকার করেন না, সেই হয়েছে তোমার অপরাধ— মহারাজ তোমার উপরে রাগ দেখিয়ে তার শোধ তুলতে চান।

নেপথ্যে। দাদা, দাদা!

উদয়াদিত্য। ও কে ও! বিভা বুঝি! (দ্বার খুলিয়া) কী বিভা! কী হয়েছে? এত রাত্রে কেন?

বিভা। (চুপিচুপি কিছু বলিয়া সরোদনে) দাদা, কী হবে?

উদয়াদিত্য। ভয় নেই, আমি যাচ্ছি।

বিভা। না না, তুমি যেয়ো না।

উদয়াদিত্য। কেন বিভা?

বিভা। বাবা যদি জানতে পারেন?

উদয়াদিত্য। জানতে পারবেন না তো কী? তাই বলে বসে থাকব?

বিভা। যদি রাগ করেন?

সুরমা। ছি বিভা, এখন সে কথা কি ভাববার সময়?

বিভা। (উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া) দাদা, তুমি যেয়ো না, তুমি লোক পাঠিয়ে দাও। আমার ভয় করছে।

উদয়াদিত্য। ভয় করবার সময় নেই বিভা! [প্রস্থান

বিভা। কী হবে ভাই? বাবা জানতে পারলে জানি নে কী কাণ্ড করবেন।

সুরমা। যাই করুন না বিভা, নারায়ণ আছেন।

২

মন্ত্রগৃহে প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, কাজটা কি ভালো হবে?

প্রতাপাদিত্য। কোন্ কাজটা?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, কাল যেটা আদেশ করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্য। কাল কী আদেশ করেছিলুম?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে—

প্রতাপাদিত্য। আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী?

মন্ত্রী। মহারাজ আদেশ করেছিলেন, যখন রাজা বসন্তরায় যশোরে আসবার পথে শিমুলতলির চটিতে আশ্রয় নেবেন, তখন—

প্রতাপাদিত্য। তখন কী? কথাটা শেষ করেই ফেলো।

মন্ত্রী। তখন দুজন পাঠান গিয়ে—

প্রতাপাদিত্য। হাঁ—

মন্ত্রী। তাঁকে নিহত করবে।

প্রতাপাদিত্য। নিহত করবে! অমরকোষ খুঁজে বুঝি আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না? নিহত করবে! মেরে ফেলবে কথাটা মুখে আনতে বুঝি বাধছে?

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটি ভালো বুঝতে পারেন নি।

প্রতাপাদিত্য। বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, আমি—

প্রতাপাদিত্য। তুমি শিশু! খুন করাকে তুমি জুজু বলে জান। তোমার বুড়ি দিদিমার কাছে শিখেছ খুন করাটা পাপ। খুন করাটা যেখানে ধর্ম সেখানে না করাটাই পাপ, এটা এখনও তোমার শিখতে বাকি আছে। যে মুসলমান আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে, তাদের যারা মিত্র তাদের বিনাশ না করাই অধর্ম। পিতৃব্য বসন্তরায় নিজেকে ম্লেচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হলে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়, সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

প্রতাপাদিত্য। অমন তাড়াতাড়ি 'যে আজ্ঞে' বললে চলবে না। তুমি মনে করছ নিজের পিতৃব্যকে বধ করা সকল অবস্থাতেই পাপ। 'না' বোলো না, ঠিক এই কথাটাই তোমার মনে জাগছে। কিন্তু মনে কোরো না এর উত্তর নেই। পিতার অনুরোধে ভৃগু তাঁর মাকে বধ করেছিলেন, আর ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে কেন বধ করব না?

মন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীশ্বর যদি শোনেন তবে—

প্রতাপাদিত্য। আর যাই কর, দিল্লীশ্বরের ভয় আমাকে দেখিয়ো না।

মন্ত্রী। প্রজারা জানতে পারলে কী বলবে?

প্রতাপাদিত্য। জানতে পারলে তো।

মন্ত্রী। এ কথা কখনোই চাপা থাকবে না।

প্রতাপাদিত্য। দেখো মন্ত্রী, কেবল ভয় দেখিয়ে আমাকে দুর্বল করে তোলবার জন্যেই কি তোমাকে রেখেছি?

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—

প্রতাপাদিত্য। দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, শেষকালে উদয়াদিত্য! সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা আমার কাছে তুলো না।

মন্ত্রী। তাঁর সম্বন্ধে একটি সংবাদ আছে। কাল তিনি রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে একলা বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।

প্রতাপাদিত্য। কোন্ দিকে গেছে?

মন্ত্রী। পুবের দিকে।

প্রতাপাদিত্য। কখন গেছে?

মন্ত্রী। তখন রাত দেড় প্রহর হবে।

প্রতাপাদিত্য। নাঃ, আর চলল না। ঈশ্বর করুন আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি যেন উপযুক্ত হয়। এখনও ফেরে নি!

মন্ত্রী। আজ্ঞে না।

প্রতাপাদিত্য। একজন প্রহরী তার সঙ্গে যায় নি কেন?

মন্ত্রী। যেতে চেয়েছিল, তিনি নিষেধ করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্য। তাকে না জানিয়ে, তার পিছনে পিছনে যাওয়া উচিত ছিল।

মন্ত্রী। তারা তো কোনো সন্দেহ করে নি।

প্রতাপাদিত্য। বড়ো ভালো কাজই করেছিল! মন্ত্রী, তুমি কি বোঝাতে চাও এজন্যে কেউ দায়ী নয়? তা হলে এ দায় তোমার।

৩

পথপার্শ্বে গাছতলায় বাহকহীন পালকিতে বসন্তরায় আসীন
পাশে একজন পাঠান দণ্ডায়মান

পাঠান। নাঃ, এ বুড়োকে মারার চেয়ে বাঁচিয়ে রেখে লাভ আছে। মারলে যশোরের রাজা কেবল একবার বকশিশ দেবে, কিন্তু একে বাঁচিয়ে রাখলে এর কাছে অনেক বকশিশ পাব।

বসন্তরায়। খাঁসাহেব, তুমিও যে ওদের সঙ্গে গেলে না?

পাঠান। হুজুর, যাই কী করে? আপনি তো ডাকাতের হাত থেকে আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যে আপনার সব লোকজনদেরই পাঠিয়ে দিলেন— আপনাকে মাঠের মধ্যে একলা ফেলে যাব এমন অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাওরাবেন না। দেখুন, আমাদের

কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী, পরকালে সে ঋণ তাকে শোধ করতেই হবে, যে আমার উপকার করে আমি তার কাছে ঋণী, কোনো কালেই সে ঋণ শোধ করতে পারব না।

বসন্তরায়। বা বা বা! লোকটা তো বেশ! খাঁসাহেব, তোমাকে বড়ো ঘরের লোক বলে মনে হচ্ছে।

পাঠান। (সেলাম করিয়া) ক্যা তাজ্জব! মহারাজ ঠিক ঠাউরেছেন।

বসন্তরায়। এখন তোমার কী করা হয়?

পাঠান। (সনিশ্বাসে) হুজুর, গরিব হয়ে পড়েছি, চাষবাস করেই দিন চলে। কবি বলেন, হে অদৃষ্ট, তৃণকে তৃণ করে গড়েছ সেজন্যে তোমাকে দোষ দিই নে। কিন্তু বটগাছকে বটগাছ করেও তাকে ঝড়ের ঘায়ে তৃণের সঙ্গে এক মাটিতে শোয়াও, এতেই বুঝেছি তোমার হৃদয়টা পাষাণ!

বসন্তরায়। বাহবা, বাহবা! কবি কী কথাই বলেছেন! সাহেব, যে দুটো বয়েত আজ বললে ও তো আমাকে লিখে দিতে হবে। আচ্ছা খাঁসাহেব, তোমার তো বেশ মজবুত শরীর, তুমি তো ফৌজের সিপাহি হতে পার।

পাঠান। হুজুরের মেহেরবানি হলেই পারি। আমার বাপ-পিতামহ সকলেই তলোয়ার হাতে মরেছেন। কবি বলেন—

বসন্তরায়। (হাসিয়া) কবি যাই বলুন, আমার কাজ যদি নাও তবে তলোয়ার হাতে নিয়ে মরার শখ মিটতে পারে, কিন্তু সে তলোয়ার খাপ থেকে খোলবার সুযোগ হবে না। প্রজারা শান্তিতে আছে— ভগবান করুন আর লড়াইয়ের দরকার না হয়। বুড়ো হয়েছি, তলোয়ার ছেড়েছি, এখন তার বদলে আর-একজন আমার পাণিগ্রহণ করেছে। (সেতারে ঝংকার)

পাঠান। (ঘাড় নাড়িয়া) হায় হায়, এমন অস্ত্র কি আছে! একটি বয়েত আছে — তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায় কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।

বসন্তরায়। (উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কী বললে, খাঁসাহেব! সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়! কী চমৎকার! তলোয়ার যে এমন ভয়ানক জিনিস, তাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না। কেমন করে বলব নাশ করা যায়? রোগীকে 'বধ ক'রে রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতরো আরোগ্য? কিন্তু সংগীত যে এমন মৃদু জিনিস, তাতে শত্রু নাশ না করেও শত্রুত্ব নাশ করা যায়। এ কি সাধারণ কবিত্বের কথা! বাঃ, কী তারিফ! খাঁসাহেব, তোমাকে একবার রায়গড়ে যেতে হচ্ছে। আমি যশোর থেকে ফিরে গিয়েই আমার সাধ্যমত তোমার কিছু—

পাঠান। আপনার পক্ষে যা 'কিছু' আমার পক্ষে তাই ঢের। হুজুর, আপনার সেতার বাজানো আসে?

বসন্তরায়। বাজানো আসে কেমন করে বলি? তবে বাজাই বটে।

[সেতার-বাদন

পাঠান। বাহবা! খাসা!

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। আঃ, বাঁচলুম! দাদামশায়, পথের ধারে এত রাত্রে কাকে বাজনা শোনাচ্ছ?

বসন্তরায়। খবর কী দাদা? সব ভালো তো? দিদি ভালো আছে?

উদয়াদিত্য। সমস্তই মঙ্গল।

বসন্তরায়। সেতার লইয়া গান

ভূপালী। খং

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
তুমি গগনেরই তারা
মর্তে এলে পথহারা,
এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরই হাস।

উদয়াদিত্য। দাদামশায়, এ লোকটি কোথা থেকে জুটল?

বসন্তরায়। খাঁসাহেব বড়ো ভালো লোক। সমজদার ব্যক্তি। আজ রাত্রে এঁকে নিয়ে বড়ো আনন্দেই কাটানো গেছে।

উদয়াদিত্য। তোমার সঙ্গের লোকজন কোথায়? চটিতে না গিয়ে এই পথের ধারে রাত কাটাচ্ছ যে?

বসন্তরায়। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলে! খাঁসাহেব, তোমাদের জন্যে আমার ভাবনা হচ্ছে। এখনও তো কেউ ফিরল না। সেই ডাকাতের দল কি তবে—

পাঠান। হুজুর, অভয় দেন তো সত্য কথা বলি। আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা, যুবরাজ বাহাদুর আমাদের বেশ চেনেন। মহারাজ আমাকে আর আমার ভাই রহিমকে আদেশ করেন যে, আপনি যখন নিমন্ত্রণ রাখতে যশোরের দিকে আসবেন তখন পথে আপনাকে খুন করা হয়।

বসন্তরায়। রাম, রাম!

উদয়াদিত্য। বলে যাও।

পাঠান। আমার ভাই গ্রামে ডাকাত পড়েছে বলে কেঁদেকেটে আপনার অনুচরদের নিয়ে গেলেন। আমার উপরেই এই কাজের ভার ছিল। কিন্তু মহারাজ, যদিও রাজার আদেশ, তবু এমন কাজে আমার প্রবৃত্তি হল না। কারণ আমাদের কবি বলেন, রাজা তো পৃথিবীরই রাজা, তাঁর আদেশে পৃথিবী নষ্ট করতে পার, কিন্তু সাবধান, স্বর্গের এক কোণও নষ্ট কোরো না। গরিব এখন মহারাজের শরণাগত। দেশে ফিরে গেলে আমার সর্বনাশ হবে।

বসন্তরায়। তোমাকে পত্র দিচ্ছি, তুমি এখান থেকে রায়গড়ে চলে যাও।

উদয়াদিত্য। দাদামশায়, তুমি এখান থেকে যশোরে যাবে নাকি?

বসন্তরায়। হাঁ ভাই।

উদয়াদিত্য। সে কী কথা!

বসন্তরায়। আমি তো ভাই ভবসমুদ্রের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি— একটা ঢেউ লাগলেই বাস্। আমার ভয় কাকে? কিন্তু আমি যদি না যাই তবে প্রতাপের সঙ্গে ইহজন্মে আমার আর দেখা হওয়া শক্ত হবে। এই যে ব্যাপারটা ঘটল এর সমস্ত কালি মুছে ফেলতে হবে যে— এইখেন থেকেই যদি রায়গড়ে ফিরে যাই তা হলে সমস্তই জমে থাকবে। চল্ দাদা চল্। রাত শেষ হয়ে এল।

৪

মন্ত্রসভায় প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

প্রতাপাদিত্য। দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটো এখনও এল না।

মন্ত্রী। সেটা তো আমার দোষ নয় মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। দোষের কথা হচ্ছে না। দেরি কেন হচ্ছে তুমি কী অনুমান কর তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মন্ত্রী। শিমুলতলি তো কাছে নয়। কাজ সেরে আসতে দেরি তো হবেই।

প্রতাপাদিত্য। উদয় কাল রাত্রেই বেরিয়ে গেছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সে তো পূর্বেই জানিয়েছি।

প্রতাপাদিত্য। কী উপযুক্ত সময়েই জানিয়েছ। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি মন্ত্রী, এ সমস্তই সে তার স্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে করেছে। কী বোধ হয়?

মন্ত্রী। কেমন করে বলব মহারাজ?

প্রতাপাদিত্য। আমি কি তোমার কাছে বেদবাক্য শুনতে চাচ্ছি? তুমি কি আন্দাজ কর তাই জিজ্ঞাসা করছি।

একজন পাঠানের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কী হল?

পাঠান। মহারাজ, এতক্ষণে কাজ নিকেশ হয়ে গেছে।

প্রতাপাদিত্য। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। জানি বই-কি। কাজ শেষ হয়ে গেছে ভুল নেই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলুম না। আমার ভাই হোসেন খাঁর উপর ভার আছে, সে খুব হুঁশিয়ার। মহারাজের পরামর্শমতে আমি খুড়ারাজা-সাহেবের লোকজনদের তফাত করেই চলে আসছি।

প্রতাপাদিত্য। হোসেন যদি ফাঁকি দেয়?

পাঠান। তোবা! সে তেমন বেইমান নয়। মহারাজ, আমি আমার শির জামিন রাখলুম।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, এইখানে হাজির থাকো, তোমার ভাই ফিরে এলে বকশিশ মিলবে। (পাঠানের বাহিরে গমন) এটা যাতে প্রজারা টের না পায় সে চেষ্টা করতে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কথা গোপন থাকবে না।

প্রতাপাদিত্য। কিসে তুমি জানলে?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষ আপনি তো কোনোদিন লুকোতে পারেন নি। এমন-কি, আপনার কন্যার বিবাহেও আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন নি— তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছিলেন। আর আজ আপনি অকারণে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, আর পথে এই কাণ্ডটি ঘটল, এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এর মূল বলে জানবে।

প্রতাপাদিত্য। তা হলেই তুমি খুব খুশি হও, না?

মন্ত্রী। মহারাজ, এমন কথা কেন বলছেন? আপনার ধর্ম-অধর্ম পাপপুণ্যের বিচার আমি করি নে, কিন্তু রাজ্যের ভালোমন্দর কথাও যদি আমাকে ভাবতে না দেবেন তবে আমি আছি কী করতে? কেবল প্রতিবাদ করে মহারাজের জেদ বাড়িয়ে তোলবার জন্যে?

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, ভালোমন্দর কথাটা কী ঠাওরালে শুনি।

মন্ত্রী। আমি এই কথা বলছি, পদে পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবেন না। দেখুন, মাধবপুরের প্রজারা খুব প্রবল এবং আপনার বিশেষ বাধ্য নয়। তারা রাজ্যের সীমানার কাছে থাকে, পাছে আপনার প্রতিবেশী শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয় এই ভয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা যায় না। সেইজন্য মাধবপুর-শাসনের ভার যুবরাজের উপর দেবার কথা আমিই মহারাজকে বলেছিলেম।

প্রতাপাদিত্য। সে তো বলেছিলে। তার ফল কী হল দেখো না। আজ দু বৎসরের খাজনা বাকি। সকল মহল থেকে টাকা এল, আর ওখান থেকে কী আদায় হল?

মন্ত্রী। আজ্ঞে আশীর্বাদ। তেমন সব বজ্জাত প্রজাও যুবরাজের পায়ের গোলাম হয়ে গেছে। টাকার চেয়ে কি তার কম দাম? সেই যুবরাজের কাছ থেকে আপনি মাধবপুরের ভার কেড়ে নিলেন। সমস্তই উলটে গেল। এর চেয়ে তাঁকে না পাঠানোই ভালো ছিল। সেখানকার প্রজারা তো হন্যে কুকুরের মতো খেপে রয়েছে— তার পরে আবার যদি এই কথাটা প্রকাশ হয় তা হলে কী হয় বলা যায় না। রাজকার্যে ছোটোদেরও অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ! অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড়ো হয়ে ওঠে।

প্রতাপাদিত্য। সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী তো মাধবপুরে থাকে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্মের ভেক ধরে সেই তো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই তো প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। উদয়কে বলেছিলুম যেমন করে হোক তাকে আচ্ছা করে শাসন করে দিতে। কিন্তু উদয়কে জান তো? এ দিকে তার না আছে তেজ, না আছে পৌরুষ, কিন্তু একগুঁয়েমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন দূরে থাক্‌, তাকে আস্পর্ধা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। এবারে তার কণ্ঠীসুদ্ধ কণ্ঠ চেপে ধরতে হচ্ছে, তার পরে দেখা যাবে তোমার মাধবপুরের প্রজাদের কতবড়ো বুকের পাটা! আর দেখো, লোকজন আজই সব ঠিক করে রাখো— খবরটা পাবামাত্রই রায়গড়ে গিয়ে বসতে হবে। সেইখানেই শ্রাদ্ধশান্তি করব— আমি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর তো কাউকে দেখি নে।

বসন্তরায়ের প্রবেশ। প্রতাপাদিত্য চমকিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান

বসন্তরায়। আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য; তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আমি বৃদ্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তিই নেই।

(প্রতাপ নীরব) প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো— ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েছ— তার পরে বহুকাল সেখানে যাও নি।

প্রতাপাদিত্য। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগর্জনে) খবরদার! ওই পাঠানকে ছাড়িস নে! [দ্রুত প্রস্থান

বসন্তরায়ের প্রস্থান। প্রতাপ ও মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। দেখো মন্ত্রী, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখা যাচ্ছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই।

প্রতাপাদিত্য। এ বিষয়ের কথা তোমাকে কে বলছে? আমি বলছি রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখছি। সেদিন তোমাকে চিঠি রাখতে দিলেম, হারিয়ে ফেললে! আর একদিন মনে আছে উমেশ রায়ের কাছে তোমাকে যেতে বলেছিলুম, তুমি লোক দিয়ে কাজ সেরেছিলে।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ—

প্রতাপাদিত্য। চুপ করো। দোষ কাটাবার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা কোরো না। যা হোক, তোমাকে জানিয়ে রাখছি, রাজকার্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছ না। যাও, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল তাদের কয়েদ করো গে।

রাজান্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা। (বিভার গলা ধরিয়া) তুই অমন চুপ করে থাকিস কেন ভাই? যা মনে আছে বলিস নে কেন?

বিভা। আমার আর কী বলবার আছে?

সুরমা। অনেকদিন তাঁকে দেখিস নি। তা তুইই না হয় তাঁকে একখানা চিঠি লেখ্‌ না। আমি তোর দাদাকে দিয়ে পাঠাবার সুবিধা করে দেব।

বিভা। যেখানে তাঁর আদর নেই সেখানে আসবার জন্যে আমি কেন তাঁকে লিখব? তিনি আমাদের চেয়ে কিসে ছোটো?

সুরমা। আচ্ছা গো আচ্ছা, না হয় তিনি খুব মানী, তাই বলে মানটাই কি সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো হল? সেটা কি বিসর্জন করবার কোনো জায়গা নেই?

গান

ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি টুটবে না ?
ওর মনের বেদন থাকবে মনে
প্রাণের কথা ফুটবে না ?
কঠিন পাষাণ বুকে লয়ে
নাই রহিল অটল হয়ে।
প্রেমেতে ঐ পাথর ক্ষ'য়ে
চোখের জল কি ছুটবে না ?

আচ্ছা বিভা, তুই যদি পুরুষ হতিস তো কী করতিস ? নিমন্ত্রণ-চিঠি না পেলে এক পা নড়তিস নে নাকি ?

বিভা। আমার কথা ছেড়ে দাও— কিন্তু তাই বলে—

সুরমা। বিভা, শুনেছিস দাদামশায় এসে পৌঁচেছেন।

বিভা। এখানে এলেন কেন ভাই ? আবার তো কিছু বিপদ ঘটবে না ?

সুরমা। বিপদের মুখের উপর তেড়ে এলে বিপদ ছুটে পালায়।

বিভা। না ভাই, আমার বুকের ভিতর এখনও কেঁপে উঠছে। আমার এমন একটা ভয় ধরে গেছে, কিছুতে ছাড়ছে না ; আমার মনে হচ্ছে কী যেন একটা হবে। মনে হচ্ছে যেন কাকে সাবধান করে দেবার আছে। আমার কিছুই ভালো লাগছে না। আচ্ছা, তিনি আমাদের দেখতে এখনও এলেন না কেন ?

বসন্তরায়ের প্রবেশ ও গান

আজ তোমারে দেখতে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভয় কোরো না, সুখে থাকো,
বেশিক্ষণ থাকব নাকো,
এসেছি দণ্ড দুয়ের তরে।
দেখব শুধু মুখখানি,
শোনাও যদি শুনব বাণী,
নাহয় যাব আড়াল থেকে
হাসি দেখে দেশান্তরে।

সুরমা। (বিভার চিবুক ধরিয়া) দাদামশায়, বিভার হাসি দেখবার জন্যে তো আড়ালে যেতে হল না। এবার তবে দেশান্তরের উদ্‌যোগ করো।

বসন্তরায়। না না, অত সহজে না। অমনি যে ফাঁকি দিয়ে হেসে তাড়াবে আমি তেমন পাত্র না। কেঁদে না তাড়ালে বুড়ো বিদায় হবে না। গোটা পনেরো নতুন গান আর একমাথা পুরোনো পাকাচুল এনেছি, সমস্ত নিকেশ না করে নড়ছি নে।

বিভা। মিছে বড়াই কর কেন? আধমাথা বই চুলই নেই!

বসন্তরায়। (মাথায় হাত বুলাইয়া) ওরে, সে একদিন গেছে রে ভাই। বললে বিশ্বাস করবি নে, বসন্তরায়েরও মাথায় একেবারে মাথাভরা চুল ছিল। সেদিন কি আর এত রাস্তা পেরিয়ে তোদের খোশামোদ করতে আসতুম। সেদিন একটা চুল পেকেছে কি, অমনি পাঁচটা রূপসী তোলবার জন্যে উমেদার হত। মনের আগ্রহে কাঁচাচুল সুদ্ধ উজাড় করে দেবার জো করত।

সুরমা। দাদামশায়, টাকের আলোচনা পরে হবে, এখন বিভার একটা যা হয় উপায় করে দাও।

বসন্তরায়। সেও কি আমাকে আবার বলতে হবে না কি? এতক্ষণ কী করছিলুম? এই যে বুড়োটা রয়েছে, এ কি কোনো কাজেই লাগে না মনে করছ?

গান

মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু-নয়ন।
মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ।
অশ্রুধোওয়া কাজলরেখা
আবার চোখে দিক না দেখা,
শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে কুসুমবন্ধন।

বিভা। দাদামশায়, সত্যি তুমি বাবার কাছে কিছু বলেছ?

বসন্তরায়। একটা কিছু যে বলেছি তার সাক্ষী আমি থাকতে থাকতেই হাজির হবে।

বিভা। কেন এমন কাজ করতে গেলে?

বসন্তরায়। খুব করেছি, বেশ করেছি।

বিভা। না দাদামশায়, আমি ভারি রাগ করেছি।

বসন্তরায়। এই বুঝি বকশিশ! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!

বিভা। না, সত্যি বলছি, কেন তুমি বাবাকে অনুরোধ করতে গেলে?

বসন্তরায়। দিদি, রাজার ঘরে যখন জন্মেছিস তখন অভিমান করে ফল নেই— এরা সব পাথর।

বিভা। আমার নিজের জন্যে অভিমান করি বুঝি! তিনি যে মানী, তাঁর অপমান কেন হবে?

বসন্তরায়। আচ্ছা বেশ, সে আমার সঙ্গে তার বোঝাপড়া হবে। ওরে, তুই এখন—

গান

পিলু বারোয়াঁ

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
এগিয়ে নিয়ে আয়—
তারে এগিয়ে নিয়ে আয়।
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি
ঢেলে দে তার পায়—
ওরে ঢেলে দে তার পায়।
আসছে পথে ছায়া পড়ে,
আকাশ এল আঁধার করে,
শুষ্ক কুসুম পড়ছে ঝরে
সময় বহে যায়—
ওরে সময় বহে যায়।

৬

মাধবপুরের পথ

ধনঞ্জয় ও প্রজাদল

ধনঞ্জয়। একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস কেন? মেরেছে বেশ করেছে। এতদিন আমার কাছে আছিস, বেটারা এখনও ভালো করে মার খেতে শিখলি নে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে?

১। রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়। আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে? এখনও সবাই তোদের গায়ে ধুলো দেয় না রে? তবে এখনও তোরা ধরা পড়িস নি? তবে এখনও আরও অনেক বাকি আছে!

২। বাকি আর রইল কী ঠাকুর! এ দিকে পেটের জ্বালায় মরছি, ও দিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে।

ধনঞ্জয়। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে— একবার খুব করে নেচে নে!

গান

আরো আরো প্রভু, আরো আরো।
এমনি করে আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই?
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।
এবার যা করবার তা সারো সারো।
আমি হারি কিম্বা তুমিই হার।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার!

২। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কোথায় চলেছ বলো দেখি।

ধনঞ্জয়। যশোর যাচ্ছি রে।

৩। কী সর্বনাশ! সেখানে কী করতে যাচ্ছ?

ধনঞ্জয়। একবার রাজাকে দেখে আসি। চিরকাল কি তোদের সঙ্গেই কাটাব? এবার রাজদরবারে নাম রেখে আসব।

৪। তোমার উপরে রাজার যে ভারি রাগ! তার কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে?

৫। জান তো যুবরাজ তোমাকে শাসন করতে চায় নি বলে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মার সইতে পারিস নে। সেইজন্যে তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্যে স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি। পেয়াদা নয় রে, পেয়াদা নয়— যেখানে স্বয়ং মারের বাবা বসে আছে সেইখানে ছুটেছি।

১। না, না, সে হবে না ঠাকুর, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। খুব হবে— পেট ভরে হবে, আনন্দে হবে।

১। তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। পেয়াদার হাতে আশ মেটে নি বুঝি?

২। না ঠাকুর, সেখানে একলা যেতে পারছ না, আমরাও সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। আচ্ছা, যেতে চাস তো চল্‌। একবার শহরটা দেখে আসবি।

৩। কিছু হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে।

ধনঞ্জয়। কেন রে? হাতিয়ার নিয়ে কী করবি?

৩। যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে—

ধনঞ্জয়। তা হলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়! কী আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ! তোদের যদি এইরকম বুদ্ধি হয় তবে এইখানেই থাক্‌।

৪। না, না, তুমি যা বলবে তাই করব, কিন্তু আমরা তোমার সঙ্গে থাকব।

৩। আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে?

৩। আমরা যুবরাজকে চাইব।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, অর্ধেক রাজত্ব চাইবি নে?

৩। ঠাট্টা করছ ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব? সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী? চাইতে দোষ নেই রে। চেয়ে দেখিস।

৪। যখন তাড়া দেবে?

ধনঞ্জয়। তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে? আরও একজন শোনবার লোক রাজদরবারে বসে থাকেন— শুনতে শুনতে তিনি একদিন মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছুই ক্ষতি হয় না।

গান

আমরা বসব তোমার সনে।
তোমার শরিক হব রাজার রাজা,
তোমার আধেক সিংহাসনে।
তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত,
তারা জানে না যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি,
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১

চন্দ্রদ্বীপ। রাজা রামচন্দ্ররায়ের কক্ষ

রামচন্দ্র, রমাই ভাঁড়, ফর্নাণ্ডিজ ও মন্ত্রী

রামচন্দ্র। (তামাকু টানিয়া) ওহে রমাই!

রমাই। আজ্ঞা মহারাজ!

রামচন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ।

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ।

ফর্নাণ্ডিজ। (হাততালি দিয়া) হিঃ হিঃ হিঃ— হিঃ হিঃ হিঃ।

রামচন্দ্র। খবর কী হে?

রমাই। পরম্পরায় শুনা গেল, সেনাপতি মশাইয়ের ঘরে চোর পড়েছিল।

রামচন্দ্র। (চোখ টিপিয়া) তার পরে?

রমাই। নিবেদন করি মহারাজ! (ফর্নাণ্ডিজ তাঁর কোর্তার বোতাম খুলছেন ও দিচ্ছেন) আজ দিন তিন-চার ধরে সেনাপতি মশাইয়ের ঘরে রাত্রে চোর আনাগোনা করছিল। সাহেবের ব্রাহ্মণী জানতে পেরে কর্তাকে অনেক ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কোনোমতেই কর্তার ঘুম ভাঙাতে পারেন নি।

রামচন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

সেনাপতি। হিঃ হিঃ হিঃ।

রমাই। তার পর দিনের বেলায় গৃহিণীর নিগ্রহ আর সইতে না পেরে জোড় হস্তে বললেন, "দোহাই তোমার, আজ রাত্রে চোর ধরব।" রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গিন্নি বললেন, "ওগো চোর এসেছে।" কর্তা বললেন, "ওই যাঃ ঘরে যে আলো জ্বলছে!" চোরকে ডেকে বললেন, "আজ তুই বড়ো বেঁচে গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পালাতে পারবি, কাল আসিস দেখি— অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস।"

রামচন্দ্র। হা হা হা হা।

মন্ত্রী। হো হো হো হো হো।

সেনাপতি। হি

রামচন্দ্র। তার পরে ?

রমাই। জানি না, কী কারণে চোরের যথেষ্ট ভয় হল না তার পর রাত্রেও ঘরে এল। গিন্নি বললেন, "সর্বনাশ হল, ওঠো।" কর্তা বললেন, "তুমি ওঠো না।" গিন্নি বললেন, "আমি উঠে কী করব ?" কর্তা বললেন, "কেন, ঘরে একটা আলো জ্বালাও না, কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না।" গিন্নি বিষম ক্রুদ্ধ ; কর্তা ততোধিক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "দেখো দেখি। তোমার জন্যই তো যথাসর্বস্ব গেল। আলোটা জ্বালাও। বন্দুকটা আনো।" ইতিমধ্যে চোর কাজকর্ম সেরে বললে, "মশাই, এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পারেন ? বড়ো পরিশ্রম হয়েছে।" কর্তা বিষম ধমক দিয়ে বললেন, "রোস বেটা! আমি তামাক সেজে দিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে আসবি তো এই বন্দুকে তোর মাথা উড়িবে দেব।" তামাক খেয়ে চোর বললে, "মশাই আলোটা যদি জ্বালেন তো বড়ো উপকার হয়। সিঁদকাটিটা পড়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না।" সেনাপতি বললেন, "বেটার ভয় হয়েছে। তফাতে থাক্‌, কাছে আসিস নে।" বলে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে দিলেন। ধীরে সুস্থে জিনিসপত্র বেঁধে চোর তো চলে গেল। কর্তা গিন্নিকে বললেন, "বেটা বিষম ভয় পেয়েছে।"

রামচন্দ্র। রমাই, শুনেছ আমি শ্বশুরালয়ে যাচ্ছি ?

রমাই। (মুখভঙ্গি করিয়া) অসারং খলু সংসারং সারং শ্বশুরমন্দিরং (সকলের হাস্য) কথাটা মিথ্যা নয় মহারাজ! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) শ্বশুরমন্দিরের সকলই সার— আহারটা, সমাদরটা— দুধের সরটি পাওয়া যায়, মাছের মুড়োটি পাওয়া যায়— সকলই সারপদার্থ! কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ওই যিনি—

রামচন্দ্র। (হাসিয়া) সে কী হে, তোমার অর্ধাঙ্গ—

রমাই। (জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে) মহারাজ, তাকে অর্ধাঙ্গ বলবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করলে আমি বরঞ্চ একদিন তার অর্ধাঙ্গ হতে পারব এমন ভরসা আছে। আমার মতন পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়লেও তার আয়তনে কুলোয় না।

[যথাক্রমে সকলের হাস্য

রামচন্দ্র। আমি তো শুনেছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়োই শান্তস্বভাবা, ঘরকন্নায় বিশেষ পটু।

রমাই। সে কথায় কাজ কী! ঘরে আর সকল রকমই জঞ্জাল আছে, কেবল আমি তিষ্ঠতে পারি না। প্রত্যূষে গৃহিণী এমনি ঝেঁটিয়ে দেন যে একেবারে মহারাজের দুয়ারে এসে পড়ি! [সকলের হাস্য

রামচন্দ্র। ওহে রমাই, তোমাকে এবার যে যেতে হবে, সেনাপতিকে সঙ্গে

নেব। (সেনাপতিকে) যাত্রার জন্য সমস্ত উদ্‌যোগ করো। আমার চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা যেন প্রস্তুত থাকে। [মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রস্থান

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি তো সমস্তই শুনেছ। গতবারে শ্বশুরালয়ে আমাকে বড়োই মাটি করেছিল।

রমাই। আজ্ঞে হাঁ, মহারাজের লেজ বানিয়ে দিয়েছিল।

রামচন্দ্র। (কাষ্ঠ হাসিয়া তাম্রকূট-সেবন)

রমাই। আপনার এক শ্যালক এসে আমাকে বললেন, বাসরঘরে তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি রামচন্দ্র না রামদাস? এমন তো পূর্বে জানতাম না। আমি তৎক্ষণাৎ বললুম, "পূর্বে জানবেন কী করে? পূর্বে তো ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করতে এসেছেন, তাই যস্মিন্ দেশে যদাচার।"

রামচন্দ্র। রমাই, এবারে গিয়ে জিতে আসতে হবে। যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার আংটি উপহার দেব।

রমাই। মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী? রমাইকে যদি অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়িঠাকরুনকে পর্যন্ত মনের সাধে ঘোল খাইয়ে আসতে পারি।

রামচন্দ্র। তার ভাবনা? তোমাকে আমি অন্তঃপুরেই নিয়ে যাব।

রমাই। আপনার অসাধ্য কী আছে?

২

পথপার্শ্বে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপুরের একদল প্রজা

১। বাবাঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্ছ, কিন্তু তিনি তোমাকে সহজে ছাড়বেন না।

ধনঞ্জয়। ছাড়বেন কেন বাপসকল! আদর করে ধরে রাখবেন।

১। সে আদরের ধরা নয়।

ধনঞ্জয়। ধরে রাখতে কষ্ট আছে বাপ— পাহারা দিতে হয়— যে-সে লোককে কি রাজা এত আদর করে? রাজবাড়িতে কত লোক যায়, দরজা থেকেই ফেরে— আমাকে ফেরাবে না।

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে!

আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,
সে কি অমনি হবে!
তার আগে তার পাষাণ হিয়া গলবে করুণ রসে,
সে কি অমনি হবে!
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে!

২। বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি রাজা হাত দেন তা হলে কিন্তু আমরা সইতে পারব না।

ধনঞ্জয়। আমার এই গা যাঁর তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেছি আমার এই গায়ে তিনি কত দুঃখই সইলেন— কত মার খেলেন, কত ধুলোই মাখলেন— হায় হায়—

কে বলেছে তোমায় বঁধু, এত দুঃখ সইতে?
আপনি কেন এলে, বঁধু, আমার বোঝা বইতে?
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু,
তোমায় দেব না দুখ পাব না দুখ,
হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ,
আমি সুখে দুঃখে পারব বন্ধু চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

৩। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব?

ধনঞ্জয়। বলব, আমরা খাজনা দেব না।

৩। যদি শুধোয় কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তা হলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই— কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

৪। বাবা, এ কথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না? ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

৫। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি— তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছোয় তা জানিস?

৬। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম— একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেকলে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ্, পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভালো হয় না। যতদূর পর্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয় তখনই শান্তি হয়।

৭। তোরা অত ভয় করছিস কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনঞ্জয়। তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলেছে তার নাম কর্। বেটারা কেবল তোরা বাঁচতেই চাস্— পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন, মরতে দোষ কী হয়েছে? যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি নে বুঝি! ওরে, সেই গানটা ধর্।—

গান

বলো ভাই, ধন্য হরি।
বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি।
ধন্য হরি সুখের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্যপাটে।
ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে—
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
সুধা দিয়ে মাতান যখন
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে
ধন্য হরি হাসিমুখে—
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে
ধন্য হরি, ধন্য হরি।

আপনি কাছে আসেন হেসে
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
খুঁজিয়ে বেড়ান দেশে দেশে
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
ধন্য হরি স্থলে জলে,
ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়পদ্মদলে
চরণ-আলোয় ধন্য করি।

৩

বিভার কক্ষ

রামমোহনের প্রবেশ ও প্রণাম

বিভা। মোহন, তুই এতদিন আসিস নি কেন?

রামমোহন। তা মা, কুপুত্র যদি-বা হয়, কুমাতা কখনও নয়, তুমি কোন্ আমাকে মনে করেছ? সে কথা বলো। একবার ডাকলেই তো হত। অমনি লজ্জা হল। আর মুখে উত্তরটি নেই! না না, মা, অবসর পাই নে বলেই আসতে পারি নে—নইলে মনে মনে ওই চরণপদ্ম দুখানি কখনও তো ভুলি নে।

বিভা। মোহন, তুই বোস, তোদের দেশের গল্প আমায় বল্।

রাম। মা, তোমার জন্য চারগাছি শাঁখা এনেছি, তোমাকে ওই হাতে পরতে হবে, আমি দেখব।

মহিষীর প্রবেশ

বিভা। (স্বর্ণালংকার খুলিয়া, হাতে শাঁখা পরিয়া) এই দেখো মা। মোহন তোমার চুড়ি খুলে আমায় চারগাছি শাঁখা পরিয়ে দিয়েছে।

মহিষী। (হাসিয়া) তা বেশ তো মানিয়েছে। মোহন, এইবারে তোর সেই আগমনী গানটি গা। তোর গান শুনতে আমার বড়ো ভালো লাগে।

রামমোহন। গান

সারা বরষ দেখি নে মা,
মা তুই আমার কেমন ধারা?

নয়নতারা হারিয়ে আমার
অন্ধ হল নয়নতারা।
এলি কি পাষাণী ওরে ?
দেখব তোরে আঁখি ভরে ;
কিছুতেই থামে না যে মা,
পোড়া এ নয়নের ধারা।

মহিষী। মোহন চল্‌, তোকে খাইয়ে আনি গে।

[রামমোহন ও মহিষীর প্রস্থান

সুরমা ও বসন্তরায়ের প্রবেশ

বসন্তরায়। সুরমা, ও সুরমা, একবার দেখে যাও। তোমাদের বিভার মুখখানি দেখো। বয়স যদি না যেত তো আজ তোর ওই মুখ দেখে এইখানে মাথা ঘুরে পড়তুম আর মরতুম। হায় হায়— মরবার বয়স গেছে! যৌবনকালে ঘড়ি ঘড়ি মরতুম। বুড়োবয়সে রোগ না হলে আর মরণ হয় না।

গান

হাসিরে কি লুকাবি লাজে,
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে।
রুধিয়া অধর-দ্বারে
ঝাঁপিতে চাহিলি তারে,
অমনি সে ছুটে এল নয়নমাঝে।

৪

প্রমোদসভা। নৃত্যগীত

রামচন্দ্ররায়

নটীর গান

পরজ বসন্ত। কাওয়ালি

না বলে যেয়ো না চলে মিনতি করি!
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি।

সারা নিশি জেগে থাকি,
ঘুমে ঢুলে পড়ে আঁখি,
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি।
চকিতে চমকি বঁধু, তোমারে খুঁজি—
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি!
নিশিদিন চাহে হিয়া
পরান পসারি দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি।

[রামচন্দ্ররায় মাঝে মাঝে বাহবা দিতেছেন, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন]

রামচন্দ্র। (দ্বারের কাছে উঠিয়া আসিয়া অনুচরের প্রতি) রমাইয়ের খবর কী?

অনুচর। কিছু তো জানি নে।

রামচন্দ্র। এখনও ফিরল না কেন? ধরা পড়ে নি তো?

অনুচর। হুজুর, বলতে তো পারি নে।

রামচন্দ্র। (ফিরিয়া আসিয়া আসনে বসিয়া) গাও, গাও, তোমরা গাও! কিন্তু ওটা নয়— একটা জলদ তাল লাগাও!

নটীর গান

ভৈরবী। কাওয়ালি

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, 'না, না, না।'
যত বলি 'নাই রাতি,
মলিন হয়েছে বাতি'
মুখপানে চেয়ে বলে, 'না না না।'
বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে
ফাগুন করিছে হাহা ফুলের বনে।
আমি যত বলি 'তবে
এবার যে যেতে হবে'
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, 'না, না, না।'

রামচন্দ্র। এ কী রকম হল! গান শুনে যে কেবলই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে!

রামমোহনের প্রবেশ

রামমোহন। একবার উঠে আসুন।

রামচন্দ্র। কেন, উঠব কেন?

রামমোহন। শীঘ্র আসুন, আর দেরি করবেন না।

রামচন্দ্র। চমৎকার গান জমেছে— এখন বিরক্ত করিস নে।

রামমোহন। যুবরাজ ডেকে পাঠিয়েছেন— বিশেষ কথা আছে।

রামচন্দ্র। আচ্ছা, তোমরা গান করো, আমি আসছি। রমাইয়ের কী হল জান? এখনও সে এল না কেন?

৫

প্রতাপাদিত্যের শয়নকক্ষ

প্রতাপাদিত্য ও লছমন সর্দার

প্রতাপাদিত্য। দেখো লছমন, আজ রাত্রে আমি রামচন্দ্ররায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখতে চাই।

লছমন। (সেলাম করিয়া) যো হুকুম মহারাজ!

রাজশ্যালকের প্রবেশ

রাজশ্যালক। (পদতলে পড়িয়া) মহারাজ, মার্জনা করুন, বিভার কথা একবার মনে করুন। অমন কাজ করবেন না।

প্রতাপাদিত্য। কী মুশকিল! আজ রাত্রে এরা আমাকে ঘুমোতে দেবে না নাকি? [পাশ ফিরিয়া শয়ন

রাজশ্যালক। মহারাজ, রাজজামাতা এখন অন্তঃপুরে আছেন। তাঁকে মার্জনা করুন। লছমনকে সেখানে যেতে নিষেধ করুন। তাতে আপনার অন্তঃপুরের অবমাননা হবে।

প্রতাপাদিত্য। এখন আমার ঘুমোবার সময়। কাল সকালে তোমাদের দরবার শোনা যাবে। তুমি বলছ রাজজামাতা এখন অন্তঃপুরে? আচ্ছা, লছমন!

লছমন। মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর হতে বাহিরে আসবে তখন আমার আদেশ পালন করবে। এখন সব যাও— আমার ঘুমের ব্যাঘাত কোরো না।

[লছমন ও রাজশ্যালকের প্রস্থান

বসন্তরায়ের প্রবেশ

বসন্তরায়। প্রতাপ! (প্রতাপাদিত্য নিরুত্তরে নিদ্রার ভান করিয়া রহিলেন) বাবা প্রতাপ! (প্রতাপাদিত্য নিরুত্তর) বাবা প্রতাপ, এও কি সম্ভব?

প্রতাপাদিত্য। (দ্রুত বিছানায় উঠিয়া বসিয়া) কেন সম্ভব নয়?

বসন্তরায়। ছেলেমানুষ, অপরিণামদর্শী, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য পাত্র?

প্রতাপাদিত্য। ছেলেমানুষ! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় এ বোঝবার বয়স তার হয় নি? ছেলেমানুষ! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া মূর্খ ব্রাহ্মণ, নির্বোধদের কাছে দাঁত দেখিয়ে যে রোজকার করে খায়, তাকে স্ত্রীলোক সাজিয়ে আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রূপ করবার জন্যে এনেছে— এতটা বুদ্ধি যার জোগাতে পারে, তার ফল কী হতে পারে সে বুদ্ধিটা আর তার মাথায় জোগাল না! দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাবে তখন তার মাথাও শরীরে থাকবে না।

বসন্তরায়। আহা, সে ছেলেমানুষ। সে কিছুই বোঝে না।

প্রতাপাদিত্য। দেখো পিতৃব্যঠাকুর, যশোরের রায়-বংশের কিসে মান-অপমান সে জ্ঞান যদি তোমার থাকবে তবে কি ওই পাকা মাথার উপর মোগল-বাদশার শিরোপা জড়িয়ে বেড়াতে পার! তোমার ওই মাথাটা ধূলিতে লুটাবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাতে বাধা পড়ল। এই তোমাকে স্পষ্টই বললুম। খুড়ামহাশয়, এখন আমার নিদ্রার সময়। [বসন্তরায়ের দিকে পিছন করিয়া চোখ বুজিয়া শয়ন

বসন্তরায়। প্রতাপ, আমি সব বুঝেছি। তুমি যখন একবার ছুরি তোল তখন সে ছুরি একজনের উপর পড়তেই চায়, আমি তার লক্ষ্য হতে সরে পড়লুম বলে আর-একজন তার লক্ষ্য হয়েছে। ভালো প্রতাপ, তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ একজনকে যদি গ্রাস করতেই চায় তবে আমাকেই করুক। প্রতাপ! (প্রতাপ নিদ্রার ভানে নিরুত্তর) প্রতাপ! (প্রতাপ নিরুত্তর) বাবা প্রতাপ, একবার বিভার কথা ভেবে দেখো। (প্রতাপ নিরুত্তর) করুণাময় হরি! [বসন্তরায়ের প্রস্থান

৬

নটনটীগণ

প্রথমা। কই, এখনও তো ফিরলেন না!

দ্বিতীয়া। আর তো ভাই, পারি নে। ঘুম পেয়ে আসছে।

তৃতীয়া। ফের কি সভা জমবে নাকি?

প্রথমা। কেউ যে জেগে আছে তা তো বোধ হচ্ছে না। এতবড়ো রাজবাড়ি সমস্ত যেন হাঁ হাঁ করছে।

দ্বিতীয়া। চাকররাও সব হঠাৎ কে কোথায় যেন চলে গেল!

তৃতীয়া। বাতিগুলো সব নিবে আসছে, কেউ জ্বালিয়ে দেবে না?

প্রথমা। আমার কেমন ভয় করছে ভাই!

দ্বিতীয়া। (বাদকদিগকে দেখাইয়া দিয়া) ওরাও যে সব ঘুমোতে লাগল— কী মুশকিলেই পড়া গেল। ওদের তুলে দে না। কেমন গা ছম্ ছম্ করছে।

তৃতীয়া। মিছে না ভাই! একটা গান ধর্। ওগো, তোমরা ওঠো ওঠো।

বাদকগণ। (ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ! এসেছেন নাকি?

প্রথমা। তোমরা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখো না গো! কেউ কোথাও নেই। আমাদের আজকে বিদায় দেবে না নাকি?

একজন বাদক। (বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ও দিকে যে সব বন্ধ।

প্রথমা। অ্যাঁ! বন্ধ! আমাদের কি কয়েদ করলে নাকি?

দ্বিতীয়া। দূর! কয়েদ করতে যাবে কেন?

তৃতীয়া। গান

নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে।
গোপনে কে এমন করে ফাঁদ ফেঁদেছে?
বসন্তরজনীশেষে
বিদায় নিতে গেলেম হেসে,
যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেছে।

প্রথমা। তোর সকল সময়েই গান। ভালো লাগছে না। কী হল বুঝতে পারছি নে।

৭

অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ

বিভা, উদয়াদিত্য, রামচন্দ্ররায় ও সুরমা। বসন্তরায়ের প্রবেশ
বসন্তরায়কে দেখিয়া মুখে কাপড় ঢাকিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠিল

বসন্তরায়। (উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া) দাদা, একটা উপায় করো।

উদয়াদিত্য। অন্তঃপুরের প্রহরীদের জন্যে আমি ভাবি নে। সদর-দরজায় এই প্রহরে যে দুজন পাহারা দেয় তারাও আমার বশ আছে। কিন্তু দেখলুম বড়ো ফটক বন্ধ, সে তো পার হবার উপায় নেই।

বসন্তরায়। উপায় নেই বললে চলবে কেন? উপায় যে করতেই হবে। দাদা চলো।

উদয়াদিত্য। যদি-বা ফটক পার হওয়া যায়, এ রাজ্য থেকে পালাবে কী করে?

রামচন্দ্র। আমার চৌষট্টি দাঁড়ের ছিপ রয়েছে, একবার তাতে চড়ে বসতে পারলে আমি আর কাউকে ভয় করি নে।

বসন্তরায়। সে নৌকো কোথায় আছে ভাই?

উদয়াদিত্য। সে নৌকো আমি রাজবাটীর দক্ষিণ পাশের খালের মধ্যে আনিয়ে রেখেছি। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছব কী করে?

রামচন্দ্র। রামমোহন কোথায় গেল?

উদয়াদিত্য। সে বন্ধ ফটকের উপর খাঁচার সিংহের মতো বৃথা ধাক্কা মারছে— তাতে কোনো ফল হবে না।

বিভা। খাল তো দূরে নয়। তোমার দক্ষিণের ঘরের জানালার একেবারে নীচেই তো খাল।

উদয়াদিত্য। সে যে অনেক নীচে। লাফিয়ে পড়া চলে না তো।

সুরমা। (উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে) আমাদের এখানে যে দাঁড়িয়ে থাকলে কোনো ফল হবে তা তো বোধ হয় না। মহারাজ কি শুতে গিয়েছেন?

বসন্তরায়। হাঁ শুতে গিয়েছেন, রাত তো কম হয় নি।

সুরমা। মা কি একবার তাঁর কাছে গিয়ে—

উদয়াদিত্য। মা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না। জানলে তিনি কান্নাকাটি করে এমনি গোলমাল বাধিয়ে তুলবেন যে, আর কোনো উপায় থাকবে না। জানই

তো তিনি মহারাজের কাছে কিছু বলতে গেলে সমস্তই উলটো হবে— মাঝের থেকে কেবল তিনিই অস্থির হয়ে উঠবেন।

সুরমা। বিভা, কাঁদিস নে বিভা। এ কখনও ঘটতেই পারে না। এ একটা স্বপ্ন— এ সমস্তই কেটে যাবে।

রামমোহনের প্রবেশ

রামচন্দ্র। কী রামমোহন— কী করবি বল্।

রামমোহন। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ—

রামচন্দ্র। আরে তোর প্রাণ নিয়ে আমার কী হবে? এখন পালাবার উপায় কী?

রামমোহন। মহারাজ, তুমি যদি ভয় না কর, আমি এক কাজ করতে পারি।

রামচন্দ্র। কী বল্।

রামমোহন। তোমাকে পিঠে করে নিয়ে রাজবাটীর ছাতের উপর থেকে আমি খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে পারি।

বসন্তরায়। কী সর্বনাশ! সে কি হয়!

রামচন্দ্র। না, সে হবে না। আর-একটা সহজ উপায় কিছু বল্।

রামমোহন। যুবরাজ, আমাকে গোটাকতক মোটা চাদর এনে দাও— পাকিয়ে শক্ত করে দক্ষিণের দরজার সঙ্গে বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিই।

উদয়াদিত্য। ঠিক বলেছিস রামমোহন। বিপদের সময় সবচেয়ে সহজ কথাটাই মাথায় আসে না। চল্ চল্।

বিভা। মোহন, কোনো ভয় নেই তো?

রামমোহন। কোনো ভয় নেই মা! আমি দড়ি বেয়ে স্বচ্ছন্দে নামিয়ে নিয়ে যাব। জয় মা কালী!

৮

অন্তঃপুর

মহিষী

মহিষী। কী হল বুঝতে পারছি নে তো। সকলকেই খাওয়ালুম কিন্তু মোহনকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে কেন? বামী!

বামীর প্রবেশ

এদিককার খাওয়াদাওয়া তো সব শেষ হল— মোহনকে খুঁজে পাচ্ছি নে কেন?

বামী। মা, তুমি অত ভাবছ কেন? তুমি শুতে যাও, রাত যে পুইয়ে এল, তোমার শরীরে সইবে কেন?

মহিষী। সে কি হয়! আমি যে তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়াব বলে রেখেছি।

বামী। সে নিশ্চয় রাজকুমারীর মহলে গেছে, তিনি তাকে খাইয়েছেন। তুমি চলো, শুতে চলো।

মহিষী। আমি তো ও মহলে খোঁজ করতে যাচ্ছিলুম, দেখি সব দরজা বন্ধ— এর মানে কী, কিছু তো বুঝতে পারছি নে।

বামী। বাড়িতে গোলমাল দেখে রাজকুমারী তাঁর মহলের দরজা বন্ধ করেছেন। অনেক দিন পরে জামাই এসেছেন, আজ লোকজনের ভিড় সইবে কেন? চলো, তুমি শুতে চলো।

মহিষী। কী জানি বামী, আজ ভালো লাগছে না। প্রহরীদের ডাকতে বললুম, তাদের কারও কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

বামী। যাত্রা হচ্ছে, তারা তাই আমোদ করতে গেছে।

মহিষী। মহারাজ জানতে পারলে যে তাদের আমোদ বেরিয়ে যাবে। উদয়ের মহলও যে বন্ধ, তারা ঘুমিয়েছে বুঝি!

বামী। ঘুমোবেন না! বল কী! রাত কম হয়েছে?

মহিষী। গানবাজনা ছিল, জামাইকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে না! ওরা মনে কী ভাববে বল্ তো? এ-সমস্তই ওই বউমার কাণ্ড। একটু বিবেচনা নেই। রোজই তো ঘুমোচ্ছে— একটা দিন কি আর—

বামী। মা, সে-সব কথা কাল হবে— আজ চলো।

মহিষী। মঙ্গলার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে তো?

বামী। হয়েছে বই-কি।

মহিষী। ওষুধের কথা বলেছিস?

বামী। সে-সব ঠিক হয়ে গেছে।

৯

শয়নকক্ষ

প্রতাপাদিত্য, প্রহরী, পীতাম্বর। অনুচরের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কত রাত আছে ?

পীতাম্বর। এখনও চার দণ্ড রাত আছে।

প্রতাপাদিত্য। কী যেন একটা গোলমাল শুনলুম।

পীতাম্বর। আজ্ঞে হাঁ, তাই শুনেই আমি আসছি।

প্রতাপাদিত্য। কী হয়েছে ?

পীতাম্বর। আসবার সময় দেখলুম, বাইরের প্রহরীরা দ্বারে নেই।

প্রতাপাদিত্য। অন্তঃপুরের প্রহরীরা ?

পীতাম্বর। হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপাদিত্য। তারা কী বললে ?

পীতাম্বর। আমার কথায় কোনো জবাব দিলে না— হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

প্রতাপাদিত্য। রামচন্দ্ররায় কোথায় ? উদয়াদিত্য, বসন্তরায় কোথায় ?

পীতাম্বর। বোধ করি তাঁরা অন্তঃপুরেই আছেন।

প্রতাপাদিত্য। বোধ করি ! তোমার বোধ করার কথা কে জিজ্ঞাসা করছে ? মন্ত্রীকে ডাকো। [পীতাম্বরের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজজামাতা—

প্রতাপাদিত্য। রামচন্দ্র রায়—

মন্ত্রী। তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করে গেছেন।

প্রতাপাদিত্য। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) পরিত্যাগ করে গেছে! প্রহরীরা গেল কোথা ?

মন্ত্রী। বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেছে।

প্রতাপাদিত্য। (মুষ্টি বদ্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে! পালাবে কোথায় ? যেখানে থাকে তাদের খুঁজে আনতে হবে। অন্তঃপুরের প্রহরীদের এখনই ডেকে নিয়ে এসো। অন্তঃপুরের পাহারায় কে কে ছিল ?

মন্ত্রী। সীতারাম আর ভাগবত।

প্রতাপাদিত্য। ভাগবত ছিল? সে তো হুঁশিয়ার। সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিলে?

মন্ত্রী। সে হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপাদিত্য। হাত-পা-বাঁধা আমি বিশ্বাস করি নে। হাত-পা ইচ্ছা করে বাঁধিয়েছে। আচ্ছা সীতারামকে নিয়ে এসো। সেই গর্দভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হল কী করে?

সীতারাম। (করজোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নেই।

প্রতাপাদিত্য। সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করছে?

সীতারাম। আজ্ঞা না, মহারাজ! যুবরাজ— যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বেঁধে অন্তঃপুর হতে বেরিয়েছিলেন।

ব্যস্তভাবে বসন্তরায়ের প্রবেশ

সীতারাম। যুবরাজকে নিষেধ করলুম, তিনি শুনলেন না।

বসন্তরায়। হাঁ, হাঁ সীতারাম, কী বললি? অধর্ম করিস নে সীতারাম, উদয়াদিত্যের এতে কোনো দোষ নেই।

সীতারাম। আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নেই।

প্রতাপাদিত্য। তবে তোর দোষ?

সীতারাম। আজ্ঞা না।

প্রতাপাদিত্য। তবে কার দোষ?

সীতারাম। আজ্ঞা, যুবরাজ—

প্রতাপাদিত্য। তাঁর সঙ্গে আর কে ছিল?

সীতারাম। আজ্ঞা, বউরানীমা—

প্রতাপাদিত্য। বউরানী! ওই সেই শ্রীপুরের (বসন্তরায়ের দিকে চাহিয়া)— উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নেই।

বসন্তরায়। বাবা প্রতাপ, উদয়ের এতে কোনো দোষ নেই।

প্রতাপাদিত্য। দোষ নেই? তুমি দোষ নেই বলছ বলেই তাকে বিশেষরূপে শাস্তি দেব। তুমি মাঝে পড়ে মীমাংসা করতে এসেছ কেন? শোনো পিতৃব্যঠাকুর!

তুমি যদি দ্বিতীয় বার যশোরে এসে উদয়াদিত্যের সঙ্গে দেখা কর তবে তার প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

বসন্ত রায়। (কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া) ভালো প্রতাপ,,আজ সন্ধ্যাবেলায় তবে আমি চললেম। [প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

১

উদয়াদিত্যের ঘরের অলিন্দ

উদয়াদিত্য ও মাধবপুরের একদল প্রজা

উদয়াদিত্য। ওরে, তোরা মরতে এসেছিস এখানে? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা পালা।

১। আমাদের মরণ সর্বত্রই। পালাব কোথায়?

২। তা মরতে যদি হয় তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব।

উদয়াদিত্য। তোদের কী চাই বল্ দেখি।

অনেকে। আমরা তোমাকে চাই।

উদয়াদিত্য। আমাকে নিয়ে তোদের কোনো লাভ হবে না রে— দুঃখই পাবি।

৩। আমাদের দুঃখই ভালো কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

৪। আমাদের মাধবপুরে ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কাঁদছে, সে কি কেবল ভাত না পেয়ে? তা নয়। তুমি চলে এসেছ বলে। তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য। আরে চুপ কর্, চুপ কর্। ও কথা বলিস নে।

৫। রাজা তোমাকে ছাড়বে না। আমরা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা রাজাকে মানি নে— আমরা তোমাকে রাজা করব।

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কাকে মানিস নে রে! তোরা কাকে রাজা করবি?

প্রজাগণ। মহারাজ, পেন্নাম হই।

১। আমরা তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

প্রতাপাদিত্য। কিসের দরবার?

১। আমরা যুবরাজকে চাই।

প্রতাপাদিত্য। বলিস কী রে!

সকলে। হাঁ মহারাজ, আমরা যুবরাজকে মাধবপুরে নিয়ে যাব।

প্রতাপাদিত্য। আর ফাঁকি দিবি? খাজনা দেবার নামটি করবি নে?

সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে!

প্রতাপাদিত্য। মরতে তো সকলকেই হবে। বেটারা রাজার দেনা বাকি রেখে মরবি?

১। আচ্ছা, আমরা না খেয়েই খাজনা দেব, কিন্তু যুবরাজকে আমাদের দাও। মরি তো ওঁরই হাতে মরব।

প্রতাপাদিত্য। সে বড়ো দেরি নেই। তোদের সর্দার কোথায় রে?

২। (প্রথমকে দেখাইয়া) এই যে আমাদের গণেশ সর্দার।

প্রতাপাদিত্য। ও নয়— সেই বৈরাগীটা।

১। আমাদের ঠাকুর! তিনি তো পুজোয় বসেছেন। এখনই আসবেন। ওই যে এসেছেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রবেশ

ধনঞ্জয়। দয়া যখন হয় তখন সাধনা না করেই পাওয়া যায়। ভয় ছিল কাঙালদের দরজা থেকেই ফিরতে হয় বা। প্রভুর কৃপা হল, রাজাকে অমনি দেখতে পেলুম। (উদয়াদিত্যের প্রতি) আর এই আমাদের হৃদয়ের রাজা। ওকে রাজা বলতে যাই, বন্ধু বলে ফেলি!

উদয়াদিত্য। ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয়। কী রাজা! কী ভাই?

উদয়াদিত্য। এখানে কেন এলে?

ধনঞ্জয়। তোমাকে না দেখে থাকতে পারি নে যে!

উদয়াদিত্য। মহারাজ রাগ করছেন।

ধনঞ্জয়। রাগই সই। আগুন জ্বলছে, তবু পতঙ্গ মরতে যায়।

প্রতাপাদিত্য। তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খেপাই বই-কি! নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই, এই তো আমার কাজ।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ খেপা সে।
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজে কোন্ বাতাসে।

ওরে খেপার দল, গান ধর্ রে— হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাজাকে পেয়েছিস, আনন্দ করে নে। রাজা আমাদের মাধবপুরের নৃত্যটা দেখে নিক।

সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত

গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন-গিরি খুঁজে ফিরি,
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে!

(প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে এ কী লীলা হচ্ছে! ধরা দেবে না বলে পণ করেছিলে, আমরা ধরব বলে কোমর বেঁধে বেরিয়েছি।

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি— দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না! এতবড়ো আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী ব'লে?

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না— পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে, এমন কাজ করতে নেই— প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপাদিত্য। *দেখো ধনঞ্জয়,* তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ— সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে— ব্যথা আমার বেঁচে থাক্।

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তোমার চাল নেই, চুলো নেই; কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ? (প্রজাদের প্রতি) দেখ্ বেটারা, আমি বলছি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

প্রজাগণ। আমাদের প্রাণ থাকতে সে তো হবে না।

ধনঞ্জয়। কেন হবে না রে! তোদের বুদ্ধি এখনও হল না? রাজা বললে বৈরাগী তুমি রইলে, তোরা বললি না তা হবে না— আর বৈরাগী লক্ষ্মীছাড়াটা কি ভেসে এসেছে? তার থাকা না-থাকা কেবল রাজা আর তোরা ঠিক করে দিবি?

গান

রইল বলে রাখলে কারে?
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টিঁকবে না ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।
যা খুশি তাই করতে পার—
গায়ের জোরে রাখ মার;
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা সন সেটাই সবে।
অনেক তোমার টাকাকড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী—
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

মন্ত্রীর প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ—

প্রতাপাদিত্য। কী, হুকুমটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না বুঝি ?

উদয়াদিত্য। মহারাজ, বৈরাগীঠাকুর সাধুপুরুষ।

প্রজারা। মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ, অকল্যাণ হবে।

ধনঞ্জয়। আমি বলছি, তোরা ফিরে যা। হুকুম হয়েছে আমি দু দিন রাজার কাছে থাকব, বেটাদের সেটা সহ্য হল না।

প্রজারা। আমরা এইজন্যেই কি দরবার করতে এসেছিলুম ? আমরা যুবরাজকেও পাব না, তোমাকেও হারাব ?

ধনঞ্জয়। দেখ্, তোদের কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। হারাবি কি রে বেটা ? আমাকে তোদের গাঁঠে বেঁধে রেখেছিলি ? তোদের কাজ হয়ে গেছে, এখন পালা, সব পালা।

প্রজারা। মহারাজ, আমরা কি আমাদের যুবরাজকে পাব না ?

প্রতাপাদিত্য। না।

২

অন্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা। বিভা, ভাই বিভা, তোর চোখে যদি জল দেখতুম তা হলে আমার মনটা যে খোলসা হত। তোর হয়ে যে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে ভাই। সব কথাই কি এমনি করে চেপে রাখতে হয় ?

বিভা। কোনো কথাই তো চাপা রইল না বউরানী। ভগবান তো লজ্জা রাখলেন না !

সুরমা। আমি কেবল এই কথাই ভাবি যে জগতে সব দাহই জুড়িয়ে যায়। আজকের মতো এমন কপাল-পোড়া সকাল তো রোজ আসবে না; সংসার লজ্জা

দিতেও যেমন, লজ্জা মিটিয়ে দিতেও তেমনি! সব ভাঙাচোরা জুড়ে আবার দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে যায়।

বিভা। ঠিক নাও যদি হয়ে যায় তাতেই বা কী? যেটা হয় সেটা তো সইতেই হয়।

সুরমা। শুনেছিস তো বিভা, মাধবপুর থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এসেছেন। তাঁর তো খুব নাম শুনেছি, বড়ো ইচ্ছা করে তাঁর গান শুনি। গান শুনবি বিভা? ওই দেখ, কেবল অতটুকু মাথা নাড়লে হবে না। লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছি, আজ যেন একবার মন্দিরে গান গাইতে আসেন; তা হলে আমরা উপরের ঘর থেকে শুনতে পাব। ও কী, পালাচ্ছিস কোথায়?

বিভা। দাদা আসছেন।

সুরমা। তা এলই বা দাদা।

বিভা। না, আমি যাই বউরানী! [প্রস্থান

সুরমা। আজ ওর দাদার কাছেও মুখ দেখাতে পারছে না।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

সুরমা। আজ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমাদের মন্দিরে গান গাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়াদিত্য। সে তো হবে না।

সুরমা। কেন?

উদয়াদিত্য। তাঁকে মহারাজ কয়েদ করেছেন।

সুরমা। কী সর্বনাশ! অমন সাধুকে কয়েদ করেছেন?

উদয়াদিত্য। ওটা আমার উপর রাগ করে। তিনি জানেন আমি বৈরাগীকে ভক্তি করি— মহারাজের কঠিন আদেশেও আমি তাঁর গায়ে হাত দিই নি— সেই-জন্যে আমাকে দেখিয়ে দিলেন রাজকার্য কেমন করে করতে হয়।

সুরমা। কিন্তু এগুলো যে অমঙ্গলের কথা— শুনলে ভয় হয়। কী করা যাবে?

উদয়াদিত্য। মন্ত্রী আমার অনুরোধে বৈরাগীকে গারদে না দিয়ে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বললেন, আমি গারদেই যাব, সেখানে যত কয়েদি আছে তাদের প্রভুর নামগান শুনিয়ে আসব। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না— তাঁর ভাবনার লোক উপরে আছেন।

সুরমা। মাধবপুরের প্রজাদের জন্যে আমি সব সিধে সাজিয়ে রেখেছি— কোথায় সব পাঠাব ?

উদয়াদিত্য। গোপনে পাঠাতে হবে। নির্বোধগুলো আমাকে রাজা রাজা করে চেঁচাচ্ছিল, মহারাজ সেটা শুনতে পেয়েছেন— নিশ্চয় তাঁর ভালো লাগে নি। এখন তোমার ঘর থেকে তাদের খাবার পাঠানো হলে মনে কী সন্দেহ করবেন বলা যায় না।

সুরমা। আচ্ছা, সে আমি বিভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমি ভাবছি, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল সেই সীতারাম-ভাগবতের কী দশা হবে!

উদয়াদিত্য। মহারাজ ওদের গায়ে হাত দেবেন না— সে ভয় নেই।

সুরমা। কেন?

উদয়াদিত্য। মহারাজ কখনও ছোটো শিকারকে বধ করেন না। দেখলে না রমাই ভাঁড়কে তিনি ছেড়ে দিলেন ?

সুরমা। কিন্তু শাস্তি তো তিনি একজন কাউকে না দিয়ে থাকবেন না।

উদয়াদিত্য। সে তো আমি আছি।

সুরমা। ও কথা বোলো না।

উদয়াদিত্য। বলতে বারণ কর তো বলব না। কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হতে হবে না ?

সুরমা। আমি থাকতে তোমার বিপদ ঘটবে কেন ? সব বিপদ আমি নেব।

উদয়াদিত্য। তুমি নেবে ? তার চেয়ে বিপদ আমার আর আছে নাকি ? যাই হোক, সীতারাম-ভাগবতের অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সুরমা। তুমি কিন্তু কিছু কোরো না। তাদের জন্যে যা করবার ভার সে আমি নিয়েছি।

উদয়াদিত্য। না, না, এতে তুমি হাত দিয়ো না।

সুরমা। আমি দেব না তো কে দেবে ? ও তো আমার কাজ। আমি সীতারাম-ভাগবতের স্ত্রীদের ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়াদিত্য। সুরমা, তুমি বড়ো অসাবধান।

সুরমা। আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আসল ভাবনার কথা কী জান ?

উদয়াদিত্য। কী বলো দেখি ?

সুরমা। ঠাকুরজামাই তাঁর ভাঁড়কে নিয়ে যে কাণ্ডটি করলেন বিভা সেজন্যে লজ্জায় মরে গেছে।

উদয়াদিত্য। লজ্জার কথা বই-কি।

সুরমা। এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের 'পরেই তার অভিমান ছিল— আজ যে তার সে অভিমান করবারও মুখ রইল না। বাপের নিষ্ঠুরতার চেয়ে তার স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজেছে। একে তো ভারি চাপা মেয়ে, তার পরে এই কাণ্ড। আজ থেকে দেখো, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও বলতে পারবে না। স্বামীর গর্ব যে স্ত্রীলোকের ভেঙেছে জীবন তার পক্ষে বোঝা, বিশেষত বিভার মতো মেয়ে।

উদয়াদিত্য। ভগবান বিভাকে দুঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেমনি সহ্য করবার শক্তিও দিয়েছেন।

সুরমা। সে শক্তির অভাব নেই— বিভা তোমারই তো বোন বটে!

উদয়াদিত্য। আমার শক্তি যে তুমি।

সুরমা। তাই যদি হয় তো সে'ও তোমারই শক্তিতে।

উদয়াদিত্য। আমার কেবলই ভয় হয় তোমাকে যদি হারাই তা হলে—

সুরমা। তা হলে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। দেখো এক দিন ভগবান প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহত্ত্ব একলা তোমাতেই আছে।

উদয়াদিত্য। আমার সে প্রমাণে কাজ নেই।

সুরমা। ভাগবতের স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

উদয়াদিত্য। আচ্ছা চললুম, কিন্তু দেখো। [প্রস্থান

ভাগবতের স্ত্রীর প্রবেশ

সুরমা। ভোর-রাত্রে আমি যে টাকা আর কাপড় পাঠিয়েছি তা তোদের হাতে গিয়ে পৌচেছে তো?

ভাগবতের স্ত্রী। পৌচেছে মা, কিন্তু তাতে আমাদের কতদিন চলবে? তোমরা আমাদের সর্বনাশ করলে।

সুরমা। ভয় নেই কামিনী! আমার যতদিন খাওয়া-পরা জুটবে তোদেরও জুটবে। আজও কিছু নিয়ে যা। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকিস নে। [উভয়ের প্রস্থান

মহিষী ও বামীর প্রবেশ

মহিষী। এত বড়ো একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আমি জানতেও পারলুম না।

বামী। মহারানীমা, জেনেই বা লাভ হত কী? তুমি তো ঠেকাতে পারতে না।

মহিষী। সকালে উঠে আমি ভাবছি হল কী— জামাই বুঝি রাগ করেই গেল।

এ দিকে যে এমন সর্বনাশের উদ্‌যোগ হচ্ছিল তা মনে আনতেও পারি নি। তুই সে রাত্রেই জানতিস, আমাকে ভাঁড়িয়েছিলি।

বামী। জানলে তুমি যে ভয়েই মরে যেতে। তা মা, আর ও কথায় কাজ নেই— যা হয়ে গেছে সে হয়ে গেছে।

মহিষী। হয়ে চুকলে তো বাঁচতুম— এখন যে আমার উদয়ের জন্যে ভয় হচ্ছে।

বামী। ভয় খুব ছিল কিন্তু সে কেটে গেছে।

মহিষী। কী করে কাটল ?

বামী। মহারাজার রাগ বউরানীর উপর পড়েছে। তিনিও আচ্ছা মেয়ে যা হোক— আমাদের মহারাজের ভয়ে যম কাঁপে কিন্তু ওঁর ভয় ডর নেই। যাতে তাঁরই উপরে সব রাগ পড়ে তিনি ইচ্ছে করেই যেন তার জোগাড় করছেন।

মহিষী। তার জন্যে তো বেশি জোগাড় করবার দরকার দেখি নে। মহারাজ যে ওকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। এবারে আর তো ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। তা তোকে যা বলেছিলুম সেটা ঠিক আছে তো ?

বামী। সে-সমস্তই তৈরি হয়ে রয়েছে, সেজন্যে ভেবো না।

মহিষী। আর দেরি করিস নে, আজকেরই যাতে—

বামী। সে আমাকে বলতে হবে না, কিন্তু—

মহিষী। যা হয় হবে— অত ভাবতে পারি নে— ওকে বিদায় করতে পারলেই আপাতত মহারাজের রাগ পড়ে যাবে, নইলে উদয়কে বাঁচাতে পারা যাবে না। তুই যা, শীঘ্র কাজ সেরে আয়।

বামী। আমি সে ঠিক করেই এসেছি— এতক্ষণে হয়তো—

মহিষী। কী জানি বামী, ভয়ও হয়।

৩

প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

মহিষী ও প্রতাপাদিত্য

প্রতাপাদিত্য। মহিষী !

মহিষী। কী মহারাজ ?

প্রতাপাদিত্য। এ-সব কাজ কি আমাকে নিজের হাতে করতে হবে !

মহিষী। কী কাজ ?

প্রতাপাদিত্য। ওই-যে আমি তোমাকে বলেছিলুম, শ্রীপুরের মেয়েকে তার পিত্রালয়ে দূর করে দিতে হবে— এ কাজটা কি আমার সৈন্য-সেনাপতি নিয়ে করতে হবে ?

মহিষী। আমি তার জন্যে বন্দোবস্ত করছি।

প্রতাপাদিত্য। বন্দোবস্ত ! এর আবার বন্দোবস্ত কিসের ? আমার রাজ্যে ক-জন পালকির বেহারা জুটবে না নাকি ?

মহিষী। সেজন্যে নয় মহারাজ !

প্রতাপাদিত্য। তবে কী জন্যে ?

মহিষী। দেখো, তবে খুলে বলি। ওই বউ আমার উদয়কে যেন জাদু করে রেখেছে সে তো তুমি জান। ওকে যদি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই তা হলে —

প্রতাপাদিত্য। এমন জাদু তো ভেঙে দিতে হবে— এ বাড়ি থেকে ওই মেয়েটাকে নির্বাসিত করে দিলেই জাদু ভাঙবে।

মহিষী। মহারাজ, এ-সব কথা তোমরা বুঝবে না - সে আমি ঠিক করেছি।

প্রতাপাদিত্য। কী ঠিক করেছ জানতে চাই।

মহিষী। আমি বামীকে দিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে ওষুধ আনিয়েছি।

প্রতাপাদিত্য। ওষুধ কিসের জন্যে ?

মহিষী। ওকে ওষুধ খাওয়ালেই ওর জাদু কেটে যাবে। মঙ্গলার ওষুধ অব্যর্থ, সকলেই জানে।

প্রতাপাদিত্য। আমি তোমার ওষুধ-টষুধ বুঝি নে আমি এক ওষুধ জানি— শেষকালে সেই ওষুধ প্রয়োগ করব। আমি তোমাকে বলে রাখছি, কাল যদি ওই শ্রীপুরের মেয়ে শ্রীপুরে ফিরে না যায় তা হলে আমি উদয়কে সুদ্ধ নির্বাসনে পাঠাব। এখন যা করতে হয় করো গে।

মহিষী। আর তো বাঁচি নে ! কী যে করব মাথামুণ্ডু ভেবে পাই নে। [প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। সীতারাম-ভাগবতের বেতন বন্ধ হয়েছে সে কি রাজকোষে অর্থ নেই বলে ?

উদয়াদিত্য। না মহারাজ, আমি বলপূর্বক তাদের কর্তব্যে বাধা দিয়েছি, আমাকে তারই দণ্ড দেবার জন্যে।

প্রতাপাদিত্য। বউমা তাদের গোপনে অর্থসাহায্য করছেন।

উদয়াদিত্য। আমিই তাঁকে সাহায্য করতে বলেছি।

প্রতাপাদিত্য। আমার ইচ্ছার অপমান করবার জন্যে ?

উদয়াদিত্য। না মহারাজ, যে দণ্ড আমারই প্রাপ্য তা নিজে গ্রহণ করবার জন্যে।

প্রতাপাদিত্য। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে তাদের আর যেন অর্থসাহায্য না করা হয়।

উদয়াদিত্য। আমার প্রতি আরও গুরুতর শাস্তির আদেশ হল।

প্রতাপাদিত্য। আর বউমাকে বোলো, তিনি আমাকে একেবারেই ভয় করেন না— দীর্ঘকাল তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলেই এরকম ঘটতে পেরেছে, কিন্তু তিনি জানতে পারবেন স্পর্ধা প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। তিনি মনে রাখেন যেন আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয়। [উভয়ের প্রস্থান

মহিষী ও বামীর প্রবেশ

মহিষী। ওষুধের কী করলি ?

বামী। সে তো এনেছি— পানের সঙ্গে সেজে দিয়েছি।

মহিষী। খাঁটি ওষুধ তো ?

বামী। খুব খাঁটি।

মহিষী। খুব কড়া ওষুধ হওয়া চাই, এক দিনেই যাতে কাজ হয়! মহারাজ বলেছেন, কালকের মধ্যে যদি সুরমা বিদায় না হয় তা হলে উদয়কে স্বন্ধ নির্বাসনে পাঠাবেন। আমি যে কী কপাল করেছিলুম!

বামী। কড়া ওষুধ তো বটে। বড়ো ভয় হয় মা, কী হতে কী ঘটে।

মহিষী। ভয়ভাবনা করবার সময় নেই বামী! একটা-কিছু করতেই হবে। মহারাজকে তো জানিস— কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে তাঁর কথা নড়ানো যায় না। উদয়ের জন্যে আমি দিনরাত্রি ভেবে মরছি। ওই বউটাকে বিদায় করতে পারলে তবু মহারাজের রাগ একটু কম পড়বে। ও যেন ওঁর চক্ষুশূল হয়েছে।

বামী। তা তো জানি। কিন্তু ওষুধের কথা তো বলা যায় না। দেখো, শেষকালে মা, আমি যেন বিপদে না পড়ি। আর আমার বাজুবন্দর কথাটা মনে রেখো।

মহিষী। সে আমাকে বলতে হবে না। তোকে তো গোটছড়াটা আগাম দিয়েছি।

বামী। শুধু গোট নয় মা, বাজুবন্দ চাই। [প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক!

উদয়াদিত্য। কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করেছে?

মহিষী। কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে মহারাজার রাজকার্যের যে কী সুযোগ হবে, মহারাজই জানেন।

উদয়াদিত্য। মা, রাজবাড়িতে যদি আমার স্থান হয়ে থাকে তবে সুরমার কি হবে না? কেবল স্থানটুকুমাত্রই তার ছিল, তার বেশি তো আর কিছু সে পায় নি!

মহিষী। (সরোদনে) কী জানি বাবা, মহারাজ কখন কী যে করেন কিছুই বুঝতে পারি নে। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমা বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করে অবধিই এখানে আর শান্তি নেই। হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল। তা, ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক-না কেন, দেখা যাক— কী বল বাছা? ও দিনকতক এখান থেকে গেলেই দেখতে পাবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।

[উদয় নীরব থাকিয়া কিয়ৎকাল পরে প্রস্থান

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। কই, এখানে তো তিনি নেই।

মহিষী। পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী করলি? আমার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দে। এসে অবধি তুই তার কী সর্বনাশ না করলি? অবশেষে— সে রাজার ছেলে— তার হাতে বেড়ি না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হবি নে?

সুরমা। কোনো ভয় নেই মা! বেড়ি এবার ভাঙল। আমি বুঝতে পারছি আমার বিদায় হবার সময় হয়ে এসেছে— আর বড়ো দেরি নেই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। বুকের ভিতর যেন আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। তোমার পায়ের ধুলো নিতে এলুম। অপরাধ যা-কিছু করেছি মাপ কোরো। ভগবান করুন যেন আমি গেলেই শান্তি হয়। [পদধূলি লইয়া প্রস্থান

মহিষী। ওষুধ খেয়েছে বুঝি। বিপদ কিছু ঘটবে না তো? যে যা বলুক, বউমা কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর করে বিদায় করলে কি ধর্মে সইবে? বামী, বামী!

বামীর প্রবেশ

বামী। কী মা?

মহিষী। ওষুধটা কি বড্ড কড়া হয়েছে?

বামী। তুমি তো কড়া ওষুধের কথাই বলেছিলে।

মহিষী। কিন্তু বিপদ ঘটবে না তো?

বামী। আপদবিপদের কথা বলা যায় কি?

মহিষী। সত্যি বলছি বামী, আমার মনটা কেমন করছে। ওষুধটা কি খেয়েছে-- ঠিক জানিস?

বামী। বেশিক্ষণ নয়— এই খানিকক্ষণ হল খেয়েছে।

মহিষী। দেখলুম, মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কী করলুম কে জানে! হরি, রক্ষা করো।

বামী। তোমরা তো ওকে বিদায় করতেই চেয়েছিলে!

মহিষী। না না, ছি ছি— অমন কথা বলিস নে। দেখ্, আমি তোকে আমার এই গলার হারগাছটা দিচ্ছি, তুই শিগগির দৌড়ে গিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে এর উলটো ওষুধ নিয়ে আয় গে। যা বামী, যা! শিগগির যা! [বামীর প্রস্থান

বিভার সরোদনে প্রবেশ

বিভা। মা মা, কী হল মা!

মহিষী। কী হয়েছে বিভু?

বিভা। বউদিদির এমন হল কেন মা! তোমরা তাকে কী করলে মা? কী খাওয়ালে?

মহিষী। (উচ্চস্বরে) ওরে বামী, বামী! শিগগির দৌড়ে যা— ওরে, ওষুধ নিয়ে আয়।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, কী হয়েছে বাপ!

উদয়াদিত্য। সুরমা বিদায় হয়েছে মা, এবার আমি বিদায় হতে এসেছি— আর এখানে নয়।

মহিষী। (কপালে করাঘাত করিয়া) কী সর্বনাশ হল রে! কী সর্বনাশ হল!

উদয়াদিত্য। (প্রণাম করিয়া) চললুম তবে।

মহিষী। (হাত ধরিয়া) কোথায় যাবি বাপ? আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা!

বিভা। (পা জড়াইয়া) কোথায় যাবে দাদা! আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে?

উদয়াদিত্য। তোকে কার হাতে দিয়ে যাব! আমি হতভাগা ছাড়া তোর কে

আছে? ওরে বিভা, তুইই আমাকে টেনে রাখলি— নইলে এ পাপ-বাড়িতে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতুম না।

বিভা। বুক ফেটে গেল দাদা, বুক ফেটে গেল।

উদয়াদিত্য। দুঃখ করিস নে বিভা, যে গেছে সে সুখে গেছে। এ বাড়িতে এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম পেল।

৪

প্রাসাদের দ্বারের বাহিরে

মাধবপুরের প্রজাদল

১। (উচ্চস্বরে) আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।

২। আমরা এখানে না খেয়ে মরব।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। এরা সব বৈরাগীঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিন্তু যেরকম গোলমাল লাগিয়েছে, এখনই মহারাজের কানে যাবে— মুশকিলে পড়ব। কী বাবা, তোমরা মিছে চেঁচামেচি করছ কেন বলো তো?

সকলে। আমরা রাজার কাছে দরবার করব।

প্রহরী। আমার পরামর্শ শোন্ বাবা— দরবার করতে গিয়ে মরবি। তোরা নেহাত ছোটো বলেই মহারাজ তোদের গায়ে হাত দেন নি— কিন্তু হাঙ্গামা যদি করিস তো একটি প্রাণীও রক্ষা পাবি নে।

১। আমরা আর তো কিছু চাই নে, যে গারদে বাবা আছেন আমরাও সেখানে থাকতে চাই।

প্রহরী। ওরে, চাই বললেই হবে এমন দেশ এ নয়।

২। আচ্ছা, আমরা আমাদের যুবরাজকে দেখে যাব।

প্রহরী। তিনি তোদের ভয়েই লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন।

৩। তাঁকে না দেখে আমরা যাব না।

সকলে। (ঊর্ধ্বস্বরে) দোহাই যুবরাজ বাহাদুর!

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। আমি তোদের হুকুম করছি তোরা দেশে ফিরে যা।

১। তোমার হুকুম মানব— আমাদের ঠাকুরও হুকুম করেছেন তাঁর হুকুমও মানব— কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য। আমায় নিয়ে কী হবে ?

১।" তোমাকে আমাদের রাজা করব।

উদয়াদিত্য। তোদের তো বড়ো আস্পর্ধা হয়েছে! এমন কথা মুখে আনিস! তোদের কি মরবার জায়গা ছিল না ?

২। মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দুঃখ সহ্য হয় না।

৩। আমাদের যে বুক কেমন করে ফাটছে তা বিধাতাপুরুষ জানেন।

৪। রাজা, তোমার দুঃখে আমাদের কলিজা জ্বলে গেল।

৫। আমাদের মা-লক্ষ্মী কোথায় গেল রাজা ?

১। আমাদের দয়া করেছিল বলেই সে গেল।

২। এ রাজ্যে কেউ আমাদের মুখ তুলে চায় নি— সন্তানের সেই অনাদর কেবল আমাদের মার মনে সয় নি।

৩। দুবেলা মা আমাদের কত যত্ন করে কত খাবার পাঠিয়েছে। সেই মাকে রাখতে পারলুম না রে!

৪। কিন্তু রাজা, তুমি মুখ ফিরিয়ে চলেছ কোথায় ? তোমাকে ছাড়ছি নে।

৫। আমরা জোর করে নিয়ে যাব, কেড়ে নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য। আচ্ছা শোন্, আমি বলি— তোরা যদি দেরি না করে এখনই দেশে চলে যাস তা হলে আমি মহারাজের কাছে নিজে মাধবপুরে যাবার দরবার করব।

১। সঙ্গে আমাদের ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে ?

উদয়াদিত্য। চেষ্টা করব। কিন্তু আর দেরি না— এই মুহূর্তে তোরা এখান থেকে বিদায় হ।

প্রজারা। আচ্ছা, আমরা বিদায় হলুম। জয় হোক। তোমার জয় হোক।

৫

চন্দ্রদ্বীপ। রাজা রামচন্দ্রের কক্ষ

রামচন্দ্র, মন্ত্রী, দেওয়ান, রমাই ও অন্যান্য সভাসদগণ

রামচন্দ্র গদির উপর তাকিয়া হেলান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে *সম্মুখস্থ একজন অপরাধীর বিচার করিতেছেন*

রামচন্দ্র। বেটা, তোর এতবড়ো যোগ্যতা!

অপরাধী। (সরোদনে) দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নি।

মন্ত্রী। বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আর আমাদের মহারাজের তুলনা?

দেওয়ান। বেটা, জানিস নে, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয় তখন তাকে রাজটিকা পরাবার জন্যে সে আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহের কাছে আবেদন করে। অনেক কাঁদাকাটা করাতে তিনি তাঁর বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুল দিয়ে তাকে টিকা পরিয়ে দেন।

রমাই। বিক্রমাদিত্যের বেটা প্রতাপাদিত্য, ওরা তো দুই পুরুষে রাজা। প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, কেঁচোর পুত্র হল জোঁক, বেটা প্রজার রক্ত খেয়ে খেয়ে বিষম ফুলে উঠল, সেই জোঁকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মাথাটা কুলোপানা করে তুলেছে আর চক্র ধরতে শিখেছে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করে আসছি; আমরা বেদে, আমরা জাতসাপ চিনি নে?

রামচন্দ্র। আচ্ছা, যা— এ যাত্রা বেঁচে গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান থাকিস।

[মন্ত্রী, রমাই ও রামচন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান

রমাই। আপনি তো চলে এলেন, এ দিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়লেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হলে হাতের লোহা আর বালা দুগাছি বিক্রি করে রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাতে ব্যাঘাত করলেন। তা নিয়ে তম্বি কত!

রামচন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) বটে!

মন্ত্রী। মহারাজ, শুনতে পাই, প্রতাপাদিত্য আজকাল আপসোসে সারা হচ্ছেন। এখন কী উপায়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবেন তাই ভেবে তাঁর আহারনিদ্রা নেই।

রামচন্দ্র। সত্যি নাকি? [হাস্য ও তাম্রকূটসেবন]

মন্ত্রী। আমি বললুম, আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে কাজ নেই। তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করেছেন এতেই তোমাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেছে। তার

পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে এনে ঘর নিচু করা, এত পুণ্য এখনও তোমরা কর নি। কেমন হে ঠাকুর ?

রমাই। তার সন্দেহ আছে ? মহারাজ, আপনি যে পাঁকে পা দিয়েছেন সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্যি, কিন্তু তাই বলে ঘরে ঢোকবার সময় পা ধুয়ে আসবেন না তো কী ?

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহারাজ, আহার প্রস্তুত। [রমাই ও মন্ত্রীর প্রস্থান

রামমোহন মালের প্রবেশ

রামমোহন। (করজোড়ে) মহারাজ !

রামচন্দ্র। কী রামমোহন ?

রামমোহন। মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি মাঠাকরুনকে আনতে যাই।

রামচন্দ্র। সে কী কথা !

রামমোহন। আজ্ঞে হাঁ। অন্তঃপুর অন্ধকার হয়ে আছে, আমি তা দেখতে পারি নে। অন্দরে যাই, মহারাজের ঘরে কাকেও দেখতে পাই নে, আমার যেন প্রাণ কেমন করতে থাকে। আমার মা-লক্ষ্মী ঘরে এসে ঘর আলো করুন, দেখে চক্ষু সার্থক করি।

রামচন্দ্র। রামমোহন, তুমি পাগল হয়েছ ? সে মেয়েকে আমি ঘরে আনি ?

রামমোহন। (নেত্র বিস্ফারিত করিয়া) কেন মহারাজ !

রামচন্দ্র। বল কী রামমোহন ? প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনব ?

রামমোহন। কেন আনবেন না হুজুর ? আপনার রানীকে আপনি যদি ঘরে এনে তাঁর সম্মান না রাখেন তা হলে কি আপনার সম্মানই রক্ষা হবে ?

রামচন্দ্র। যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয় ?

রামমোহন। (বক্ষ ফুলাইয়া) কী বললে মহারাজ ? যদি না দেয় ? এতবড়ো সাধ্য কার যে দেবে না ! আমার মা জননী, আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মী, কার সাধ্য তাঁকে আমাদের কাছ হতে কেড়ে রাখতে পারে ? আমার মাকে আমি আনব, তুমিই বা বারণ করবার কে ? [প্রস্থানোদ্যম

রামচন্দ্র। (তাড়াতাড়ি) রামমোহন, যেয়ো না, শোনো শোনো। আচ্ছা, তুমি আনতে যাচ্ছ যাও— তাতে আপত্তি নেই ; কিন্তু দেখো, এ কথা যেন কেউ শুনতে না পায়। রমাই কিম্বা মন্ত্রীর কানে এ কথা যেন কোনোমতে না ওঠে।

রামমোহন। যে আজ্ঞা মহারাজ !

চতুর্থ অঙ্ক

১

মন্ত্রী ও প্রতাপাদিত্য

প্রতাপাদিত্য। মাধবপুরের প্রজারা দরখাস্ত নিয়ে দিল্লিতে চলেছিল, হাতে হাতে ধরা পড়েছিল— সেও কি তুমি অবিশ্বাস কর?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না মহারাজ, অবিশ্বাস করছি নে।

প্রতাপাদিত্য। ওরা তাতে লিখেছে, আমি দিল্লীশ্বরের শত্রু; ওদের ইচ্ছা আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উদয়কে সিংহাসন দেওয়া হয়— এ কথাগুলো তো ঠিক?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সে দরখাস্ত তো আমি দেখেছি।

প্রতাপাদিত্য। এর চেয়ে তুমি আর কী প্রমাণ চাও?

মন্ত্রী। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের যুবরাজ আছেন এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারি নে।

প্রতাপাদিত্য। তোমার বিশ্বাস কিম্বা তোমার আন্দাজের উপর নির্ভর করে তো আমি রাজকার্য চালাতে পারি নে। যদি বিপদ ঘটে তবে, 'ওই যা, মন্ত্রী আমার ভুল বিশ্বাস করেছিল' বলে তো নিষ্কৃতি পাব না।

মন্ত্রী। কিন্তু যুবরাজকে যে সন্দেহে কারাদণ্ড দিয়েছেন তার যদি কোনো মূল না থাকে তা হলেও রাজকার্যের মঙ্গল হবে না।

প্রতাপাদিত্য। রাজ্য রক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী! অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হলে তার পরে দণ্ড দেওয়াই যে রাজার কর্তব্য তা আমি মনে করি নে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিম্বা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য।

মন্ত্রী। আপনি রাগ করবেন, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে সন্দেহ কিম্বা ভবিষ্যৎ অপরাধের সম্ভাবনা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারি নে।

প্রতাপাদিত্য। মাধবপুরের প্রজারা এখানে এসেছিল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। তারা ওকেই রাজা করতে চেয়েছিল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ, চেয়েছিল।

প্রতাপাদিত্য। তুমি বলতে চাও এ-সকলের মধ্যে উদয়ের কোনো হাত ছিল না?

মন্ত্রী। যদি হাত থাকত তা হলে এত প্রকাশ্যে এ কথার আলোচনা হত না।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে থাকো— কিন্তু আমি বরঞ্চ নির্দোষকে দণ্ড দেব কিন্তু যেখানে রাজ্যের কিছুমাত্র অহিত ঘটবার আশঙ্কা আছে সেখানে বিপদটা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব না। রাজার দায়িত্ব মন্ত্রীর দায়িত্বের চেয়ে ঢের বেশি।

মন্ত্রী। অন্তত বৈরাগীঠাকুরকে ছেড়ে দিন মহারাজ! প্রজাদের মনে একসঙ্গে এতগুলো বেদনা চাপাবেন না।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, সে আমি বিবেচনা করে দেখব।

২

রায়গড়। বসন্তরায়ের প্রাসাদ। বসন্তরায় একাকী আসীন

পাঠানের প্রবেশ ও সেলাম

বসন্তরায়। খাঁসাহেব, এসো এসো। সাহেব, তোমার মুখ এমন মলিন দেখছি কেন? মেজাজ ভালো তো?

পাঠান। মেজাজের কথা আর বলবেন না মহারাজ! একটি বয়েত আছে— রাত্রি বলে, আমার কি হাসবার ক্ষমতা আছে? যখন চাঁদ হাসে তখনই আমি হাসি, নইলে সব অন্ধকার! মহারাজ, আমরাই বা কে? আপনি না হাসলে যে আমাদের হাসি ফুরিয়ে যায়! আমাদের আর সুখ নেই প্রভু!

বসন্তরায়। সে কী কথা সাহেব! আমার তো অসুখ কিছুই নেই।

পাঠান। এখন আপনার আর তেমন গানবাজনা শুনি নে। আপনার যে সেতার কোলে-কোলেই থাকত সে তো আর দেখতেই পাই নে।

বসন্তরায়। সেতার! সেতারে তো নাড়া দিলেই বেজে ওঠে। কিন্তু মানুষের মনে যখন সুর লাগে না তখন কার সাধ্য তাকে বাজায়।

সীতারামের প্রবেশ

সীতারাম। জয় হোক মহারাজ! [প্রণাম

বসন্তরায়। আরে সীতারাম যে! ভালো আছিস তো? মুখ শুকনো যে? খবর সব ভালো তো? শীঘ্র বল্।

সীতারাম। খবর বড়ো খারাপ— সব বলছি।

পাঠান। হুজুর, তবে এখন আসি। *[সেলাম ও প্রস্থান*

বসন্তরায়। সীতারাম, কী হয়েছে সব বল্‌ বল্‌! আমার প্রাণ বড়ো অধীর হচ্ছে। আমার দাদার—

সীতারাম। নিবেদন করছি মহারাজ! যুবরাজকে আমাদের মহারাজ কারাদণ্ড দিয়েছেন।

বসন্তরায়। কারাদণ্ড! সে কী কথা! কেন, উদয় কী অপরাধ করেছিল?

সীতারাম। সে তো আমরা কিছু বুঝতে পারলুম না। হঠাৎ একদিন শুনলুম যুবরাজ বন্দী।

বসন্তরায়। অ্যাঁ! বন্দী!

সীতারাম। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ!

বসন্তরায়। সীতারাম, এ কী কথা! তাকে কি একেবারে জেলখানায় ফৌজ-পাহারায় বন্ধ করে রেখেছে?

সীতারাম। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ!

বসন্তরায়। তাকে কি একবার বেরোতেও দেয় না?

সীতারাম। আজ্ঞা না।

বসন্তরায়। সে একলা কারাগারে?

সীতারাম। হাঁ মহারাজ!

বসন্তরায়। প্রতাপ আমাকে বন্দী করুক না— আমি আপনি গিয়ে ধরা দিচ্ছি।

সীতারাম। তাতে কোনো ফল হবে না।

বসন্তরায়। কিন্তু কী হবে সীতারাম! কী করা যায়?

সীতারাম। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আপনাকে যেতে হচ্ছে। একবার যশোরে চলুন।

বসন্তরায়। সে তো যাবই। একবার তো প্রতাপকে বলে কয়ে চেষ্টা করে দেখতেই হবে।

৩

চন্দ্রদ্বীপ। রামচন্দ্রের কক্ষ

রামচন্দ্র, মন্ত্রী, রমাই, দেওয়ান ও ফর্নাণ্ডিজ

রামমোহন প্রবেশ করিয়া জোড়হস্তে দণ্ডায়মান

রামচন্দ্র। (বিস্মিত ভাবে) কী হল রামমোহন?

রামমোহন। সকলই নিষ্ফল হয়েছে।

রামচন্দ্র। (চমকিয়া) আনতে পারলি নে?

রামমোহন। আজ্ঞে না মহারাজ! কুলগ্নে যাত্রা করেছিলুম।

রামচন্দ্র। (ক্রুদ্ধ হইয়া) বেটা, তোকে যাত্রা করতে কে বলেছিল? তখন তোকে বার বার করে বারণ করলুম, তখন যে তুই বুক ফুলিয়ে গেলি, আর আজ—

রামমোহন। (কপালে হাত দিয়া) মহারাজ, আমার অদৃষ্টের দোষ।

রামচন্দ্র। (আরও ক্রুদ্ধ হইয়া) রামচন্দ্ররায়ের অপমান! তুই বেটা, আমার নাম করে ভিক্ষা চাইতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিলে না! এতবড়ো অপমান আমাদের বংশে আর কখনও হয় নি।

রামমোহন। (নত শির তুলিয়া) ও কথা বলবেন না। প্রতাপাদিত্য যদি না দিতেন, আমি যেমন করে পারি আনতুম। প্রতাপাদিত্য রাজা বটেন, কিন্তু আমার রাজা তো নন।

রামচন্দ্র। ওরে হতভাগা বেটা, তবে হল না কেন? (রামমোহন নীরব) রামমোহন, শীঘ্র বল্।

রামমোহন। মহারাজ, তাঁর ভাই আজ কারাগারে।

রামচন্দ্র। তাতে কী হল?

রামমোহন। ভাইয়ের এই বিপদের দিনে তাঁকে একলা ফেলে চলে আসেন, এমন মা কি আমার?

রামচন্দ্র। বটে! আসতে চাইলেন না বটে! আমার লোক গিয়ে ফিরে এল!

রামমোহন। রাগ করেন কেন মহারাজ! রাগ করতে হয় তা হলে যারা আপনার বুদ্ধি নষ্ট করেছে তাদের উপর রাগ করুন।

রামচন্দ্র। তার মানে কী হল?

রামমোহন। যুবরাজ যে আজ বন্দী তার গোড়াকার কথাটা কি এরই মধ্যে

ভুললেন ? এ-সমস্ত তো আমাদেরই জন্যে ! এমন স্থলে আমাদের মহারানীমাকেও তো জোর করে বলতে পারলুম না যে আমাদের কর্মের ফল তোমার ভাইয়ের উপরে চাপিয়ে তুমি চলে এসো।

রামচন্দ্র। বেরো বেটা, বেরো তুই ! এখনই আমার সুমুখ হতে দূর হয়ে যা।

রামমোহন। যাচ্ছি মহারাজ ; কিন্তু এ কথা বলে যাব যে, সতীলক্ষ্মী যদি এবার তাঁর ভাইকে ছেড়ে চলে আসতেন তা হলে তাঁর স্বামীর পাপ বৃদ্ধি হত— সেই ভয়েই তিনি হৃদয় পাষাণ করে রইলেন, আসতে পারলেন না। [প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ, আর-একটি বিবাহ করুন।

দেওয়ান। মন্ত্রী ঠিক কথাই বলেছেন। তা হলে প্রতাপাদিত্য এবং তাঁর কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে।

রমাই। এ শুভকার্যে আপনার বর্তমান শ্বশুরমশাইকে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাতে ভুলবেন না, নইলে কী জানি তিনি মনে দুঃখ করতে পারেন।

সকলে। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ ! হাঃ হাঃ ! হোঃ হোঃ হোঃ !

রমাই। বরণ করবার জন্য এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়িঠাকরুনকে ডেকে পাঠাবেন ; আর মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ— প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একথাল মিষ্টান্ন পাঠাবেন তখন তার সঙ্গে দুটো কাঁচা রম্ভা পাঠিয়ে দেবেন।

রামচন্দ্র। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ ! হাঃ হাঃ !

[সভাসদগণের হাস্য। সকলের অলক্ষ্যে ফর্নাণ্ডিজের প্রস্থান

দেওয়ান। তা মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে তা হলে তো যশোরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হয়ে যায়, চন্দ্রদ্বীপে আর খাবার উপযুক্ত লোক থাকে না।

রামচন্দ্র। আমার শ্বশুরকে এখনই একটা চিঠি লিখে দিতে হচ্ছে।

মন্ত্রী। কী লিখব ?

রমাই। লেখো, তোমার রাজত্ব এবং রাজকন্যা তোমারই থাক্— জগতে শালা-শ্বশুরের অভাব নেই।

সকলে। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ ! হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ ! ওঃ হোঃ হোঃ !

মন্ত্রী। তা বেশ, ওই কথাই গুছিয়ে লেখা যাবে।

রামচন্দ্র। আজই ও চিঠি রওনা করে দিয়ো।

৪

যশোহর। প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

বসন্তরায়ের প্রবেশ

বসন্তরায়। বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও? পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে তবে তাকে এই বুড়োর কাছে দাও-না। (প্রতাপ নিরুত্তর) তুমি যা মনে করে উদয়কে শাস্তি দিচ্ছ সেই অপরাধ যে যথার্থ আমার। আমিই যে রামচন্দ্ররায়কে রক্ষা করবার জন্যে চক্রান্ত করেছিলুম।

প্রতাপাদিত্য। খুড়োমশায়, বৃথা কথা বলে আমার কাছে কোনোদিন কেউ কোনো ফল পায় নি।

বসন্তরায়। ভালো, আমার আর-একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি একবার কেবল উদয়কে দেখে যেতে চাই – আমাকে তার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করতে কেউ যেন বাধা না দেয় এই অনুমতি দাও।

প্রতাপাদিত্য। সে হতে পারবে না।

বসন্তরায়। তা হলে আমাকে তার সঙ্গে এক সঙ্গে বন্দী করে রাখো। আমাদের দুজনেরই অপরাধ এক, দণ্ডও এক হোক— যতদিন সে কারাগারে থাকবে আমিও থাকব। [নীরবে প্রতাপের প্রস্থান

সীতারামের প্রবেশ ও প্রণাম

বসন্তরায়। কী সীতারাম, খবর কী?

সীতারাম। খবর পরে বলব। এখন শীঘ্র একবার আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে। বিলম্ব করবেন না।

বসন্তরায়। কেন সীতারাম? কোথায় যেতে হবে?

[বসন্তরায়ের কানে কানে সীতারামের ভাষণ

(বিস্ফারিত নেত্রে) অ্যাঁ! সত্যি নাকি!

সীতারাম। মহারাজ, কথা কবার সময় নেই, শীঘ্র আসুন।

বসন্তরায়। একবার বিভার সঙ্গে দেখাটা করে আসি না?

সীতারাম। না, সে হয় না— আর দেরি না।

বসন্তরায়। তবে কাজ নেই— চলো। (অগ্রসর হইয়া) কিন্তু বেশি দেরি হত না— একবার দেখা করেই চলে আসতুম।

সীতারাম। না মহারাজ, তা হলে বিপদ হবে। [প্রস্থান

৫

কারাগার

উদয়াদিত্য। অনুচরের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। লোচনদাস!

লোচনদাস। যুবরাজ!

উদয়াদিত্য। যুবরাজ কাকে বলছ?

লোচনদাস। আজ্ঞে, আপনাকে।

উদয়াদিত্য। আমার এই যৌবরাজ্য যেন পরম শত্রুর ভাগ্যেও না পড়ে। লোচন।

লোচনদাস। আজ্ঞে।

উদয়াদিত্য। সময় এখন কত? বিভার কি আসবার সময় হয় নি?

লোচনদাস। আজ্ঞে, এখনও কিছু দেরি আছে। মায়ের ভোগ সারা হলে তিনি নিজের হাতে প্রসাদ নিয়ে আসবেন।

উদয়াদিত্য। সন্ধ্যারতি এতক্ষণে হয়ে গেছে বোধ হয়?

লোচনদাস। আজ্ঞে হাঁ, হয়ে গেছে।

উদয়াদিত্য। পাখিরা সব বাসায় ফিরে গেছে। নহবতখানায় এতক্ষণে ইমন-কল্যাণের সুর বাজছে। লোচন, বিভার শ্বশুরবাড়ি থেকে কি আজও লোক আসে নি?

লোচনদাস। একবার মোহন এসেছিল।

উদয়াদিত্য। তবে? বিভা কি—

লোচনদাস। দিদিঠাকরুন আপনাকে একলা রেখে যেতে পারলেন না।

উদয়াদিত্য। সে হবে না, সে হবে না! তাকে যেতে হবে! যেতেই হবে! আমার জন্যে ভাবনা নেই— আমার সমস্ত সইবে। এই-যে তার ফুলগুলি এখনও শুকোয় নি। সকালবেলায় পুজোর পরে প্রসাদী ফুল এনে দিয়ে গেল— তখন তার মুখে দেবীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছিলুম।

লোচনদাস। আহা, দেবীই বটে!

উদয়াদিত্য। কিন্তু তাকে যেতেই হবে। আমি সইতে পারব। তাকে ধরে রাখব না।

বাহিরে। আগুন! আগুন!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। আগুন লেগেছে! পালান পালান!

৬

খালের ধারে নৌকার সম্মুখে

সীতারামের সহিত যুবরাজের দ্রুত প্রবেশ

সীতারাম। এই নৌকা, এই নৌকা, আসুন, উঠে পড়ুন—

নৌকার ভিতর হইতে বসন্তরায়ের অবতরণ

বসন্তরায়। দাদা এসেছিস ? আয় দাদা আয় ! [বাহু প্রসারণ

উদয়াদিত্য। দাদামশায় ! [আলিঙ্গন

বসন্তরায়। কী দাদা ?

উদয়াদিত্য। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে চারি দিকে চাহিয়া) দাদামশায় !

বসন্তরায়। এই যে আমি দাদা— কেন ভাই ?

উদয়াদিত্য। (দুই হস্ত ধরিয়া) আজ আমি ছাড়া পেয়েছি— তোমাকে পেয়েছি। আর আমার সুখের কী অবশিষ্ট রইল ? এ মুহূর্ত আর কতক্ষণ থাকবে ?

সীতারাম। (করজোড়ে) যুবরাজ, নৌকায় উঠুন।

উদয়াদিত্য। (চমকিত হইয়া) কেন ? নৌকায় কেন ?

সীতারাম। নইলে এখনই আবার প্রহরীরা আসবে, এখনই ধরে ফেলবে।

উদয়াদিত্য। (বিস্মিত হইয়া) আমরা কি পালিয়ে যাচ্ছি ?

বসন্তরায়। (হাত ধরিয়া) হাঁ ভাই— আমি তোকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি। এ যে পাষাণ-হৃদয়ের দেশ।

সীতারাম। যুবরাজ, আমি তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে কারাগারে আগুন লাগিয়েছি।

উদয়াদিত্য। কী সর্বনাশ ! মরবি যে !

সীতারাম। তুমি যতদিন কয়েদে ছিলে প্রতিদিনই আমি মরেছি।

উদয়াদিত্য। (অনেকক্ষণ ভাবিয়া) না, আমি পালাতে পারব না।

বসন্তরায়। কেন দাদা, এ বুড়োকে কি ভুলে গেছিস ?

উদয়াদিত্য। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) না না— আমি কারাগারে ফিরে যাই।

বসন্তরায়। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) কেমন করে যাবি যা দেখি ! আমি যেতে দেব না।

উদয়াদিত্য। এ হতভাগাকে নিয়ে কেন বিপদ ডাকছ ?

বসন্তরায়। দাদা, তোর জন্য যে বিভাও কারাবাসিনী হয়ে উঠল। তার এই নবীন বয়সে সে কি তার সমস্ত জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দেবে ?

উদয়াদিত্য। চলো, চলো, চলো। সীতারাম, প্রাসাদে তিনখানি পত্র পাঠাতে চাই।

সীতারাম। নৌকাতেই লিখে দেবেন। ওইখানেই চলুন। [প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

নৃত্যগীত

ওরে আগুন, আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।
তুমি দু হাত তুলে আকাশ-পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে।
এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয়, বলিহারি যাই।
যে দিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে ভাই,
আগল যাবে সরে,
সে দিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবি রে ছাই করে।
সে দিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে
ঘুচবে সব বালাই।

৭

প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

প্রতাপাদিত্য। দৈবাৎ আগুন লাগার কথা আমি এক বর্ণ বিশ্বাস করি নে। এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। খুড়ো কোথায় ?

মন্ত্রী। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

প্রতাপাদিত্য। হুঁ। তিনিই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পালিয়েছেন।

মন্ত্রী। তিনি সরল লোক— এ-সকল বুদ্ধি তো তাঁর আসে না।

প্রতাপাদিত্য। বাইরে থেকে যাকে সরল বলে বোধ না হবে তার কুটিল বুদ্ধি বৃথা। •

মন্ত্রী। কারাগার ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যদি—

প্রতাপাদিত্য। কোনো আশঙ্কা নেই, আমি বলছি উদয়কে নিয়ে খুড়োমহারাজ পালিয়েছেন।

দ্বারীর প্রবেশ

দ্বারী। মহারাজ, পত্র—

প্রতাপাদিত্য। কার পত্র ?

দ্বারী। হুজুর, যুবরাজের হাতের লেখা।

প্রতাপাদিত্য। কে এনেছে ?

দ্বারী। একজন নৌকার মাঝি।

প্রতাপাদিত্য। সে কোথায় গেল ?

দ্বারী। সে পালিয়েছে। [প্রস্থান

প্রতাপাদিত্য। (পত্রপাঠান্তে) এই দেখো মন্ত্রী, উদয় আমার কাছে মাপ চেয়েছে।

মন্ত্রী। (করজোড়ে) তাঁকে মাপ করুন মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। তাকে মাপ করব না তো কী! সে আমার দণ্ডেরও যোগ্য নয়। কিন্তু— মুক্তিয়ার খাঁ!

মুক্তিয়ার খাঁর প্রবেশ

মুক্তিয়ার। খোদাবন্দ্! [সেলাম

প্রতাপাদিত্য। অশ্ব প্রস্তুত আছে— তুমি এখনই যাও! কাল রাত্রে আমি বসন্তরায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখতে চাই।

মুক্তিয়ার। যো হুকুম মহারাজ! [প্রস্থান

প্রতাপাদিত্য। সেই বৈরাগীটার খবর পেয়েছ ?

মন্ত্রী। না মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। সে বোধ হয় পালিয়েছে। সে যদি থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ, তাঁকে আবার কিসের প্রয়োজন?

প্রতাপাদিত্য। আর কিছু নয়— সেই ভাঁড়টাকে নিয়ে একটু আমোদ করতে পারতুম— তার কথা শুনতে মজা আছে।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। জয় হোক মহারাজ! আপনি তো আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির। কিন্তু না বলে যাই কী করে! তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপাদিত্য। ক-দিন কাটল কেমন?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে— কোনো ভাবনা ছিল না। এ-সব তারই লুকোচুরি খেলা— ভেবেছিল গারদে লুকোবে, ধরতে পারব না— কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তার পরে খুব হাসি, খুব গান। বড়ো আনন্দে গেছে— আমার গারদ-ভাইকে মনে থাকবে।

গান

ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝংকার।
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহংকার।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা
সুখে দুঃখে কাটল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলংকার।
তোমার 'পরে করি নে রোষ,
দোষ থাকে তো আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ংকর।
অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথি,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপাদিত্য। বল কী বৈরাগী! গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের?

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দ— অভাব কিসের? তোমাকে সুখ দিতে পারেন আর আমাকে পারেন না?

প্রতাপাদিত্য। এখন তুমি যাবে কোথায়?

ধনঞ্জয়। রাস্তায়।

প্রতাপাদিত্য। বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো— আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক— আমরা কোথায় লাগি? তা হলে অনুমতি যদি হয় তো এবারকার মতো বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, কিন্তু মাধবপুরে যেয়ো না।

ধনঞ্জয়। সে কেমন করে বলি! যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না?

পঞ্চম অঙ্ক

রায়গড়। বসন্তরায়ের প্রাসাদসংলগ্ন প্রান্তর

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। মহারাজ যে দাদামশায়কে সহজে নিষ্কৃতি দেবেন তার সম্ভাবনা নেই। আমি এখানে থেকে তাঁর এই বিপদ ঘনিয়ে তোলা কোনোমতেই উচিত হচ্ছে না। আর দেরি করা না। আজই আমাকে পালাতে হবে। দাদামশায়কে বলে যাওয়া মিথ্যা। তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। উঃ— আজ সমস্ত দিনটা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে— দেখি দাদামশায় কী করছেন, তাঁকে— ও দিকে কে একটা লোক সরে গেল, ও আবার কে?

পশ্চাৎ হইতে মুক্তিয়ার খাঁর প্রবেশ ও সেলাম
সম্মুখ হইতে দুইজন সৈন্যের প্রবেশ ও সেলাম

উদয়াদিত্য। কে! মুক্তিয়ার খাঁ? কী খবর?

মুক্তিয়ার। জনাব, আমাদের মহারাজের কাছ থেকে আদেশ নিয়ে এসেছি।

উদয়াদিত্য। কী আদেশ মুক্তিয়ার?

[উদয়াদিত্যের হস্তে মুক্তিয়ার খাঁর আদেশপত্র প্রদান

উদয়াদিত্য। এর জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন কী? আমাকে একখানা পত্র লিখে আদেশ করলেই তো আমি যেতুম। আমি তো আপনিই যাচ্ছিলুম, যাব বলেই স্থির করেছি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কী? এখনই চলো। এখনই যশোরে ফিরে যাই।

মুক্তিয়ার। (করজোড়ে) এখনই ফিরতে পারব না তো হুজুর, আমার যে আরও কাজ আছে।

উদয়াদিত্য। (ভীত হইয়া) কেন! কী কাজ?

মুক্তিয়ার। আরও এক আদেশ আছে, তা পালন না করে যেতে পারব না।

উদয়াদিত্য। কী আদেশ? বলছ না কেন?

মুক্তিয়ার। রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ করেছেন।

উদয়াদিত্য। (চমকিয়া উচ্চস্বরে) না— করেন নি! মিথ্যা কথা!

মুক্তিয়ার। আজ্ঞে যুবরাজ, মিথ্যে নয়। আমার কাছে মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।

উদয়াদিত্য। (সেনাপতির হাত ধরিয়া) মুক্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বুঝেছ। মহারাজ আদেশ করেছেন যে যদি উদয়াদিত্যকে না পাও তা হলে বসন্তরায়ের— আমি যখন আপনি ধরা দিচ্ছি, তখন আর কী? আমাকে এখনই নিয়ে চলো— এখনই নিয়ে চলো— বন্দী করে নিয়ে চলো, আর দেরি কোরো না।

মুক্তিয়ার। যুবরাজ, আমি ভুল বুঝি নি। মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করেছেন—

উদয়াদিত্য। তুমি নিশ্চয় ভুল বুঝেছ, তাঁর অভিপ্রায় এরূপ নয়। আচ্ছা চলো, যশোরে চলো। আমি মহারাজের সাক্ষাতে তোমাদের বুঝিয়ে দেব। তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন সম্পন্ন কোরো।

মুক্তিয়ার। (করজোড়ে) যুবরাজ, মার্জনা করুন। তা পারব না।

উদয়াদিত্য। (অধীরভাবে) মুক্তিয়ার, মনে আছে আমি এককালে সিংহাসন পাব? আমার কথা রাখো, আমাকে সন্তুষ্ট করো। [মুক্তিয়ার খাঁ নীরব (সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া) মুক্তিয়ার খাঁ, বৃদ্ধ নিরপরাধ পুণ্যাত্মাকে বধ করলে নরকেও তোমার স্থান হবে না!

মুক্তিয়ার। মনিবের আদেশ পালন করতে পাপ নেই।

উদয়াদিত্য। মিথ্যা কথা! যে ধর্মশাস্ত্রে তা বলে সে ধর্মশাস্ত্রও মিথ্যা। নিশ্চয় জেনো মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করলে পাপ। [মুক্তিয়ার খাঁ নীরব

তবে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি গড়ে ফিরে যাই। তোমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেখানে যেয়ো— আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ করে তার পর তোমার আদেশ পালন কোরো।

[কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ ও উদয়াদিত্যকে বেষ্টন

উদয়াদিত্য। (উচ্চৈঃস্বরে) দাদামশায়, সাবধান! [সৈন্যগণ কর্তৃক বন্দী দাদামশায়, সাবধান!

জনৈক পথিকের প্রবেশ

পথিক। কে গো?

উদয়াদিত্য। যাও যাও— গড়ে ছুটে যাও— মহারাজকে সাবধান করে দাও।

মুক্তিয়ার। বাঁধো ওকে। [পথিক গ্রেপ্তার

২

কতিপয় বালককে লইয়া বসন্তরায়

বসন্তরায়। বাবা, খুব ভালো করে শিখে নাও। এবারকার রাসলীলায় খুব ধুম হবে। আমি নিজে পদ রচনা করেছি— একেবারে নিখুঁত করে গাইতে হবে। রায়গড়ে এবার আমাদের উদয় এসেছে— আমার সেই বঁধু (গাহিতে গাহিতে)

শিশুকাল হতে বঁধুর সহিতে
পরানে পরানে লেহা।

বাবা, ধরো, তোমাদের গান ধরো—

ভৈরবী

ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না,
ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে!
মন নাই যদি দিল, নাই দিল,
মন নেয় যদি নিক কেড়ে।
এ কী খেলা মোরা খেলেছি,
শুধু নয়নের জল ফেলেছি,

ওরি জয় যদি হয় জয় হোক,
মোরা হারি যদি, যাই হেরে !
একদিন মিছে আদরে
মনে গরব সোহাগ না ধরে,
শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে
সব গরব দিয়েছে সেরে।
ভেবেছিনু ওকে চিনেছি,
বুঝি বিনা পণে ওকে কিনেছি—
ও যে আমাদেরি কিনে নিয়েছে,
ও যে তাই আসে, তাই ফেরে।

দাদা এখনও কেন এল না ? ওরে, দাদা কি ফিরেছে ?

অনুচর। না, তিনি তো ফেরেন নি।

বসন্তরায়। দাদা যে অনেকক্ষণ বেরিয়েছে রে ! সঙ্গে লোক আছে তো ?

অনুচর। না, তিনি লোক ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বসন্তরায়। ওরে, তোরা একজন কেউ যা। ও কে ও ? এ কী ! এ যে মুক্তিয়ার খাঁ ! খাঁসাহেব, ভালো তো ?

মুক্তিয়ার খাঁর প্রবেশ

মুক্তিয়ার। (সেলাম করিয়া) হাঁ মহারাজ !

বসন্তরায়। আহারাদি হয়েছে ?

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা হাঁ। গোপনে কিছু কথা আছে।

বসন্তরায়। আচ্ছা, তোমরা সব যাও। [সকলের প্রস্থান

আজ তবে তোমার এখানে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিই।

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা না, প্রয়োজন নেই। কাজ সেরে এখনই যেতে হবে।

বসন্তরায়। না, তা হবে না খাঁসাহেব, আজ তোমাকে ছাড়ব না। আজ এখানে থাকতেই হবে। লোকজন তো সঙ্গে অনেক দেখছি। কোথাও লড়াইয়ে বেরিয়েছ নাকি ? রসদের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে তো। ওরে—

মুক্তিয়ার। না মহারাজ, কিছুই করতে হবে না, শীঘ্রই যাব।

বসন্তরায়। কেন বলো দেখি, বিশেষ কাজ আছে বুঝি ? প্রতাপ ভালো আছে তো ?

মুক্তিয়ার। মহারাজ ভালো আছেন।

বসন্তরায়। তবে কী তোমার কাজ শীঘ্র বলো, বিশেষ জরুরি শুনে উদ্বেগ হচ্ছে। প্রতাপের তো কোনো বিপদ ঘটে নি?

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা না, তাঁর কোনো বিপদ ঘটে নি। মহারাজের একটি আদেশ পালন করতে এসেছি।

বসন্তরায়। কী আদেশ এখনই বলো।

আদেশপত্র বাহির করিয়া বসন্তরায়ের হস্তে প্রদান এবং বসন্ত-রায়ের পত্র পাঠ। দ্বারে সৈন্যগণের সমাবেশ

বসন্তরায়। এ কি প্রতাপের লেখা!

মুক্তিয়ার। হাঁ।

বসন্তরায়। খাঁসাহেব, এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা!

মুক্তিয়ার। হাঁ মহারাজ!

বসন্তরায়। খাঁসাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মানুষ করেছি। (কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া) প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল সে আমাকে একমুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চাইত না। দাদা কোথায়? উদয় কোথায়?

মুক্তিয়ার। তিনি বন্দী হয়েছেন, মহারাজের নিকট বিচারের জন্যে পাঠানো হয়েছে।

বসন্তরায়। উদয় বন্দী হয়েছে! বন্দী হয়েছে খাঁসাহেব! আমি একবার তাকে কি দেখতে পাব না?

মুক্তিয়ার। (করজোড়ে) না জনাব, হুকুম নেই।

বসন্তরায়। (মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া) একবার তাকে দেখতে দেবে না খাঁসাহেব?

মুক্তিয়ার। আমি আদেশপালক ভৃত্য মাত্র।

বসন্তরায়। এসো সাহেব, তোমার অন্য আদেশটাও পালন করো।

মুক্তিয়ার। (মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে) মহারাজ, আমাকে মার্জনা করবেন— আমি প্রভুর আদেশ পালন করছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নেই।

বসন্তরায়। না সাহেব, তোমার দোষ কী? তোমার কোনো দোষ নেই। প্রতাপকে বোলো, এই পাপে তার প্রয়োজন ছিল না— আমি আর কতদিনই বা বাঁচতুম। আমি মরতে ভয় করি নে। কিন্তু এইখানেই পাপের শাস্তি হোক, শাস্তি হোক— আর নয়। উদয়কে যেন— খাঁসাহেব, কী আর বলব— ঈশ্বর যা করেন তাই হবে— আমাদের কেবল কান্নাই সার।

৩

প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

বন্দীভাবে উদয়াদিত্য

প্রতাপাদিত্য। কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত?

উদয়াদিত্য। আপনি যা আদেশ করেন।

প্রতাপাদিত্য। তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নও।

উদয়াদিত্য। না মহারাজ, আমি যোগ্য নই। আপনার এই সিংহাসন হতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।

প্রতাপাদিত্য। তুমি যা বলছ তা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তা কী করে জানব?

উদয়াদিত্য। আজ আমি মা-কালীর চরণ স্পর্শ করে শপথ করব— আপনার রাজ্যের সূচ্যগ্র ভূমিও আমি কখনও শাসন করব না, সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

প্রতাপাদিত্য। তুমি তবে কী চাও?

উদয়াদিত্য। মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই নে— কেবল আমাকে পিঞ্জরের পশুর মতো গারদে পুরে রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করুন, আমি একাকী কাশী চলে যাই।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, বেশ। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

উদয়াদিত্য। আমার আর-একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ! আমি বিভাকে নিজে তার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবার অনুমতি চাই।

প্রতাপাদিত্য। তার আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

উদয়াদিত্য। তাই যদি মনে করেন তবে সেই অনাথা কন্যাকে আমার কাছে থাকবার অনুমতি দিন। এখানে তো তার সুখও নেই, কর্মও নেই।

প্রতাপাদিত্য। তার মাতার কাছে অনুমতি নিতে পার।

উদয়াদিত্য। তাঁর অনুমতি নিয়েছি।

মহিষী ও বিভার প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, তবে কি তুই কাশী যাওয়াই স্থির করলি? আমাকেও তোর সঙ্গে নিয়ে চল্। [প্রতাপের প্রস্থান

(সরোদনে) বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছেড়ে গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার নিয়ে থাকব ? রাজ্য-সংসার পরিত্যাগ করে তুই সন্ন্যাসী হয়ে থাকবি— আর আমার মুখে এই রাজবাড়ির অন্ন যে বিষের মতো ঠেকবে ! [রোদন

উদয়াদিত্য। মা, মিথ্যা কেন কাঁদছ ? যে মুক্তি পেয়েছে তার জন্যেও আবার কান্না ! আমাকে আশীর্বাদ করে বিদায় করো।

মহিষী। রাজবাড়িতে জন্ম দিয়ে তোকে চিরদিন কেবল দুঃখ দিয়েছি— আমার ভাগ্য দিয়ে যখন তোর সুখ হল না তখন আমি আর তোকে কী বলে এখানে রাখব ? ঈশ্বর তোকে যেখানে রাখেন সুখে রাখুন— কিন্তু বাবা, বিভার কী হবে ?

উদয়াদিত্য। কী করে বলব মা ! মহারাজের কাছে হুকুম নিয়েছি, ওকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দেব। সেখানে যদি সুখে থাকে তো ভালো— না যদি থাকে তবু ভালো— ভগবান যদি প্রসন্ন থাকেন ওর ভালো তো কেউ কেড়ে নেবে না।

বিভা। দাদা, দাদামহাশয় কেমন আছেন ?

প্রতাপাদিত্যের পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। এসো উদয়, কালীর মন্দিরে এসো— মার পা ছুঁয়ে শপথ করবে এসো। [সকলের প্রস্থান

৪

বাটীর বাহিরে

উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয়। আজ রাস্তায় মিলন— আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই— আজ আর যুবরাজ নয়। আজ তো তুমি ভাই ! আয় ভাই, কোলাকুলি করে নিই। (কোলাকুলি) দাদা, যেখানে দীনদরিদ্র সবাই এসে মেলে সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছু ভাবনা নেই।

গান

সকল ভয়ের ভয় যে তারে
কোন্ বিপদে কাড়বে ?
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়বে ?

নাহয় গেল সবই ভেসে—
রইবে তো সেই সর্বনেশে!
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে
　　সে লাভ কেবল বাড়বে।
সুখ নিয়ে ভাই ভয়ে থাকি,
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি,
দুঃখে যে সুখ থাকে বাকি
　　কেই বা সে সুখ নাড়বে?
যে পড়েছে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে,
ভয় মিটেছে বেঁচেছে সে—
　　তারে কে আর পাড়বে?

উদয়াদিত্য। বৈরাগীঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গ ধরলুম, আর ছাড়ছি নে কিন্তু।

ধনঞ্জয়। তুমি ছাড়লে আমি ছাড়ি কই ভাই? মনে বেশ আনন্দ আছে তো? খুঁতমুত কিছু নেই তো?

উদয়াদিত্য। কিছু না— বেশ আছি।

ধনঞ্জয়। তবে দাও একটু পায়ের ধুলো!

উদয়াদিত্য। ও কী কর! ও কী কর! অপরাধ হবে যে।

ধনঞ্জয়। দাদা, এত বড়ো বোঝা নিজের হাতে ভগবান যার কাঁধ থেকে নামিয়ে দেন সে যে মহাপুরুষ। তোমাকে দেখে আজ আমার সর্ব গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। একবার দিদিকে আনো— তাকে একবার দেখি।

উদয়াদিত্য। সে তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে— তাকে ডেকে আনছি।

বিভার প্রবেশ ও বৈরাগীকে প্রণাম

ধনঞ্জয়। ভয় নেই দিদি, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। এই দেখ্‌ না, আমাকে দেখ্‌ না— আমি তাঁর রাস্তার ছেলে— রাস্তার কোলে-কোলেই দিন কেটে গেল, দিনরাত্রি একেবারে ধুলোয় ধুলোময় হয়ে বেড়াই, মায়ের আদরে লাল হয়ে উঠি। আমার মায়ের এই ধুলোঘরে আজ তোমার নতুন নিমন্ত্রণ— কিন্তু মনে কোনো ভয় রেখো না।

বিভা। বৈরাগীঠাকুর, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

ধনঞ্জয়। কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ওই রাস্তাই তো আমাকে মজিয়েছে। এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।

গান

সারি গানের সুর

গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে!
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে!
ও যে আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে,
যায় রে কোন্‌ চুলায় রে!
ও কোন্‌ বাঁকে কী ধন দেখাবে,
কোন্‌খানে কী দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে!

উদয়াদিত্য। ঠাকুর, তুমি কি ভাবছ বিভা আমার পথের সঙ্গিনী? ওকে আমি ওর শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, হরি যেখানে নিয়ে যান সেইখানেই ভালো। দেখি তিনি কোন্‌খানে পৌঁছিয়ে দেন— আমিও সঙ্গে আছি। কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই।

৫

বরবেশে রামচন্দ্র

সম্মুখে নৃত্যগীত

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি যাও— লোকজনদের দেখো গে। [রমাইয়ের প্রস্থান সেনাপতি, তুমি এখানে বোসো, রমাইয়ের হাসি আমার ভালো লাগছে না।

ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ, রমাইয়ের হাসি গন্ধকের আলোর মতো, তার ধোঁয়ায় দম আটকে আসে।

রামচন্দ্র। ঠিক বলেছ সেনাপতি, আমার ইচ্ছা হচ্ছিল উঠে চলে যাই, আজ গানবাজনা ভালো জমছে না ফর্নাণ্ডিজ।

ফর্নাণ্ডিজ। না মহারাজ, জমছে না। আমার এই বুকে বাজছে, আর-একদিনের কথা মনে পড়ছে।

রামচন্দ্র। গুজবটা কি সত্যি ?

ফর্নাণ্ডিজ। কিসের গুজব ?

রামচন্দ্র। ওই তাঁরা কি যশোর থেকে আসছেন ?

ফর্নাণ্ডিজ। হাঁ মহারাজ, যশোরের একটি লোকের কাছে শুনলুম তাঁদের আসবার কথা হচ্ছে। আমাকে যদি আদেশ করেন মহারাজ, আমি তাঁদের এগিয়ে আনবার জন্যে যাই।

রামচন্দ্র। এগিয়ে আনবে ? তা হলে কিন্তু মন্ত্রী রমাই সবাই হাসবে।

ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ যদি আদেশ করেন তাদের হাসিসুদ্ধ মুখটা আমি একেবারে সাফ করে দিতে পারি !

রামচন্দ্র। না, না, গোলমাল করে কাজ নেই। কিন্তু সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বোলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারছি নে ! কালই রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি।

ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ, আমি আর কী বলব— তাঁর জন্যে প্রাণ দিলে যদি কোনো কাজেও না লাগে তবুও দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রামচন্দ্র। দেখো সেনাপতি, এক কাজ করলে হয় না ?

ফর্নাণ্ডিজ। কী বলুন।

রামচন্দ্র। মোহন যদি একবার খবর পায় যে তাঁরা আসছেন তা হলে সে আপনি ছুটে যাবে। একবার কোনোমতে তাকে সংবাদটা জানাও না। কিন্তু দেখো, আমার নাম কোরো না।

ফর্নাণ্ডিজ। যে আজ্ঞা মহারাজ ! [প্রস্থান

রমাইয়ের প্রবেশ

রমাই। মহারাজ, যশোর থেকে তো কেউ নিমন্ত্রণ রাখতে এল না ! রাগ করলে বা !

রামচন্দ্র। হা হা হা হা।

রমাই। আপনার প্রথম পক্ষের শ্বশুর তো সেবার তাঁর কন্যার সিঁথির সিঁদুরের উপর হাত বুলোবার চেষ্টায় ছিলেন— এবারে তাঁকে—

রামমোহনের দ্রুত প্রবেশ

রামমোহন। চুপ! আর একটি কথা যদি কও তা হলে—

রমাই। বুঝেছি বাবা, আর বলতে হবে না।

রামমোহন। মহারাজ, হাসবেন না মহারাজ! আজকের দিনে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু মহারাজার ওই হাসি সহ্য করতে পারছি নে।

রামচন্দ্র। ফের বেয়াদবি করছিস!

রামমোহন। আমার বেয়াদবি! বেয়াদবি কে করলে বুঝলে না!

ফর্নাণ্ডিজ। মোহন, একটা কথা আছে ভাই, একটু এ দিকে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

রামচন্দ্র। ওরা সব গান বন্ধ করে হাঁ করে বসে রইল কেন? ওদের একটু গাইতে বলো না। আজ সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে।

উপসংহার

নদীতীরে নৌকা

বিভা ও রামমোহন

বিভা। মোহন!

রামমোহন। মা, আজ তুমি এলে?

বিভা। হাঁ মোহন। তুই কি আমায় নিতে এলি?

রামমোহন। না মা, অত ব্যস্ত হোয়ো না, আজ থাক্।

বিভা। কেন মোহন, আজ কেন নয়?

রামমোহন। আজ দিন ভালো নয় যে মা, আজ দিন ভালো নয়।

বিভা। ভালো দিন নয়? তবে আজ এত উৎসবের আয়োজন কেন? বরাবর দেখলুম রাস্তায় আলোর মালা— বাঁশি বাজছে। আজ বুঝি শুভলগ্ন পড়েছে?

রামমোহন। শুভলগ্ন! মিথ্যে কথা। সমস্ত ভুল।

বিভা। মোহন, তোর কথা আমি বুঝতে পারছি নে, কী হয়েছে আমাকে সত্যি করে বল্! মহারাজ কি রাগ করেছেন?

রামমোহন। রাগ করেছেন বই-কি।

বিভা। তিনি তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

রামমোহন। দেরি হয়ে গেছে মা, দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বিভা। অনেক দেরি হয়ে গেছে? সময় একেবারে ফুরিয়ে গেছে?

রামমোহন। ফুরিয়ে গেছে— সব ফুরিয়ে গেছে। সময় গেলে আর ফেরে না।

বিভা। কে বললে ফেরে না? আমি তপস্যা করে ফেরাব— আমি জীবন-মন দিয়ে ফেরাব। মোহন, এখনই তুই আমাকে নিয়ে যা। দেরি হয়ে থাকে, আর এক মুহূর্ত দেরি করব না।

রামমোহন। যুবরাজ কোথায় গেছেন?

বিভা। তিনি খবর নিতে গেছেন।

রামমোহন। তিনি ফিরে আসুন না।

বিভা। না মোহন, আর বিলম্ব নয়। তিনি কি খবর পেয়েছেন আমি এসেছি? দাদা বললেন, তিনি নৌকার ছাত থেকে দেখেছেন ময়ূরপংখি সাজানো হচ্ছে।

রামমোহন। হাঁ, সাজানো হচ্ছে বটে—

বিভা। এখনও কি সাজানো শেষ হয় নি?

রামমোহন। ওই ময়ূরপংখির সাজসজ্জায় আগুন লাগুক, আগুন লাগুক!

বিভা। মোহন, তোর মুখে এ কী কথা! তুই যখন আনতে গেলি আসতে পারি নি বলে এত রাগ করেছিস? তুইও আমার দুঃখ বুঝতে পারিস নি মোহন?

[মোহন নিরুত্তর

এই দেখ্, তোর দেওয়া সেই শাঁখাজোড়া পরে এসেছি— আজকের দিনে তুই আমার উপর রাগ করিস নে।

রামমোহন। আমাকে আর দগ্ধ কোরো না! মিথ্যে দিয়ে তোমার কাছে আর কথা চাপা দিতে পারলুম না। মা জননী, এ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি, কিন্তু এ রাজ্যে তোমার আজ আর স্থান নেই। চলো মা, তুমি ফিরে চলো— তোমার এই পাদপদ্মের দাস, এই অধম সন্তান তোমার সঙ্গে যাবে।

বিভা। মোহন, যা তোর বলবার আছে সব তুই বল্। আমি যে কত দুঃখ বইতে পারি তা কি তুই জানিস নে?

রামমোহন। সন্তান যখন ডাকতে গেল তখন কেন এলি নে, তখন কেন এলি নে— আমার পোড়া কপাল, তোকে কেন আনতে পারলুম না!

বিভা। ওরে মোহন, জগতে এমন কোনো সুখ নেই যার লোভে আমি সেদিন দাদাকে ফেলে আসতে পারতুম— এতে আমার কপালে যা থাকে তাই হবে।

রামমোহন। তবে শোন্ মা, সেই ময়ূরপংখি তোর জন্যে নয়।

বিভা। নাই হল মোহন, দুঃখ কিসের? আমি হেঁটে চলে যাব।

রামমোহন। যাবি কোথায়? সেখানে যে আজ আর-এক রানী আসছে।

বিভা। আর-এক রানী!

রামমোহন। হাঁ, আর-এক রানী। আজ মহারাজের বিবাহ।

বিভা। ওঃ! আজ বিবাহের লগ্ন!

রামমোহন। এক বিবাহের লগ্নে মহারাজ তোমাদের ঘরে গিয়েছিলেন— আজ কোন্ বিবাহের লগ্নে তুমি তাঁর ঘরের সামনে এসে পৌঁছোলে! আর আমার এমন কপাল, আজ আমি বেঁচে আছি। চল্ মা, ফিরে চল্, আর এক দণ্ড নয়— ওই বাঁশি আমার কানে বিষ ঢালছে! ওরে, আর একদিন কী বাঁশি শুনেছিলুম সেই কথা মনে পড়ছে! চল্ চল্, ফিরে চল্! অমন চুপ করে বসে রইলে কেন মা? কেমন করে যে কাঁদতে হয় তাও কি একেবারে ভুলে গেলে? মা, কোন্ দিকে তাকিয়ে আছ মা? তোমার এই সন্তানের মুখের দিকে একবার চাও।

বিভা। মোহন, আমার একটি কথা রাখতে হবে।

রামমোহন। কী কথা?

বিভা। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। যদি না যাস আমি একলা যাব।

রামমোহন। সে আজ ময়ূরপংখিতে চড়বে, আর তুমি আজ হেঁটে যাবে!

বিভা। হেঁটে যাওয়াই আমাকে সাজে— আমি হেঁটেই যাব। তুই সঙ্গে যাবি নে?

রামমোহন। আমি সঙ্গে যাব না তো কে যাবে? কিন্তু মা, সে সভায় আজ তুমি কিসের জন্যে যাবে?

বিভা। কিসের জন্যে যাব? সেখানে আমার কোনো আশা নেই বলেই যাব। আমার রাগ অভিমান, আমার সমস্ত বাসনা বিসর্জন করব বলেই যাব। আমি কি এতদূরে এসে অমনি চলে যাব! যে আজ আসছে তাকে আশীর্বাদ করে যাব না? নিজের হাতে করে তার হাতে আমার রাজাকে সমর্পণ করব।

রামমোহন। তার পরে?

বিভা। তার পরে! ভগবানের পৃথিবীতে অভাগাদেরও আশ্রয় মেলে। আমারও মিলবে।

রামমোহন। সেইসঙ্গে আমারও মিলবে। আমি তোমাকে আনতে পারি নি, কিন্তু তুমি আমাকে নিয়ে যাবে মা।

বিভা। মোহন, আমাকে দুঃখ সইতে হবে সে কথাটা হঠাৎ আমি ভুলে গিয়েছিলুম— ভেবেছিলুম যা ভোগ হবার তা বুঝি হয়ে চুকে গেছে।

রামমোহন। কেন মা, তুমি সতীলক্ষ্মী, তুমি দুঃখ কেন পাও!

বিভা। মোহন, সেদিন অপরাধ যে সত্যি হয়েছিল— সে কথা তো আর ভোলবার নয়। সে অপরাধের শাস্তি না হয়ে তো মিটবে না। সে শাস্তি আমিই নিলুম — প্রায়শ্চিত্ত আমাকে দিয়েই হবে।

রামমোহন। মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় করে নিয়েছ— আবার তোমার স্বামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই নিলে। কিন্তু আমি বলছি মা, সকলের চেয়ে বড়ো দণ্ড পেলে তোমার স্বামী। সে আজ দ্বারের কাছ থেকেও তোমাকে হারাল।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। ওরে বিভা!

বিভা। দাদা, সব জানি। কিছু ভেবো না।

উদয়াদিত্য। এখন কী করবি বোন?

বিভা। ভেবেছিলুম রাজবাড়িতে একবার যাব, কিন্তু যাব না।

রামমোহন। মা, যেয়ো না, যেয়ো না। গেলে তোমার অপমান হত— সেই অপমানে তোমার স্বামীর পাপ আরও বাড়ত।

বিভা। আমার মান অপমান সব চুকে গেছে। কিন্তু দাদার অপমান হত যে। দাদা, এবার নৌকা ফেরাও।

উদয়াদিত্য। তুই কোথায় যাবি বিভা?

বিভা। তোমার সঙ্গে কাশী যাব।

উদয়াদিত্য। হায় রে অদৃষ্ট!

বিভা। দাদা, আমি আজ মুক্তি পেয়েছি। এখন তোমার চরণসেবা করে আমার জীবন আনন্দে কাটবে। মোহন, তুই তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা।

রামমোহন। ওই দেখো মা, ফেরবার পথে আগুন লেগেছে, ওই-যে মশালের আলো— ওই-যে ময়ূরপংখি চলেছে। ও পথ আমার পথ নয়।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

বিভা। বৈরাগীঠাকুর!

ধনঞ্জয়। কেন দিদি?

বিভা। আমাকে তোমাদের সঙ্গ দিয়ো ঠাকুর!

উদয়াদিত্য। ঠাকুর, শেষকালে বিভাকেও আমাদের পথ নিতে হল!

ধনঞ্জয়। সে তো বেশ কথা! দয়াময় হরি! কী আনন্দ! তোমার এ কী আনন্দ! ছাড় না, কিছুতেই ছাড় না। শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মতো বসে আছ। দিদি, এই মাঝরাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব পড়েছে! একেবারে জোর তলব। চল্ চল্। চল্ চল্। পা ফেলে চল্। খুশি হয়ে চল্। হাসতে হাসতে চল্। রাস্তা এমন করে পরিষ্কার করে দিয়েছে— আর ভয় কিসের!

গান

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব না রে—
এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী,
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে!
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে,
তাই খুঁটে আজ মরব কি রে!
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর ঘিরব না রে!
ঘাটের রশি গেছে কেটে,
কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে?
এখন পালের রশি ধরব কষি,
এ রশি ছিঁড়ব না আর ছিঁড়ব না রে!

—

উপন্যাস ও গল্প

যোগাযোগ

যোগাযোগ

১

আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন। বয়স তার হল বত্রিশ। ভোর থেকে আসছে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম, আর ফুলের তোড়া।

গল্পটার এইখানে আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।

এই কাহিনীর পৌরাণিক যুগ সন্ধান করলে দেখা যায়, ঘোষালরা এক সময়ে ছিল সুন্দরবনের দিকে, তার পরে হুগলি জেলায় নুরনগরে। সেটা বাহির থেকে পর্টু-গীজদের তাড়ায়, না ভিতর থেকে সমাজের ঠেলায়, ঠিক জানা নেই। মরিয়া হয়ে যারা পুরানো ঘর ছাড়তে পারে, তেজের সঙ্গে নূতন ঘর বাঁধবার শক্তিও তাদের। তাই ঘোষালদের ঐতিহাসিক যুগের শুরুতেই দেখি, প্রচুর ওদের জমিজমা, গোরু-বাছুর, জনমজুর, পালপার্বণ, আদায়বিদায়। আজও তাদের সাবেক গ্রাম শেয়াকুলিতে অন্তত বিঘে দশেক আয়তনের ঘোষাল-দিঘি পানা-অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে পঙ্করুদ্ধ-কণ্ঠে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজ সে দিঘিতে শুধু নামটাই ওদের, জলটা চাটুজ্যে জমিদারের। কী করে একদিন ওদের পৈতৃক মহিমা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল সেটা জানা দরকার।

এদের ইতিহাসের মধ্যম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, খিটিমিটি বেধেছে চাটুজ্যে জমিদারের সঙ্গে। এবার বিষয় নিয়ে নয়, দেবতার পুজো নিয়ে। ঘোষালরা স্পর্ধা করে চাটুজ্যেদের চেয়ে দু-হাত উঁচু প্রতিমা গড়িয়েছিল। চাটুজ্যেরা তার জবাব দিলে। রাতারাতি বিসর্জনের রাস্তার মাঝে মাঝে এমন মাপে তোরণ বসালে যাতে করে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা যায় ঠেকে। উঁচু-প্রতিমার দল তোরণ ভাঙতে বেরোয়, নিচু-প্রতিমার দল তাদের মাথা ভাঙতে ছোটে। ফলে, দেবী সে বার বাঁধা বরাদ্দর চেয়ে অনেক বেশি রক্ত আদায় করেছিল। খুন-জখম থেকে মামলা উঠল। সে মামলা থামল ঘোষালদের সর্বনাশের কিনারায় এসে।

আগুন নিবল, কাঠও বাকি রইল না, সবই হল ছাই। চাটুজ্যেদেরও বাস্তুলক্ষ্মীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দায়ে পড়ে সন্ধি হতে পারে, কিন্তু তাতে শান্তি হয় না।

যে ব্যক্তি খাড়া আছে, আর যে ব্যক্তি কাত হয়ে পড়েছে, দুই পক্ষেরই ভিতরটা তখনও গর্ গর্ করছে। চাটুজ্যেরা ঘোষালদের উপর শেষ কোপটা দিলে সমাজের খাঁড়ায়। রটিয়ে দিলে এককালে ওরা ছিল ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ, এখানে এসে সেটা চাপা দিয়েছে, কেঁচো সেজেছে কেউটে। যারা খোঁটা দিলে, টাকার জোরে তাদের গলার জোর। তাই স্মৃতিরত্নপাড়াতেও তাদের এই অপকীর্তনের অনুস্বার-বিসর্গওআলা ঢাকি জুটল। কলঙ্কভঞ্জনের উপযুক্ত প্রমাণ বা দক্ষিণা ঘোষালদের শক্তিতে তখন ছিল না, অগত্যা চণ্ডীমণ্ডপবিহারী সমাজের উৎপাতে এরা দ্বিতীয়বার ছাড়ল ভিটে। রজবপুরে অতি সামান্যভাবে বাসা বাঁধলে।

যারা মারে তারা ভোলে, যারা মার খায় তারা সহজে ভুলতে পারে না। লাঠি তাদের হাত থেকে খসে পড়ে বলেই লাঠি তারা মনে-মনে খেলতে থাকে। বহু দীর্ঘকাল হাতটা অসাড় থাকাতেই মানসিক লাঠিটা ওদের বংশ বেয়ে চলে আসছে। মাঝে মাঝে চাটুজ্যেদের কেমন করে ওরা জব্দ করেছিল সত্যমিথ্যে মিশিয়ে সে-সব গল্প ওদের ঘরে এখনও অনেক জমা হয়ে আছে। খোড়ো চালের ঘরে আষাঢ়-সন্ধ্যাবেলায় ছেলেরা সেগুলো হাঁ করে শোনে। চাটুজ্যেদের বিখ্যাত দাশু সর্দার রাত্রে যখন ঘুমোচ্ছিল তখন বিশ-পঁচিশ জন লাঠিয়াল তাকে ধরে এনে ঘোষালদের কাছারিতে কেমন করে বেমালুম বিলুপ্ত করে দিলে সে গল্প আজ একশো বছর ধরে ঘোষালদের ঘরে চলে আসছে। পুলিস যখন খানাতল্লাসি করতে এল নায়েব ভুবন বিশ্বাস অনায়াসে বললে, হাঁ, সে কাছারিতে এসেছিল তার নিজের কাজে, হাতে পেয়ে বেটাকে কিছু অপমানও করেছি, শুনলেম নাকি সেই ক্ষোভে বিবাগি হয়ে চলে গেছে। হাকিমের সন্দেহ গেল না। ভুবন বললে, হুজুর, এই বছরের মধ্যে যদি তার ঠিকানা বের করে দিতে না পারি তবে আমার নাম ভুবন বিশ্বাস নয়। কোথা থেকে দাশুর মাপের এক গুণ্ডা খুঁজে বার করলে— একেবারে তাকে পাঠালে ঢাকায়। সে করলে ঘটি চুরি, পুলিসে নাম দিলে দাশরথি মণ্ডল। হল এক মাসের জেল। যে তারিখে ছাড়া পেয়েছে ভুবন সেইদিন ম্যাজেস্টেরিতে খবর দিলে দাশু সর্দার ঢাকার জেলখানায়। তদন্তে বেরোল, দাশু জেলখানায় ছিল বটে, তার গায়ের দোলাইখানা জেলের বাইরের মাঠে ফেলে চলে গেছে। প্রমাণ হল সে দোলাই সর্দারেরই। তার পর সে কোথায় গেল সে খবর দেওয়ার দায় ভুবনের নয়।

এই গল্পগুলো দেউলে-হওয়া বর্তমানের সাবেক কালের চেক। গৌরবের দিন গেছে; তাই গৌরবের পুরাতত্ত্বটা সম্পূর্ণ ফাঁকা বলে এত বেশি আওয়াজ করে।

যা হোক, যেমন তেল ফুরোয়, যেমন দীপ নেবে, তেমনি এক সময়ে রাতও

পোহায়। ঘোষাল-পরিবারে সূর্যোদয় দেখা দিল অবিনাশের বাপ মধুসূদনের জোর কপালে।

২

মধুসূদনের বাপ আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়তদারদের মুহুরি। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সংসার চলে। গৃহিণীদের হাতে শাঁখা-খাড়ু, পুরুষদের গলায় রক্ষামন্ত্রের পিতলের মাদুলি আর বেলের আটা দিয়ে মাজা খুব মোটা পইতে। ব্রাহ্মণ-মর্যাদায় প্রমাণ ক্ষীণ হওয়াতে পইতেটা হয়েছিল প্রমাণসই।

মফস্বল ইস্কুলে মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা ছিল নদীর ধারে, আড়তের প্রাঙ্গণে, পাটের গাঁটের উপর চড়ে বসে। যাচনদার, খরিদদার, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের ভিড়ের মধ্যেই তার ছুটি— যেখানে বাজারে টিনের চালাঘরে সাজানো থাকে সারবাঁধা গুড়ের কলসী, আঁটিবাঁধা তামাকের পাতা, গাঁটবাঁধা বিলিতি র‍্যাপার, কেরোসিনের টিন, সরষের ঢিবি, কলাইয়ের বস্তা, বড়ো বড়ো তৌল-দাঁড়ি আর বাটখারা, সেইখানে ঘুরে তার যেন বাগানে বেড়ানোর আনন্দ।

বাপ ঠাওরালে ছেলেটার কিছু হবে। ঠেলেঠুলে গোটা দুত্তিন পাস করাতে পারলেই ইস্কুলমাস্টারি থেকে মোক্তারি ওকালতি পর্যন্ত ভদ্রলোকদের যে কয়টা মোক্ষতীর্থ তার কোনো-না-কোনোটাতে মধু ভিড়তে পারবে। অন্য তিনটে ছেলের ভাগ্যসীমারেখা গোমস্তাগিরি পর্যন্তই পিলপে-গাড়ি হয়ে রইল। তারা কেউ-বা আড়তদারের, কেউ-বা তালুকদারের দফতরে কানে কলম গুঁজে শিক্ষা-নবিশিতে বসে গেল। আনন্দ ঘোষালের ক্ষীণ সর্বস্বের উপর ভর করে মধুসূদন বাসা নিলে কলকাতার মেসে।

অধ্যাপকেরা আশা করেছিল পরীক্ষায় এ ছেলে কলেজের নাম রাখবে। এমন সময় বাপ গেল মারা। পড়বার বই, মায় নোটবই সমেত, বিক্রি করে মধু পণ করে বসল এবার সে রোজগার করবে। ছাত্রমহলে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বই বিক্রি করে ব্যাবসা হল শুরু। মা কেঁদে মরে— বড়ো তার আশা ছিল, পরীক্ষাপাসের রাস্তা দিয়ে ছেলে ঢুকবে 'ভদ্দোর' শ্রেণীর ব্যূহের মধ্যে। তার পরে ঘোষাল-বংশদণ্ডের আগায় উড়বে কেরানিবৃত্তির জয়পতাকা।

ছেলেবেলা থেকে মধুসূদন যেমন মাল বাছাই করতে পাকা, তেমনি তার বন্ধু

বাছাই করবারও ক্ষমতা। কখনও ঠকে নি। তার প্রধান ছাত্রবন্ধু ছিল কানাই গুপ্ত। এর পূর্বপুরুষেরা বড়ো বড়ো সওদাগরের মুচ্ছুদ্দিগিরি করে এসেছে। বাপ নামজাদা কেরোসিন কোম্পানির আপিসে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

ভাগ্যক্রমে এরই মেয়ের বিবাহ। মধুসূদন কোমরে চাদর বেঁধে কাজে লেগে গেল। চাল বাঁধা, ফুলপাতায় সভা সাজানো, ছাপাখানায় দাঁড়িয়ে থেকে সোনার কালিতে চিঠি ছাপানো, চৌকি কার্পেট ভাড়া করে আনা, গেটে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা, গলা ভাঙিয়ে পরিবেষণ, কিছুই বাদ দিলে না। এই সুযোগে এমন বিষয়বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিলে যে, রজনীবাবু ভারি খুশি। তিনি কেজো মানুষ চেনেন, বুঝলেন এ ছেলের উন্নতি হবে। নিজের থেকে টাকা ডিপজিট দিয়ে মধুকে রজবপুরে কেরোসিনের এজেন্সিতে বসিয়ে দিলেন।

সৌভাগ্যের দৌড় শুরু হল; সেই যাত্রাপথে কেরোসিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে বিন্দু-আকারে পিছিয়ে পড়ল। জমার ঘরের মোটা মোটা অঙ্কের উপর পা ফেলতে ফেলতে ব্যাবসা হু-হু করে এগোল গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে, উদ্‌যোগপর্ব থেকে স্বর্গারোহণে। সবাই বললে, "একেই বলে কপাল!" অর্থাৎ পূর্বজন্মের ইষ্টিমেতেই এ জন্মের গাড়ি চলছে। মধুসূদন নিজে জানত যে, তাকে ঠকাবার জন্যে অদৃষ্টের ত্রুটি ছিল না, কেবল হিসেবে ভুল করে নি বলেই জীবনের অঙ্ক-ফলে পরীক্ষকের কাটা দাগ পড়ে নি। যারা হিসেবের দোষে ফেল করতে মজবুত, পরীক্ষকের পক্ষপাতের 'পরে তারাই কটাক্ষপাত করে থাকে।

মধুসূদনের রাশ ভারী। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা কয় না। তবে কিনা আন্দাজে বেশ বোঝা যায়, মরা গাঙে বান এসেছে। গৃহপালিত বাংলাদেশে এমন অবস্থায় সহজ মানুষে বিবাহের চিন্তা করে, জীবিতকালবর্তী সম্পত্তিভোগটাকে বংশাবলীর পথ বেয়ে মৃত্যুর পরবর্তী ভবিষ্যতে প্রসারিত করবার ইচ্ছা তাদের প্রবল হয়। কন্যাদায়িকেরা মধুকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করে না, মধুসূদন বলে, "প্রথমে একটা পেট সম্পূর্ণ ভরলে তার পরে অন্য পেটের দায় নেওয়া চলে।" এর থেকে বোঝা যায়, মধুসূদনের হৃদয়টা যাই হোক, পেটটা ছোটো নয়।

এই সময়ে মধুসূদনের সতর্কতায় রজবপুরের পাটের নাম দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ মধুসূদন সব-প্রথমেই নদীর ধারের পোড়ো জমি বেবাক কিনে ফেললে, তখন দর শস্তা। ইটের পাঁজা পোড়ালে বিস্তর, নেপাল থেকে এল বড়ো বড়ো শালকাঠ, সিলেট থেকে চুন, কলকাতা থেকে মালগাড়ি-বোঝাই করোগেটেড

লোহা। বাজারের লোক অবাক! ভাবলে, 'এই রে! হাতে কিছু জমেছিল, সেটা সইবে কেন! এবার বদহজমের পালা, কারবার মরণদশায় ঠেকল বলে!'

এবারও মধুসূদনের হিসেবে ভুল হল না। দেখতে দেখতে রজবপুরে ব্যাবসার একটা আওড় লাগল। তার ঘূর্ণিটানে দালালরা এসে জুটল, এল মাড়োয়ারির দল, কুলির আমদানি হল, কল বসল, চিমনি থেকে কুণ্ডলায়িত ধূমকেতু আকাশে আকাশে কালিমা বিস্তার করলে।

হিসেবের খাতার গবেষণা না করেও মধুসূদনের মহিমা এখন দূর থেকে খালি-চোখেই ধরা পড়ে। একা সমস্ত গঞ্জের মালিক, পাঁচিল-ঘেরা দোতলা ইমারত, গেটে শিলাফলকে লেখা 'মধুচক্র'। এ-নাম তার কলেজের পূর্বতন সংস্কৃত অধ্যাপকের দেওয়া। মধুসূদনকে তিনি পূর্বের চেয়ে অকস্মাৎ এখন অনেক বেশি স্নেহ করেন।

এইবার বিধবা মা ভয়ে ভয়ে এসে বললে, "বাবা, কবে মরে যাব, বউ দেখে যেতে পারব না কি?"

মধু গম্ভীরমুখে সংক্ষেপে উত্তর করলে, "বিবাহ করতেও সময় নষ্ট, বিবাহ করেও তাই। আমার ফুরসত কোথায়?"

পীড়াপীড়ি করে এমন সাহস ওর মায়েরও নেই, কেননা সময়ের বাজার-দর আছে। সবাই জানে মধুসূদনের এক কথা।

আরও কিছুকাল যায়। উন্নতির জোয়ার বেয়ে কারবারের আপিস মফস্বল থেকে কলকাতায় উঠল। নাতিনাতনীর দর্শনসুখ সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে মা ইহলোক ত্যাগ করলে। ঘোষাল-কোম্পানির নাম আজ দেশবিদেশে, ওদের ব্যাবসা বনেদি বিলিতি কোম্পানির গা ঘেঁষে চলে, বিভাগে বিভাগে ইংরেজ ম্যানেজার।

মধুসূদন এবার স্বয়ং বললে, বিবাহের ফুরসত হল। কন্যার বাজারে ক্রেডিট তার সর্বোচ্চে। অতিবড়ো অভিমানী ঘরেরও মানভঞ্জন করবার মতো তার শক্তি। চার দিক থেকে, অনেক কুলবতী রূপবতী গুণবতী ধনবতী বিদ্যাবতী কুমারীদের খবর এসে পৌঁছোয়। মধুসূদন চোখ পাকিয়ে বলে, ওই চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়ে চাই।

ঘা-খাওয়া বংশ, ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড়ো ভয়ংকর।

৩

এইবার কন্যাপক্ষের কথা।

নুরনগরের চাটুজ্যেদের অবস্থা এখন ভালো নয়। ঐশ্বর্যের বাঁধ ভাঙছে। ছয়-আনি শরিকরা বিষয় ভাগ করে বেরিয়ে গেল, এখন তারা বাইরে থেকে লাঠি হাতে দশ-আনির সীমানা খাবলে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া রাধাকান্ত জীউর সেবায়তি অধিকারে দশে-ছয়ে যতই সূক্ষ্মভাবে ভাগ করবার চেষ্টা চলছে, ততই তার শস্য-অংশ স্থূলভাবে উকিল-মোক্তারের আঙিনায় নয়-ছয় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, আমলারাও বঞ্চিত হল না। নুরনগরের সে প্রতাপ নেই— আয় নেই, ব্যয় বেড়েছে চতুর্গুণ। শতকরা ন-টাকা হারে সুদের ন-পা-ওয়ালা মাকড়সা জমিদারির চার দিকে জাল জড়িয়ে চলেছে।

পরিবারে দুই ভাই, পাঁচ বোন। কন্যাধিক্য-অপরাধের জরিমানা এখনও শোধ হয় নি। কর্তা থাকতেই চার বোনের বিয়ে হয়ে গেল কুলীনের ঘরে। এদের ধনের বহরটুকু হাল আমলের, খ্যাতিটা সাবেক আমলের। জামাইদের পণ দিতে হল কৌলীন্যের মোটা দামে ও ফাঁকা খ্যাতির লম্বা মাপে। এই বাবদেই ন-পার্সেন্টের সূত্রে গাঁথা দেনার ফাঁসে বারো পার্সেন্টের গ্রন্থি পড়ল। ছোটো ভাই মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসি, রোজগার না করলে চলবে না। সে গেল বিলেতে, বড়ো ভাই বিপ্রদাসের ঘাড়ে পড়ল সংসারের ভার।

এই সময়টাতে পূর্বোক্ত ঘোষাল ও চাটুজ্যেদের ভাগ্যের ঘুড়িতে পরস্পরের লখে লখে আর-একবার বেধে গেল। ইতিহাসটা বলি।

বড়োবাজারের তনসুকদাস হালওয়াইদের কাছে এদের একটা মোটা অঙ্কের দেনা। নিয়মিত সুদ দিয়ে আসছে, কোনো কথা ওঠে নি। এমন সময়ে পুজোর ছুটি পেয়ে বিপ্রদাসের সহপাঠী অমূল্যধন এল আত্মীয়তা দেখাতে। সে হল বড়ো অ্যাটর্নি-আপিসের আর্টিকেল্ড্ হেডক্লার্ক। এই চশমা-পরা যুবকটি নুরনগরের অবস্থাটা আড়চোখে দেখে নিলে। সেও কলকাতায় ফিরল আর তনসুকদাসও টাকা ফেরত চেয়ে বসল; বললে, নতুন চিনির কারবার খুলেছে, টাকার জরুরি দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে পড়ল।

সেই সংকটকালেই চাটুজ্যে ও ঘোষাল এই দুই নামে দ্বিতীয়বার ঘটল দ্বন্দ্ব-সমাস। তার পূর্বেই সরকারবাহাদুরের কাছ থেকে মধুসূদন রাজখেতাব পেয়েছে।

পূর্বোক্ত ছাত্রবন্ধু এসে বললে, নতুন রাজা খোশমেজাজে আছে, এই সময় ওর কাছ থেকে সুবিধেমত ধার পাওয়া যেতে পারে। তাই পাওয়া গেল— চাটুজ্যেদের সমস্ত খুচরো দেনা একঠাঁই করে এগারো লাখ টাকা সাত পার্সেণ্ট সুদে। বিপ্রদাস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কুমুদিনী ওদের শেষ অবশিষ্ট বোন বটে, তেমনি আজ ওদের সম্বলেরও শেষ অবশিষ্ট দশা। পণ জোটানোর, পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা করতে গেলে আতঙ্ক হয়। দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড়ো না হোক, একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রঙ শাঁখের মতো চিকন গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্যের ভাব।

কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সংকুচিত। তার বিশ্বাস সে অপয়া। সে জানে পুরুষরা সংসার চালায় নিজের শক্তি দিয়ে, মেয়েরা লক্ষ্মীকে ঘরে আনে নিজের ভাগ্যের জোরে। ওর দ্বারা তা হল না। যখন থেকে ওর বোঝবার বয়স হয়েছে তখন থেকে চার দিকে দেখছে দুর্ভাগ্যের পাপদৃষ্টি। আর সংসারের উপর চেপে আছে ওর নিজের আইবুড়ো-দশা, জগদ্দল পাথর, তার যত বড়ো দুঃখ, তত বড়ো অপমান। কিছু করবার নেই, কপালে করাঘাত ছাড়া। উপায় করবার পথ বিধাতা মেয়েদের দিলেন না, দিলেন কেবল ব্যথা পাবার শক্তি। অসম্ভব একটা-কিছু ঘটে না কি? কোনো দেবতার বর, কোনো যক্ষের ধন, পূর্বজন্মের কোনো-একটা বাকিপড়া পাওনার এক মুহূর্তে পরিশোধ? এক-একদিন রাতে বিছানা থেকে উঠে বাগানের মর্মরিত ঝাউগাছগুলোর মাথার উপরে চেয়ে থাকে, মনে মনে বলে, 'কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাতরাজার-ধন মানিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।'

বংশের দুর্গতির জন্য নিজেকে যতই অপরাধী করে, ততই হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় ক'রে ভাইদের ওর ভালোবাসা দেয়— কঠিন দুঃখে নেংড়ানো ওর ভালোবাসা। কুমুর 'পরে তাদের কর্তব্য করতে পারছে না বলে ওর ভাইরাও বড়ো ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এই পিতৃমাতৃহীনাকে উপরওআলা যে স্নেহের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, ভাইরা তা ভরিয়ে দেবার জন্যে সর্বদা উৎসুক। ও যে চাঁদের আলোর টুকরো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর করে রেখেছে। যখন মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যের বাহন বলে নিজেকে সে ধিক্‌কার দেয়, দাদা বিপ্রদাস হেসে

বলে, "কুমু, তুই নিজেই তো আমাদের সৌভাগ্য— তোকে না পেলে বাড়িতে শ্রী থাকত কোথায় ?"

কুমুদিনী ঘরে পড়াশুনো করেছে। বাইরের পরিচয় নেই বললেই হয়। পুরোনো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস। তার জগৎটা আবছায়া— সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু, ষষ্ঠী ; সেখানে বিশেষ দিনে চন্দ্র দেখতে নেই ; শাঁখ বাজিয়ে গ্রহণের কুদৃষ্টিকে তাড়াতে হয়, অম্বুবাচীতে সেখানে দুধ খেলে সাপের ভয় ঘোচে ; মন্ত্র প'ড়ে, পাঁঠা মানত ক'রে, সুপুরি আলো-চাল ও পাঁচ পয়সার সিন্নি মেনে, তাগাতাবিজ প'রে, সে জগতের শুভ-অশুভের সঙ্গে কারবার ; স্বস্ত্যয়নের জোরে ভাগ্য-সংশোধনের আশা— সে আশা হাজারবার ব্যর্থ হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, অনেক সময়েই শুভলগ্নের শাখায় শুভফল ফলে না, তবু বাস্তবের শক্তি নেই প্রমাণের দ্বারা স্বপ্নের মোহ কাটাতে পারে। স্বপ্নের জগতে বিচার চলে না, একমাত্র চলে মেনে-চলা। এ জগতে দৈবের ক্ষেত্রে যুক্তির সুসংগতি, বুদ্ধির কর্তৃত্ব ভালো-মন্দর নিত্যতত্ত্ব নেই বলেই কুমুদিনীর মুখে এমন একটা করুণা। ও জানে, বিনা অপরাধেই ও লাঞ্ছিত। আট বছর হল সেই লাঞ্ছনাকে একান্ত সে নিজের বলেই গ্রহণ করেছিল— সে তার পিতার মৃত্যু নিয়ে।

৪

পুরোনো ধনী-ঘরে পুরাতন কাল যে দুর্গে বাস করে তার পাকা গাঁথুনি। অনেক দেউড়ি পার হয়ে তবে নতুন কালকে সেখানে ঢুকতে হয়। সেখানে যারা থাকে নতুন যুগে এসে পৌঁছোতে তাদের বিস্তর লেট হয়ে যায়। বিপ্রদাসের বাপ মুকুন্দলালও ধাবমান নতুন যুগকে ধরতে পারেন নি।

দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল, বড়ো বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ভারী গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অনুচর-পরিচরদের বুক থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে। যদিও পালোয়ান রেখে নিয়মিত কুস্তি করা তাঁর অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নয়, তবু সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই। পরনে চুনট-করা ফুর্‌ফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্নবিন্যস্ত কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, কর্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইত্তাম্বুল-আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদ্‌বর্তী, দ্বারের কাছে সর্বদা হাজির তকমা-পরা আরদালি। সদর-দরজায় বৃদ্ধ চন্দ্রভান জমাদার তামাক মাখা ও সিদ্ধি কোটার অবকাশে বেঞ্চে

বসে লম্বা দাড়ি দুই ভাগ করে বার বার আঁচড়িয়ে দুই কানের উপর বাঁধে, নিম্নতন দারোয়ানরা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয়। দেউড়ির দেওয়ালে ঝোলে নানা রকমের ঢাল, বাঁকা তলোয়ার, বহুকালের পুরানো বন্দুক বল্লম বর্শা।

বৈঠকখানায় মুকুন্দলাল বসেন গদির উপর, পিঠের কাছে তাকিয়া। পারিষদেরা বসে নীচে, সামনে বাঁয়ে দুই ভাগে। হুঁকাবরদারের জানা আছে, এদের কার সম্মান কোন্ রকম হুঁকোয় রক্ষা হয়— বাঁধানো, আবাঁধানো, না গুড়গুড়ি। কর্তামহারাজের জন্যে বৃহৎ আলবোলা, গোলাপজলের গন্ধে সুগন্ধি।

বাড়ির আর-এক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাব। সামনেই কালোদাগ-ধরা মস্ত এক আয়না, তার গিল্‌টি-করা ফ্রেমের দুই গায়ে ডানাওআলা পরীমূর্তির হাতে-ধরা বাতিদান। তলায় টেবিলে সোনার জলে চিত্রিত কালো পাথরের ঘড়ি, আর কতকগুলো বিলিতি কাঁচের পুতুল। খাড়া-পিঠ-ওআলা চৌকি, সোফা, কড়িতে দোদুল্যমান ঝাড়লণ্ঠন, সমস্তই হল্যাণ্ড-কাপড়ে মোড়া। দেয়ালে পূর্বপুরুষদের অয়েলপেন্টিং, আর তার সঙ্গে বংশের মুরুব্বি দু-একজন রাজপুরুষের ছবি। ঘরজোড়া বিলিতি কার্পেট, তাতে মোটা মোটা ফুল টক্‌টকে কড়া রঙে আঁকা। বিশেষ ক্রিয়াকর্মে জিলার সাহেবসুবাদের নিমন্ত্রণোপলক্ষে এই ঘরের অবগুণ্ঠন মোচন হয়। বাড়িতে এই একটা মাত্র আধুনিক ঘর, কিন্তু মনে হয় এইটেই সবচেয়ে প্রাচীন ভূতে-পাওয়া কামরা, অব্যবহারের রুদ্ধ ঘনগন্ধে দম-আটকানো দৈনিক জীবনযাত্রার সম্পর্কবঞ্চিত বোবা।

মুকুন্দলালের যে শৌখিনতা সেটা তখনকার আদবকায়দার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। তার মধ্যে যে নির্ভীক ব্যয়বাহুল্য, সেইটেতেই ধনের মর্যাদা। অর্থাৎ ধন বোঝা হয়ে মাথায় চড়ে নি, পাদপীঠ হয়ে আছে পায়ের তলায়। এদের শৌখিনতার আমদরবারে দানদাক্ষিণ্য, খাসদরবারে ভোগবিলাস— দু'ই খুব টানা মাপের। এক দিকে আশ্রিতবাৎসল্যে যেমন অকৃপণতা, আর-এক দিকে ঔদ্ধত্যদমনে তেমনি অবাধ অধৈর্য। একজন হঠাৎ-ধনী প্রতিবেশী গুরুতর অপরাধে কর্তার বাগানের মালীর ছেলের কান মলে দিয়েছিল মাত্র; এই ধনীর শিক্ষাবিধান-বাবদ যত খরচ হয়েছে, নিজের ছেলেকে কলেজ পার করতেও এখনকার দিনে এত খরচ করে না। অথচ মালীর ছেলেটাকেও অগ্রাহ্য করেন নি। চাবকিয়ে তাকে শয্যাগত করেছিলেন। রাগের চোটে চাবুকের মাত্রা বেশি হয়েছিল বলে ছেলেটার উন্নতি হল। সরকারি খরচে পড়াশুনো করে সে আজ মোক্তারি করে।

পুরাতন কালের ধনবানদের প্রথামত মুকুন্দলালের জীবন দুই-মহলা। এক

মহলে গার্হস্থ্য, আর-এক মহলে ইয়ারকি। অর্থাৎ এক মহলে দশকর্ম, আর-এক মহলে একাদশ অকর্ম। ঘরে আছেন ইষ্টদেবতা আর ঘরের গৃহিণী। সেখানে পুজা-অর্চনা, অতিথিসেবা, পালপার্বণ, ব্রত-উপবাস, কাঙালিবিদায়, ব্রাহ্মণভোজন, পাড়াপড়শি, গুরুপুরোহিত। ইয়ারমহল গৃহসীমার বাইরেই, সেখানে নবাবি আমল, মজলিসি সমারোহে সরগরম। এইখানে আনাগোনা চলত গৃহের প্রত্যন্তপুরবাসিনীদের। তাদের সংসর্গকে তখনকার ধনীরা সহবত শিক্ষার উপায় বলে গণ্য করত। দুই বিরুদ্ধ হাওয়ার দুইকক্ষবর্তী গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গৃহিণীদের বিস্তর সহ্য করতে হয়।

মুকুন্দলালের স্ত্রী নন্দরানী অভিমানিনী, সহ্য করাটা তাঁর সম্পূর্ণ অভ্যাস হল না। তার কারণ ছিল। তিনি নিশ্চিত জানেন, বাইরের দিকে তাঁর স্বামীর তানের দৌড় যতদূরই থাক্‌, তিনিই হচ্ছেন ধুয়ো, ভিতরের শক্ত টান তাঁরই দিকে। সেইজন্যেই স্বামী যখন নিজের ভালোবাসার 'পরে নিজে অন্যায় করেন, তিনি সেটা সইতে পারেন না। এবারে তাই ঘটল।

৫

রাসের সময় খুব ধুম। কতক কলকাতা, কতক ঢাকা থেকে আমোদের সরঞ্জাম এল। বাড়ির উঠোনে কৃষ্ণযাত্রা, কোনোদিন বা কীর্তন। এইখানে মেয়েদের ও সাধারণ পাড়াপড়শির ভিড়। অন্যবারে তামসিক আয়োজনটা হত বৈঠকখানা ঘরে; অন্তঃপুরিকারা, রাতে ঘুম নেই, বুকে ব্যথা বিঁধছে, দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু-কিছু আভাস নিয়ে যেতে পারতেন। এবারে খেয়াল গেল বাইনাচের ব্যবস্থা হবে বজরায় নদীর উপর।

কী হচ্ছে দেখবার জো নেই বলে নন্দরানীর মন রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে আছড়ে আছড়ে কাঁদতে লাগল। ঘরে কাজকর্ম, লোককে খাওয়ানো-দাওয়ানো, দেখাশুনো হাসিমুখেই করতে হয়। বুকের মধ্যে কাঁটাটা নড়তে চড়তে কেবলই বেঁধে, প্রাণটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, কেউ জানতে পারে না। ও দিকে থেকে-থেকে তৃপ্ত কণ্ঠের রব ওঠে, জয় হোক রানীমার।

অবশেষে উৎসবের মেয়াদ ফুরোল, বাড়ি হয়ে গেল খালি। কেবল ছেঁড়া কলাপাতা ও সরা-খুরি-ভাঁড়ের ভগ্নাবশেষের উপর কাক-কুকুরের কলরবমুখর উত্তরকাণ্ড চলছে। ফরাশেরা সিঁড়ি খাটিয়ে লণ্ঠন খুলে নিল, চাঁদোয়া নামাল, ঝাড়ের টুকরো বাতি ও শোলার ফুলের ঝালরগুলো নিয়ে পাড়ার ছেলেরা কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দিল। সেই

ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে চড়ের আওয়াজ ও চীৎকার কান্না যেন তারস্বরের হাউইয়ের মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠছে। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ থেকে উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারির গন্ধে বাতাস অম্লগন্ধী ; সেখানে সর্বত্র ক্লান্তি, অবসাদ ও মলিনতা। এই শূন্যতা অসহ্য হয়ে উঠল যখন মুকুন্দলাল আজও ফিরলেন না। নাগাল পাবার উপায় নেই বলেই নন্দরানীর ধৈর্যের বাঁধ হঠাৎ ফেটে খান্ খান্ হয়ে গেল।

দেওয়ানজিকে ডাকিয়ে পরদার আড়াল থেকে বললেন, "কর্তাকে বলবেন, বৃন্দাবনে মার কাছে আমাকে এখনই যেতে হচ্ছে। তাঁর শরীর ভালো নেই।"

দেওয়ানজি কিছুক্ষণ টাকে হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, "কর্তাকে জানিয়ে গেলেই ভালো হত মাঠাকরুন। আজকালের মধ্যে বাড়ি ফিরবেন খবর পেয়েছি।"

"না, দেরি করতে পারব না।"

নন্দরানীও খবর পেয়েছেন আজকালের মধ্যেই ফেরবার কথা। সেইজন্যেই যাবার এত তাড়া। নিশ্চয় জানেন, অল্প একটু কান্নাকাটি-সাধ্যসাধনাতেই সব শোধ হয়ে যাবে। প্রতিবারই এমনি হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তি অসমাপ্তই থাকে। এবারে তা কিছুতেই চলবে না। তাই দণ্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েই দণ্ডদাতাকে পালাতে হচ্ছে। বিদায়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে পা সরতে চায় না— শোবার খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কান্না। কিন্তু যাওয়া বন্ধ হল না।

তখন কার্তিক মাসের বেলা দুটো। রৌদ্রে বাতাস আতপ্ত। রাস্তার ধারের সিসুতরুশ্রেণীর মর্মরের সঙ্গে মিশে কচিৎ গলাভাঙা কোকিলের ডাক আসছে। যে রাস্তা দিয়ে পালকি চলেছে সেখান থেকে কাঁচা ধানের খেতের পরপ্রান্তে নদী দেখা যায়। নন্দরানী থাকতে পারলেন না, পালকির দরজা ফাঁক করে সে দিকে চেয়ে দেখলেন। ও পারের চরে বজরা বাঁধা আছে, চোখে পড়ল। মাস্তুলের উপর নিশেন উড়ছে। দূর থেকে মনে হল, বজরার ছাতের উপর চিরপরিচিত গুপি হরকরা বসে ; তার পাগড়ির তকমার উপর সূর্যের আলো ঝক্‌মক করছে। সবলে পালকির দরজা বন্ধ করে দিলেন, বুকের ভিতরটা পাথর হয়ে গেল।

৬

মুকুন্দলাল, যেন মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ, সসংকোচে বন্দরে এসে ভিড়লেন। অপরাধের বোঝায় বুক ভারী। প্রমোদের স্মৃতিটা যেন অতিভোজনের পরের উচ্ছিষ্টের মতো মনটাকে বিতৃষ্ণায়

ভরে দিয়েছে। যারা ছিল তাঁর এই আমোদের উৎসাহদাতা উদ্‌যোগকর্তা, তারা যদি সামনে থাকত তা হলে তাদের ধরে চাবুক কষিয়ে দিতে পারতেন। মনে-মনে পণ করছেন আর কখনও এমন হতে দেবেন না। তাঁর আলুথালু চুল, রক্তবর্ণ চোখ আর মুখের অতিশুষ্ক ভাব দেখে প্রথমটা কেউ সাহস করে কর্ত্রীঠাকরুনের খবরটা দিতে পারলে না, মুকুন্দলাল ভয়ে ভয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। 'বড়োবউ মাপ করো— অপরাধ করেছি, আর কখনও এমন হবে না' এই কথা মনে মনে বলতে বলতে শোবার ঘরের দরজার কাছে একটুখানি থমকে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকলেন। মনে মনে নিশ্চয় স্থির করেছিলেন যে, অভিমানিনী বিছানায় পড়ে আছেন। একেবারে পায়ের কাছে গিয়ে পড়বেন এই ভেবে ঘরে ঢুকেই দেখলেন ঘর শূন্য। বুকের ভিতরটা দমে গেল। শোবার ঘরে বিছানায় নন্দরানীকে যদি দেখতেন তবে বুঝতেন যে, অপরাধ ক্ষমা করবার জন্যে মানিনী অর্ধেক রাস্তা এগিয়ে আছেন। কিন্তু বড়োবউ যখন শোবার ঘরে নেই তখন মুকুন্দলাল বুঝলেন, তাঁর প্রায়শ্চিত্তটা হবে দীর্ঘ এবং কঠিন। হয়তো আজ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কিম্বা হবে আরও দেরি। কিন্তু এতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সম্পূর্ণ শাস্তি এখনই মাথা পেতে নিয়ে ক্ষমা আদায় করবেন, নইলে জলগ্রহণ করবেন না। বেলা হয়েছে, এখনও স্নানাহার হয় নি, এ দেখে কি সাধ্বী থাকতে পারবেন? শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, প্যারী দাসী বারান্দার এক কোণে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর বড়োবউমা কোথায়?"

সে বললে, "তিনি তাঁর মাকে দেখতে পরশুদিন বৃন্দাবনে গেছেন।"

ভালো যেন বুঝতে পারলেন না, রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গেছেন?"

"বৃন্দাবনে। মায়ের অসুখ।"

মুকুন্দলাল একবার বারান্দার রেলিং চেপে ধরে দাঁড়ালেন। তার পরে দ্রুতপদে বাইরের বৈঠকখানায় গিয়ে একা বসে রইলেন। একটি কথা কইলেন না। কাছে আসতে কারও সাহস হয় না।

দেওয়ানজি এসে ভয়ে ভয়ে বললেন, "মাঠাকরুনকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিই?"

কোনো কথা না বলে কেবল আঙুল নেড়ে নিষেধ করলেন। দেওয়ানজি চলে গেলে রাধু খানসামাকে ডেকে বললেন, "ব্রাণ্ডি লে আও।"

বাড়িসুদ্ধ লোক হতবুদ্ধি। ভূমিকম্প যখন পৃথিবীর গভীর গর্ভ থেকে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে তখন যেমন তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করা মিছে, নিরুপায়ভাবে তার ভাঙাচোরা সহ্য করতেই হয়— এও তেমনি।

দিনরাত চলছে নির্জল ব্র্যাণ্ডি। খাওয়াদাওয়া প্রায় নেই। একে শরীর পূর্ব থেকেই ছিল অবসন্ন, তার পরে এই প্রচণ্ড অনিয়মে বিকারের সঙ্গে রক্তবমন দেখা দিল।

কলকাতা থেকে ডাক্তার এল— দিনরাত মাথায় বরফ চাপিয়ে রাখলে।

মুকুন্দলাল যাকে দেখেন খেপে ওঠেন, তাঁর বিশ্বাস তাঁর বিরুদ্ধে বাড়িসুদ্ধ লোকের চক্রান্ত। ভিতরে ভিতরে একটা নালিশ গুমরে উঠছিল— এরা যেতে দিলে কেন।

একমাত্র মানুষ যে তাঁর কাছে আসতে পারত সে কুমুদিনী। সে এসে পাশে বসে; ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে মুকুন্দলাল চেয়ে দেখেন— যেন মার সঙ্গে ওর চোখে কিম্বা কোথাও একটা মিল দেখতে পান। কখনও কখনও বুকের উপরে তার মুখ টেনে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে থাকেন, চোখের কোণ দিয়ে জল পড়তে থাকে, কিন্তু কখনও ভুলে একবার তার মার কথা জিজ্ঞাসা করেন না। এ দিকে বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম গেছে। কর্ত্রীঠাকরুনের কালই ফেরবার কথা। কিন্তু শোনা গেল, কোথায় এক জায়গায় রেলের লাইন গেছে ভেঙে।

৭

সেদিন তৃতীয়া; সন্ধ্যাবেলায় ঝড় উঠল। বাগানে মড়্ মড়্ করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। থেকে থেকে বৃষ্টির ঝাপটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠছে ক্রুদ্ধ অধৈর্যের মতো। লোকজন খাওয়াবার জন্যে যে চালাঘর তোলা হয়েছিল তার করোগেটেড লোহার চাল উড়ে দিঘিতে গিয়ে পড়ল। বাতাস বাণবিদ্ধ বাঘের মতো গোঁ গোঁ করে গোঙরাতে গোঙরাতে আকাশে আকাশে লেজ ঝাপটা দিয়ে পাক খেয়ে বেড়ায়। হঠাৎ বাতাসের এক দমকে জানলাদরজাগুলো খড় খড় করে কেঁপে উঠল। কুমুদিনীর হাত চেপে ধরে মুকুন্দলাল বললেন, "মা কুমু, ভয় নেই, তুই তো কোনো দোষ করিস নি। ওই শোন্ দাঁতকড়মড়ানি, ওরা আমাকে মারতে আসছে।"

বাবার মাথায় বরফের পুঁটুলি বুলোতে বুলোতে কুমুদিনী বলে, "মারবে কেন বাবা? ঝড় হচ্ছে; এখনই থেমে যাবে।"

"বৃন্দাবন? বৃন্দাবন···চন্দ্র···চক্রবর্তী! বাবার আমলের পুরুত— সে তো মরে গেছে— ভূত হয়ে গেছে বৃন্দাবনে। কে বললে সে আসবে?"

"কথা কোয়ো না বাবা, একটু ঘুমোও।"

"ওই যে, কাকে বলছে, খবরদার, খবরদার!"

"কিছু না, বাতাসে বাতাসে গাছগুলোকে ঝাঁকানি দিচ্ছে।"

"কেন, ওর রাগ কিসের? এতই কী দোষ করেছি, তুই বল্ মা।"

"কোনো দোষ কর নি বাবা। একটু ঘুমোও।"

"বিন্দে দূতী? সেই যে মধু অধিকারী সাজত।

মিছে কর কেন নিন্দে,

ওগো বিন্দে শ্রীগোবিন্দে— "

চোখ বুজে গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগলেন।

"কার বাঁশি ঐ বাজে বৃন্দাবনে।

সই লো সই,

ঘরে আমি রইব কেমনে!

রাধু, ব্র্যাণ্ডি লে আও।"

কুমুদিনী বাবার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, "বাবা, ও কী বলছ?" মুকুন্দলাল চোখ চেয়ে তাকিয়েই জিভ কেটে চুপ করেন। বুদ্ধি যখন অত্যন্ত বেঠিক তখনও এ কথা ভোলেন নি যে, কুমুদিনীর সামনে মদ চলতে পারে না।

একটু পরে আবার গান ধরলেন,

"শ্যামের বাঁশি কাড়তে হবে,

নইলে আমায় এ বৃন্দাবন ছাড়তে হবে।"

এই এলোমেলো গানের টুকরোগুলো শুনে কুমুর বুক ফেটে যায়— মায়ের উপর রাগ করে, বাবার পায়ের তলায় মাথা রাখে যেন মায়ের হয়ে মাপ-চাওয়া।

মুকুন্দ হঠাৎ ডেকে উঠলেন, "দেওয়ানজি!"

দেওয়ানজি আসতে তাকে বললেন, "ওই যেন ঠক্ ঠক্ শুনতে পাচ্ছি।"

দেওয়ানজি বললেন, "বাতাসে দরজা নাড়া দিচ্ছে।"

"বুড়ো এসেছে, সেই বৃন্দাবনচন্দ্র— টাক মাথায়, লাঠি হাতে, চেলির চাদর কাঁধে। দেখে এসো তো। কেবলই ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ করছে। লাঠি, না খড়ম?"

রক্তবমন কিছুক্ষণ শান্ত ছিল। তিনটে রাত্রে আবার আরম্ভ হল। মুকুন্দলাল বিছানার চারি দিকে হাত বুলিয়ে জড়িতস্বরে বললেন, "বড়োবউ, ঘর যে অন্ধকার! এখনও আলো জ্বালবে না?"

বজরা থেকে ফিরে আসবার পর মুকুন্দলাল এই প্রথম স্ত্রীকে সম্ভাষণ করলেন — আর এই শেষ।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে নন্দরানী বাড়ির দরজার কাছে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে ধরাধরি করে বিছানায় এনে শোয়াল। সংসারে কিছুই তাঁর

আর রুচল না। চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সান্ত্বনা নেই। গুরু এসে শাস্ত্রের শ্লোক আওড়ালেন, মুখ ফিরিয়ে রইলেন। হাতের লোহা খুললেন না— বললেন, "আমার হাত দেখে বলেছিল আমার এয়োত ক্ষয় হবে না। সে কি মিথ্যে হতে পারে?"

দূরসম্পর্কের ক্ষেমা-ঠাকুরঝি আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "যা হবার তা তো হয়েছে, এখন ঘরের দিকে তাকাও। কর্তা যে যাবার সময় বলে গেছেন, বড়োবউ ঘরে কি আলো জ্বালবে না?"

নন্দরানী বিছানা থেকে উঠে বসে দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাব, আলো জ্বালতে যাব। এবার আর দেরি হবে না।" বলে তাঁর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন হাতে প্রদীপ নিয়ে এখনই যাত্রা করে চলেছেন।

সূর্য গেছেন উত্তরায়ণে ; মাঘ মাস এল, শুক্ল চতুর্দশী। নন্দরানী কপালে মোটা করে সিঁদুর পরলেন, গায়ে জড়িয়ে নিলেন লাল বেনারসি শাড়ি। সংসারের দিকে না তাকিয়ে মুখে হাসি নিয়ে চলে গেলেন।

৮

বাবার মৃত্যুর পর বিপ্রদাস দেখলে, যে গাছে তাদের আশ্রয় তার শিকড় খেয়ে দিয়েছে পোকায়। বিষয়সম্পত্তি ঋণের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে— অল্প করে ডুবছে। ক্রিয়াকর্ম সংক্ষেপ ও চালচলন খাটো না করলে উপায় নেই। কুমুর বিয়ে নিয়েও কেবলই প্রশ্ন আসে, তার উত্তর দিতে মুখে বাধে। শেষকালে নূরনগর থেকে বাসা তুলতে হল। কলকাতায় বাগবাজারের দিকে একটা বাড়িতে এসে উঠল।

পুরোনো বাড়িতে কুমুদিনীর একটা প্রাণময় পরিমণ্ডল ছিল। চারি দিকে ফুলফল, গোয়ালঘর, পুজোবাড়ি, শস্যখেত, মানুষজন। অন্তঃপুরের বাগানে ফুল তুলেছে, সাজি ভরেছে, নুন-লঙ্কা ধনেপাতার সঙ্গে কাঁচা কুল মিশিয়ে অপথ্য করেছে ; চালতা পেড়েছে, বোশেখ-জষ্টির ঝড়ে আমবাগানে আম কুড়িয়েছে। বাগানের পূর্বপ্রান্তে ঢেঁকিশাল, সেখানে নাড়ুকোটা প্রভৃতি উপলক্ষে মেয়েদের কলকোলাহলে তারও অল্প কিছু অংশ ছিল। শ্যাওলায়-সবুজ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খিড়কির পুকুর ঘন ছায়ায় স্নিগ্ধ, কোকিল-ঘুঘু-দোয়েল-শ্যামার ডাকে মুখরিত। এইখানে প্রতিদিন সে জলে কেটেছে সাঁতার, নালফুল তুলেছে, ঘাটে বসে দেখেছে খেয়াল, আনমনে একা বসে করেছে পশম সেলাই। ঋতুতে ঋতুতে মাসে মাসে প্রকৃতির উৎসবের

সঙ্গে মানুষের এক-একটি পরব বাঁধা। অক্ষয়তৃতীয়া থেকে দোলযাত্রা বাসন্তীপুজো পর্যন্ত কত কী। মানুষে প্রকৃতিতে হাত মিলিয়ে সমস্ত বছরটিকে যেন নানা কারুশিল্পে বুনে তুলছে। সবই যে সুন্দর, সবই যে সুখের তা নয়। মাছের ভাগ, পুজোর পার্বণী, কর্ত্রীর পক্ষপাত, ছেলেদের কলহে স্ব-স্ব ছেলের পক্ষসমর্থন প্রভৃতি নিয়ে নীরবে ঈর্ষা বা তারস্বরে অভিযোগ, কানে কানে পরচর্চা বা মুক্তকণ্ঠে অপবাদঘোষণা, এ-সমস্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে— সবচেয়ে আছে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ব্যস্ততার ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা উদ্বেগ— কর্তা কখন কী করে বসেন, তাঁর বৈঠকে কখন কী দুর্যোগ আরম্ভ হয়। যদি আরম্ভ হল তবে দিনের পরে দিন শান্তি নেই। কুমুদিনীর বুক দুর্ দুর্ করে, ঘরে লুকিয়ে মা কাঁদেন, ছেলেদের মুখ শুকনো। এই-সমস্ত শুভে অশুভে সুখে দুঃখে সর্বদা আন্দোলিত প্রকাণ্ড সংসারযাত্রা।

এরই মধ্য থেকে কুমুদিনী এল কলকাতায়। এ যেন মস্ত একটা সমুদ্র কিন্তু কোথায় একফোঁটা পিপাসার জল? দেশে আকাশের বাতাসেরও একটা চেনা চেহারা ছিল। গ্রামের দিগন্তে কোথাও-বা ঘন বন, কোথাও-বা বালির চর, নদীর জলরেখা, মন্দিরের চুড়ো, শূন্য বিস্তৃত মাঠ, বুনো ঝাউয়ের ঝোপ, গুণটানা পথ— এরা নানা রেখায় নানা রঙে বিচিত্র ঘের দিয়ে আকাশকে একটি বিশেষ আকাশ করে তুলেছিল— কুমুদিনীর আপন আকাশ। সূর্যের আলোও ছিল তেমনি বিশেষ আলো। দিঘিতে, শস্যখেতে, বেতের ঝাড়ে, জেলে-নৌকোর খয়েরি রঙের পালে, বাঁশঝাড়ের কচি ডালের চিকন পাতায়, কাঁঠালগাছের মসৃণ-ঘন সবুজে, ও পারের বালুতটের ফ্যাকাশে হলদেয়— সমস্তর সঙ্গে নানা ভাবে মিশিয়ে সেই আলো একটি চিরপরিচিত রূপ পেয়েছিল। কলকাতার এই-সব অপরিচিত বাড়ির ছাদে দেয়ালে কঠিন অনম্র রেখার আঘাতে নানাখানা হয়ে সেই চির-দিনের আকাশ আলো তাকে বেগানা লোকের মতো কড়া চোখে দেখে। এখানকার দেবতাও তাকে একঘরে করেছে।

বিপ্রদাস তাকে কেদারার কাছে টেনে নিয়ে বলে, "কী কুমু, মন কেমন করছে?"

কুমুদিনী হেসে বলে, "না দাদা, একটুও না।"

"যাবি বোন, ম্যুজিয়ম দেখতে?"

"হ্যাঁ যাব।"

এত বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলে যে, বিপ্রদাস যদি পুরুষমানুষ না হত তবে বুঝতে পারত যে এটা স্বাভাবিক নয়। ম্যুজিয়মে না যেতে হলেই সে বাঁচে। বাইরের লোকের ভিড়ের মধ্যে বেরোনো অভ্যেস নেই বলে জনসমাগমে যেতে তার

সংকোচের অন্ত নেই। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, চোখ চেয়ে ভালো করে দেখতেই পারে না।

বিপ্রদাস তাকে দাবাখেলা শেখালে। নিজে অসামান্য খেলোয়াড়, কুমুর কাঁচা খেলা নিয়ে তার আমোদ লাগে। শেষকালে নিয়মিত খেলতে খেলতে কুমুর এতটা হাত পাকল যে বিপ্রদাসকে সাবধানে খেলতে হয়। কলকাতায় কুমুর সমবয়সী মেয়ে-সঙ্গিনী না থাকাতে এই দুই ভাইবোন যেন দুই ভাইয়ের মতো হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিপ্রদাসের বড়ো অনুরাগ; কুমু একমনে তার কাছ থেকে ব্যাকরণ শিখেছে। যখন কুমারসম্ভব পড়লে তখন থেকে শিবপূজায় সে শিবকে দেখতে পেলে, সেই মহাতপস্বী যিনি তপস্বিনী উমার পরম তপস্যার ধন। কুমারীর ধ্যানে তার ভাবী পতি পবিত্রতার দৈবজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিলে।

বিপ্রদাসের ফোটোগ্রাফ তোলার শখ, কুমুও তাই শিখে নিলে। ওরা কেউ-বা নেয় ছবি, কেউ-বা সেটাকে ফুটিয়ে তোলে। বন্দুকে বিপ্রদাসের হাত পাকা। পার্বণ উপলক্ষে দেশে যখন যায়, খিড়কির পুকুরে ডাব, বেলের খোলা, আখরোট প্রভৃতি ভাসিয়ে দিয়ে পিস্তল অভ্যাস করে; কুমুকে ডাকে, "আয় না কুমু, দেখ্ না চেষ্টা করে।"

যে-কোনো বিষয়েই তার দাদার রুচি সে সমস্তকেই বহু যত্নে কুমু আপনার করে নিয়েছে। দাদার কাছে এসরাজ শিখে শেষে ওর হাত এমন হল যে দাদা বলে, আমি হার মানলুম।

এমনি ক'রে, শিশুকাল থেকে যে দাদাকে ও সবচেয়ে বেশি ভক্তি করে, কলকাতায় এসে তাকেই সে সবচেয়ে কাছে পেলে। কলকাতায় আসা সার্থক হল। কুমু স্বভাবতই মনের মধ্যে একলা। পর্বতবাসিনী উমার মতোই ও যেন এক কল্প-তপোবনে বাস করে, মানস-সরোবরের কূলে। এইরকম জন্ম-একলা মানুষদের জন্যে দরকার মুক্ত আকাশ, বিস্তৃত নির্জনতা, এবং তারই মধ্যে এমন একজন কেউ, যাকে নিজের সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারে। নিকটের সংসার থেকে এই দূরবর্তিতা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ নয় বলে মেয়েরা এটা একেবারেই পছন্দ করে না। তারা এটাকে হয় অহংকার, নয় হৃদয়হীনতা বলে মনে করে। তাই দেশে থাকতেও সঙ্গিনীদের মহলে কুমুদিনীর বন্ধুত্ব জমে ওঠে নি।

পিতা-বর্তমানেই বিপ্রদাসের বিবাহ প্রায় ঠিক, এমন সময় গায়ে হলুদের দুদিন আগেই কনেটি জ্বরবিকারে মারা গেল। তখন ভাটপাড়ায় বিপ্রদাসের কুষ্ঠিগণনায় বেরোল, বিবাহস্থানীয় দুর্গ্রহের ভোগক্ষয় হতে দেরি আছে। বিবাহ চাপা পড়ল।

ইতিমধ্যে ঘটল পিতার মৃত্যু। তার পর থেকে ঘটকালি প্রশ্রয় পাবার মতো অনুকূল সময় বিপ্রদাসের ঘরে এল না। ঘটক একদা মস্ত একটা মোটা পণের আশা দেখালে। তাতে হল উলটো ফল। কম্পিত হস্তে হুঁকোটি দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে সেদিন অত্যন্ত দ্রুতপদেই ঘটককে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল।'

৯

সুবোধের চিঠি বিলেত থেকে আসত নিয়মমত। এখন মাঝে মাঝে ফাঁক পড়ে। কুমু ডাকের জন্যে ব্যগ্র হয়ে চেয়ে থাকে। বেহারা এবার চিঠি তারই হাতে দিল। বিপ্রদাস আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছে, কুমু ছুটে গিয়ে বললে, "দাদা, ছোড়দাদার চিঠি।"

দাড়ি-কামানো সেরে কেদারায় বসে বিপ্রদাস একটু যেন ভয়ে ভয়েই চিঠি খুললে। পড়া হয়ে গেলে চিঠিখানা এমন করে হাতে চাপলে যেন সে একটা তীব্র ব্যথা।

কুমুদিনী ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ছোড়দাদার অসুখ করে নি তো?"

"না, সে ভালোই আছে।"

"চিঠিতে কী লিখেছেন বলো না দাদা।"

"পড়াশুনোর কথা।"

কিছুদিন থেকে বিপ্রদাস কুমুকে সুবোধের চিঠি পড়তে দেয় না। একটু-আধটু পড়ে শোনায়। এবার তাও নয়। চিঠিখানা চেয়ে নিতে কুমুর সাহস হল না, মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

সুবোধ প্রথম-প্রথম হিসেব করেই খরচ চালাত। বাড়ির দুঃখের কথা তখনও মনে তাজা ছিল। এখন সেটা যতই ছায়ার মতো হয়ে এসেছে, খরচও ততই চলেছে বেড়ে। বলছে, বড়োরকম চালে চলতে না পারলে এখানকার সামাজিক উচ্চশিখরের আবহাওয়ায় পৌঁছনো যায় না। আর তা না গেলে বিলেতে আসাই ব্যর্থ হয়।

দায়ে পড়ে দুই-একবার বিপ্রদাসকে তার-যোগে অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে হয়েছে। এবার দাবি এসেছে হাজার পাউণ্ডের— জরুরি দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে বললে, পাব কোথায়? গায়ের রক্ত জল করে কুমুর বিবাহের জন্যে টাকা জমাচ্ছি, শেষে কি সেই টাকায় টান পড়বে? কী হবে সুবোধের ব্যারিস্টার হয়ে, কুমুর ভবিষ্যৎ ফতুর করে যদি তার দাম দিতে হয়?

সে রাত্রে বিপ্রদাস বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। জানে না, কুমুদিনীর চোখেও ঘুম নেই। এক সময়ে যখন বড়ো অসহ্য হল কুমু ছুটে এসে বিপ্রদাসের হাত ধরে বললে, "সত্যি করে বলো দাদা, ছোড়দাদার কী হয়েছে? পায়ে পড়ি, আমার কাছে লুকিয়ো না।"

বিপ্রদাস বুঝলে গোপন করতে গেলে কুমুদিনীর আশঙ্কা আরও বেড়ে উঠবে। একটু চুপ করে থেকে বললে, "সুবোধ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, অত টাকা দেবার শক্তি আমার নেই।"

কুমু বিপ্রদাসের হাত ধরে বললে, "দাদা, একটা কথা বলি, রাগ করবে না বলো।"

"রাগ করবার মতো কথা হলে রাগ না করে বাঁচব কী করে?"

"না দাদা, ঠাট্টা নয়, শোনো আমার কথা— মায়ের গয়না তো আমার জন্যে আছে, তাই নিয়ে—"

"চুপ, চুপ, তোর গয়নায় কি আমরা হাত দিতে পারি!"

"আমি তো পারি।"

"না, তুইও পারিস নে। থাক্ সে-সব কথা, এখন ঘুমোতে যা।"

কলকাতা শহরের সকাল, কাকের ডাক ও স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ির খড়খড়ানিতে রাত পোয়ালো। দূরে কখনও স্টীমারের, কখনও তেলের কলের বাঁশি বাজে। বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে একজন লোক মই কাঁধে জ্বরারি-বটিকার বিজ্ঞাপন খাটিয়ে চলেছে; খালি-গাড়ির দুটো গোরু গাড়োয়ানের দুই হাতের প্রবল তাড়ার উত্তেজনায় গাড়ি নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবমান; কল থেকে জল নেবার প্রতিযোগিতায় এক হিন্দুস্থানি মেয়ের সঙ্গে উড়িয়া ব্রাহ্মণের ঠেলাঠেলি বকাবকি জমেছে। বিপ্রদাস বারান্দায় বসে; গুড়গুড়ির নলটা হাতে; মেজেতে পড়ে আছে না-পড়া খবরের কাগজ।

কুমু এসে বললে, "দাদা, 'না' বোলো না।"

"আমার মতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবি তুই? তোর শাসনে রাতকে দিন, 'না'-কে হাঁ করতে হবে?"

"না, শোনো বলি— আমার গয়না নিয়ে তোমার ভাবনা ঘুচুক।"

"সাধে তোকে বলি বুড়ি? তোর গয়না নিয়ে আমার ভাবনা ঘুচবে এমন কথা ভাবতে পারলি কোন্ বুদ্ধিতে?"

"সে জানি নে, কিন্তু তোমার এই ভাবনা আমার সয় না।"

"ভেবেই ভাবনা শেষ করতে হয় রে, তাকে ফাঁকি দিয়ে থামাতে গেলে বিপরীত ঘটে। একটু ধৈর্য ধর্, একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

বিপ্রদাস সে মেলে চিঠিতে লিখলে, টাকা পাঠাতে হলে কুমুর পণের সম্বলে হাত দিতে হয়; সে অসম্ভব।

যথাসময়ে উত্তর এল। সুবোধ লিখেছে, কুমুর পণের টাকা সে চায় না। সম্পত্তিতে তার নিজের অর্ধ অংশ বিক্রি করে যেন টাকা পাঠানো হয়। সঙ্গে সঙ্গেই পাওআর অফ অ্যাটর্নি পাঠিয়েছে।

এ চিঠি বিপ্রদাসের বুকে বাণের মতো বিঁধল। এতবড়ো নিষ্ঠুর চিঠি সুবোধ লিখল কী করে! তখনই বুড়ো দেওয়ানজিকে ডেকে পাঠালে। জিজ্ঞাসা করলে, "ভূষণ রায়রা করিমহাটি তালুক পত্তনি নিতে চেয়েছিল না? কত পণ দেবে?"

দেওয়ান বললে, "বিশ হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে।"

"ভূষণ রায়কে তলব দিয়ে পাঠাও। কথাবার্তা কইতে চাই।"

বিপ্রদাস বংশের বড়ো ছেলে। তার জন্মকালে তার পিতামহ এই তালুক স্বতন্ত্র ভাবে তাকেই দান করেছেন। ভূষণ রায় মস্ত মহাজন, বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার তেজারতি। জন্মস্থান করিমহাটিতে। এইজন্যে অনেক দিন থেকে নিজের গ্রাম পত্তনি নেবার চেষ্টা। অর্থসংকটে মাঝে মাঝে বিপ্রদাস রাজি হয় আর-কি, কিন্তু প্রজারা কেঁদে পড়ে। বলে, ওকে আমরা কিছুতেই জমিদার বলে মানতে পারব না। তাই প্রস্তাবটা বারে বারে যায় ফেঁসে। এবার বিপ্রদাস মন কঠিন করে বসল। ও নিশ্চয় জানে, সুবোধের টাকার দাবি এইখানেই শেষ হবে না। মনে মনে বললে, আমার তালুকের এই সেলামির টাকা রইল সুবোধের জন্যে, তার পর দেখা যাবে।

দেওয়ান বিপ্রদাসের মুখের উপর জবাব দিতে সাহস করলে না। গোপনে কুমুকে গিয়ে বললে, "দিদি, তোমার কথা বড়োবাবু শোনেন। বারণ করো তাঁকে, এটা অন্যায় হচ্ছে।"

বিপ্রদাসকে বাড়ির সকলেই ভালোবাসে। কারও জন্যে বড়োবাবু যে নিজের স্বত্ব নষ্ট করবে, এ ওদের গায়ে সয় না।

বেলা হয়ে যায়। বিপ্রদাস ওই তালুকের কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটছে। এখনও স্নানাহার হয় নি। কুমু বারে বারে তাকে ডেকে পাঠাচ্ছে। শুকনো মুখ করে এক সময়ে অন্দরে এল। যেন বাজে-ছোঁওয়া পাতা-ঝলসানো গাছের মতো। কুমুর বুকে শেল বিঁধল।

স্নানাহার হয়ে গেলে পর বিপ্রদাস আলবোলার নল-হাতে খাটের বিছানায় পা

ছড়িয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসল যখন, কুমু তার শিয়রের কাছে বসে ধীরে ধীরে তার চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "দাদা, তোমার তালুক তুমি পত্তনি দিতে পারবে না।"

"তোকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভূতে পেয়েছে নাকি ? সব কথাতেই জুলুম ?"

"না দাদা, কথা চাপা দিয়ো না।"

তখন বিপ্রদাস আর থাকতে পারলে না, সোজা হয়ে উঠে বসে কুমুকে শিয়রের কাছ থেকে সরিয়ে সামনে বসালে। রুদ্ধ স্বরটাকে পরিষ্কার করবার জন্যে একটুখানি কেশে নিয়ে বললে, "সুবোধ কী লিখেছে জানিস ? এই দেখ্।"

এই বলে জামার পকেট থেকে তার চিঠি বের করে কুমুর হাতে দিলে। কুমু সমস্তটা পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে বললে, "মাগো, ছোড়দাদা এমন চিঠিও লিখতে পারলে ?"

বিপ্রদাস বললে, "ওর নিজের সম্পত্তি আর আমার সম্পত্তিতে ও যখন আজ ভেদ করে দেখতে পেরেছে তখন আমার তালুক আমি কি আর আলাদা রাখতে পারি ? আজ ওর বাপ নেই, বিপদের সময়ে আমি ওকে দেব না তো কে দেবে ?"

এর উপর কুমু আর কথা কইতে পারলে না, নীরবে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বিপ্রদাস তাকিয়ায় আবার ঠেস দিয়ে চোখ বুজে রইল।

অনেকক্ষণ দাদার পায়ে হাত বুলিয়ে অবশেষে কুমু বললে, "দাদা, মায়ের ধন তো এখন মায়েরই আছে, তাঁর সেই গয়না থাকতে তুমি কেন—"

বিপ্রদাস আবার চমকে উঠে বসে বললে, "কুমু, এটা তুই কিছুতে বুঝলি নে, তোর গয়না নিয়ে সুবোধ আজ যদি বিলেতে থিয়েটার-কন্সার্ট দেখে বেড়াতে পারে তা হলে আমি কি তাকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব— না সে কোনোদিন মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে ? তাকে এত শাস্তি কেন দিবি ?"

কুমু চুপ করে রইল, কোনো উপায় সে খুঁজে পেল না। তখন, অনেকবার যেমন ভেবেছে তেমনি করেই ভাবতে লাগল— অসম্ভব কিছু ঘটে না কি ? আকাশের কোনো গ্রহ, কোনো নক্ষত্র এক মুহূর্তে সমস্ত বাধা সরিয়ে দিতে পারে না ? কিন্তু শুভলক্ষণ দেখা দিয়েছে যে, কিছুদিন থেকে বার বার তার বাঁ চোখ নাচছে। এর পূর্বে জীবনে আরও অনেকবার বাঁ চোখ নেচেছে, তা নিয়ে কিছু ভাববার দরকার হয় নি। এবারে লক্ষণটাকে মনে মনে ধরে পড়ল। যেন তার প্রতিশ্রুতি তাকে রাখতেই হবে— শুভলক্ষণের সত্যভঙ্গ যেন না হয়।

১০

বাদলা করেছে। বিপ্রদাসের শরীরটা ভালো নেই। বালাপোশ মুড়ি দিয়ে আধশোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছে। কুমুর আদরের বিড়ালটা বালাপোশের একটা ফালতো অংশ দখল করে গোলাকার হয়ে নিদ্রামগ্ন। বিপ্রদাসের টেরিয়র কুকুরটা অগত্যা ওর স্পর্ধা সহ্য করে মনিবের পায়ের কাছে শুয়ে স্বপ্নে এক-একবার গোঁ গোঁ করে উঠছে।

এমন সময়ে এল আর-এক ঘটক।

"নমস্কার।"

"কে তুমি ?"

"আজ্ঞে, কর্তারা আমাকে খুবই চিনতেন, (মিথ্যে কথা) আপনারা তখন শিশু। আমার নাম নীলমণি ঘটক, ৺গঙ্গামণি ঘটকের পুত্র।"

"কী প্রয়োজন ?"

"ভালো পাত্রের সন্ধান আছে। আপনাদেরই ঘরের উপযুক্ত।"

বিপ্রদাস একটু উঠে বসল। ঘটক রাজাবাহাদুর মধুসূদন ঘোষালের নাম করলে।

বিপ্রদাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলে আছে নাকি ?"

ঘটক জিভ কেটে বললে, "না, তিনি বিবাহ করেন নি। প্রচুর ঐশ্বর্য। নিজে কাজ দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, এখন সংসার করতে মন দিয়েছেন।"

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ বসে গুড়গুড়িতে টান দিতে লাগল। তার পরে হঠাৎ এক সময়ে একটু যেন জোর করে বলে উঠল, "বয়সের মিল আছে এমন মেয়ে আমাদের ঘরে নেই।"

ঘটক ছাড়তে চায় না, বরের ঐশ্বর্যের যে পরিমাণ কত, আর গবর্নরের দরবারে তাঁর আনাগোনার পথ যে কত প্রশস্ত, ইনিয়ে-বিনিয়ে তারই ব্যাখ্যা করতে লাগল।

বিপ্রদাস আবার স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। আবার অনাবশ্যক বেগের সঙ্গে বলে উঠল, "বয়সে মিলবে না।"

ঘটক বললে, "ভেবে দেখবেন, দু-চারদিন বাদে আর-একবার আসব।"

বিপ্রদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়ল।

দাদার জন্যে গরম চা নিয়ে কুমু ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। দরজার বাইরে গামছাসুদ্ধ একটা ভিজে জীর্ণ ছাতি ও কাদামাখা তালতলার চটি দেখে থেমে গেল। ওদের কথাবার্তা অনেকখানি কানে পৌঁছোল। ঘটক তখন বলছে, "রাজাবাহাদুর এবার বছর

না যেতে মহারাজা হবেন এটা একেবারে লাটসাহেবের নিজ মুখের কথা। তাই এতদিন পরে তাঁর ভাবনা ধরেছে, মহারানীর পদ এখন আর খালি রাখা চলবে না। আপনাদের গ্রহাচার্য কিনু ভটচাজ দূরসম্পর্কে আমার সম্বন্ধী, তার কাছে কন্যার কুষ্ঠি দেখা গেল— লক্ষণ ঠিকটি মিলেছে। এই নিয়ে শহরের মেয়ের কুষ্ঠি ঘাঁটতে বাকি রাখি নি— এমন কুষ্ঠি আর-একটিও হাতে পড়ল না। এই দেখে নেবেন, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এ সম্বন্ধ হয়েই গেছে, এ প্রজাপতির নির্বন্ধ।

ঠিক এই সময়ে কুমুর আবার বাঁ চোখ নাচল। শুভলক্ষণের কী অপূর্ব রহস্য ! কিনু আচার্যি কতবার তার হাত দেখে বলেছে, রাজরানী হবে সে। করকোষ্ঠির সেই পরিণত ফলটা আপনি যেচে আজ তার কাছে উপস্থিত। ওদের গ্রহাচার্য এই কদিন হল বার্ষিক আদায় করতে কলকাতায় এসেছিল ; সে বলে গেছে, এবার আষাঢ় মাস থেকে বৃষরাশির রাজসম্মান, স্ত্রীলোকঘটিত অর্থলাভ, শত্রুনাশ ; মন্দের মধ্যে পত্নীপীড়া, এমন-কি হয়তো পত্নীবিয়োগ। বিপ্রদাসের বৃষরাশি। মাঝে মাঝে দৈহিক পীড়ার কথা আছে। তারও প্রমাণ হাতে হাতে, কাল রাত থেকে স্পষ্টই সর্দির লক্ষণ। আষাঢ় মাসও পড়ল— পত্নীর পীড়া ও মৃত্যুর কথাটা ভাববার আশু প্রয়োজন নেই, অতএব এবার সময় ভালো।

কুমু দাদার পাশে বসে বললে, "দাদা মাথা ধরেছে কি ?"

দাদা বললে, "না।"

"চা তো ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি ? তোমার ঘরে লোক দেখে ঢুকতে পারলুম না।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা সবচেয়ে অসহ্য, যখন সে সোনার রথ আনে যার চাকা অচল। দাদার মুখভাবে এই দ্বিধার বেদনা কুমুকে ব্যথা দিলে। দৈবের দানকে কেন দাদা এমন করে সন্দেহ করছেন ? বিবাহ-ব্যাপারে নিজের পছন্দ বলে যে একটা উপসর্গ আছে এ চিন্তা কখনও কুমুদিনীর মাথায় আসে নি। শিশুকাল থেকে পরে পরে সে তার চার দিদির বিয়ে দেখেছে। কুলীনের ঘরে বিয়ে—কুল ছাড়া আর বিশেষ কিছু পছন্দর বিষয় ছিল তাও নয়। ছেলেপুলে নিয়ে তবু তারা সংসার করছে, দিন কেটে যাচ্ছে। যখন দুঃখ পায় বিদ্রোহ করে না ; মনে ভাবতেও পারে না যে কিছুতেই এটা ছাড়া আর কিছুই হতে পারত। মা কি ছেলে বেছে নেয় ? ছেলেকে মেনে নেয়। কুপুত্রও হয় সুপুত্রও হয়। স্বামীও তেমনি। বিধাতা তো দোকান খোলেন নি। ভাগ্যের উপর বিচার চলবে কার ?

এতদিন পরে কুমুর মন্দভাগ্যের তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে এল রাজপুত্র ছদ্মবেশে।

রথচক্রের শব্দ কুমু তার হৃৎস্পন্দনের মধ্যে ওই-যে শুনতে পাচ্ছে। বাইরের ছদ্মবেশটা সে যাচাই করে দেখতেই চায় না।

তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়েই সে পাঁজি খুলে দেখলে, আজ মনোরথ-দ্বিতীয়া। বাড়িতে কর্মচারীদের মধ্যে যে-কয়জন ব্রাহ্মণ আছে সন্ধ্যাবেলা ডাকিয়ে তাদের ফলার করালে, দক্ষিণাও যথাসাধ্য কিছু দিলে। সবাই আশীর্বাদ করলে, রাজরানী হয়ে থাকো, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।

দ্বিতীয়বার বিপ্রদাসের বৈঠকখানায় ঘটকের আগমন। তুড়ি দিয়ে 'শিব শিব' বলে বৃদ্ধ উচ্চস্বরে হাই তুললে। এবারে অসম্মতি দিয়ে কথাটাকে শেষ করে দিতে বিপ্রদাসের সাহস হল না। ভাবলে এতবড়ো দায়িত্ব নিই কী করে? কেমন করে নিশ্চয় জানব কুমুর পক্ষে এ সম্বন্ধ সবচেয়ে ভালো নয়? পরশুদিন শেষকথা দেবে বলে ঘটককে বিদায় করে দিলে।

১১

সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘের ছায়ায় বৃষ্টির জলে নিবিড়। কুমুর আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই। এক পাশে ছোটো খাট, আলনায় গুটি দুয়েক পাকানো শাড়ি আর চাঁপা-রঙের গামছা। কোণে কাঁঠাল-কাঠের সিন্দুক, তার মধ্যে ওর ব্যবহারের কাপড়। খাটের নীচে সবুজ-রঙ-করা টিনের বাক্সে পান সাজবার সরঞ্জাম, আর একটা বাক্সে চুল বাঁধবার সামগ্রী। দেয়ালের খাঁজের মধ্যে কাঠের থাকে কিছু বই, দোয়াতকলম, চিঠির কাগজ, মায়ের হাতের পশমে-বোনা বাবার সর্বদা ব্যবহারের চটিজুতোজোড়া; শোবার খাটের শিয়রে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের পট। দেয়ালের কোণে ঠেসানো একটা এসরাজ।

ঘরে কুমু আলো জ্বালায় নি। কাঠের সিন্দুকের উপর বসে জানলার বাইরে চেয়ে আছে। সামনে ইঁটের কলেবরওআলা কলকাতা আদিম কালের বর্মকঠিন একটা অতিকায় জন্তুর মতো, জলধারার মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার গায়ে গায়ে আলোকশিখার বিন্দু। কুমুর মন তখন ছিল অদৃষ্টনিরূপিত তার ভাবীলোকের মধ্যে। সেখানকার ঘরবাড়ি-লোকজন সবই তার আপন আদর্শে গড়া। তারই মাঝখানে নিজের সতীলক্ষ্মী-রূপের প্রতিষ্ঠা— কত ভক্তি, কত পূজা, কত সেবা। তার নিজের মায়ের পুণ্যচরিতে এক জায়গায় একটা গভীর ক্ষত রয়ে গেছে। তিনি স্বামীর অপরাধে কিছুকালের জন্যেও ধৈর্য হারিয়েছিলেন। কুমু কখনও সে ভুল করবে না।

বিপ্রদাসের পায়ের শব্দ শুনে কুমু চমকে উঠল। দাদাকে দেখে বললে, "আলো জ্বেলে দেব কি?"

"না কুমু, দরকার নেই" বলে বিপ্রদাস সিন্দুকে তার পাশে এসে বসল। কুমু তাড়াতাড়ি মেজের উপর নেমে বসে আস্তে আস্তে তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

বিপ্রদাস স্নিগ্ধস্বরে বললে, "বৈঠকখানায় লোক এসেছিল, তাই তোকে ডেকে পাঠাই নি। এতক্ষণ একলা বসে ছিলি?"

কুমু লজ্জিত হয়ে বললে, "না, ক্ষেমাপিসি অনেকক্ষণ ছিলেন। কথাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে বললে, "বৈঠকখানায় কে এসেছিল, দাদা?"

"সেই কথাই তোকে বলতে এসেছি। এ বছর জষ্টি মাসে তুই আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়লি, তাই না?"

"হাঁ দাদা, তাতে দোষ হয়েছে কী?"

"দোষের কথা না। আজ নীলমণি ঘটক এসেছিল। লক্ষ্মী বোন, লজ্জা করিস নে। বাবা যখন ছিলেন, তোর বয়স দশ—বিয়ে প্রায় ঠিক হয়েছিল। হয়ে গেলে তোর মতের অপেক্ষা কেউ করত না। আজ তো আমি তা পারি নে। রাজা মধুসূদন ঘোষালের নাম নিশ্চয়ই শুনেছিস। বংশমর্যাদায় ওঁরা খাটো নন। কিন্তু বয়সে তোর সঙ্গে অনেক তফাত। আমি রাজি হতে পারি নি। এখন, তোর মুখের একটা কথা শুনলেই চুকিয়ে দিতে পারি। লজ্জা করিস নে কুমু।"

"না, লজ্জা করব না।" বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। "যাঁর কথা বলছ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েই গেছে।" এটা সেই ঘটকের কথার প্রতিধ্বনি—কখন কথাটা এর মনের গভীরতায় আটকা পড়ে গেছে।

বিপ্রদাস আশ্চর্য হয়ে বললে, "কেমন করে ঠিক হল?"

কুমু চুপ করে রইল।

বিপ্রদাস তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, "ছেলেমানুষি করিস নে, কুমু।"

কুমুদিনী বললে, "তুমি বুঝবে না দাদা, একটুও ছেলেমানুষি করছি নে।"

দাদার উপর তার অসীম ভক্তি। কিন্তু দাদা তো দৈববাণী মানে না, কুমুদিনী জানে এইখানেই দাদার দৃষ্টির ক্ষীণতা।

বিপ্রদাস বললে, "তুই তো তাঁকে দেখিস নি।"

"তা হোক, আমি যে ঠিক জেনেছি।"

বিপ্রদাস ভালো করেই জানে, এই জায়গাতেই ভাইবোনের মধ্যে অসীম প্রভেদ। কুমুর চিত্তের এই অন্ধকার মহলে ওর উপর দাদার একটুও দখল নেই। তবু বিপ্রদাস

আর একবার বললে, "দেখ্ কুমু, চিরজীবনের কথা, ফস্ করে একটা খেয়ালের মাথায় পণ করে বসিস নে।"

কুমু ব্যাকুল হয়ে বললে, "খেয়াল নয় দাদা, খেয়াল নয়। আমি তোমার এই পা ছুঁয়ে বলছি, আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।"

বিপ্রদাস চমকে উঠল। যেখানে কার্যকারণের যোগাযোগ নেই সেখানে তর্ক করবে কী নিয়ে? অমাবস্যার সঙ্গে কুস্তি করা চলে না। বিপ্রদাস বুঝেছে, কী একটা দৈব-সংকেত কুমু মনের মধ্যে বানিয়ে বসেছে। কথাটা সত্য। আজই সকালে ঠাকুরকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলেছিল, এই বেজোড় সংখ্যার ফুলে জোড় মিলিয়ে সব-শেষে যেটি বাকি থাকে তার রঙ যদি ঠাকুরের মতো নীল হয় তবে বুঝব তাঁরই ইচ্ছা। সব-শেষের ফুলটি হল নীল অপরাজিতা।

অদূরে মল্লিকদের বাড়িতে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠল। কুমু জোড়হাত করে প্রণাম করলে। বিপ্রদাস অনেকক্ষণ রইল বসে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; বৃষ্টিধারার বিরাম নেই।

১২

বিপ্রদাস আরও কয়েকবার কুমুদিনীকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলে। কুমু কথার জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে আঁচল খুঁটতে লাগল।

বিয়ের প্রস্তাব পাকা, কেবল একটা বিষয় নিয়ে দুই পক্ষে কিছু কথা-চালাচালি হল। বিয়েটা হবে কোথায়? বিপ্রদাসের ইচ্ছে কলকাতার বাড়িতে। মধুসূদনের একান্ত জেদ নুরনগরে। বরপক্ষের ইচ্ছেই বাহাল রইল।

আয়োজনের জন্যে কিছু আগে থাকতেই নুরনগরে আসতে হল। বৈশেখ-জষ্টির খরার পরে আষাঢ়ের বৃষ্টি নামলে মাটি যেমন দেখতে দেখতে সবুজ হয়ে আসে, কুমুদিনীর অন্তরে-বাহিরে তেমনি একটা নূতন প্রাণের রঙ লাগল। আপন মনগড়া মানুষের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ওকে অহরহ পুলকিত করে রাখে। শরৎকালের সোনার আলো ওর সঙ্গে চোখে চোখে কথা কইছে, কোন্ এক অনাদিকালের মনের কথা। শোবার ঘরের সামনের বারান্দায় কুমু মুড়ি ছড়িয়ে দেয়, পাখিরা এসে খায়; রুটির টুকরো রাখে, কাঠবিড়ালি চঞ্চল চোখে চারি দিকে চেয়ে দ্রুত ছুটে এসে লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়; সামনের দুই পায়ে রুটি তুলে ধরে কুটুর কুটুর করে খেতে থাকে। কুমুদিনী আড়াল থেকে আনন্দিত হয়ে বসে দেখে। বিশ্বের

প্রতি ওর অন্তর আজ দাক্ষিণ্যে ভরা। বিকেলে গা ধোবার সময় খিড়কির পুকুরে গলা ডুবিয়ে চুপ করে বসে থাকে, জল যেন ওর সর্বাঙ্গে আলাপ করে। বিকেলের বাঁকা আলো পুকুরের পশ্চিম-ধারের বাতাবি-লেবু গাছের শাখার উপর দিয়ে এসে ঘন কালো জলের উপরে নিকষে সোনার রেখার মতো ঝিকিমিকি করতে থাকে; ও চেয়ে চেয়ে দেখে, সেই আলোয় ছায়ায় ওর সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে অনির্বচনীয় পুলকের কাঁপন বয়ে যায়। মধ্যাহ্নে বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় একলা গিয়ে বসে থাকে, পাশের জামগাছ থেকে ঘুঘুর ডাক কানে আসে। ওর যৌবন-মন্দিরে আজ যে দেবতার বরণ হচ্ছে ভাবঘন রসের রূপটি তার, কৃষ্ণরাধিকার যুগলরূপের মাধুর্য তার সঙ্গে মিশেছে। বাড়ির ছাদের উপরে এসরাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে বাজায়, ওর দাদার সেই ভূপালী সুরের গানটি:

আজু মোর ঘরে আইল পিয়রওয়া
রোমে রোমে হরখীলা।

রাত্রে বিছানায় বসে প্রণাম করে, সকালে উঠে বিছানায় বসে আবার প্রণাম করে। কাকে করে সেটা স্পষ্ট নয়— একটি নিরবলম্ব ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

কিন্তু মনগড়া প্রতিমার মন্দিরদ্বার চিরদিন তো রুদ্ধ থাকতে পারে না। কানাকানির নিশ্বাসের তাপে ও বেগে সে মূর্তির সুষমা যখন ঘা খেতে আরম্ভ করে তখন দেবতার রূপ টিঁকবে কী করে? তখন ভক্তের বড়ো দুঃখের দিন।

একদিন তেলেনিপাড়ার বুড়ি তিনকড়ি এসে কুমুদিনীর মুখের সামনেই বলে বসল, "হ্যাঁ গা, আমাদের কুমুর কপালে কেমন রাজা জুটল? ওই-যে বেদেনীদের গান আছে—

এক-যে ছিল কুকুর-চাটা শেয়ালকাঁটার বন,
কেটে করলে সিংহাসন।

এ'ও সেই শেয়ালকাঁটা-বনের রাজা। ওই তো রজবপুরের আন্দো মুহুরির ছেলে মেধো। দেশে যে বার আকাল, মগের মুলুক থেকে চাল আনিয়ে বেচে ওর টাকা। তবু বুড়ি মাকে শেষদিন পর্যন্ত রাঁধিয়ে রাঁধিয়ে হাড় কালি করিয়েছে।"

মেয়েরা উৎসুক হয়ে তিনকড়িকে ধরে বসে; বলে, "বরকে জানতে নাকি?"

"জানতুম না? ওর মা যে আমাদের পাড়ার মেয়ে, পুরুত চক্রবর্তীদের ঘরের। (গলা নিচু করে) সত্যি কথা বলি বাছা, ভালো বামুনের ঘরে ওদের বিয়ে চলে না। তা হোক গে, লক্ষ্মী তো জাতবিচার করেন না।"

পূর্বেই বলেছি, কুমুদিনীর মন একালের ছাঁচে নয়। জাতকুলের পবিত্রতা তার কাছে খুব একটা বাস্তব জিনিস। মনটা তাই যতই সংকুচিত হয়ে ওঠে ততই

যারা নিন্দে করে তাদের উপর রাগ করে ; ঘর থেকে হঠাৎ কেঁদে উঠে ছুটে বাইরে চলে যায়। সবাই গা-টেপাটেপি করে বলে, "ইস্‌, এখনই এত দরদ! এ যে দেখি দক্ষযজ্ঞের সতীকেও ছাড়িয়ে গেল।"

বিপ্রদাসের মনের গতি হাল-আমলের, তবু জাতকুলের হীনতায় তাকে কাবু করে। তাই, গুজবটা চাপা দেবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু ছেঁড়া বালিশে চাপ দিলে তার তুলো যেমন আরও বেশি বেরিয়ে পড়ে, তেমনি হল।

এ দিকে বুড়ো প্রজা দামোদর বিশ্বাসের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, বহুপূর্বে ঘোষালেরা নুরনগরের পাশের গ্রাম শেয়াকুলির মালেক ছিল। এখন সেটা চাটুজ্যেদের দখলে। ঠাকুর-বিসর্জনের মামলায় কী করে সবসুদ্ধ ঘোষালদেরও বিসর্জন ঘটেছিল, কী কৌশলে কর্তাবাবুরা, শুধু দেশছাড়া নয়, তাদের সমাজছাড়া করেছিলেন, তার বিবরণ বলতে বলতে দামোদরের মুখ ভক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঘোষালেরা এককালে ধনে মানে কুলে চাটুজ্যেদের সমকক্ষ ছিলেন এটা সুখবর, কিন্তু বিপ্রদাসের মনে ভয় লাগল যে, এই বিয়েটাও সেই পুরাতন মামলার একটা জের নাকি ?

১৩

অঘ্রান মাসে বিয়ে। পঁচিশে আশ্বিন লক্ষ্মীপুজো হয়ে গেল। হঠাৎ সাতাশে আশ্বিনে তাঁবু ও নানাপ্রকার সাজসরঞ্জাম নিয়ে ঘোষাল-কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ওভারসিয়র এসে উপস্থিত, সঙ্গে একদল পশ্চিমি মজুর। ব্যাপারখানা কী ? শেয়াকুলিতে ঘোষালদিঘির ধারে তাঁবু গেড়ে বর ও বরযাত্রীরা কিছুদিন আগে থাকতেই সেখানে এসে উঠবেন।

এ কী রকম কথা ? বিপ্রদাস বললে, "তাঁরা যতজন খুশি আসুন, যতদিন খুশি থাকুন, আমরাই বন্দোবস্ত করে দেব। তাঁবুর দরকার কী ? আমাদের স্বতন্ত্র বাড়ি আছে, সেটা খালি করে দিচ্ছি।"

ওভারসিয়র বললে, "রাজাবাহাদুরের হুকুম। দিঘির চারি ধারের বনজঙ্গলও সাফ করে দিতে বলেছেন— আপনি জমিদার, অনুমতি চাই।"

বিপ্রদাস মুখ লাল করে বললে, "এটা কি উচিত হচ্ছে ? জঙ্গল তো আমরাই সাফ করে দিতে পারি।"

ওভারসিয়র বিনীতভাবে উত্তর করলে, "ওইখানেই রাজাবাহাদুরের পূর্বপুরুষের ভিটেবাড়ি, তাই শখ হয়েছে নিজেই ওটা পরিষ্কার করে নেবেন।"

কথাটা নিতান্ত অসংগত নয়, কিন্তু আত্মীয়স্বজনেরা খুঁত খুঁত করতে লাগল। প্রজারা বলে, এটা আমাদের কর্তাবাবুদের উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা। হঠাৎ তবিল ফেঁপে উঠেছে, সেটা ঢাকা দিতে পারছে না; সেটাকে জয়ঢাক করে তোলবার জন্যেই না এই কাণ্ড? সাবেক আমল হলে বরসুদ্ধ বরসজ্জা বৈতরণী পার করতে দেরি হত না। ছোটোবাবু থাকলে তিনিও সইতেন না, দেখা যেত ওই বাবুগুলো আর তাঁবু-গুলো থাকত কোথায়।

প্রজারা এসে বিপ্রদাসকে বললে, "হুজুর, ওদের কাছে হটতে পারব না। যা খরচ লাগে আমরাই দেব।"

ছয়-আনার কর্তা নবগোপাল এসে বললে, "বংশের অমর্যাদা সওয়া যায় না। একদিন আমাদের কর্তারা ওই ঘোষালদের হাড়ে হাড়ে ঠকাঠকি লাগিয়েছেন, আজ তারা আমাদেরই এলাকার উপর চড়াও হয়ে টাকার ঝলক মারতে এসেছে! ভয় নেই দাদা, খরচ যা লাগে আমরাও আছি। বিষয় ভাগ হোক, বংশের মান তো ভাগ হয়ে যায় নি।"

এই বলে নবগোপালই ঠেলেঠুলে কর্মকর্তা হয়ে বসল।

বিপ্রদাস কয়দিন কুমুর কাছে যেতে পারে নি। তার মুখের দিকে তাকাবে কী করে? কুমুর কাছে বরপক্ষের স্পর্ধার কথা কেউ যে গলা খাটো করে বলবে সমাজে সে দয়া বা ভদ্রতা নেই। তারই কাছে সবাই বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলে। মেয়েদের রাগ তারই 'পরে। ওরই জন্যে পূর্বপুরুষের মাথা যে হেঁট হল। রাজরানী হতে চলেছেন! কী যে রাজার ছিরি!

জাতকুলের কথাটাকে কুমু তার ভক্তি দিয়ে চাপা দিয়েছিল। কিন্তু ধনের বড়াই করে শ্বশুরকুলকে খাটো করার নীচতা দেখে তার মন বিষাদে ভরে উঠল। কেবলই লোকের কাছ থেকে সে পালিয়ে বেড়ায়। ঘোষালদের লজ্জায় আজ যে ওরই লজ্জা। দাদার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্‌ করছে। কিন্তু দাদার দেখা নেই, অন্দরমহলে খেতেও আসে না।

একদিন বিপ্রদাস অন্তঃপুরের বাগানে ভিয়েনঘরের জন্যে চালা বাঁধবার জায়গা ঠিক করতে গিয়ে হঠাৎ খিড়কির পুকুরের ঘাটে দেখে, কুমু নীচের পৈঁঠের উপর বসে মাথা হেঁট করে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। দাদাকে দেখে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এল। এসেই রুদ্ধস্বরে বললে, "দাদা, কিছুই বুঝতে পারছি নে।" বলেই মুখে কাপড় দিয়ে কেঁদে উঠল।

দাদা ধীরে ধীরে পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, "লোকের কথায় কান দিস নে বোন।"

"কিন্তু ওঁরা এ-সব কী করছেন? এতে কি তোমাদের মান থাকবে?"

"ওদের দিকটাও ভেবে দেখিস। পূর্বপুরুষদের জন্মস্থানে আসছে, ধুমধাম করবে না? বিয়ের ব্যাপার থেকে এটাকে স্বতন্ত্র করে দেখিস।"

কুমু চুপ করে রইল। বিপ্রদাস থাকতে পারলে না, মরিয়া হয়ে বললে, "তোর মনে যদি একটুও খটকা থাকে বিয়ে এখনও ভেঙে দিতে পারি।"

কুমুদিনী সবেগে মাথা নেড়ে বললে, "ছি ছি, সে কি হয়?"

অন্তর্যামীর সামনে সত্যগ্রন্থিতে তো গাঁঠ পড়ে গেছে। বাকি যেটুকু সে তো বাইরের।

বিপ্রদাসের একেলে মন এতটা নিষ্ঠায় অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে বললে, "দুই পক্ষের সততায় তবেই বিবাহবন্ধন সত্য। সুরে-বাঁধা এসরাজের কোনো মানেই থাকে না যদি বাজাবার হাতটা হয় বেসুরো। পুরাণে দেখ্ না, যেমন সীতা তেমনি রাম, যেমন মহাদেব তেমনি সতী, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠও তেমনি। হাল-আমলের বাবুদের নিজেদের মধ্যে নেই পুণ্য, তাই একতরফা সতীত্ব প্রচার করেন। তাঁদের তরফে তেল জোটে না, সলতেকে বলেন জ্বলতে— শুকনো প্রাণে জ্বলতে জ্বলতেই ওরা গেল ছাই হয়ে।"

কুমুকে বলা মিথ্যে। এখন থেকে ও মনে মনে জোরের সঙ্গে জপতে লাগল, তিনি ভালোই হন, মন্দই হন, তিনি আমার পরম গতি।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ—

শুধু যতিধর্মের নয়, সতীধর্মেরও এই লক্ষণ। সে ধর্ম সুখদুঃখের অতীত— তাতে ক্রোধ নেই, ভয় নেই। আর অনুরাগ? তারই বা অত্যাবশ্যকতা কিসের? অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তারও বড়ো। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন আছে। সতীধর্ম নির্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল। মধুসূদন-ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী-নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।

১৪

ঘোষালদিঘির ধারে জঙ্গল সাফ হয়ে গেল— চেনা যায় না। জমি নিখুঁতভাবে সমতল, মাঝে মাঝে সুরকি দিয়ে রাঙানো রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে আলো দেবার থাম। দিঘির পানা সব তোলা হয়েছে। ঘাটের কাছে তকতকে নতুন

বিলিতি পাল-খেলাবার দুটি নৌকো, তাদের একটির গায়ে লেখা 'মধুমতী', আর-একটির গায়ে 'মধুকরী'। যে তাঁবুতে রাজাবাহাদুর স্বয়ং থাকবেন তার সামনে ফ্রেমে হলদে বনাতের উপর লাল রেশমে বোনা 'মধুচক্র'। একটা তাঁবু অন্তঃপুরের, সেখান থেকে জল পর্যন্ত চাটাই দিয়ে ঘেরা ঘাট। ঘাটের উপরেই মস্ত নিমগাছের গায়ে কাঠের ফলকে লেখা, 'মধুসাগর'। খানিকটা জমিতে নানা আকারের চানকায় সূর্যমুখী রজনীগন্ধা, গাঁদা দোপাটি, ক্যানা ও পাতাবাহার, কাঠের চৌকো বাক্সে নানা রঙের বিলিতি ফুল। মাঝে একটি ছোটো বাঁধানো জলাশয়, তারই মধ্যে লোহার ঢালাই-করা নগ্ন স্ত্রীমূর্তি, মুখে শাঁখ তুলে ধরেছে, তার থেকে ফোয়ারার জল বেরোবে। এই জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে 'মধুকুঞ্জ'। প্রবেশপথে কারুকাজ-করা লোহার গেট, উপরে নিশান উড়ছে— নিশানে লেখা 'মধুপুরী'। চারি দিকেই 'মধু' নামের ছাপ। নানা রঙের কাপড়ে কানাতে চাঁদোয়ায় নিশানে রঙিন ফুলে চীনালণ্ঠনে হঠাৎ-তৈরি এই মায়াপুরী দেখবার জন্যে দূর থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। এ দিকে ঝক্‌ঝকে চাপরাস-ঝোলানো, হলদের উপর লাল পাড় দেওয়া পাগড়ি-বাঁধা, জরির ফিতে-দেওয়া লাল বনাতের উর্দিপরা চাপরাসির দল বিলিতি জুতো মস্‌মসিয়ে বেড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে, দিনরাত প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজায়, তাদের কারও কারও চামড়ার কোমরবন্ধে ঝোলানো বিলিতি তলোয়ারটা জমিদারের মাটিকে পায়ে পায়ে খোঁচা দিতে থাকে। চাটুজ্যেদের সাবেক কালের জীর্ণসাজপরা বরকন্দাজেরা লজ্জায় ঘর হতে বার হতে চায় না। কাণ্ড দেখে চাটুজ্যে-পরিবারের গায়ে জ্বালা ধরল। নুরনগরের পাঁজরটার মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে শেলদণ্ডের উপর আজ ঘোষালদের জয়পতাকা উড়েছে।

শুভপরিণয়ের এই সূচনা।

১৫

বিপ্রদাস নবগোপালকে ডেকে বললে, "নবু, আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা— ওটা ইতরের কাজ।"

নবগোপাল বললে, "চতুর্মুখ তাঁর পা ঝাড়া দিয়েই বেশি মানুষ গড়েছেন; চারটে মুখ কেবল বড়ো বড়ো কথা বলবার জন্যেই। সাড়ে পনেরো আনা লোক যে ইতর, তাদের কাছে সম্মান রাখতে হলে ইতরের রাস্তাই ধরতে হয়।"

বিপ্রদাস বললে, "তাতেও তুমি পেরে উঠবে না। তার চেয়ে সাত্ত্বিকভাবে কাজ

করি, সে দেখাবে ভালো। উপযুক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনিয়ে আমাদের সামবেদের মতে বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান পালন করব। ওরা রাজা হয়েছে করুক আড়ম্বর ; আমরা ব্রাহ্মণ, পুণ্যকর্ম আমাদের।"

নবগোপাল বললে, "দাদা, পাঁজি ভুলেছ, এটা সত্যযুগ নয়। জলের নৌকো চালাতে চাও পাঁকের উপর দিয়ে! তোমার প্রজারা আছে— তিনু সরকার আছে তোমার তালুকদার— ভানু পরামানিক, কমরদ্দি বিশ্বেস, পাঁচু মণ্ডল— এরা কি তোমার ওই কাঁচকলাভাতে হবিষ্যি-করা বামনাইয়ের এক অক্ষর মানে বুঝবে? এরা কি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রপৌত্র? এদের যে বুক ফেটে যাবে। তুমি চুপ করে থাকো, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।"

নবগোপাল প্রজাদের সঙ্গে মিলে উঠে-পড়ে লাগল। সবাই বুক ঠুকে বললে, টাকার জন্যে ভাবনা কী? আমলা ফয়লা পাইক বরকন্দাজ সবারই গায়ে চড়ল নতুন লাল বনাতের চাদর, রঙিন ধুতি। সালুতে-মোড়া ঝালর-ঝোলানো নিশেন-ওড়ানো এক নহবতখানা উঠল, সাত ক্রোশ তফাত থেকে তার চুড়ো দেখা যায়। দুই শরিকে মিলে তাদের চার-চার হাতি বের করলে, সাজ চড়ল তাদের পিঠে, যখন-তখন বিনা কারণে ঘোষালদিঘির সামনের রাস্তায় শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে তারা টহলিয়ে বেড়ায়, গলায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে। আর যাই হোক, পাটের বস্তা থেকে হাতি বের হয় না, এই বলে সকলেই দুই পা চাপড়ে হো হো করে হেসে নিলে।

অঘ্রানের সাতাশে পড়েছে বিয়ের দিন ; এখনও দিনদশেক বাকি। এমন সময় লোকমুখে জানা গেল, রাজা আসছে দলবল নিয়ে। ভাবনা পড়ে গেল, কর্তব্য কী। মধুসূদন এদের কাছে কোনো খবর দেয় নি। বুঝি মনে করেছে ভদ্রতা সাধারণ লোকের, অভদ্রতাই রাজোচিত। এমন অবস্থায় নিজেরা গায়ে পড়ে স্টেশন থেকে ওদের এগিয়ে আনতে যাওয়া কি সংগত হবে? খবর না-দেওয়ার উচিত জবাব হচ্ছে খবর না-নেওয়া।

সবই সত্য, কিন্তু যুক্তির দ্বারা সংসারে দুঃখ ঠেকানো যায় না। কুমুর প্রতি বিপ্রদাসের গভীর স্নেহ ; পাছে তাকে কিছুতে আঘাত করে এ কথাটা সকল তর্ক ছাড়িয়ে যায়। মেয়েদের পীড়ন করা এতই সহজ ; তাদের মর্মস্থান চার দিকেই অনাবৃত। জবরদস্তের হাতেই সমাজ চাবুক জুগিয়েছে ; আর যারা বর্মহীন তাদের স্পর্শকাতর পিঠের দিকে কোনো বিধিবিধান নজর করে না। এমন অবস্থায় স্নেহের ধনকে রোষ-বিদ্বেষ-ঈর্ষার তুফানে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের অভিমান বাঁচাবার চেষ্টা করা কাপুরুষতা, বিপ্রদাসের মনের এই ভাব।

বিপ্রদাস কাউকে না জানিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গেল স্টেশনে। গাড়ি এসে পৌঁছোল, তখন বেলা পাঁচটা। সেলুন-গাড়ি থেকে রাজা নামল দলবল নিয়ে। বিপ্রদাসকে দেখে শুষ্ক সংক্ষিপ্ত নমস্কার করে বললে, "এ কী, আপনি কেন কষ্ট করে ?"

বিপ্রদাস। বিলক্ষণ! এই প্রথম আসা আমার দেশে, অভ্যর্থনা করে নেব না ?

রাজা। ভুল করছেন। আপনার দেশে এখনও আসি নি। সে হবে বিয়ের দিনে।

বিপ্রদাস কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে তর্ক করবার জায়গা নয়— তাই কেবল বললে, "ঘাটে বজরা তৈরি।"

রাজা বললে, "দরকার হবে না, আমাদের স্টীমলঞ্চ এসেছে।"

বিপ্রদাস বুঝলে সুবিধে নয়। তবু আর-একবার বললে, "খাওয়া-দাওয়ার জিনিস-পত্র, রসুয়ের নৌকো সমস্তই প্রস্তুত।"

"কেন এত উৎপাত করলেন! কিছুই দরকার হবে না। দেখুন, একটা কথা মনে রাখবেন, এসেছি আমার পূর্বপুরুষদের জন্মভূমিতে— আপনাদের দেশে না। বিয়ের দিনে সেখানে যাবার কথা।"

বিপ্রদাস বুঝলে কিছুতেই নরম হবার আশা নেই। বুকের ভিতরটা দমে গেল। স্টেশনের বসবার ঘরে কেদারায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। শীতের সন্ধ্যা, অন্ধকার হয়ে এসেছে। উত্তর থেকে গাড়ি আসবার জন্যে ঘণ্টা পড়ল, স্টেশনে আলো জ্বলল— লাগাম ছেড়ে ঘোড়াকে নিজের মরজিমত চলতে দিয়ে বিপ্রদাস যখন বাড়ি ফিরলে তখন যথেষ্ট রাত। কোথায় গিয়েছিল, কী ঘটেছিল, কাউকে কিছুই বললে না।

সেইদিন রাত্রে ওর ঠাণ্ডা লেগে কাশি আরম্ভ হল। ক্রমেই চলল বেড়ে। উপেক্ষা করতে গিয়ে ব্যামোটাকে আরও উস্‌কে তুললে। শেষকালে কুমু ওকে অনেক ধরে কয়ে এনে বিছানায় শোওয়ায়। অনুষ্ঠানের সমস্ত ভারই পড়ল নবগোপালের উপর।

১৬

দু-দিন পরেই নবগোপাল এসে বললে, "কী করি একটা পরামর্শ দাও।"

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ? কী হয়েছে ?"

"সঙ্গে গোটাকতক সাহেব— দালাল হবে, কিম্বা মদের দোকানের বিলিতি শুঁড়ি— কাল পীরপুরের চরের থেকে কিছু না হবে তো দু শো কাদাখোঁচা পাখি মেরে নিয়ে উপস্থিত। আজ চলেছে চন্দনদহের বিলে। এই শীতের সময় সেখানে হাঁসের

মরস্থম— রাক্ষুসে ওজনের জীবহত্যা হবে— অহিরাবণ মহীরাবণ হিড়িম্বা ঘটোৎকচ ইস্তিক কুম্ভকর্ণের পর্যন্ত পিণ্ডি দেবার উপযুক্ত, প্রেতলোকে দশমুণ্ড রাবণের চোয়াল ধরে যাবার মতো।"

বিপ্রদাস স্তম্ভিত হয়ে রইল, কিছু বললে না।

নবগোপাল বললে, "তোমারই হুকুম ওই বিলে কেউ শিকার করতে পাবে না। সেবার জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত ঠেকিয়েছিলে— আমরা তো ভয় করেছিলুম তোমাকেও পাছে সে রাজহাঁস ভুল করে গুলি করে বসে। লোকটা ছিল ভদ্র, চলে গেল। কিন্তু এরা গো-মৃগ-দ্বিজ কাউকে মানবার মতো মানুষ নয়। তবু যদি বল তো একবার না হয়—"

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে বললে, "না না, কিছু বোলো না।"

বিপ্রদাস বাঘ-শিকারে জেলার মধ্যে সব-সেরা। কোনো একবার পাখি মেরে তার এমন ধিক্‌কার হয়েছিল যে, সেই অবধি নিজের এলাকায় পাখি মারা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে।

শিয়রের কাছে কুমু বসে বিপ্রদাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। নবগোপাল চলে গেলে সে মুখ শক্ত করে বললে, "দাদা, বারণ করে পাঠাও।"

"কী বারণ করব ?"

"পাখি মারতে।"

"ওরা ভুল বুঝবে কুমু, সইবে না।"

"তা বুঝুক ভুল। মান-অপমান শুধু ওদের একলার নয়।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসলে। সে জানে কঠিন নিষ্ঠার সঙ্গে কুমু মনে মনে সতীধর্ম অনুশীলন করছে। ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা। সামান্য পাখির প্রাণ নিয়ে কায়ার সঙ্গে ছায়ার পথভেদ ঘটবে না কি ?

বিপ্রদাস স্নেহের স্বরে বললে, "রাগ করিস নে কুমু, আমিও একদিন পাখি মেরেছি। তখন অন্যায় বলে বুঝতেই পারি নি। এদেরও সেই দশা।"

অক্লান্ত উৎসাহের সঙ্গে চলল শিকার, পিকনিক, এবং সন্ধেবেলায় ব্যাণ্ডের সংগীত-সহযোগে ইংরেজ অভ্যাগতদের নাচ। বিকালে টেনিস ; তা ছাড়া দিঘির নৌকোর 'পরে তিন-চার পর্দা তুলে দিয়ে বাজি রেখে পালের খেলা ; তাই দেখতে গ্রামের লোকেরা দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে যায়। রাত্রে ডিনারের পরে চীৎকার চলে, 'ফর হী ইজ এ জলি গুড ফেলো।' এই-সব বিলাসের প্রধান নায়কনায়িকা সাহেব-মেম, তাতেই গাঁয়ের লোকের চমক লাগে। এরা যে সোলার টুপি মাথায় ছিপ ফেলে

মাছ ধরে, সেও বড়ো অপরূপ দৃশ্য। অন্য পক্ষে লাঠিখেলা কুস্তি নৌকোবাচ যাত্রা শখের থিয়েটার এবং চারটে হাতির সমাবেশ এর কাছে লাগে কোথায় ?

বিবাহের দুদিন আগে গায়ে-হলুদ। দামি গহনা থেকে আরম্ভ করে খেলার পুতুল পর্যন্ত সওগাত যা বরের বাসা থেকে এল তার ঘটা দেখে সকলে অবাক। তার বাহনই বা কত! চাটুজ্যেরা খুব দরাজ হাতেই তাদের বিদায় করলে।

অবশেষে জনসাধারণকে খাওয়ানো নিয়ে বৈবাহিক কুরুক্ষেত্রের দ্রোণপর্ব শুরু হল।

সেদিন ঢোল পিটিয়ে সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ মধুসাগরের তীরে মধুপুরীতে। রবাহূত অনাহূত কারও বাদ নেই। নবগোপাল রেগে আগুন। এ কী আস্পর্ধা! আমরা হলুম জমিদার, এর মধ্যে উনি ওঁর মধুপুরী খাড়া করেন কোথা থেকে ?

এ দিকে ভোজের আয়োজনটা খুব ব্যাপকরূপেই সকলের কাছে প্রকাশমান হয়ে উঠল। সামান্য ফলার নয়। মাছ দই ক্ষীর সন্দেশ ঘি ময়দা চিনি খুব শোরগোল করে আমদানি। গাছতলায় মস্ত মস্ত উনন পাতা ; রান্নার জন্যে নানা আয়তনের হাঁড়ি হাঁড়া মালসা কলসী জালা ; সারবন্দি গোরুর গাড়িতে এল আলু বেগুন কাঁচ-কলা শাকসব্‌জি। আহারটা হবে সন্ধের সময় বাঁধা রোশনাইয়ের আলোয়।

এ দিকে চাটুজ্যেদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন। দলে দলে প্রজারা মিলে নিজেরাই আয়োজন করেছে। হিন্দুদের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জায়গা। মুসলমান প্রজার সংখ্যাই বেশি— রাত না পোয়াতেই তারা নিজেরাই রান্না চড়িয়েছে। আহারের উপকরণ যত না হোক, ঘন ঘন চাটুজ্যেদের জয়ধ্বনি উঠছে তার চতুর্গুণ। স্বয়ং নবগোপালবাবু বেলা প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় বসে থেকে সকলকে খাওয়ালেন। তার পরে হল কাঙালিবিদায়। মাতব্বর প্রজারা নিজেরাই দানবিতরণের ব্যবস্থা করলে। কলধ্বনিতে জয়ধ্বনিতে বাতাসে চলল সমুদ্রমন্থন।

মধুপুরীতে সমস্তদিন রান্না বসেছে। গন্ধে বহুদূর পর্যন্ত আমোদিত। খুরি ভাঁড় কলাপাতা হয়েছে পর্বতপ্রমাণ। তরকারি ও মাছ কোটার আবর্জনা নিয়ে কাকেদের কলরবের বিরাম নেই— রাজ্যের কুকুরগুলোও পরস্পর কামড়াকামড়ি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েছে। সময় হয়ে এল, রোশনাই জ্বলছে, মেটিয়াবুরুজের রোশন-চৌকি ইমনকল্যাণ থেকে কেদারা পর্যন্ত বাজিয়ে চলল। অনুচরপরিচরেরা থেকে থেকে উদ্বিগ্নমুখে রাজাবাহাদুরের কানের কাছে ফিস্‌ ফিস্‌ করে জানাচ্ছে এখনও খাবার লোক যথেষ্ট এল না। আজ হাটের দিন, ভিন্ন এলেকা থেকে যারা হাট করতে এসেছে তাদের কেউ কেউ পাত-পাড়া দেখে বসে গেছে। কাঙাল-ভিক্ষুকও সামান্য কয়েকজন আছে।

মধুসূদন নির্জন তাঁবুর ভিতর ঢুকে মুখ অন্ধকার করে একটা চাপা হুংকার দিলে—"হুঁ।"

ছোটো ভাই রাধু এসে বললে, "দাদা, আর কেন ? চলো।"

"কোথায় ?"

"ফিরে যাই কলকাতায়। এরা সব বদমাইশি করছে। এদের চেয়ে বড়ো বড়ো ঘরের পাত্রী তোমার কড়ে আঙুল নাড়ার অপেক্ষায় বসে। একবার তু করলেই হয়।"

মধুসূদন গর্জন করে উঠে বললে, "যা চলে।"

এক শো বছর পূর্বে যেমন ঘটেছিল আজও তাই। এবারেও এক পক্ষের আড়ম্বরের চুড়োটা অন্য পক্ষের চেয়ে অনেক উঁচু করেই গড়া হয়েছিল, অন্যপক্ষ তা রাস্তা পার হতে দিলে না। কিন্তু আসল হারজিত বাইরে থেকে দেখা যায় না। তার ক্ষেত্রটা লোকচক্ষুর অগোচরে।

চাটুজ্যেদের প্রজারা খুব হেসে নিলে। বিপ্রদাস রোগশয্যায় ; তার কানে কিছুই পৌঁছোল না।

১৭

বিয়ের দিন রাজার হুকুম, কনের বাড়ি যাবার পথে ধুমধাম একেবারেই বন্ধ। আলো জ্বলল না, বাজনা বাজল না, সঙ্গে কেবল নিজেদের পুরোহিত, আর দুইজন ভাট। পালকিতে করে নিঃশব্দে বিয়েবাড়িতে বর এল, লোকে হঠাৎ বুঝতেই পারলে না। ও দিকে মধুপুরীর তাঁবুতে আলো জালিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিপরীত হৈ হৈ শব্দে বরযাত্রীর দল আহারে আমোদে প্রবৃত্ত। নবগোপাল বুঝলে এটা হল পালটা জবাব। এমন স্থলে কন্যাপক্ষ হাতে পায়ে ধরে বরপক্ষের সাধ্যসাধনা করে ; নবগোপাল তার কিছুই করলে না। একবার জিজ্ঞাসাও করলে না, বরযাত্রীদের হল কী।

কুমুদিনী সাজসজ্জা করে বিবাহ-আসরে যাবার আগে দাদাকে প্রণাম করতে এল ; তার সর্বশরীর কাঁপছে। বিপ্রদাসের তখন এক শো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর, বুকে পিঠে রাইসরষের পলস্তারা ; কুমুদিনী তার পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ক্ষেমাপিসি মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, "ছি ছি, অমন করে কাঁদতে নেই।"

বিপ্রদাস একটু উঠে বসে ওকে হাত ধরে পাশে বসিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল— দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্ষেমাপিসি বললে, "সময় হল যে।"

বিপ্রদাস কুমুর মাথায় হাত দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "সর্বশুভদাতা কল্যাণ করুন।" বলেই ধপ্‌ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বিবাহের সমস্তক্ষণ কুমুর দু চোখ দিয়ে কেবল জল পড়েছে। বরের হাতে যখন হাত দিলে সে হাত ঠাণ্ডা হিম, আর থরথর করে কাঁপছে। শুভদৃষ্টির সময় সে কি স্বামীর মুখ দেখেছে? হয়তো দেখে নি। এদের ব্যবহারে সবসুদ্ধ জড়িয়ে স্বামীর উপর ওর ভয় ধরে গেছে। পাখির মনে হচ্ছে তার জন্যে বাসা নেই, আছে ফাঁস।

মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন। কালো মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সে হচ্ছে পাখির চঞ্চুর মতো মস্ত বড়ো বাঁকা নাক, ঠোঁটের সামনে পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে যেন পাহারা দিচ্ছে। প্রশস্ত গড়ানে কপাল ঘন ভ্রূর উপর বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মতো স্ফীত। সেই ভ্রূর ছায়াতলে সংকীর্ণ তির্যক চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র। গোঁফদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারি। কড়া চুল কাফ্রিদের মতো কোঁকড়া, মাথার তেলো ঘেঁষে ছাঁটা। খুব আঁটসাঁট শরীর; যত বয়েস তার চেয়ে কম বোধ হয়, কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে। বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাগ্রভাবে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখলেই বোঝা যায়, বাজে কথা বাজে বিষয় বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই।

বিবাহটা এমন ভাবে হল যে, সকলেরই মনে খারাপ লাগল। বরপক্ষ-কন্যাপক্ষের প্রথম সংস্পর্শমাত্রই এমন একটা বেসুর ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল যে, তার মধ্যে উৎসবের সংগীত কোথায় গেল তলিয়ে। থেকে থেকে কুমুর মনের একটা প্রশ্ন অভিমানে বুক ঠেলে ঠেলে উঠছে, 'ঠাকুর কি তবে আমাকে ভোলালেন?' সংশয়কে প্রাণপণে চাঁপা দেয়, রুদ্ধঘরের মধ্যে একলা বসে বারবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে; বলে, মন যেন দুর্বল না হয়। সবচেয়ে কঠিন হয়েছে দাদার কাছে সংশয় লুকোনো।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে কুমুদিনীর সেবার 'পরেই বিপ্রদাসের একান্ত নির্ভর। কাপড়চোপড়, দিনখরচের টাকাকড়ি, বইয়ের আলমারি, ঘোড়ার দানা, বন্দুকের

সম্মার্জন, কুকুরের সেবা, ক্যামেরার রক্ষণ, সংগীতযন্ত্রের পর্যবেক্ষণ, শোবার বসবার ঘরের পারিপাট্যসাধন— সমস্ত কুমুর হাতে। এত বেশি অভ্যাস হয়ে এসেছে যে প্রাত্যহিক ব্যবহারে কুমুর হাত কোথাও না থাকলে তার রোচে না। সেই দাদার রোগশয্যায় বিদায়ের আগে শেষ কয়দিন যে সেবা করতে হয়েছে তার মধ্যে নিজের ভাবনার কোনো ছায়া না পড়ে এই তার দুঃসাধ্য চেষ্টা। কুমুর এসরাজের হাত নিয়ে বিপ্রদাসের ভারি গর্ব। লাজুক কুমু সহজে বাজাতে চায় না। এই দুদিন সে আপনি যেচে দাদাকে কানাড়া-মালকোষের আলাপ শুনিয়েছে। সেই আলাপের মধ্যেই ছিল তার দেবতার স্তব, তার প্রার্থনা, তার আশঙ্কা, তার আত্মনিবেদন। বিপ্রদাস চোখ বুজে চুপ করে শোনে আর মাঝে মাঝে ফরমাশ করে— সিন্ধু, বেহাগ, ভৈরবী— যে-সব সুরে বিচ্ছেদ-বেদনার কান্না বাজে। সেই সুরের মধ্যে ভাইবোন দুজনেরই ব্যথা এক হয়ে মিশে যায়। মুখের কথায় দুজনে কিছুই বললে না ; না দিলে পরস্পরকে সান্ত্বনা, না জানালে দুঃখ।

বিপ্রদাসের জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা সারল না— বরং বেড়ে উঠছে। ডাক্তার বলছে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হয়তো ন্যুমোনিয়ায় গিয়ে পৌঁছোতে পারে, খুব সাবধান হওয়া চাই। কুমুর মনে উদ্বেগের সীমা নেই। কথা ছিল বাসি-বিয়ের কালরাত্রিটা এখানেই কাটিয়ে দিয়ে পরদিন কলকাতায় ফিরবে। কিন্তু শোনা গেল মধুসূদন হঠাৎ পণ করেছে, বিবাহের পরদিনে ওকে নিয়ে চলে যাবে। বুঝলে, এটা প্রথার জন্যে নয়, প্রয়োজনের জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে নয়, শাসনের জন্যে। এমন অবস্থায় অনুগ্রহ দাবি করতে অভিমানিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়। তবু কুমু মাথা হেঁট করে লজ্জা কাটিয়ে কম্পিতকণ্ঠে বিবাহের রাতে স্বামীর কাছে এইমাত্র প্রার্থনা করেছিল যে, আর দুটো দিন যেন তাকে বাপের বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়, দাদাকে একটু ভালো দেখে যেন সে যেতে পারে। মধুসূদন সংক্ষেপে বললে, "সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে।" এমন বজ্রে-বাঁধা একপক্ষের ঠিকঠাক, তার মধ্যে কুমুর মর্মান্তিক বেদনারও এক তিল স্থান নেই। তার পর মধুসূদন ওকে রাত্রে কথা কওয়াতে চেষ্টা করেছে, ও একটিও জবাব দিল না— বিছানার প্রান্তে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল।

তখনও অন্ধকার, প্রথম পাখির দ্বিধাজড়িত কাকলি শোনবামাত্র ও বিছানা ছেড়ে চলে গেল।

বিপ্রদাস সমস্ত রাত ছট্‌ফট্ করেছে। সন্ধ্যার সময় জ্বর-গায়েই বিবাহসভায় যাবার জন্যে ওর ঝোঁক হল। ডাক্তার অনেক চেষ্টায় চেপে রেখে দিলে। ঘন ঘন লোক পাঠিয়ে সে খবর নিয়েছে। খবরগুলো যুদ্ধের সময়কার খবরের মতো, অধিকাংশই

বানানো। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, "কখন বর এল? বাজনাবাদ্যির আওয়াজ তো পাওয়া গেল না।"

সংবাদদাতা শিবু বললে, "আমাদের জামাই বড়ো বিবেচক— বাড়িতে অসুখ শুনেই সব থামিয়ে দিয়েছে— বরযাত্রদের পায়ের শব্দ শোনা যায় না, এমনি ঠাণ্ডা।"

"ওরে শিবু, খাবার জিনিস তো কুলিয়েছিল? আমার ওই এক ভাবনা ছিল, এ তো কলকাতা নয়!"

"কুলোয় নি? বলেন কী হুজুর! কত ফেলা গেল। আরও অতগুলো লোককে খাওয়াবার মতো জিনিস বাকি আছে।"

"ওরা খুশি হয়েছে তো?"

"একটি নালিশ কারও মুখে শোনা যায় নি। একেবারে টুঁ শব্দটি না। আরও তো এত এত বিয়ে দেখেছি, বরযাত্রের দাপাদাপিতে কন্যাকর্তার ভির্মি লাগে। এরা এমনি চুপ, আছে কি না-আছে বোঝাই যায় না।"

বিপ্রদাস বললে, "ওরা কলকাতার লোক কিনা, তাই ভদ্র ব্যবহার জানা আছে। ওরা বোঝে যে, যে বাড়ি থেকে মেয়ে নেবে তাদের অপমানে নিজেদেরই অপমান।"

"আহা, হুজুর যা বললেন এই কথাটি ওদের লোকজনদের আমি শুনিয়ে দেব। শুনলে ওরা খুশি হবে।"

কুমু কাল সন্ধের সময়েই বুঝেছিল অসুখ বাড়বার মুখে। অথচ সে যে দাদার সেবা করতে পারবে না এই দুঃখ সর্বক্ষণ তার বুকের মধ্যে ফাঁদে-পড়া পাখির মতো ছট্‌ফট্ করতে লাগল। তার হাতের সেবা যে তার দাদার কাছে ওষুধের চেয়ে বেশি।

স্নান করে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে কুমু যখন দাদার ঘরে এল তখনও সূর্য ওঠে নি। কঠিন রোগের সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়াই করে ক্ষণকাল ছুটি পাবার সময় যে অবসাদের বৈরাগ্য আসে সেই বৈরাগ্যে বিপ্রদাসের মন তখন শিথিল। জীবনের আসক্তি, সংসারের ভাবনা সব তার কাছে শস্যশূন্য মাঠের মতো ধূসরবর্ণ। সমস্ত রাত দরজা বন্ধ ছিল, ডাক্তার ভোরের বেলায় পুব দিকের জানালাটা খুলে দিয়েছে। অশথগাছের শিশির-ভেজা পাতার আড়ালে অরুণবর্ণ আকাশের আভা ধীরে ধীরে শুভ্র হয়ে আসছে— অদূরবর্তী নদীতে মহাজনি নৌকোর বৃহৎ তালি-দেওয়া পালগুলি সেই আরক্তিম আকাশের গায়ে স্ফীত হয়ে উঠল। নহবতে করুণ সুরে রামকেলি বাজছে।

পাশে বসে কুমু নিজের দুই ঠাণ্ডা হাতের মধ্যে দাদার শুকনো গরম হাত তুলে নিলে। বিপ্রদাসের টেরিয়র কুকুর খাটের নীচে বিমর্ষ মনে চুপ করে শুয়ে ছিল। কুমু খাটে এসে বসতেই সে দাঁড়িয়ে উঠে দু পা তার কোলের উপর রেখে লেজ নাড়তে নাড়তে করুণ চোখে ক্ষীণ আর্তস্বরে কী যেন প্রশ্ন করলে।

বিপ্রদাসের মনে ভিতরে ভিতরে কী একটা চিন্তার ধারা চলছিল, তাই হঠাৎ এক সময়ে অসংলগ্নভাবে বলে উঠল, "দিদি, আসলে কিছুই নয়— কে বড়ো কে ছোটো কে উপরে কে নীচে, এ সমস্তই বানানো কথা। ফেনার মধ্যে বুদ্‌বুদগুলোর কোন্‌টার কোথায় স্থান তাতে কী আসে যায়? আপনার ভিতরে আপনি সহজ হয়ে থাকিস, কিছুতেই তোকে মারবে না।"

"আমাকে আশীর্বাদ করো দাদা, আমাকে আশীর্বাদ করো," বলে কুমু দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্না চাপা দিলে।

বিপ্রদাস বালিশে ঠেস দিয়ে একটু উঠে বসে কুমুর মুখ নামিয়ে ধরে তার মাথায় চুমো খেলে।

ডাক্তার ঘরে ঢুকে বললে, "আর নয় কুমুদিদি, এখন ওঁর একটু শান্ত থাকা দরকার।"

কুমু রোগীর বালিশ একটু চেপে-চুপে ঠিক করে গায়ের উপর গরম কাপড়টা টেনে দিয়ে, পাশের টিপাইটার উপরকার বিশৃঙ্খলতা একটু সেরে নিয়ে দাদার কানের কাছে মৃদুস্বরে বললে, "সেরে গেলেই কলকাতায় যেয়ো দাদা, সেখানে তোমাকে দেখতে পাব।"

বিপ্রদাস বড়ো বড়ো দুই স্নিগ্ধ চোখ কুমুর মুখের উপর স্থির রেখে বললে, "কুমু, পশ্চিমের মেঘ যায় পুবে, পুবের মেঘ যায় পশ্চিমে, এ-সব হাওয়ায় হয়। সংসারে সেই হাওয়া বইছে। মেঘের মতোই অমনি সহজে এটাকে মেনে নিস দিদি। এখন থেকে আমাদের কথা বেশি ভাবিস নে। যেখানে যাচ্ছিস সেখানে লক্ষ্মীর আসন তুই জুড়ে থাকিস— এই আমার সকল মনের আশীর্বাদ। তোর কাছে আমরা আর কিছুই চাই নে।"

দাদার পায়ের কাছে কুমু মাথা রেখে পড়ে রইল। 'আজ থেকে আমার কাছে আর কিছুই চাবার নেই। এখানকার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমার কোনো হাতই থাকবে না'— এক মুহূর্তে এতবড়ো বিচ্ছেদের কথা মেনে নেওয়া যায় না। ঝড়ে যখন নৌকাকে ডাঙা থেকে টেনে নিয়ে যায় তখন নোঙর যেমন করে মাটি আঁকড়ে থাকতে চায়, দাদার পায়ের কাছে কুমুর তেমনি এই শেষ ব্যগ্রতার বন্ধন।

ডাক্তার আবার এসে ধীরে ধীরে বললে, "আর নয় দিদি।" বলে নিজের অশ্রুসিক্ত চোখ মুছে ফেললে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজার বাইরে যে চৌকিটা ছিল তার উপর বসে পড়ে মুখে আঁচল দিয়ে কুমু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ এক সময়ে মনে পড়ে গেল দাদার 'বেসি' ঘোড়াকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়ে যাবে বলে কাল রাত্রে সে গুড়মাখা আটার রুটি তৈরি করে রেখেছিল। সইস আজ ভোরবেলায় তাকে খিড়কির বাগানে রেখে এসেছে। কুমু সেখানে গিয়ে দেখলে ঘোড়া আমড়া-গাছতলায় ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে কুমুর পায়ের শব্দ শুনেই কান খাড়া করলে এবং তাকে দেখেই চিঁহিঁ হিঁহিঁ করে ডেকে উঠল। বাঁ হাত তার কাঁধের উপর রেখে ডান হাতে কুমু তার মুখের কাছে রুটি ধরে তাকে খাওয়াতে লাগল। সে খেতে খেতে তার বড়ো বড়ো কালো স্নিগ্ধ চোখে কুমুর মুখের দিকে কটাক্ষে চাইতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে বেসির দুই চোখের মাঝখানকার প্রশস্ত কপালের উপর চুমো খেয়ে কুমু দৌড়ে চলে গেল।

১৮

বিপ্রদাস নিশ্চয় মনে করেছিল মধুসূদন এই কয়দিনের মধ্যে একবার এসে দেখা করে যাবে। তা যখন করলে না তখন ওর বুঝতে বাকি রইল না যে, দুই পরিবারের এই বিবাহের সম্বন্ধটাই এল পরস্পরের বিচ্ছেদের খড়্গ হয়ে। রোগের নিরতিশয় ক্লান্তিতে এ কথাটাকেও সহজভাবে সে মেনে নিলে। ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "একটু এসরাজ বাজাতে পারি কি?"

ডাক্তার বললে, "না, আজ থাক্।"

"তা হলে কুমুকে ডাকো, সে একটু বাজাক। আবার কবে তার বাজনা শুনতে পাব, কে জানে।"

ডাক্তার বললে, "আজ সকালে ন-টার গাড়িতে ওঁদের ছাড়তে হবে, নইলে সূর্যাস্তের আগে কলকাতায় পৌঁছোতে পারবেন না। কুমুর তো আর সময় নেই।"

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলে বললে, "না, এখানে ওর সময় ফুরোল। উনিশ বছর কাটতে পেরেছে, এখন এক ঘণ্টাও আর কাটবে না।"

বিদায়ের সময় স্বামীস্ত্রী জোড়ে প্রণাম করতে এল। মধুসূদন ভদ্রতা করে বললে, "তাই তো, আপনার শরীর তো ভালো দেখছি নে।"

বিপ্রদাস তার কোনো উত্তর না করে বললে, "ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।"

"দাদা, নিজের শরীরের একটু যত্ন কোরো" বলে আর-একবার বিপ্রদাসের পায়ের কাছে পড়ে কুমু কাঁদতে লাগল।

হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ঢাক-কাঁসর-নহবতে একটা আওয়াজের সাইক্লোন ঝড় উঠল। ওরা গেল চলে।

পরস্পরের আঁচলে চাদরে বাঁধা ওরা যখন চলে যাচ্ছে সেই দৃশ্যটা আজ, কেন কী জানি, বিপ্রদাসের কাছে বীভৎস লাগল। প্রাচীন ইতিহাসে তৈমুর জঙ্গিস অসংখ্য মানুষের কঙ্কালস্তম্ভ রচনা করেছিল। কিন্তু ওই-যে চাদরে-আঁচলের গ্রন্থি, ওর সৃষ্ট জীবন-মৃত্যুর জয়তোরণ যদি মাপা যায় তবে তার চূড়া কোন্ নরকে গিয়ে ঠেকবে! কিন্তু এ কেমনতরো ভাবনা আজ ওর মনে!

পূজার্চনায় বিপ্রদাসের কোনোদিন উৎসাহ ছিল না। তবু আজ হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল।

এক সময়ে চমকে উঠে বললে, "ডাক্তার, ডাকো তো দেওয়ানজিকে।"

বিপ্রদাসের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিয়ে দিতে আসবার কিছুদিন আগে যখন সুবোধকে টাকা পাঠানো নিয়ে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, হিসাবের খাতাপত্র ঘেঁটে ক্লান্ত, বেলা এগারোটা— এমন সময়ে অত্যন্ত বে-মেরামত গোছের একটা মানুষ, কিছু-কালের না-কামানো কণ্টকিত জীর্ণ মুখ, হাড়-বের-করা শির-বের-করা হাত, ময়লা একখানা চাদর, খাটো একখানা ধুতি, ছেঁড়া একজোড়া চটি-পরা এসে উপস্থিত। নমস্কার করে বললে, "বড়োবাবু, মনে পড়ে কি?"

বিপ্রদাস একটু লক্ষ্য করে বললে, "কী, বৈকুণ্ঠ নাকি?"

বিপ্রদাস বালককালে যে ইস্কুলে পড়ত সেই ইস্কুলেরই সংলগ্ন একটা ঘরে বৈকুণ্ঠ ইস্কুলের বই খাতা কলম ছুরি ব্যাটবল লাঠিম আর তারই সঙ্গে মোড়কে-করা চীনাবাদাম বিক্রি করত। তার ঘরে বড়ো ছেলেদের আড্ডা ছিল— যতরকম অদ্ভুত অসম্ভব খোশগল্প করতে এর জুড়ি কেউ ছিল না।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার এমন দশা কেন?"

কয়েক বৎসর হল সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। তাদের পণের বিশেষ কোনো আবশ্যক ছিল না বলেই বরের পণও ছিল বেশি। বারো শো টাকায় রফা হয়, তা ছাড়া আশি ভরি সোনার গয়না। একমাত্র আদরের মেয়ে বলেই মরিয়া হয়ে সে রাজি হয়েছিল। একসঙ্গে সব টাকা সংগ্রহ করতে পারে নি, তাই মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে ওরা বাপের রক্ত শুষেছে। সম্বল সবই ফুরোল তবু এখনও আড়াই শো টাকা বাকি। এবারে মেয়েটির অপমানের শেষ নেই। অত্যন্ত

অসহ্য হওয়াতেই বাপের বাড়ি পালিয়ে এসেছিল। তাতে করে জেলের কয়েদির জেলের নিয়ম ভঙ্গ করা হল, অপরাধ বেড়েই গেল। এখন ওই আড়াই শো টাকা ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলে বাপ মরবার কথাটা ভাববার সময় পায়।

বিপ্রদাস ম্লান হাসি হাসলে। যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবার কথা সেদিন ভাববারও জো ছিল না। ক্ষণকালের জন্যে ইতস্তত করলে, তার পরে উঠে গিয়ে বাক্স থেকে থলি ঝেড়ে দশটি টাকার নোট এনে তার হাতে দিল। বললে, "আরও দু-চার জায়গা থেকে চেষ্টা দেখো, আমার আর সাধ্য নেই।"

বৈকুণ্ঠ সে কথা একটুও বিশ্বাস করলে না। পা টেনে টেনে চলে গেল, চটিজুতোয় অত্যন্ত অপ্রসন্ন শব্দ।

সেদিনকার এই ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল, আজ হঠাৎ বিপ্রদাসের মনে পড়ল। দেওয়ানজিকে ডেকে হুকুম হল— বৈকুণ্ঠকে আজই আড়াই শো টাকা পাঠানো চাই। দেওয়ানজি চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোয়। জেদাজেদির মুখে খরচ করে বিবাহ তো চুকেছে, কিন্তু অনেকদিন ধরে তার হিসাব শোধ করতে হবে— এখন দিনের গতিকে আড়াই শো টাকা যে মস্তবড়ো অঙ্ক।

দেওয়ানজির মুখের ভাব দেখে বিপ্রদাস আঙুল থেকে হীরের আংটি খুলে বললে, "ছোটোবাবুর নামে যে-টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, তার থেকে ওই আড়াই শো টাকা নাও, তার বদলে আমার আংটি বন্ধক রইল। বৈকুণ্ঠকে টাকাটা যেন কুমুর নামে পাঠানো হয়।"

১৯

বিবাহের লঙ্কাকাণ্ডের সব-শেষ অধ্যায়টা এখনও বাকি।

সকালবেলায় কুশণ্ডিকা সেরে তবে বরকনে যাত্রা করবে এই ছিল কথা। নবগোপাল তারই সমস্ত উদ্‌যোগ ঠিক করে রেখেছে। এমন সময় বিপ্রদাসের ঘর থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে রাজাবাহাদুর বলে বসল— কুশণ্ডিকা হবে বরের ওখানে, মধুপুরীতে।

প্রস্তাবের ঔদ্ধত্যটা নবগোপালের কাছে অসহ্য লাগল। আর কেউ হলে আজ একটা ফৌজদারি বাধত। তবু ভাষার প্রাবল্যে নবগোপালের আপত্তি প্রায় লাঠিয়ালির কাছ পর্যন্ত এসে তবে থেমেছিল।

অন্তঃপুরে অপমানটা খুব বাজল। বহুদূর থেকে আত্মীয়-কুটুম সব এসেছে,

তাদের মধ্যে ঘরশত্রুর অভাব নেই। সবার সামনে এই অত্যাচার। ক্ষেমাপিসি মুখ গোঁ করে বসে রইলেন। বরকনে যখন বিদায় নিতে এল তাঁর মুখ দিয়ে যেন আশীর্বাদ বেরোতে চাইল না। সবাই বললে, এ কাজটা কলকাতায় সেরে নিলে তো কারও কিছু বলবার কথা থাকত না। বাপের বাড়ির অপমানে কুমু একান্তই সংকুচিত হয়ে গেল— মনে হতে লাগল সে'ই যেন অপরাধিনী তার সমস্ত পূর্বপুরুষদের কাছে। মনে মনে তার ঠাকুরের প্রতি অভিমান করে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি যে জন্যে আমার এত শাস্তি! আমি তো তোমাকেই বিশ্বাস করে সমস্ত স্বীকার করে নিয়েছি।'

বরকনে গাড়িতে উঠল। কলকাতা থেকে মধুসূদন যে ব্যাণ্ড এনেছিল তাই উচ্চৈঃস্বরে নাচের সুর লাগিয়ে দিলে। মস্ত একটা শামিয়ানার নীচে হোমের আয়োজন। ইংরেজ মেয়েপুরুষ অভ্যাগত কেউ-বা গদিওআলা চৌকিতে বসে, কেউ-বা কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। এরই মধ্যে তাদের জন্যে চা-বিস্কুটও এল। একটা টিপায়ের উপর মস্তবড়ো একটা ওয়েডিং কেকও সাজানো আছে। অনুষ্ঠান সারা হয়ে গেলে এরা এসে যখন কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে লাগল, কুমু মুখ লাল করে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। একজন মোটাগোছের প্রৌঢ়া ইংরেজ মেয়ে ওর বেনারসি শাড়ির আঁচল তুলে ধরে পর্যবেক্ষণ করে দেখলে; ওর হাতে খুব মোটা সোনার বাজুবন্ধ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেও তার বিশেষ কৌতূহল বোধ হল। ইংরেজি ভাষায় প্রশংসাও করলে। অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মধুসূদনকে একদল বললে, "how interesting"; আর একদল বললে; "isn't it?"

এই মধুসূদনকে কুমু তার দাদা আর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখেছে— আজ তাকেই দেখলে ইংরেজ বন্ধুমহলে। ভদ্রতায় অতি গদ্‌গদভাবে অবনম্র, আর হাসির আপ্যায়নে মুখ নিয়তই বিকশিত। চাঁদের যেমন এক পিঠে আলো আর-এক পিঠে চির-অন্ধকার, মধুসূদনের চরিত্রেও তাই। ইংরেজের অভিমুখে তার মাধুর্য পূর্ণচাঁদের আলোর মতোই যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। অন্য দিকটা দুর্গম, দুর্দৃশ্য এবং জমাট বরফের নিশ্চলতায় দুর্ভেদ্য।

সেলুন-গাড়িতে ইংরেজ বন্ধুদের নিয়ে মধুসূদন; অন্য রিজার্ভ-করা গাড়িতে মেয়েদের দলে কুমু। তারা কেউ-বা ওর হাত তুলে টিপে দেখে, কেউ-বা চিবুক তুলে মুখশ্রী বিশ্লেষণ করে; কেউ-বা বলে ঢ্যাঙা, কেউ-বা বলে রোগা। কেউ-বা অতি ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করে, "হাঁ গা, গায়ে কী রঙ মাখ, বিলেত থেকে তোমার ভাই বুঝি কিছু পাঠিয়েছে?" সকলেই মীমাংসা করলে, চোখ বড়ো নয়,

পায়ের মাপটা মেয়েমানুষের পক্ষে অধিক বড়ো। গায়ের প্রত্যেক গয়নাটি নেড়েচেড়ে বিচার করতে বসল— সেকেলে গয়না, ওজনে ভারি, সোনা খাঁটি— কিন্তু কী ফ্যাশান, মরে যাই!

ওদের গাড়িতে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের উলটো দিকের জানলা খোলা ছিল, সেই দিকে কুমু চেয়ে রইল, চেষ্টা করতে লাগল এদের কথা যাতে কানে না যায়। দেখতে পেলে একটা এক-পা-কাটা কুকুর তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে। আহা, কিছু খাবার যদি হাতের কাছে থাকত! কিছুই ছিল না। কুমু মনে মনে ভাবতে লাগল, যে-একটি পা গিয়েছে তারই অভাবে ওর যা-কিছু সহজ ছিল তার সমস্তই হয়ে গেল কঠিন। এমন সময় কুমুর কানে গেল সেলুন-গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক বলছে, "দেখুন, এই চাষির মেয়েকে আড়কাটি আসাম চা-বাগানে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, পালিয়ে এসেছে; গোয়ালন্দ পর্যন্ত টিকিটের টাকা আছে, ওর বাড়ি ডুমরাঁও, যদি সাহায্য করেন তো এই মেয়েটি বেঁচে যায়।" সেলুন-গাড়ি থেকে একটা মস্ত তাড়ার আওয়াজ কুমু শুনতে পেলে। সে আর থাকতে পারলে না, তখনই ডান দিকের জানলা খুলে তার পুঁতিগাঁথা থলে উজাড় করে দশ টাকা মেয়েটির হাতে দিয়েই জানলা বন্ধ করে দিলে। দেখে একজন মেয়ে বলে উঠল, "আমাদের বউয়ের দরাজ হাত দেখি!" আর-একজন বললে, "দরাজ নয় তো দরজা, লক্ষ্মীকে বিদায় করবার।" আর-একজন বললে, "টাকা ওড়াতে শিখেছে, রাখতে শিখলে কাজে লাগত।" এটাকে ওরা দেমাক বলে ঠিক করলে— বাবুরা যাকে এক পয়সা দিলে না, ইনি তাকে অমনি ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দেন, এত কিসের গুমোর! ওদের মনে হল এও বুঝি সেই চাটুজ্যে-ঘোষালদের চিরকেলে রেষারেষির অঙ্গ।

এমন সময়ে ওদের মধ্যে একটি মোটাসোটা কালোকোলো মেয়ে, মস্ত ডাগর চোখ, স্নেহরসে ভরা মুখের ভাব, কুমুর সমবয়সী হবে, ওর কাছে এসে বসল। চুপি চুপি বললে, "মন কেমন করছে ভাই? এদের কথায় কান দিয়ো না, দু-দিন এই-রকম টেপাটেপি বলাবলি করবে, তার পরে কণ্ঠ থেকে বিষ নেমে গেলেই থেমে যাবে।" এই মেয়েটি কুমুর মেজো জা, নবীনের স্ত্রী। ওর নাম নিস্তারিণী, ওকে সবাই মোতির মা বলে ডাকে।

মোতির মা কথা তুললে, "যেদিন নুরনগরে এলুম, ইস্টিশনে তোমার দাদাকে দেখলুম যে।"

কুমু চমকে উঠল। ওর দাদা যে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিল সে খবর এই প্রথম শুনলে।

"আহা, কী সুপুরুষ! এমন কখনও চক্ষে দেখি নি। ওই-যে গান শুনেছিলেম কীর্তনে—

গোরার রূপে লাগল রসের বান—
ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ার পুরনারীর প্রাণ

আমার তাই মনে পড়ল।"

মুহূর্তে কুমুর মন গলে গেল। মুখ আড় করে জানলার দিকে রইল চেয়ে—বাইরের মাঠ বন আকাশ অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হয়ে গেল।

মোতির মার বুঝতে বাকি ছিল না কোন্ জায়গায় কুমুর দরদ, তাই নানারকম করে ওর দাদার কথাই আলোচনা করলে। জিজ্ঞাসা করলে বিয়ে হয়েছে কি না।

কুমু বললে, "না।"

মোতির মা বলে উঠল, "মরে যাই! অমন দেবতার মতো রূপ, এখনও ঘর খালি! কোন্ ভাগ্যবতীর কপালে আছে ওই বর!"

কুমু তখন ভাবছে— দাদা গিয়েছিলেন সমস্ত অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে, কেবল আমারই জন্যে! তার পরে এঁরা একবার দেখতেও এলেন না! কেবলমাত্র টাকার জোরে এমন মানুষকেও অবজ্ঞা করতে সাহস করলেন! তাঁর শরীর এইজন্যেই বুঝি-বা ভেঙে পড়ল।

বৃথা আক্ষেপের সঙ্গে বার বার মনে মনে বলতে লাগল— দাদা কেন গেল ইস্টেশনে? কেন নিজেকে খাটো করলে? আমার জন্যে? আমার মরণ হল না কেন?

যে কাজটা হয়ে গেছে, আর ফেরানো যাবে না, তারই উপর ওর মনটা মাথা ঠুকতে লাগল। কেবলই মনে পড়তে লাগল, সেই রোগে-ক্লান্ত শান্ত মুখ, সেই আশীর্বাদে-ভরা স্নিগ্ধগম্ভীর দুটি চোখ।

২০

রেলগাড়ি হাওড়ায় পৌঁছোল, বেলা তখন চারটে হবে। ওড়নায়-চাদরে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে বরকনে গিয়ে বসল ব্রুহাম গাড়িতে। কলকাতার দিবালোকের অসংখ্য চক্ষু, তার সামনে কুমুর দেহমন সংকুচিত হয়ে রইল। যে একটি অতিশয় শুচিতাবোধ এই উনিশ বছরের কুমারীজীবনে ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত, সেটা যে কর্ণের সহজ কবচের মতো, কেমন করে ও হঠাৎ ছিন্ন করে ফেলবে? এমন মন্ত্র আছে যে মন্ত্রে এই কবচ এক নিমেষে আপনি খসে যায়। কিন্তু সে মন্ত্র হৃদয়ের মধ্যে

এখনও বেজে ওঠে নি। পাশে যে মানুষটি বসে আছে, মনের ভিতরে সে তো আজও বাইরের লোক। আপন লোক হবার পক্ষে তার দিক থেকে কেবল তো বাধাই এসেছে। তার ভাবে ব্যবহারে যে একটা রূঢ়তা সে যে কুমুকে এখনও পর্যন্ত কেবলই ঠেলে ঠেলে দূরে ঠেকিয়ে রাখল।

এ দিকে মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। ওর পণ্যজগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁওয়াও ওকে কখনও লাগে নি। কোনো স্ত্রী ওর মনকে কখনও বিচলিত করে নি এ কথা সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্যন্তই ঘটেছে— ইমারত জখম হয় নি। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বউঝিদের মধ্যে। তারা ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এদের সংস্রব নিতান্তই যৎসামান্য। ওর স্ত্রীও যে জগতের এই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবে নি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তার মধ্যেও যে পাওয়ার বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকতে পারে, এ কথা তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায় নি ; বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয়, ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেমনি করেই ভেবেছিল।

এমন সময় বিবাহের পরে সে কুমুকে প্রথম দেখলে। একরকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি— প্রতি ক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুকতারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের ও পারে। মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুকে একরকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করলে— অন্তত একটা ভাবনা উঠল এর সঙ্গে কী রকম ভাবে ব্যবহার করা চাই, কোন্ কথা কেমন করে বললে সংগত হবে।

কী বলে আলাপ আরম্ভ করবে ভাবতে ভাবতে মধুসূদন হঠাৎ এক সময়ে কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "এ দিক থেকে রোদ্দুর আসছে, না ?"

কুমু কিছুই জবাব করলে না। মধুসূদন ডান দিকের পর্দাটা টেনে দিলে।

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ কাটল। আবার খামকা বলে উঠল, শীত করছে না তো ? বলেই উত্তরের প্রতীক্ষা না করে সামনের আসন থেকে বিলিতি কম্বলটা

টেনে নিয়ে কুমুর ও নিজের পায়ের উপর বিছিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে এক-আবরণের সহযোগিতা স্থাপন করলে। শরীর মন পুলকিত হয়ে উঠল। চমকে উঠে কুমুদিনী কম্বলটাকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, শেষে নিজেকে সম্বরণ করে আসনের প্রান্তে গিয়ে সংলগ্ন হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ এইভাবে যায় এমন সময় হঠাৎ কুমুর হাতের দিকে মধুসূদনের চোখ পড়ল।

"দেখি দেখি" বলে হঠাৎ তার বাঁ হাতটা চোখের কাছে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার আঙুলে এ কিসের আংটি? এ যে নীলা দেখছি।"

কুমু চুপ করে রইল।

"দেখো, নীলা আমার সয় না, ওটা তোমাকে ছাড়তে হবে।"

কোনো-এক সময়ে মধুসূদন নীলা কিনেছিল, সেই বছর ওর গাধাবোট-বোঝাই পাট হাওড়ার ব্রিজে ঠেকে তলিয়ে যায়। সেই অবধি নীলা-পাথরকে ও ক্ষমা করে না।

কুমুদিনী আস্তে আস্তে হাতটাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলে। মধুসূদন ছাড়লে না; বললে, "এটা আমি খুলে নিই।"

কুমু চমকে উঠল; বললে, "না, থাক্।"

একবার দাবাখেলায় ওর জিত হয়; সেইবার দাদা ওকে তার নিজের হাতের আংটি পারিতোষিক দিয়েছিল।

মধুসূদন মনে মনে হাসলে। আংটির উপর বিলক্ষণ লোভ দেখছি। এইখানে নিজের সঙ্গে কুমুর সাধর্ম্যের পরিচয় পেয়ে একটু যেন আরাম লাগল। বুঝলে, সময়ে অসময়ে সিঁথি কণ্ঠহার বালা বাজুর যোগে অভিমানিনীর সঙ্গে ব্যবহারের সোজা পথ পাওয়া যাবে— এই পথে মধুসূদনের প্রভাব না মেনে উপায় নেই, বয়স না হয় কিছু বেশিই হল।

নিজের হাত থেকে মস্তবড়ো কমলহীরের একটা আংটি খুলে নিয়ে মধুসূদন হেসে বললে, "ভয় নেই, এর বদলে আর-একটা আংটি তোমাকে পরিয়ে দিচ্ছি।"

কুমু আর থাকতে পারলে না, একটু চেষ্টা করেই হাত ছাড়িয়ে নিলে। এইবার মধুসূদনের মনটা ঝেঁকে উঠল। কর্তৃত্বের খর্বতা তাকে সইবে না, শুষ্ক গলায় জোর করেই বললে, "দেখো, এ আংটি তোমাকে খুলতেই হবে।"

কুমুদিনী মাথা হেঁট করে চুপ করে রইল, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

মধুসূদন আবার বললে, "শুনছ? আমি বলছি ওটা খুলে ফেলা ভালো। দাও আমাকে।" বলে হাতটা টেনে নিতে উদ্যত হল।

কুমু হাত ফিরিয়ে নিয়ে বললে, "আমি খুলছি।"

খুলে ফেললে।

"দাও, ওটা আমাকে দাও।"

কুমুদিনী বললে, "ওটা আমিই রেখে দেব।"

মধুসূদন বিরক্ত হয়ে হেঁকে উঠল, "রেখে লাভ কী? মনে ভাবছ, এটা ভারি একটা দামি জিনিস! এ কিছুতেই তোমার পরা চলবে না, বলে দিচ্ছি।"

কুমুদিনী বললে, "আমি পরব না।" বলে সেই পুঁতির কাজ-করা থলেটির মধ্যে আংটি রেখে দিলে।

"কেন, এই সামান্য জিনিসটার উপরে এত দরদ কেন? তোমার তো জেদ কম নয়!"

মধুসূদনের আওয়াজটা খরখরে; কানে বাজে, যেন বেলে-কাগজের ঘর্ষণ। কুমুদিনীর সমস্ত শরীরটা রী রী করে উঠল।

"এ আংটি তোমাকে দিলে কে?"

কুমুদিনী চুপ করে রইল।

"তোমার মা নাকি?"

নিতান্তই জবাব দিতে হবে বলেই অর্ধস্ফুটস্বরে বললে, "দাদা।"

দাদা! সে তো বোঝাই যাচ্ছে। দাদার দশা যে কী, মধুসূদন তা ভালোই জানে। সেই দাদার আংটি শনির সিঁধকাঠি— এ ঘরে আনা চলবে না। কিন্তু তার চেয়েও ওকে এইটেই খোঁচা দিচ্ছে যে, এখনও কুমুদিনীর কাছে ওর দাদাই সবচেয়ে বেশি। সেটা স্বাভাবিক বলেই যে সেটা সহ্য হয় তা নয়। পুরোনো জমিদারের জমিদারি নতুন ধনী মহাজন নিলেমে কেনার পর ভক্ত প্রজারা যখন সাবেক আমলের কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে থাকে তখন আধুনিক অধিকারীর গায়ের জ্বালা ধরে, এও তেমনি। আজ থেকে আমিই যে ওর একমাত্র, এই কথাটা যত শীঘ্র হোক ওকে জানান দেওয়া চাই। তা ছাড়া গায়ে-হলুদের খাওয়ানো নিয়ে বরের যা অপমান হয়েছে তাতে বিপ্রদাস নেই এ কথা মধুসূদন বিশ্বাস করতেই পারে না। যদিও নবগোপাল বিবাহের পরদিনে ওকে বলেছিল, "ভায়া, বিয়েবাড়িতে তোমাদের হাটখোলার আড়ত থেকে যে-চালচলনের আমদানি করেছিলে, সে কথাটা ইঙ্গিতেও দাদাকে জানিয়ো না; উনি এর কিছুই জানেন না, ওঁর শরীরও বড়ো খারাপ।"

আংটির কথাটা আপাতত স্থগিত রাখলে, কিন্তু মনে রইল।

এ দিকে রূপ ছাড়া আরও একটা কারণে হঠাৎ কুমুদিনীর দর বেড়ে গিয়েছে। নুরনগরে থাকতেই ঠিক বিবাহের দিনে মধুসূদন টেলিগ্রাফ পেয়েছে যে, এবার তিসি চালানের কাজে লাভ হয়েছে প্রায় বিশ লাখ টাকা। সন্দেহ রইল না, এটা নতুন বধূর পয়ে। স্ত্রীভাগ্যে ধন, তার প্রমাণ হাতে হাতে। তাই কুমুকে পাশে নিয়ে গাড়িতে বসে ভিতরে ভিতরে এই পরম পরিতৃপ্তি তার ছিল যে, ভাবী মুনফার একটা জীবন্ত বিধিদত্ত দলিল নিয়ে বাড়ি চলেছে। এ নইলে আজকের এই ক্রহাম-রথযাত্রার পালাটায় অপঘাত ঘটতে পারত।

২১

রাজা উপাধি পাওয়ার পর থেকে কলকাতায় ঘোষালবাড়ির দ্বারে নাম খোদা হয়েছে 'মধুপ্রাসাদ'। সেই প্রাসাদের লোহার গেটের এক পাশে আজ নহবত বসেছে, আর বাগানে একটা তাঁবুতে বাজছে ব্যাণ্ড। গেটের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে গ্যাসের টাইপে লেখা "প্রজাপতয়ে নমঃ"। সন্ধ্যাবেলায় আলোকশিখায় এই লিখনটি সমুজ্জ্বল হবে। গেট থেকে কাঁকর-দেওয়া যে পথ বাড়ি পর্যন্ত গেছে তার দুই ধারে দেবদারুপাতা ও গাঁদার মালায় শোভাসজ্জা; বাড়ির প্রথম তলার উঁচু মেজেতে ওঠবার সিঁড়ির ধাপে লাল সালু পাতা। আত্মীয়বন্ধুর জনতার ভিতর দিয়ে বরকনের গাড়ি গাড়িবারান্দায় এসে থামল। শাঁখ উলুধ্বনি ঢাক ঢোল কাঁসর নহবত ব্যাণ্ড সব একসঙ্গে উঠল বেজে— যেন দশ-পনেরোটা আওয়াজের মালগাড়ির এক জায়গাতে পুরো বেগে ঠোকাঠুকি ঘটল। মধুসূদনের কোন্-এক সম্পর্কের দিদিমা, পরিপক্ব বুড়ি, সিঁথিতে যত মোটা ফাঁক তত মোটা সিঁদুর, চওড়া-লাল-পেড়ে শাড়ি, মোটা হাতে মোটা মোটা সোনার বালা এবং শাঁখার চুড়ি, একটা রুপোর ঘটিতে জল নিয়ে বউয়ের পায়ে ছিটিয়ে দিয়ে আঁচলে মুছে নিলেন, হাতে নোয়া পরিয়ে দিলেন, বউয়ের মুখে একটু মধু দিয়ে বললেন, "আহা, এতদিন পরে আমাদের নীল গগনে উঠল পূর্ণচাঁদ, নীল সরোবরে ফুটল সোনার পদ্ম।" বরকনে গাড়ি থেকে নাবল। যুবক-অভ্যাগতদের দৃষ্টি ঈর্ষান্বিত। একজন বললে, "দৈত্য স্বর্গ লুঠ করে এনেছে রে, অপ্সরী সোনার শিকলে বাঁধা।" আর-একজন বললে, "সাবেক কালে এমন মেয়ের জন্যে রাজায় রাজায় লড়াই বেধে যেত, আজ তিসি-চালানির টাকাতেই কাজ সিদ্ধি। কলিযুগে দেবতাগুলো বেরসিক। ভাগ্যচক্রের সব গ্রহনক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ।"

তার পরে বরণ, স্ত্রী-আচার প্রভৃতির পালা শেষ হতে হতে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে তখন কালরাত্রির মুখে ক্রিয়াকর্ম সাঙ্গ হল।

একটিমাত্র বড়ো বোনের বিবাহ কুমুর স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু তাদের নিজেদের বাড়িতে কোনো নতুন বউ আসতে সে দেখে নি। যৌবনারম্ভের পূর্বে থেকেই সে আছে কলকাতায়, দাদার নির্মল স্নেহের আবেষ্টনে। বালিকার মনের কল্পজগৎ সাধারণ সংসারের মোটা ছাঁচে গড়া হতে পায় নি। বাল্যকালে পতিকামনায় যখন সে শিবের পূজা করেছে তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী রজত-গিরিনিভ শিবকেই দেখেছে। সাধ্বী নারীর আদর্শরূপে সে আপন মাকেই জানত। কী স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য, কত দুঃখ, কত দেবপূজা, মঙ্গলাচরণ, অক্লান্ত সেবা। অপর পক্ষে তাঁর স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি চরিত্রের স্খলন ছিল ; তৎসত্ত্বেও সে চরিত্র ঔদার্যে বৃহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তার মধ্যে হীনতা কপটতা লেশমাত্র ছিল না, যে একটা মর্যাদাবোধ ছিল সে যেন দূরকালের পৌরাণিক আদর্শের। তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিদিন এইটেই প্রমাণ হয়েছে যে, প্রাণের চেয়ে মান বড়ো, অর্থের চেয়ে ঐশ্বর্য। তিনি ও তাঁর সমপর্যায়ের লোকেরা বড়ো বহরের মানুষ। তাঁদের ছিল নিজেদের ক্ষতি করেও অক্ষত সম্মানের গৌরব রক্ষা, অক্ষত সঞ্চয়ের অহংকার প্রচার নয়।

কুমুর যেদিন বাঁ চোখ নাচল সেদিন সে তার সব ভক্তি নিয়ে, আত্মোৎসর্গের পূর্ণ সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোথাও কোনো বাধা বা খর্বতা ঘটতে পারে এ কথা তার কল্পনাতেই আসে নি। দময়ন্তী কী করে আগে থাকতে জেনেছিলেন যে, বিদর্ভরাজ নলকেই বরণ করে নিতে হবে! তাঁর মনের ভিতরে নিশ্চিত বার্তা এসে পৌঁচেছিল— তেমনি নিশ্চিত বার্তা কি কুমু পায় নি? বরণের আয়োজন সবই প্রস্তুত ছিল, রাজাও এলেন, কিন্তু মনে যাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, বাইরে তাকে দেখলে কই? রূপেতেও বাধত না, বয়সেও বাধত না। কিন্তু রাজা? সেই সত্যকার রাজা কোথায়?

তার পরে আজ, যে অনুষ্ঠানের দ্বার দিয়ে কুমুকে তার নতুন সংসারে আহ্বান করলে তাতে এমন কোনো বজ্রগম্ভীর মঙ্গলধ্বনি বাজল না কেন যার ভিতর দিয়ে এই নববধূ আকাশের সপ্তর্ষিদের আশীর্বাদমন্ত্র শুনতে পেত! সমস্ত অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণ করে এমন বন্দনাগান উদাত্ত স্বরে কেন জাগল না—

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ

সেই ‘জগতঃ পিতরৌ’ যাঁর মধ্যে চিরপুরুষ ও চিরনারী বাক্য ও অর্থের মতো একত্র মিলিত হয়ে আছে?

২২

মধুসূদন যখন কলকাতায় বাস করতে এল, তখন প্রথমে সে একটি পুরোনো বাড়ি কিনেছিল, সেই চকমেলানো বাড়িটাই আজ তার অন্তঃপুর-মহল। তার পরে তারই সামনে এখনকার ফ্যাশানে একটা মস্ত নতুন মহল এরই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, সেইটে ওর বৈঠকখানা-বাড়ি। এই দুই মহল যদিও সংলগ্ন তবুও এরা সম্পূর্ণ আলাদা দুই জাত। বাইরের মহলে সর্বত্রই মার্বলের মেজে, তার উপরে বিলিতি কার্পেট, দেয়ালে চিত্রিত কাগজ মারা এবং তাতে ঝুলছে নানারকমের ছবি— কোনোটা এনগ্রেভিং, কোনোটা ওলিয়োগ্রাফ, কোনোটা অয়েলপেন্টিং— তার বিষয় হচ্ছে, হরিণকে তাড়া করেছে শিকারী কুকুর, কিম্বা ডার্বির ঘোড়দৌড় জিতেছে এমন সব বিখ্যাত ঘোড়া, বিদেশী ল্যাণ্ড্‌স্কেপ, কিম্বা স্নানরত নগ্নদেহ নারী। তা ছাড়া দেয়ালে কোথাও বা চীনে বাসন, মোরাদাবাদী পিতলের থালা, জাপানি পাখা, তিব্বতি চামর ইত্যাদি যতপ্রকার অসংগত পদার্থের অস্থানে অযথা সমাবেশ। এই সমস্ত গৃহসজ্জা পছন্দকরা, কেনা এবং সাজানোর ভার মধুসূদনের ইংরেজ অ্যাসিস্টাণ্টের উপর। এ ছাড়া মকমলে বা রেশমে মোড়া চৌকি-সোফার অরণ্য। কাঁচের আলমারিতে জমকালো-বাঁধানো ইংরেজি বই, ঝাড়ন-হস্ত বেহারা ছাড়া কোনো মানুষ তার উপর হস্তক্ষেপ করে না— টিপাইয়ে আছে অ্যাল্‌বাম, তার কোনোটাতে ঘরের লোকের ছবি, কোনোটাতে বিদেশিনী অ্যাক্ট্রেসদের।

অন্তঃপুরে একতলার ঘরগুলো অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, ধোঁয়ায় ঝুলে কালো। উঠোনে আবর্জনা— সেখানে জলের কল, বাসন মাজা কাপড় কাচা চলছেই, যখন ব্যবহার নেই তখনও কল প্রায় খোলাই থাকে। উপরের বারান্দা থেকে মেয়েদের ভিজে কাপড় ঝুলছে, আর দাঁড়ের কাকাতুয়ার উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে উঠোনে। বারান্দার দেয়ালের যেখানে-সেখানে পানের পিকের দাগ ও নানাপ্রকার মলিনতার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন। উঠোনের পশ্চিম দিকের রোয়াকের পশ্চাতে রান্নাঘর, সেখান থেকে রান্নার গন্ধ ও কয়লার ধোঁয়া উপরের ঘরে সর্বত্রই প্রসার লাভ করে। রান্নাঘরের বাইরে প্রাচীরবদ্ধ অল্প একটু জমি আছে, তারই এক কোণে পোড়া কয়লা, চুলোর ছাই, ভাঙা গামলা, ছিন্ন ধামা, জীর্ণ ঝাঁঝরি রাশীকৃত; অপর প্রান্তে গুটি-দুয়েক গাই ও বাছুর বাঁধা, তাদের খড় ও গোবর জমছে, এবং সমস্ত প্রাচীর ঘুঁটের চক্রে আচ্ছন্ন। এক ধারে একটি মাত্র নিমগাছ, তার গুঁড়িতে গোরু বেঁধে বেঁধে বাকল গেছে উঠে, আর ক্রমাগত ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তার পাতা কেড়ে নিয়ে

গাছটাকে জেরবার করে দিয়েছে। অন্তঃপুরে এই একটুমাত্র জমি, বাকি সমস্ত জমি বাইরের দিকে। সেটা লতামণ্ডপে, বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে, ছাঁটা ঘাসের মাঠে, খোয়া ও সুরকি -দেওয়া রাস্তায়, পাথরের মূর্তি ও লোহার বেঞ্চিতে সুসজ্জিত।

অন্দরমহলে তেতলায় কুমুদিনীর শোবার ঘর। মস্ত বড়ো খাট মেহগনি কাঠের ; ফ্রেমে নেটের মশারি, তাতে সিল্কের ঝালর। বিছানার পায়ের দিকে পুরো বহরের একটা নিরাবরণ মেয়ের ছবি, বুকের উপর দুই হাত চেপে লজ্জার ভান করছে। শিয়রের দিকে মধুসূদনের নিজের অয়েলপেন্টিং, তাতে তার কাশ্মীরি শালের কারুকার্যটাই সবচেয়ে প্রকাশমান। এক দিকে দেয়ালের গায়ে কাপড় রাখবার দেরাজ, তার উপরে আয়না ; আয়নার দু দিকে দুটো চীনেমাটির শামাদান, সামনে চীনেমাটির থালির উপর পাউডারের কৌটো, রুপো-বাঁধানো চিরুনি, তিন-চার রকমের এসেন্স, এসেন্স ছিটোবার পিচকারি এবং আরও নানা রকমের প্রসাধনের সামগ্রী, বিলিতি অ্যাসিস্টান্টের কেনা। নানাশাখাযুক্ত গোলাপি কাঁচের ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। আর-এক দিকে লেখবার টেবিল, তাতে দামি পাথরের দোয়াতদান, কলম ও কাগজকাটা। ইতস্তত মোটা গদিওআলা সোফা ও কেদারা— কোথাও বা টিপাই, তাতে চা খাওয়া যায়, তাসখেলা যেতেও পারে। নতুন মহারানীর উপযুক্ত শয়নঘর কী রকম হওয়া বিধিসংগত এ কথা মধুসূদনকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। এমন হয়ে উঠল, যেন অন্দরমহলের সর্বোচ্চতলার এই ঘরটি ময়লা কাঁথা গায়ে-দেওয়া ভিখিরির মাথায় জরিজহরাত-দেওয়া পাগড়ি।

অবশেষে একসময়ে গোলমাল-ধুমধামের বানডাকা দিন পার হয়ে রাত্রিবেলা কুমু এই ঘরে এসে পৌঁছোল। তাকে নিয়ে এল সেই মোতির মা। সে ওর সঙ্গে আজ রাত্রে শোবে ঠিক হয়েছে। আরও একদল মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। তাদের কৌতূহল ও আমোদের নেশা মিটতে চায় না— মোতির মা তাদের বিদায় করে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে এসেই এক হাতে সে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি কিছুখনের জন্যে যাই ওই পাশের ঘরে— তুমি একটু কেঁদে নাও ভাই, চোখের জল যে বুক ভরে জমে উঠেছে।" বলে সে চলে গেল।

কুমু চৌকির উপর বসে পড়ল। কান্না পরে হবে, এখন ওর বড়ো দরকার হয়েছে নিজেকে ঠিক করা। ভিতরে ভিতরে সকলের চেয়ে যে-ব্যথাটা ওকে বাজছিল সে হচ্ছে নিজের কাছে নিজের অপমান। এতকাল ধরে ও যা-কিছু সংকল্প করে এসেছে ওর বিদ্রোহী মন সম্পূর্ণ তার উলটো দিকে চলে গেছে। সেই মনটাকে শাসন করবার একটুও সময় পাচ্ছিল না। ঠাকুর, বল দাও, বল দাও, আমার জীবন কালি করে

দিয়ো না। আমি তোমার দাসী, আমাকে জয়ী করো, সে জয় তোমারই।

পরিণতবয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা ঘরে ঢুকেই বললে, "মোতির মা তোমাকে একটু ছুটি দিয়েছে সেই ফাঁকে এসেছি ; কাউকে তো কাছে ঘেঁষতে দেবে না, বেড়ে রাখবে তোমাকে— যেন সিঁধকাটি নিয়ে বেড়াচ্ছি, ওর বেড়া কেটে তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাব। আমি তোমার জা, শ্যামাসুন্দরী ; তোমার স্বামী আমার দেওর। আমরা তো ভেবেছিলুম শেষ পর্যন্ত জমাখরচের খাতাই হবে ওর বউ। তা ওই খাতার মধ্যে জাদু আছে ভাই, এত বয়সে এমন সুন্দরী ওই খাতার জোরেই জুটল। এখন হজম করতে পারলে হয়। ওইখানে খাতার মন্তর খাটে না। সত্যি করে বলো ভাই, আমাদের বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?"

কুমু অবাক হয়ে রইল, কী জবাব দেবে ভেবেই পেলে না। শ্যামা বলে উঠল, "বুঝেছি, তা পছন্দ না হলেই বা কী, সাত পাক যখন ঘুরেছ তখন একুশ পাক উলটো ঘুরলেও ফাঁস খুলবে না।"

কুমু বললে, "এ কী কথা বলছ দিদি !"

শ্যামা জবাব দিলে, "খোলসা করে কথা বললেই কি দোষ হয় বোন ? মুখ দেখে কি বুঝতে পারি নে ? তা দোষ দেব না তোমাকে। ও আমাদের আপন বলেই কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছি ? বড়ো শক্ত হাতে পড়েছ বউ, বুঝে সুঝে চোলো।"

এমন সময় মোতির মাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বলে উঠল, "ভয় নেই, ভয় নেই, বকুলফুল, যাচ্ছি আমি। ভাবলুম তুমি নেই এই ফাঁকে আমাদের নতুন বউকে একবার দেখে আসি গে। তা সত্যি বটে, এ কৃপণের ধন, সাবধানে রাখতে হবে। সইকে বলছিলুম আমাদের দেওরের এ যেন হল আধ-কপালে মাথাধরা ; বউকে ধরেছে ওর বাঁ দিকের পাওয়ার-কপালে, এখন ডান দিকের রাখার-কপালে যদি ধরতে পারে তবেই পুরোপুরি হবে।"

এই বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্ত পরে ঘরে ঢুকে কুমুর সামনে পানের ডিবে খুলে ধরে বললে, "একটা পান নেও। দোক্তা খাওয়া অভ্যেস আছে ?"

কুমু বললে, "না।" তখন এক টিপ দোক্তা নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিয়ে শ্যামা মন্দগমনে বিদায় নিলে।

"এখনই বদ্দিমাসিকে খাইয়ে বিদায় করে আসছি, দেরি হবে না" বলে মোতির মা চলে গেল।

শ্যামাসুন্দরী কুমুর মনের মধ্যে ভারি একটা বিস্বাদ জাগিয়ে দিলে। আজকে কুমুর সবচেয়ে দরকার ছিল মায়ার আবরণ, সেইটেই সে আপন মনে গড়তে বসেছিল,

আর যে-সৃষ্টিকর্তা দ্যুলোকে ভূলোকে নানা রঙ নিয়ে রূপের লীলা করেন, তাঁকেও সহায় করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় শ্যামা এসে ওর স্বপ্ন-বোনা জালে ঘা মারলে। কুমু চোখ বুজে খুব জোর করে নিজেকে বলতে লাগল, 'স্বামীর বয়স বেশি বলে তাঁকে ভালোবাসি নে এ কথা কখনোই সত্য নয়— লজ্জা লজ্জা। এ যে ইতর মেয়েদের মতো কথা!' শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ের কথা কি ওর মনে নেই? শিবনিন্দুকেরা তাঁর বয়স নিয়ে খোঁটা দিয়েছিল, কিন্তু সে কথা সতী কানে নেন নি।

স্বামীর বয়স বা রূপ নিয়ে এ পর্যন্ত কুমু কোনো চিন্তাই করে নি। সাধারণত যে-ভালোবাসা নিয়ে স্ত্রীপুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যার মধ্যে রূপগুণ দেহমন সমস্তই মিলে আছে, তার যে প্রয়োজন আছে এ কথা কুমু ভাবেও নি। পছন্দ করে নেওয়ার কথাটাকেই রং মাখিয়ে চাপা দিতে চায়।

এমন সময় ফুলকাটা জামা ও জরির পাড়ওআলা ধুতি-পরা ছেলে, বয়স হবে বছর সাতেক, ঘরে ঢুকেই গা ঘেঁষে কুমুর কাছে এসে দাঁড়াল। বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ চোখ ওর মুখের দিকে তুলে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে মিষ্টি স্বরে বললে, "জ্যাঠাইমা।" কুমু তাকে কোলের উপর টেনে নিয়ে বললে, "কী বাবা, তোমার নাম?" ছেলেটি খুব ঘটা করে বললে, শ্রীটুকুও বাদ দিলে না, "শ্রীমোতিলাল ঘোষাল।" সকলের কাছে পরিচয় ওর হাবলু বলে। সেইজন্যেই উপযুক্ত দেশকালপাত্রে নিজের সম্মান রাখবার জন্যে পিতৃদত্ত নামটাকে এত সুসম্পূর্ণ করে বলতে হয়। তখন কুমুর বুকের ভিতরটা টনটন করছিল— এই ছেলেকে বুকে চেপে ধরে যেন বাঁচল। হঠাৎ কেমন মনে হল কতদিন ঠাকুরঘরে যে-গোপালকে ফুল দিয়ে এসেছে, এই ছেলেটির মধ্যে সে-ই ওর কোলে এসে বসল। ঠিক যে-সময়ে ডাকছিল সেই দুঃখের সময়েই এসে ওকে বললে, "এই যে আমি আছি তোমার সান্ত্বনা।" মোতির গোল গোল গাল টিপে ধরে কুমু বললে, "গোপাল, ফুল নেবে?"

কুমুর মুখ দিয়ে গোপাল ছাড়া আর কোনো নাম বেরোল না। হঠাৎ নিজের নামান্তরে হাবলুর কিছু বিস্ময় বোধ হল— কিন্তু এমন স্বর ওর কানে পৌঁচেছে যে, কিছু আপত্তি ওর মনে আসতে পারে না।

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে মোতির মা ছেলের গলা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে বললে, "ওই রে, বাঁদর-ছেলেটা এসেছে বুঝি।" শ্রীমোতিলাল ঘোষাল-এর সম্মান আর থাকে না। নালিশে-ভরা চোখ তুলে নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে সে চেয়ে রইল, ডান হাতে জ্যাঠাইমার আঁচল চেপে। কুমু হাবলুকে তার বাঁ হাত দিয়ে বেড়ে নিয়ে বললে, "আহা, থাক্ না।"

"না ভাই, অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন শুতে যাক— এ বাড়িতে ওকে খুব সহজেই মিলবে, ওর মতো সস্তা ছেলে আর কেউ নেই।" বলে মোতির মা অনিচ্ছুক ছেলেকে শোয়াবার জন্যে নিয়ে গেল। এই এতটুকুতেই কুমুর মনের ভার গেল হালকা হয়ে। ওর মনে হল প্রার্থনার জবাব পেলুম, জীবনের সমস্যা সহজ হয়ে দেখা দেবে এই ছোটো ছেলেটির মতোই।

২৩

অনেক রাত্তিরে মোতির মা এক সময়ে জেগে উঠে দেখলে কুমু বিছানায় উঠে বসে আছে, তার কোলের উপর দুই হাত জোড়া, ধ্যানাবিষ্ট চোখ দুটি যেন সামনে কাকে দেখতে পাচ্ছে। মধুসূদনকে যতই সে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে বাধা পায়, ততই তার দেবতাকে দিয়ে সে তার স্বামীকে আবৃত করতে চায়। স্বামীকে উপলক্ষ করে আপনাকে সে দান করছে তার দেবতাকে। দেবতা তাঁর পূজাকে বড়ো কঠিন করেছেন, এ প্রতিমা স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই তো ভক্তির পরীক্ষা। শালগ্রামশিলা তো কিছুই দেখায় না, ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্ছে না সেইখানেই দেখব এই হোক আমার সাধনা, যেখানে ঠাকুর লুকিয়ে থাকেন সেইখানে গিয়েই তাঁর চরণে আপনাকে দান করব, তিনি আমাকে এড়াতে পারবেন না।

"মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি"— দাদার কাছে শেখা মীরাবাইএর এই গানটা বারবার মনে-মনে আওড়াতে লাগল।

মধুসূদনের অত্যন্ত রূঢ় যে পরিচয় সে পেয়েছে তাকে কিছুই নয় বলে জলের উপরকার বুদ্‌বুদ বলে উড়িয়ে দিতে চায়— চিরকালের যিনি সত্য, সমস্ত আবৃত করে তিনিই আছেন, "ঔর নাহি কোহি, ঔর নাহি কোহি।" এ ছাড়া আর-একটা পীড়ন আছে তাকেও মায়া বলতে চায়— সে হচ্ছে জীবনের শূন্যতা। আজ পর্যন্ত যাদের নিয়ে ওর সমস্ত কিছু গড়ে উঠেছে, যাদের বাদ দিতে গেলে জীবনের অর্থ থাকে না, তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ— সে নিজেকে বলছে এই শূন্যও পূর্ণ—

"বাপে ছাড়ে, মায়ে ছাড়ে, ছাড়ে সগা সহী,
মীরা প্রভু লগন লগী যো ন হোয়ে হোয়ী।"

ছেড়েছেন তো বাপ, ছেড়েছেন তো মা, কিন্তু তাঁদের ভিতরেই যিনি চিরকালকার তিনি তো ছাড়েন নি। ঠাকুর আরও যা-কিছু ছাড়ান-না কেন, শূন্য ভরাবেন

বলেই ছাড়িয়েছেন। আমি লেগে রইলুম, যা হয় তা হোক। মনের গান কখন তার গলায় ফুটে উঠল তা টেরই পেলে না— দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

মোতির মা কথাটি বললে না, চুপ করে দেখলে, আর শুনলে। তার পরে কুমু যখন অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল তখন মোতির মার মনে একটা চিন্তা দেখা দিল যা পূর্বে আর কখনও ভাবে নি।

ও ভাবতে লাগল, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমরা তো কচি খুকি ছিলুম, মন বলে একটা বালাই ছিল না। ছোটোছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ করে বিনা আয়োজনে মুখে পুরে দেয়, স্বামীর সংসার তেমনি করেই বিনা বিচারে আমাদের গিলেছে, কোথাও কিছু বাধে নি। সাধন করে আমাদের নিতে হয় নি, আমাদের জন্যে দিন-গোনা ছিল অনাবশ্যক। যেদিন বললে ফুলশয্যে সেইদিনই হল ফুলশয্যে, কেননা ফুলশয্যের কোনো মানে ছিল না, সে ছিল একটা খেলা। এই তো কালই হবে ফুলশয্যে, কিন্তু এ মেয়ের পক্ষে সে কতবড়ো বিড়ম্বনা! বড়োঠাকুর এখনও পর; আপন হতে অনেক সময় লাগে। একে ছোঁবে কী করে? এ মেয়ের সেই অপমান সইবে কেন? ধন পেতে বড়োঠাকুরের কত কাল লাগল আর মন পেতে দু-দিন সবুর সইবে না? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি করে মরতে হয়েছে, এ লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাততে হবে না?

এত কথা মোতির মার মনে আসত না। এসেছে তার কারণ, কুমুকে দেখবামাত্রই ও তাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। এই ভালোবাসার পূর্বভূমিকা হয়েছিল স্টেশনে যখন সে দেখেছিল বিপ্রদাসকে। যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন। বীরের মতো তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মতো শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। মোতির মার মনে হয়েছিল কেউ যদি কিছু না বলে তবে একবার ওর পা দুটো ছুঁয়ে আসি। সেই রূপ আজও সে ভুলতে পারে নি। তার পরে যখন কুমুকে দেখলে, মনে মনে বললে, দাদারই বোন বটে!

একরকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের— সে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে মোতির মা এই রহস্য নিজের মধ্যে বোঝবার সময় পায় নি— কিন্তু কুমুর ভিতর দিয়ে এই কথাটা সে নিশ্চিত করে অনুভব করলে। তার গা কেমন করতে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে— যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে। মোতির

মা রেগে উঠে মনে মনে বললে, 'দেবতার মুখে ছাই! যে-দেবতা ওর বিপদ ঘটিয়েছে সেই নাকি ওকে উদ্ধার করবে! হায় রে!'

২৪

পরের দিন সকালেই কুমু দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, "ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।" সেই টেলিগ্রামের কাগজখানি জামার মধ্যে বুকের কাছে রেখে দিলে। এই টেলিগ্রামে যেন দাদার দক্ষিণ হাতের স্পর্শ। কিন্তু দাদা নিজের শরীরের কথা কেন কিছুই লিখলে না? তবে কি অসুখ বেড়েছে? দাদার সব খবরই মুহূর্তে মুহূর্তে যার প্রত্যক্ষগোচর ছিল, আজ তার কাছে সবই অবরুদ্ধ।

আজ ফুলশয্যে, বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। আত্মীয় মেয়েরা সমস্তদিন কুমুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কিছুতে তাকে একলা থাকতে দিলে না। আজ একলা থাকবার বড়ো দরকার ছিল।

শোবার ঘরের পাশেই ওর নাবার ঘর; সেখানে জলের কল পাতা এবং ধারা-স্নানের ঝাঁঝরি বসানো। কোনো অবকাশে বাক্স থেকে যুগল-রূপের ফ্রেমে-বাঁধানো পটখানি বের করে স্নানের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। সাদা পাথরের জলচৌকির উপর পট রেখে সামনে মাটিতে বসে নিজের মনে বারবার করে বললে, 'আমি তোমারই, আজ তুমিই আমাকে নাও। সে আর কেউ নয়, সে তুমিই, সে তুমিই, সে তুমিই। তোমারই যুগল-রূপ প্রকাশ হোক আমার জীবনে।'

ডাক্তাররা বলছে বিপ্রদাসের ইনফ্লুয়েঞ্জা ন্যুমোনিয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। নবগোপাল একলা কলকাতায় এল ফুলশয্যার সওগাত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। খুব ঘটা করেই সওগাত পাঠানো হল। বিপ্রদাস নিজে থাকলে এত আড়ম্বর করত না।

কুমুর বিবাহ উপলক্ষে ওর বড়ো বোন চারজনকেই আনতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু খবর রটে গেছে— ঘোষালরা সদব্রাহ্মণ নয়। বাড়ির লোক এ-বিয়েতে কিছুতে তাদের পাঠাতে রাজি হল না। কুমুর তৃতীয় বোন যদি বা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে বিয়ের পরদিন কলকাতায় এসে পৌঁছোল, নবগোপাল বললে, "ও বাড়িতে তুমি গেলে আমাদের মান থাকবে না।" বিবাহরাত্রির কথা আজও সে ভুলতে পারে নি। তাই প্রায়-অসম্পর্কীয় গুটিকয়েক ছোটো ছোটো মেয়ে এক বুড়ি দাসীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে নিমন্ত্রণ রাখতে। কুমু বুঝলে, সন্ধি এখনও হল না, হয়তো কোনো কালে হবে না।

কুমুর সাজসজ্জা হল। ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের ঠাট্টার পালা শেষ হয়েছে— নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো শুরু হবে। মধুসূদন আগে থাকতেই বলে রেখেছিল, বেশি রাত করলে চলবে না, কাল ওর কাজ আছে। ন-টা বাজবামাত্রই হুকুম-মতো নীচের উঠোন থেকে সশব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। আর এক মুহূর্ত না। সময় অতিক্রম করবার সাধ্য কারও নেই। সভা ভঙ্গ হল। আকাশ থেকে বাজপাখির ছায়া দেখতে পেয়ে কপোতীর যেমন করে, কুমুর বুকটা তেমনি কাঁপতে লাগল। তার ঠাণ্ডা হাত ঘামছে, তার মুখ বিবর্ণ। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মোতির মার হাত ধরে বললে, "আমাকে একটুখানির জন্যে কোথাও নিয়ে যাও আড়ালে। দশ মিনিটের জন্যে একলা থাকতে দাও।" মোতির মা তাড়াতাড়ি নিজের শোবার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে, "এমন কপালও করেছিলি।"

দশ মিনিট যায়, পনেরো মিনিট যায়। লোক এল— বর শোবার ঘরে গেছে, বউ কোথায়? মোতির মা বললে, "অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন? বউ গায়ের জামা-গয়নাগুলো খুলবে না?" মোতির মা যতক্ষণ পারে ওকে সময় দিতে চায়। অবশেষে যখন বুঝলে আর চলবে না তখন দরজা খুলে দেখে, বউ মূর্ছিত হয়ে মেজের উপর পড়ে আছে।

গোলমাল পড়ে গেল। ধরাধরি করে বিছানার উপর তুলে দিয়ে কেউ জলের ছিটে দেয়, কেউ বাতাস করে। কিছুক্ষণ পরে যখন চেতনা হল, কুমু বুঝতে পারলে না কোথায় সে আছে— ডেকে উঠল, "দাদা।" মোতির মা তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, "ভয় নেই দিদি, এই যে আমি আছি।" বলে ওর মুখটা বুকের উপর তুলে নিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। সবাইকে বললে, "তোমরা ভিড় কোরো না, আমি এখনই ওকে নিয়ে যাচ্ছি।" কানে কানে বলতে লাগল, "ভয় করিস নে ভাই, ভয় করিস নে।" কুমু ধীরে ধীরে উঠল। মনে মনে ঠাকুরের নাম করে প্রণাম করলে। ঘরের অন্য পাশে একটা তক্তাপোশের উপর হাবলু গভীর ঘুমে মগ্ন— তার পাশে গিয়ে তার কপালে চুমো খেলে। মোতির মা তাকে শোবার ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এখনও ভয় করছে দিদি?"

কুমু হাতের মুঠো শক্ত করে একটু হেসে বললে, "না, আমার কিছু ভয় করছে না।" মনে মনে বলছে, 'এই আমার অভিসার, বাইরে অন্ধকার ভিতরে আলো।'

মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি।

২৫

ইতিমধ্যে শ্যামাসুন্দরী হাঁপাতে হাঁপাতে মধুকে এসে জানালে, 'বউ মূর্ছো গেছে।' মধুসূদনের মনটা দপ করে জ্বলে উঠল ; বললে, "কেন, তাঁর হয়েছে কী ?"

"তা তো বলতে পারি নে, দাদা দাদা করেই বউ হেদিয়ে গেল। তা একবার কি দেখতে যাবে ?"

"কী হবে! আমি তো ওর দাদা নই।"

"মিছে রাগ করছ ঠাকুরপো, ওরা বড়োঘরের মেয়ে, পোষ মানতে সময় লাগবে।"

"রোজ রোজ উনি মূর্ছো যাবেন আর আমি ওঁর মাথায় কবিরাজি তেল মালিশ করব এইজন্যেই কি ওঁকে বিয়ে করেছিলুম ?"

"ঠাকুরপো, তোমার কথা শুনে হাসি পায়। তা দোষ হয়েছে কী, আমাদের কালে কথায় কথায় মানিনীর মান ভাঙাতে হত, এখন না হয় মূর্ছো ভাঙাতে হবে।"

মধুসূদন গোঁ হয়ে বসে রইল। শ্যামাসুন্দরী বিগলিত করুণায় কাছে এসে হাত ধরে বললে, "ঠাকুরপো, অমন মন খারাপ কোরো না, দেখে সইতে পারি নে।"

মধুসূদনের এত কাছে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয় ইতিপূর্বে এমন সাহস শ্যামার ছিল না। প্রগল্‌ভা শ্যামা ওর কাছে ভারি চুপ করে থাকত ; জানত মধুসূদন বেশি কথা সইতে পারে না। মেয়েদের সহজ বুদ্ধি থেকে শ্যামা বুঝেছে মধুসূদন আজ সে-মধুসূদন নেই। আজ ও দুর্বল, নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে সতর্কতা ওর নেই। মধুর হাতে হাত দিয়ে বুঝল এটা ওর খারাপ লাগে নি। নববধূ ওর অভিমানে যে ঘা দিয়েছে, কোনো একটা জায়গা থেকে চিকিৎসা পেয়ে ভিতরে ভিতরে একটু আরাম বোধ হয়েছে। শ্যামা অন্তত ওকে অনাদর করে না, এটা তো নিতান্ত তুচ্ছ কথা নয়। শ্যামা কি কুমুর চেয়ে কম সুন্দরী, না হয় ওর রঙ একটু কালো— কিন্তু ওর চোখ, ওর চুল, ওর রসালো ঠোঁট!

শ্যামা বলে উঠল, "ওই আসছে বউ, আমি যাই ভাই। কিন্তু দেখো ওর সঙ্গে রাগারাগি কোরো না, আহা ও ছেলেমানুষ!"

কুমু ঘরে ঢুকতেই মধুসূদন আর থাকতে পারলে না, বলে উঠল, "বাপের বাড়ি থেকে মূর্ছো অভ্যেস করে এসেছ বুঝি ? কিন্তু আমাদের এখানে ওটা চলতি নেই। তোমাদের ওই নুরনগরি চাল ছাড়তে হবে।"

কুমু নির্নিমেষ চোখ মেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, একটি কথাও বললে না।

মধুসূদন ওর মৌন দেখে আরও রেগে গেল। মনের গভীর তলায় এই মেয়েটির

মন পাবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে বলেই ওর এই তীব্র নিষ্ফল রাগ। বলে উঠল, "আমি কাজের লোক, সময় কম, হিস্‌টিরিয়া-ওআলী মেয়ের খেদ্‌মদ্‌গারি করবার ফুরসৎ আমার নেই, এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।"

কুমু ধীরে ধীরে বললে, "তুমি আমাকে অপমান করতে চাও? হার মানতে হবে। তোমার অপমান মনের মধ্যে নেব না।"

কুমু কাকে এ-সব কথা বলছে? ওর বিস্ফারিত চোখের সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে? মধুসূদন অবাক হয়ে গেল, ভাবলে এ মেয়ে ঝগড়া করে না কেন! এর ভাবখানা কী?

মধুসূদন বক্রোক্তি করে বললে, "তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর-এক হাটে বেচতে পারি।"

ও যে কুমুর দাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা কুমুর মনে দেগে দেবার জন্যে মূঢ় আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না।

কুমু বললে, "দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হোয়ো, কিন্তু ছোটো হোয়ো না।" বলে সোফার উপর বসে পড়ল।

কর্কশস্বরে মধুসূদন বলে উঠল, "কী! আমি ছোটো! আর তোমার দাদা আমার চেয়ে বড়ো?"

কুমু বললে, "তোমাকে বড়ো জেনেই তোমার ঘরে এসেছি।"

মধুসূদন ব্যঙ্গ করে বললে, "বড়ো জেনেই এসেছ, না, টাকার লোভে?"

তখন কুমু সোফা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে খোলা ছাদে মেজের উপর গিয়ে বসল।

কলকাতায় শীতকালের কৃপণ রাত্রি, ধোঁয়ায় কুয়াশায় ঘোলা, আকাশ অপ্রসন্ন, তারার আলো যেন ভাঙা গলার কথার মতো। কুমুর মন তখন অসাড়, কোনো ভাবনা নেই, কোনো বেদনা নেই। একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে সে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।

কুমু যে এমন করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাবে মধুসূদন এ একেবারে ভাবতেই পারে নি। নিজের এই পরাভবের জন্যে সকলের চেয়ে রাগ হচ্ছে কুমুর দাদার উপর। শোবার ঘরে চৌকির উপরে বসে পড়ে শূন্য আকাশের দিকে সে একটা ঘুষি নিক্ষেপ করলে। খানিকক্ষণ বসে থেকে ধৈর্য আর রাখতে পারলে না। ধড়ফড় করে উঠে ছাদে বেরিয়ে ওর পিছনে গিয়ে ডাকলে, "বড়োবউ!"

কুমু চমকে উঠে পিছন ফিরে দাঁড়ালে।

"ঠাণ্ডায় হিমে বাইরে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ ? চলো ঘরে।"

কুমু অসংকোচে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মধুসূদনের মধ্যে যেটুকু প্রভুত্বের জোর ছিল তা গেল উড়ে। কুমুর বাঁ হাত ধরে আস্তে আস্তে বললে, "এসো ঘরে।"

কুমুর ডান হাতে তার দাদার আশীর্বাদের সেই টেলিগ্রাম ছিল, সেটা সে বুকে চেপে ধরল। স্বামীর হাত থেকে হাত টেনে নিলে না, নীরবে ধীরে ধীরে শোবার ঘরে ফিরে গেল।

২৬

পরদিন ভোরে যখন কুমু বিছানায় উঠে বসেছে তখন ওর স্বামী ঘুমোচ্ছে। কুমু তার মুখের দিকে চাইলে না, পাছে মন বিগড়ে যায়। অতি সাবধানে উঠে পায়ের কাছে প্রণাম করলে, তার পরে স্নান করবার ঘরে গেল। স্নান সারা হলে পর পিছন দিকের দরজা খুলে গিয়ে বসল ছাদে, তখন কুয়াশার ভিতর দিয়ে পূর্ব-আকাশে একটা মলিন সোনার রেখা দেখা দিয়েছে।

বেলা হল, রোদ্দুর উঠল যখন, কুমু আস্তে আস্তে শোবার ঘরে ফিরে এসে দেখলে তার স্বামী তখন চলে গেছে। আয়নার দেরাজের উপর তার পুঁতির কাজ-করা থলিটি ছিল। তার মধ্যে দাদার টেলিগ্রামের কাগজটি রাখবার জন্যে সেটা খুলেই দেখতে পেলে সেই নীলার আংটি নেই।

সকালবেলাকার মানসপূজার পর তার মুখে যে একটি শান্তির ভাব এসেছিল সেটা মিলিয়ে গিয়ে চোখে আগুন জ্বলে উঠল। কিছু মিষ্টি ও দুধ খাওয়াবে বলে ডাকতে এল মোতির মা। কুমুর মুখে জবাব নেই, যেন কঠিন পাথরের মূর্তি!

মোতির মা ভয় পেয়ে পাশে এসে বসল—জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে, ভাই ?" কুমুর মুখে কথা বেরোল না, ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

"বলো দিদি, আমাকে বলো, কোথায় তোমার বেজেছে ?"

কুমু রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললে, "নিয়ে গেছে চুরি করে!"

"কী নিয়ে গেছে দিদি ?"

"আমার আংটি—আমার দাদার আশীর্বাদী আংটি।"

"কে নিয়ে গেছে ?"

কুমু উঠে দাঁড়িয়ে কারও নাম না করে বাইরের অভিমুখে ইঙ্গিত করলে।

"শান্ত হও ভাই, ঠাট্টা করেছে তোমার সঙ্গে, আবার ফিরিয়ে দেবে।"

"নেব না ফিরিয়ে— দেখব কত অত্যাচার করতে পারে ও!"

"আচ্ছা, সে হবে পরে, এখন মুখে কিছু দেবে এসো।"

"না; পারব না ; এখানকার খাবার গলা দিয়ে নাববে না।"

"লক্ষ্মীটি ভাই, আমার খাতিরে খাও।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ থেকে আমার নিজের বলে কিছুই রইল না?"

"না, রইল না। যা-কিছু রইল তা স্বামীর মর্জির উপরে। জান না, চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত করতে হবে?"

দাসী! মনে পড়ল, রঘুবংশের ইন্দুমতীর কথা—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—

ফর্দের মধ্যে দাসী তো কোথাও নেই। সত্যবানের সাবিত্রী কি দাসী? কিম্বা উত্তররামচরিতের সীতা?

কুমু বললে, "স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ জাতের লোক?"

"ও মানুষকে এখনও চেন নি। ও যে কেবল অন্যকে গোলামি করায় তা নয়, নিজের গোলামি নিজে করে। যেদিন আপিসে যেতে পারে না, নিজের বরাদ্দ থেকে সেদিনকার টাকা কাটা পড়ে। একবার ব্যামো হয়ে এক মাসের বরাদ্দ বন্ধ ছিল, তার পরের দু-তিন মাস খাইখরচ পর্যন্ত কমিয়ে লোকসান পুষিয়ে নিয়েছে। এতদিন আমি ঘরকন্নার কাজ চালিয়ে আসছি সেই অনুসারে আমারও মাসহারা বরাদ্দ। আত্মীয় বলে ও কাউকে মানে না। এ বাড়িতে কর্তা থেকে চাকর-চাকরানী পর্যন্ত সবাই গোলাম।"

কুমু একটু চুপ করে থেকে বললে, "আমি সেই গোলামিই করব। আমার রোজকার খোরপোশ হিসেবমত রোজ রোজ শোধ করব। আমি এ বাড়িতে বিনা মাইনের স্ত্রী-বাঁদী হয়ে থাকব না। চলো আমাকে কাজে ভরতি করে নেবে। ঘরকন্নার ভার তোমার উপরেই তো— আমাকে তুমি তোমার অধীনে খাটিয়ে নিয়ো, আমাকে রানী বলে কেউ যেন ঠাট্টা না করে।"

মোতির মা হেসে কুমুর চিবুক ধরে বললে, "তা হলে তো আমার কথা মানতে হবে। আমি হুকুম করছি, চলো এখন খেতে।"

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে কুমু বললে, "দেখো ভাই, নিজেকে দেব বলেই

তৈরি হয়ে এসেছিলুম, কিন্তু ও কিছুতেই দিতে দিলে না। এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।"

মোতির মা বললে, "কাঠুরে গাছকে কাটতেই জানে, সে গাছ পায় না কাঠ পায়। মালী গাছকে রাখতে জানে, সে পায় ফুল, পায় ফল। তুমি পড়েছ 'কাঠুরের হাতে, ও যে ব্যাবসাদার। ওর মনে দরদ নেই কোথাও।"

এক সময়ে শোবার ঘরে ফিরে এসে কুমু দেখলে, তার টিপাইয়ের উপর একশিশি লজেঞ্চস। হাবলু তার ত্যাগের অর্ঘ্য গোপনে নিবেদন করে নিজে কোথায় লুকিয়েছে। এখানে পাষাণের ফাঁক দিয়েও ফুল ফোটে। বালকের এই লজেঞ্চসের ভাষায় একসঙ্গে ওকে কাঁদালে হাসালে। তাকে খুঁজতে বেরিয়ে দেখে বাইরে সে দরজার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মা তাকে এ ঘরে যাতায়াত করতে বারণ করেছিল। তার ভয় ছিল পাছে কোনো কিছু উপলক্ষে কর্তার বিরক্তি ঘটে। মোটের উপরে মধুসূদনের নিজের কাজ ছাড়া অন্য বাবদে তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই নিরাপদ, এ কথা এ বাড়ির সবাই জানে।

কুমু হাবলুকে ধরে ঘরে নিয়ে এসে কোলে বসালে। ওর গৃহসজ্জার মধ্যে পুতুল-জাতীয় যা-কিছু জিনিস ছিল সেইগুলো দুজনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কুমু বুঝতে পারলে একটা কাগজচাপা হাবলুর ভারি পছন্দ— কাঁচের ভিতর দিয়ে রঙিন ফুল যে কী করে দেখা যাচ্ছে সেইটে বুঝতে না পেরে ওর ভারি তাক লেগেছে।

কুমু বললে, "এটা নেবে গোপাল ?"

এতবড়ো অভাবনীয় প্রস্তাব ওর বয়সে কখনও শোনে নি। এমন জিনিসও কি ও কখনও আশা করতে পারে ? বিস্ময়ে সংকোচে কুমুর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইল।

কুমু বললে, "এটা তুমি নিয়ে যাও।"

হাবলু আহ্লাদ রাখতে পারলে না— সেটা হাতে নিয়েই লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেল।

সেইদিন বিকেলে হাবলুর মা এসে বললে, "তুমি করেছ কী ভাই ? হাবলুর হাতে কাঁচের কাগজচাপা দেখে বড়োঠাকুর হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েছে। কেড়ে তো নিয়েইছে — তার পর তাকে চোর বলে মার। ছেলেটাও এমনি, তোমার নামও করে নি। হাবলুকে আমিই যে জিনিসপত্র চুরি করতে শেখাচ্ছি এ কথাও ক্রমে উঠবে।"

কুমু কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে বসে রইল।

এমন সময়ে বাইরে মচ্‌মচ্‌ শব্দে মধুসূদন আসছে। মোতির মা তাড়াতাড়ি

পালিয়ে গেল। মধুসূদন কাঁচের কাগজচাপা হাতে করে যথাস্থানে ধীরে ধীরে সেটা গুছিয়ে রাখলে। তার পরে নিশ্চিতপ্রত্যয়ের কণ্ঠে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "হাবলু তোমার ঘর থেকে এটা চুরি করে নিয়েছিল। জিনিসপত্র সাবধান করে রাখতে শিখো।"

কুমু তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, "ও চুরি করে নি।"

"আচ্ছা, বেশ, তা হলে সরিয়ে নিয়েছে।"

"না, আমিই ওকে দিয়েছি।"

"এমনি করে ওর মাথা খেতে বসেছ বুঝি? একটা কথা মনে রেখো, আমার হুকুম ছাড়া জিনিসপত্র কাউকে দেওয়া চলবে না। আমি এলোমেলো কিছুই ভালোবাসি নে।"

কুমু দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তুমি নাও নি আমার নীলার আংটি?"

মধুসূদন বললে, "হাঁ নিয়েছি।"

"তাতেও তোমার ওই কাঁচের ঢেলাটার দাম শোধ হল না?"

"আমি তো বলেছিলুম, ওটা তুমি রাখতে পারবে না।"

"তোমার জিনিস তুমি রাখতে পারবে, আর আমার জিনিস আমি রাখতে পারব না?"

"এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।"

"কিছু নেই? তবে রইল তোমার এই ঘর পড়ে।"

কুমু যেই গেছে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে শ্যামা ঘরে প্রবেশ করে বললে, "বউ কোথায় গেল?"

"কেন?"

"সকাল থেকে ওর খাবার নিয়ে বসে আছি, এ বাড়িতে এসে বউ কি খাওয়াও বন্ধ করবে?"

"তা হয়েছে কী? নূরনগরের রাজকন্যা না হয় নাই খেলেন? তোমরা কি ওঁর বাঁদী নাকি?

"ছি ঠাকুরপো, ছেলেমানুষের উপর অমন রাগ করতে নেই। ও যে এমন না খেয়ে খেয়ে কাটাবে এ আমরা সহ্য করতে পারি নে। সাধে সেদিন মূর্ছো গিয়েছিল?"

মধুসূদন গর্জন করে উঠল, "কিছু করতে হবে না, যাও চলে! খিদে পেলে আপনিই খাবে।"

শ্যামা যেন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে চলে গেল।

মধুসূদনের মাথায় রক্ত চড়তে লাগল। দ্রুতবেগে নাবার ঘরে জলের ঝাঁঝরি খুলে দিয়ে তার নীচে মাথা পেতে দিলে।

২৭

সন্ধে হয়ে এল, সেদিন কুমুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষকালে দেখা গেল, ভাঁড়ারঘরের পাশে একটা ছোটো কোণের ঘরে যেখানে প্রদীপ পিলসুজ তেলের ল্যাম্প প্রভৃতি জমা করা হয় সেইখানে মেজের উপর মাদুর বিছিয়ে বসে আছে।

মোতির মা এসে জিজ্ঞাসা করলে, "এ কী কাণ্ড দিদি?"

কুমু বললে, "এ বাড়িতে আমি সেজবাতি সাফ করব, আর এইখানে আমার স্থান।"

মোতির মা বললে, "ভালো কাজ নিয়েছ ভাই, এ বাড়ি তুমি আলো করতেই তো এসেছ, কিন্তু সেজন্যে তোমাকে সেজবাতির তদারক করতে হবে না। এখন চলো।"

কুমু কিছুতে নড়ল না।

মোতির মা বললে, "তবে আমি তোমার কাছে শুই।"

কুমু দৃঢ়স্বরে বললে, "না।" মোতির মা দেখলে এই ভালোমানুষ-মেয়ের মধ্যে হুকুম করবার জোর আছে। তাকে চলে যেতে হল।

মধুসূদন রাত্রে শুতে এসে কুমুর খবর নিলে। যখন খবর শুনলে, প্রথমটা ভাবলে, "বেশ তো ওই ঘরেই থাক্‌-না, দেখি কতদিন থাকতে পারে। সাধ্যসাধনা করতে গেলেই জেদ বেড়ে যাবে।"

এই বলে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুতে গেল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। প্রত্যেক শব্দেই মনে হচ্ছে ওই বুঝি আসছে। একবার মনে হল, যেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। যতই রাত হয় মনের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। কুমুকে যে অবজ্ঞা করবে কিছুতেই সে শক্তি পাচ্ছে না। অথচ নিজে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে হার মানবে এটা ওর পলিসি-বিরুদ্ধ। ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে এসে শুল, কিন্তু ঘুম আসে না। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে উঠে পড়ল, কোনোমতেই কৌতূহল সামলাতে পারলে না। একটা লণ্ঠন হাতে করে নিদ্রিত কক্ষশ্রেণী নিঃশব্দপদে পার হয়ে অন্তঃপুরের সেই ফরাশখানার

সামনে এসে একটুক্ষণ কান পেতে রইল, ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। সাবধানে দরজা খুলে দেখে, কুমু মেজের উপর একটা মাদুর পেতে শুয়ে, সেই মাদুরের এক প্রান্ত গুটিয়ে সেইটেকে বালিশ করেছে। মধুসূদনের যেমন ঘুম নেই, কুমুরও তেমনি ঘুম না থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু দেখলে সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে; এমন-কি তার মুখের উপর যখন লণ্ঠনের আলো ফেললে তাতেও ঘুম ভাঙল না। এমন সময় কুমু একটুখানি উস্‌খুস্ করে পাশ ফিরলে। গৃহস্থের জাগার লক্ষণ দেখে চোর যেমন করে পালায় মধুসূদন তেমনি তাড়াতাড়ি পালাল। ভয় হল পাছে কুমু ওর পরাভব দেখতে পায়, পাছে মনে মনে হাসে।

বাতির ঘর থেকে মধুসূদন বেরিয়ে এসে বারান্দা বেয়ে খানিকটা যেতেই সামনে দেখে শ্যামা। তার হাতে একটি প্রদীপ।

"একি ঠাকুরপো, এখানে কোথা থেকে এলে ?"

মধুসূদন তার কোনো উত্তর না করে বললে, "তুমি কোথায় যাচ্ছ বউ ?"

"কাল যে আমার ব্রত, ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে তারই জোগাড়ে চলেছি— তোমারও নেমন্তন্ন রইল। কিন্তু তোমাকে দক্ষিণে দেবার মতো শক্তি নেই ভাই।"

মধুসূদনের মুখে একটা জবাব আসছিল, সেটা চেপে গেল।

সেই শেষরাত্রের অন্ধকারে প্রদীপের আলোয় শ্যামাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। শ্যামা একটু হেসে বললে, "আজ ঘুম থেকে উঠেই তোমার মতো ভাগ্যবান পুরুষের মুখ দেখলুম, আমার দিন ভালোই যাবে। ব্রত সফল হবে।"

ভাগ্যবান শব্দটার উপর একটু জোর দিলে— মধুসূদনের কানে কথাটা বিড়ম্বনার মতো শোনাল। কুমুর সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে শ্যামার সাহস হল না। "কাল কিন্তু আমার ঘরে খেতে এসো, মাথা খাও," বলে সে চলে গেল।

ঘরে এসে মধুসূদন বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাইরে লণ্ঠনটা রাখলে, যদি কুমু আসে। কুমুদিনীর সেই সুপ্ত মুখ কিছুতে মন থেকে নড়তে চায় না; আর কেবলই মনে পড়ে কুমুর অতুলনীয় সেই হাতখানি শালের বাইরে এলিয়ে। বিবাহকালে এই হাত যখন নিজের হাতে নিয়েছিল তখন একে সম্পূর্ণ দেখতে পায় নি— আজ দেখে-দেখে চোখের আর আশ মিটতে চায় না। এই হাতের অধিকারটি সে কবে পাবে ? বিছানায় আর টিঁকতে পারে না; উঠে পড়ল। আলো জালিয়ে কুমুর ডেস্কের দেরাজ খুললে। দেখলে সেই পুঁতি-গাঁথা থলিটি। প্রথমেই বেরোল বিপ্রদাসের টেলিগ্রামখানি— "ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন"— তার পরে একখানি ফোটোগ্রাফ,

ওর দুই দাদার ছবি— আর একখানি কাগজের টুকরো, বিপ্রদাসের হাতে-লেখা গীতার এই শ্লোক—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ,
যৎ তপস্যসি, কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।

ঈর্ষায় মধুসূদনের মন ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে বিপ্রদাসকে মনে মনে লোপ করে দিলে। সেই লুপ্তির দিন একদা আসবে ও নিশ্চয় জানে— অল্প অল্প করে স্ক্রু আঁটতে হবে; কিন্তু কুমুদিনীর যে-উনিশটা বছর মধুসূদনের আয়ত্তের বাইরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে এই মুহূর্তেই ছিনিয়ে নিতে পারলে তবেই ও মনে শান্তি পায়। আর কোনো রাস্তা জানে না জবরদস্তি ছাড়া। পুঁতির থলিটি আজ সাহস করে ফেলে দিতে পারলে না— যেদিন আংটি হরণ করে নিয়েছিল সেদিন ওর সাহস আরও বেশি ছিল; তখনও জানত কুমুদিনী সাধারণ মেয়েরই মতো সহজেই শাসনের অধীন, এমন-কি, শাসনই পছন্দ করে। আজ বুঝেছে কুমুদিনী যে কী করতে পারে এবং পারে না কিছু বলবার জো নেই।

কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে, সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই ওর সান্ত্বনা।

এমনি করে ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। কিন্তু শীতরাত্রির অন্ধকার তখনও যায় নি। আর কিছুক্ষণ পরেই আলো উঠবে, আজকের রাত হবে ব্যর্থ। মধুসূদন তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলল— ফরাশখানার সামনে পায়ের শব্দটা বেশ একটু স্পষ্টই ধ্বনিত করলে — দরজাটা শব্দ করেই খুললে— দেখলে ভিতরে কুমু নেই। কোথায় সে?

উঠোনের কলে জল-পড়ার শব্দ কানে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলে, যত রাজ্যের পুরানো অব্যবহার্য মরচে-পড়া পিলসুজগুলো নিয়ে কুমু তেঁতুল দিয়ে মাজছে। এ কেবল ইচ্ছা করে কাজের ভার বাড়াবার চেষ্টা, শীতের ভোরবেলার নিদ্রাহীন দুঃখকে বিস্তারিত করে তোলা।

মধুসূদন উপরের বারান্দা থেকে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। অবলার বলকে কী করে পরাস্ত করতে হয় এই তার ভাবনা। সকালে উঠে বাড়ির লোকে যখন দেখবে কুমু পিলসুজ মাজছে কী ভাববে! যে চাকরের উপরে মাজাঘষার ভার, সেই বা কী মনে করবে? বিশ্বসুদ্ধ লোকের কাছে তাকে হাস্যাস্পদ করবার এমন তো উপায় আর নেই।

একবার মধুসূদনের মনে হল কলতলায় গিয়ে কুমুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়। কিন্তু সকালবেলায় সেই উঠানের মাঝখানে দুজনে বচসা করবে আর বাড়িসুদ্ধ লোকে

তামাশা দেখতে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এই প্রহসনটা কল্পনা করে পিছিয়ে গেল। মেজো ভাই নবীনকে ডাকিয়ে বললে, "বাড়িতে কী সব ব্যাপার হচ্ছে চোখ রাখ কি?"

নবীন ছিল বাড়ির ম্যানেজার। সে ভয় পেয়ে বললে, "কেন দাদা, কী হয়েছে?"

নবীন জানে, দাদার যখন রাগ করবার একটা কারণ ঘটে তখন শাসন করবার একটা মানুষ চাই। দোষী যদি ফস্‌কে যায় তো নির্দোষী হলেও চলে— নইলে ডিসিপ্লিন থাকে না, নইলে সংসারে ওর রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রেস্‌টিজ চলে যায়।

মধুসূদন বললে, "বড়োবউ যে পাগলের মতো কাণ্ডটা করতে বসেছে, তার কারণটা কী সে কি আমি জানি নে মনে কর?"

বড়োবউ কী পাগলামি করছে সে প্রশ্ন করতে নবীন সাহস করলে না পাছে খবর না-জানাটাই একটা অপরাধ বলে গণ্য হয়।

মধুসূদন বললে, "মেজোবউ ওর মাথা বিগড়োতে বসেছেন সন্দেহ নেই।"

বহু সংকোচে নবীন বলতে চেষ্টা করলে, "না, মেজোবউ তো—"

মধুসূদন বললে, "আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

এর উপরে আর কথা খাটে না। স্বচক্ষে দেখার মধ্যে সেই কাগজচাপার ইতিহাসটা নিহিত ছিল।

২৮

মোতির মা যখনই কুমুকে অকৃত্রিম ভালোবাসার সঙ্গে আদরযত্ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখনই নবীন বুঝেছিল এটা সইবে না; বাড়ির মেয়েরা এই নিয়ে লাগালাগি করবে। নবীন ভাবলে সেই রকমের একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু মধুসূদনের আন্দাজি অভিযোগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই; তাতে জেদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ব্যাপারটা কী হয়েছে মধুসূদন তা স্পষ্ট করে বললে না— বোধ করি বলতে লজ্জা করছিল; কী করতে হবে তাও রইল অস্পষ্ট, কেবল ওর মধ্যে যেটুকু স্পষ্ট সে হচ্ছে এই যে, সমস্ত দায়িত্বটা মেজোবউয়েরই, সুতরাং দাম্পত্যের আপেক্ষিক মর্যাদা অনুসারে জবাবদিহির ল্যাজামুড়োর মধ্যে মুড়োর দিকটাই নবীনের ভাগ্যে।

নবীন গিয়ে মোতির মাকে বললে, "একটা ফ্যাসাদ বেধেছে।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"সে জানেন অন্তর্যামী, আর দাদা, আর সম্ভবত তুমি; কিন্তু তাড়া আরম্ভ হয়েছে আমার উপরেই।"

"কেন বলো দেখি ?"

"যাতে আমার দ্বারা তোমার সংশোধন হয়, আর তোমার দ্বারা সংশোধন হয় ওঁর নতুন ব্যবসায়ের নতুন আমদানির।"

"তা আমার উপরে তোমার সংশোধনের কাজটা শুরু করো— দেখি দাদার চেয়ে তোমার হাতযশ আছে কি না।"

নবীন কাতর হয়ে বললে, "দাদার উড়ে চাকরটা ওঁর দামি ডিনার-সেটের একটা পিরিচ ভেঙেছিল, তার জরিমানার প্রধান অংশ আমাকেই দিতে হয়েছে, জান তো— কেননা জিনিসগুলো আমারই জিম্মে। কিন্তু এবারে যে-জিনিসটা ঘরে এল সেও কি আমারই জিম্মে ? তবু জরিমানাটা তোমাতে-আমাতেই বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। অতএব যা করতে হয় করো, আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না মেজোবউ।"

"জরিমানা বলতে কী বোঝায় শুনি।"

"রজবপুরে চালান করে দেবেন। মাঝে মাঝে তো সেইরকম ভয় দেখান।"

"ভয় পাও বলেই ভয় দেখান। একবার তো পাঠিয়েছিলেন, আবার রেলভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হয় নি ? তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল করেন না। জানেন আমাকে ঘরকন্না থেকে বরখাস্ত করলে সেটা একটুও সস্তা হবে না। আর যদি কোথাও এক পয়সাও লোকসান হয় সে-ঠকা ওঁর সইবে না।"

"বুঝলুম, এখন কী করতে হবে বলো না।"

"তোমার দাদাকে বোলো, যতবড়ো রাজাই হোন না, মাইনে করে লোক রেখে রানীর মান ভাঙাতে পারবেন না— মানের বোঝা নিজেকেই মাথায় করে নামাতে হবে। বাসরঘরের ব্যাপারে মুটে ডাকতে বারণ কোরো।"

"মেজোবউ, উপদেশ তাঁকে দেবার জন্যে আমার দরকার হবে না, দুদিন বাদে নিজেরই হুঁশ হবে। ইতিমধ্যে দূতীগিরির কাজটা করো, ফল হোক বা না হোক। দেখাতে পারব নিমক খেয়ে সেটা চুপচাপ হজম করছি নে।"

মোতির মা কুমুকে গেল খুঁজতে। জানত সকালবেলা তাকে পাওয়া যাবে ছাদের উপরে। উঁচু প্রাচীর -দেওয়া ছাদ, তার মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি। এলোমেলো গোটাকতক টব, তাতে গাছ নেই। এক কোণে লোহার জাল -দেওয়া একটা বড়ো ভাঙা চৌকো খাঁচা; তার কাঠের তলাটা প্রায় সবটা জীর্ণ। কোনো এক সময় খরগোশ কিম্বা পায়রা এতে রাখা হত, এখন আচার-আমসত্ত্ব প্রভৃতিকে কাকের চৌর্যবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রোদ্দুরে দেবার কাজে লাগে। এই ছাদ থেকে মাথার উপরকার আকাশ দেখতে পাওয়া যায়, দিগন্ত দেখা যায় না। পশ্চিম-আকাশে একটা লোহার

কারখানার চিমনি। যে দুদিন কুমু এই ছাদে বসেছে ওই চিমনি থেকে উৎসারিত ধূমকুণ্ডলটাই তার একমাত্র দেখবার জিনিস ছিল— সমস্ত আকাশের মধ্যে ওই কেবল একটি যেন সজীব পদার্থ, কোন্ একটা আবেগে ফুলে ফুলে পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে।

পিলসুজ প্রভৃতি মাজা সেরে অন্ধকার থাকতেই স্নান করে পুবদিকে মুখ করে কুমু ছাদে এসে বসেছে। ভিজে চুল পিঠের উপর এলিয়ে দেওয়া— সাজসজ্জার কোনো আভাসমাত্র নেই। একখানি মোটা সুতোর সাদা শাড়ি, সরু কালো পাড়, আর শীতনিবারণের জন্য একটা মোটা এণ্ডি-রেশমের ওড়না।

কিছুদিন থেকে প্রত্যাশিত প্রিয়তমের কাল্পনিক আদর্শকে অন্তরের মাঝখানে রেখে এই যুবতী আপন হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে বসেছিল। তার যত পূজা, যত ব্রত, যত পুরাণকাহিনী, সমস্তই এই কল্পমূর্তিকে সজীব করে রেখেছিল। সে ছিল অভিসারিণী তার মানস-বৃন্দাবনে— ভোরে উঠে সে গান গেয়েছে রামকেলী রাগিণীতে—

হমারে তুমারে সম্প্রীতি লগী হৈ
শুন মনমোহন প্যারে—

যে অনাগত মানুষটির উদ্দেশে উঠছে তার আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য, সমুখে এসে পৌঁছোবার আগেই সে যেন ওর কাছে প্রতিদিন তার পেয়ালা পাঠিয়ে দিয়েছে। বর্ষার রাত্রে খিড়কির বাগানের গাছগুলি অবিশ্রাম ধারাপতনের আঘাতে আপন পল্লবগুলিকে যখন উতরোল করেছে তখন কানাড়ার সুরে মনে পড়েছে তার ওই গান—

বাজে ঝননন মেরে পায়েরিয়া
কৈস করো যাউঁ ঘরোয়ারে।

আপন উদাস মনটার পায়ে পায়ে নূপুর বাজছে ঝননন— উদ্দেশহারা পথে বেরিয়ে পড়েছে, কোনোকালে ফিরবে কেমন করে ঘরে! যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখতে পাচ্ছিল। নিগূঢ় আনন্দ-বেদনার পরিপূর্ণতার দিনে যদি মনের মতো কাউকে দৈবাৎ সে কাছে পেত তা হলে অন্তরের সমস্ত গুঞ্জরিত গানগুলি তখনই প্রাণ পেত রূপে। কোনো পথিক ওর দ্বারে এসে দাঁড়াল না। কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ও একেবারেই ছিল একলা। এমন-কি, ওর সমবয়সী সঙ্গিনীও বিশেষ কেউ ছিল না। তাই এতদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে ওর নিরুদ্ধ ভালোবাসা পূজার ফুল-আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের উদ্দেশ খুঁজেছে। সেইজন্যেই ঘটক যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল কুমু তখন তার ঠাকুরেরই হুকুম

চাইলে— জিজ্ঞাসা করলে, 'এইবার তোমাকেই তো পাব?' অপরাজিতার ফুল বললে, 'এই তো পেয়েইছ।'

অন্তরের এতদিনের এত আয়োজন ব্যর্থ হল— একেবারে ঠন্ করে উঠল পাথরটা, ভরাডুবি হল এক মুহূর্তেই। ব্যথিত যৌবন আজ আবার খুঁজতে বেরিয়েছে; কোথায় দেবে তার ফুল! থালিতে যা ছিল তার অর্ঘ্য, সে যে আজ বিষম বোঝা হয়ে উঠল। তাই আজ এমন করে প্রাণপণে গাইছে, 'মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি।'

কিন্তু আজ এ গান শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পৌঁছোল না কোথাও। এই শূন্যতায় কুমুর মন ভয়ে ভরে উঠল। আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা কি ওই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই কেবল সঙ্গিহীন নিঃশ্বসিত হয়ে উঠবে?

মোতির মা দূরে পিছনে বসে রইল। সকালের নির্মল আলোয় নির্জন ছাদে এই অসজ্জিতা সুন্দরীর মহিমা ওকে বিস্মিত করে দিয়েছে। ভাবছে, এ বাড়িতে, ওকে কেমন করে মানাবে? এখানে যে-সব মেয়ে আছে এর তুলনায় তারা কোন্ জাতের? তারা আপনি ওর থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে, ওর উপরে রাগ করছে কিন্তু ওর সঙ্গে ভাব করতে সাহস করছে না।

বসে থাকতে থাকতে মোতির মা হঠাৎ দেখলে কুমু দুই হাতে তার ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধরে কেঁদে উঠেছে। ও আর থাকতে পারলে না, কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "দিদি আমার, লক্ষ্মী আমার, কী হয়েছে বলো আমাকে।"

কুমু অনেকক্ষণ কথা কইতে পারলে না। একটু সামলে নিয়ে বললে, "আজও দাদার চিঠি পেলুম না, কী হয়েছে তাঁর বুঝতে পারছি নে।"

"চিঠি পাবার কি সময় হয়েছে ভাই?"

"নিশ্চয় হয়েছে। আমি তাঁর অসুখ দেখে এসেছি। তিনি জানেন, খবর পাবার জন্যে আমার মনটা কী রকম করছে।"

মোতির মা বললে, "তুমি ভেবো না, খবর নেবার আমি একটা-কিছু উপায় করব।"

কুমু টেলিগ্রাফ করবার কথা অনেকবার ভেবেছে, কিন্তু কাকে দিয়ে করাবে। যেদিন মধুসূদন নিজেকে ওর দাদার মহাজন বলে বড়াই করেছিল সেইদিন থেকে মধুসূদনের কাছে ওর দাদার উল্লেখমাত্র করতে ওর মুখে বেধে যায়। আজ মোতির মাকে বললে, "তুমি যদি দাদাকে আমার নামে টেলিগ্রাফ করতে পার তো আমি বাঁচি।"

মোতির মা বললে, "তাই করব, ভয় কী?"

কুমু বললে, "তুমি জান, আমার কাছে একটিও টাকা নেই।"

"কী বল, দিদি, তার ঠিক নেই। সংসারখরচের যে টাকা আমার কাছে থাকে, সে তো তোমারই টাকা। আজ থেকে আমি যে তোমারই নিমক খাচ্ছি।"

কুমু জোর করে বলে উঠল, "না না না, এ বাড়ির কিছুই আমার নয়, সিকি পয়সাও না।"

"আচ্ছা ভাই, তোমার জন্যে না হয় আমার নিজের টাকা থেকে কিছু খরচ করব। চুপ করে রইলে কেন? তাতে দোষ কী? টাকাটা আমি যদি অহংকার করে দিতুম, তুমি অহংকার করে না নিতে পারতে। ভালোবেসে যদি দিই, তা হলে ভালোবেসেই নেবে না কেন?"

কুমু বললে, "নেব।"

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "দিদি, তোমার শোবার ঘর কি আজও শূন্য থাকবে?"

কুমু বললে, "ওখানে আমার জায়গা নেই।"

মোতির মা পীড়াপীড়ি করলে না। তার মনের ভাবখানা এই যে, পীড়াপীড়ি করবার ভার আমার নয়; যার কাজ সে করুক। কেবল আস্তে আস্তে সে বললে, "একটু দুধ এনে দেব তোমার জন্যে?"

কুমু বললে, "এখন না, আর একটু পরে।" তার ঠাকুরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এখনও বাকি আছে। এখনও মনের মধ্যে কোনো জবাব পাচ্ছে না।

মোতির মা আপন ঘরে গিয়ে নবীনকে ডেকে বললে, "শোনো একটি কথা। বড়োঠাকুরের বাইরের ঘরে তাঁর ডেস্কের উপর খোঁজ করে এসো গে, দিদির কোনো চিঠি এসেছে কি না— দেরাজ খুলেও দেখো।"

নবীন বললে, "সর্বনাশ!"

"তুমি যদি না যাও তো আমি যাব।"

"এ যে ঝোপের ভিতর থেকে ভালুকের ছানা ধরতে পাঠানো!"

"কর্তা গেছেন আপিসে, তাঁর কাজ সেরে আসতে বেলা একটা হবে— এর মধ্যে—"

"দেখো মেজোবউ, দিনের বেলায় এ কাজ কিছুতেই আমার দ্বারা হবে না, এখন চারি দিকে লোকজন। আজ রাত্রে তোমাকে খবর দিতে পারব।"

মোতির মা বললে, "আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু নুরনগরে এখনই তার করে জানতে হবে বিপ্রদাসবাবু কেমন আছেন।"

"বেশ কথা, তা দাদাকে জানিয়ে করতে হবে তো ?"

"না।"

"মেজোবউ, তুমি যে দেখি মরিয়া হয়ে উঠেছ ? এ বাড়িতে টিকটিকি মাছি ধরতে পারে না কর্তার হুকুম ছাড়া, আর আমি—"

"দিদির নামে তার যাবে তোমার তাতে কী ?"

"আমার হাত দিয়ে তো যাবে।"

"বড়োঠাকুরের আপিসে ঢের তার তো রোজ দরোয়ানকে দিয়ে পাঠানো হয়, তার সঙ্গে এটা চালান দিয়ো। এই নাও টাকা, দিদি দিয়েছেন।"

কুমুর সম্বন্ধে নবীনের মনও যদি করুণায় ব্যথিত না থাকত তা হলে এতবড়ো দুঃসাহসিক কাজের ভার সে কিছুতেই নিতে পারত না।

২৯

যথানিয়মে মধুসূদন বেলা একটার পরে অন্তঃপুরে খেতে এল। যথানিয়মে আত্মীয়-স্ত্রীলোকেরা তাকে ঘিরে বসে কেউ-বা পাখা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে, কেউ-বা পরিবেশন করছে। পূর্বেই বলেছি, মধুসূদনের অন্তঃপুরের ব্যবস্থায় ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল না। তার আহারের আয়োজন পুরানো অভ্যাসমতই। মোটা চালের ভাত না হলে না মুখে রোচে, না পেট ভরে। কিন্তু পাত্রগুলি দামি। রুপোর থালা, রুপোর বাটি, রুপোর গ্লাস। সাধারণত কলাইয়ের ডাল, মাছের ঝোল, তেঁতুলের অম্বল, কাঁটাচচ্চড়ি হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী ; তার পরে সব-শেষে বড়ো একবাটি দুধ চিনি দিয়ে শেষ বিন্দু পর্যন্ত সমাধা করে পানের বোঁটায় মোটা এক ফোঁটা চুন সহযোগে একটা পান মুখে ও দুটো পান ডিবেয় ভরে পনেরো মিনিট কাল তামাক টানতে টানতে বিশ্রাম করে তৎক্ষণাৎ আপিসে প্রস্থান। অপেক্ষাকৃত দৈন্যদশা থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এর আর ব্যতিক্রম হয় নি। আহারে মধুসূদনের ক্ষুধা আছে, লোভ নেই।

শ্যামাসুন্দরী দুধের বাটিতে চিনি ঘেঁটে দিচ্ছিল। অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা বললে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা করছে। একখানি সাদা শাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয়, সর্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণের মতো, বেলা যায়-যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়ে নি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো

চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টস্‌টসে ঠোঁটদুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয় নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামি বলেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগল না বলে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহংকৃত অশ্রদ্ধা। মধুসূদনের ঐশ্বর্যের জোয়ারের মুখেই শ্যামা এ সংসারে প্রবেশ করেছে। যৌবনের জাদুমন্ত্রে এই সংসারের চূড়ায় সে স্থান করে নেবে এমনও সংকল্প ছিল। মধুসূদনের মন যে কোনোদিন টলে নি তাও বলা যায় না। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই হার মানল না; তার কারণ, মধুসূদনের বিষয়বুদ্ধি কেবলমাত্র যে বুদ্ধি তা নয়, সে হচ্ছে প্রতিভা। এই প্রতিভার জোরে সম্পদ সে সৃষ্টি করেছে, আর সেই সৃষ্টির পরমানন্দে গভীর করে সে মগ্ন। এই প্রতিভার জোরেই সে নিশ্চয় জানত ধনসৃষ্টির যে তপস্যায় সে নিযুক্ত ইন্দ্রদেব সেটা ভাঙবার জন্যে প্রবল বিঘ্ন পাঠিয়েছেন— ক্ষণে ক্ষণে তপোভঙ্গের ধাক্কা লেগেছে, বার বারই সে সামলে নিয়েছে। সুবিধা ছিল এই যে, ব্যবসায়ের ভরা মধ্যাহ্নে তার অবকাশমাত্র ছিল না। এই কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গভাবে পেত তাতে যেন মধুসূদনের ক্লান্তি দূর করত। ক্রিয়াকর্মের পার্বণী উপলক্ষে শ্যামাসুন্দরীর দিকে তার পক্ষপাতের ভারটা একটু যেন বেশি করে ঝুঁকত বলে বোঝা যায়। কিন্তু কোনোদিন শ্যামাকে সে এতটুকু প্রশ্রয় দেয় নি অন্তঃপুরে যাতে তার স্পর্ধা বাড়ে। শ্যামা মধুসূদনের মনের ঝোঁকটা ঠিক ধরেছে, তবুও ওর সম্বন্ধে তার ভয় ঘুচল না।

মধুসূদনের আহারের সময় শ্যামাসুন্দরী রোজই উপস্থিত থাকে; আজও ছিল। সদ্য স্নান করে এসেছে— তার অসামান্য কালো ঘন লম্বা চুল পিঠের উপর মেলে-দেওয়া— তার উপর দিয়ে অমলশুভ্র শাড়িটি মাথার উপর টেনে দেওয়া— ভিজে চুল থেকে মাথাঘষা মসলার মৃদু গন্ধ আসছে।

দুধের বাটি থেকে মুখ না তুলে এক সময় আস্তে আস্তে বললে, “ঠাকুরপো, বউকে কি ডেকে দেব?”

মধুসূদন কোনো কথা না বলে তার ভাজের মুখের দিকে গম্ভীরভাবে চাইলে। তার ভাজ শ্যামাসুন্দরী ভয়ে থতোমতো খেয়ে প্রশ্নটাকে ব্যাখ্যা করে বললে, “তোমার খাবার সময় কাছে বসলে হয় ভালো, তোমাকে একটু সেবা করতে—”

মধুসূদনের মুখের ভাবের কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে শ্যামাসুন্দরী বাক্য শেষ না করেই চুপ করে গেল। মধুসূদন আবার মাথা হেঁট করে আহারে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে থালা থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলে, "বড়োবউ এখন কোথায় ?"

শ্যামাসুন্দরী ব্যস্ত হয়ে উঠল, "আমি দেখে আসছি।"

মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত করে আঙুল নেড়ে নিষেধ করলে। প্রশ্নের যে উত্তর পাবার আশা আছে সেটা এর মুখে শুনলে সহ্য হবে না— অথচ মনের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল। আহার-শেষে তেতলায় যখন তার শোবার ঘরে গেল, মনের কোণে একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল। একবার ছাদ এল ঘুরে। পাশের নাবার ঘরে ঢুকে ক্ষণকালের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে বিছানায় শুয়ে গুড়গুড়িতে টান দিতে লাগল। নির্দিষ্ট পনেরো মিনিট যায়— বিশ মিনিট পার হয়ে যখন আধঘণ্টা পুরো হতে চলল তখন বুকের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে একবার সময়টা দেখলে। বৎসরের পর বৎসর গেছে, আপিসে যাবার পূর্বে কখনও পাঁচ মিনিট দেরি হয় নি। আপিসে একটা রেজিস্টারি বই আছে, কে ঠিক কোন্ সময়ে এল এবং গেল সেই বইয়ে তার হিসাব থাকে— সেই হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে বেতনের মাত্রারেখা ওঠানামা করে। আপিসের সকল কর্মচারীদের মধ্যে মধুসূদনের জরিমানার অঙ্ক সবচেয়ে সংখ্যায় কম। অথচ এ সম্বন্ধে নিজের প্রতি তার পক্ষপাত নেই। বস্তুত নিজের কাছ থেকে কর্মচারীদের চেয়ে ডবল হারে জরিমানা আদায় করে। মনে মনে আজ সে পণ করেছে যে, অপরাহ্ণে আপিসের সময় উত্তীর্ণ হলে অতিরিক্ত সময় কাজ করে ক্ষতি-পূরণ করে নেবে। বেলা যতই পড়ে আসছে, কাজে মন দিতে আর পারে না। এমন-কি আজ আধঘণ্টা সময় থাকতেই কাজ ফেলে বাড়ি ফিরে এল। কেবলই ইচ্ছে করছিল অসময়ে একবার শোবার ঘরে এসে ঢুকতে। হয়তো কাউকে দেখতে পেতেও পারে। দিন থাকতে সে কখনোই শোবার ঘরে আসে না। আজ আপিসের সাজসুদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে।

ঠিক সেই সময়ে মোতির মা ছাদের রোদ্দুরে-মেলা আমসিগুলো ঝুড়িতে তুলছিল। মধুসূদনকে অবেলায় শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে একহাত ঘোমটা টেনে তার আড়ালে অনেকখানি হাসলে। মেজোবউয়ের কাছে তার এই অনিয়ম ধরা পড়াতে মধুসূদন লজ্জিত ও বিরক্ত হল। মনে প্ল্যান ছিল অত্যন্ত নিঃশব্দপদে ঘরে ঢুকবে— পাছে ভীরু হরিণী চকিত হয়ে পালায়। সে আর হল না। কৌতুকদৃষ্টির আঘাত এড়াবার জন্যে সে নিজেই দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। দেখলে আপিস-পালানো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ঘরে কেউ তো নেই-ই, দিনের বেলা কোনোসময়ে কেউ যে ক্ষণকালের জন্যেও ছিল তার চিহ্নও পাওয়া যায় না। এক মুহূর্তে তার অধৈর্য যেন অসহ্য হয়ে

উঠল। যদিও সে ভাশুর, এবং কোনোদিন মেজোবউয়ের সঙ্গে একটা কথাও কয় নি, তবু তাকে ডেকে কুমু সম্বন্ধে যা-হয় কিছু একটা বলবার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগল। একবার বের হয়েও এল কিন্তু মোতির মা তখন নীচে চলে গিয়েছে।

নববধূ-কর্তৃক পরিত্যক্ত শোবার ঘরে অকারণে অসময়ে একলা যাপন করবার অসম্মান থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বাইরের দিকে বেগে গেল হন্ হন্ করে। মস্ত একটা জরুরি কাজ করবার ভান করে ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ল। সামনে ছিল একখানা খাতা। সাধারণত সেটা সে প্রায় দেখে না, দেখে তার আপিসের হেডবাবু। আজ লোকচক্ষুকে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্যে সেটা খুলে বসল। এই খাতায় তার বাড়ির সমস্ত চিঠি ও টেলিগ্রাম রওনা করবার দিনক্ষণ টোকা থাকে। খাতা খুলে প্রথমেই দেখতে পেলে আজকের তারিখের টেলিগ্রামের ফর্দর মধ্যে বিপ্রদাসের নাম ও ঠিকানা। প্রেরক হচ্ছেন স্বয়ং কর্ত্রীঠাকুরানী।

"ডাকো দারোয়ানকে।"

দারোয়ান এল।

"এ টেলিগ্রাম কে দিয়েছিল পাঠাতে?"

"মেজোবাবু।"

"ডাকো মেজোবাবুকে।"

মেজোবাবু পাংশুবর্ণ মুখে এসে হাজির।

"আমার হুকুম না নিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাতে কে বললে?" যে বলেছিল শাসনকর্তার সামনে তার নাম মুখে আনা তো সহজ ব্যাপার নয়; কী বলবে কিছুই ভেবে না পেয়ে নবীন ব্যাকুল হয়ে এই শীতের দিনে ঘেমে উঠল।

নবীনকে নীরব দেখে মধুসূদন আপনিই জিজ্ঞাসা করলে, "মেজোবউ বুঝি?" মুখ হেঁট করে নিরুত্তর থাকাতেই তার উত্তর স্পষ্ট হল। ঝাঁ করে মাথায় রক্ত গেল চড়ে, মুখ হল লাল টকটকে— এত রাগ হল যে, কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোল না। সবেগে হাত নেড়ে নবীনকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করে ঘরের এক ধার থেকে আর-এক ধার পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল।

৩০

নবীন ঘরে গিয়ে মুখ শুকনো করে মোতির মাকে বললে, "মেজোবউ, আর কেন?"

"হয়েছে কী?"

"এবার জিনিসপত্রগুলো বাক্সয় তোলো।"

"তোমার বুদ্ধিতে যদি তুলি, তা হলে আবার কালই বের করতে হবে। কেন? তোমার দাদার মেজাজ ভালো নেই বুঝি?"

"আমি তো চিনি ওঁকে। এবার বোধ হচ্ছে এখানকার বাসায় হাত পড়বে।"

"তা চলোই না। অত ভাবছ কেন? সেখানে তো জলে পড়বে না?"

"আমাকে চলতে বলছ কিসের জন্যে? এবারে হুকুম হবে মেজোবউকে দেশে পাঠিয়ে দাও।"

"সে হুকুম তুমি মানতে পারবে না জানি।"

"কেমন করে জানলে?"

"আমি কেবল একাই জানি মনে কর, তা নয়— বাড়িসুদ্ধ সবাই তোমাকে স্ত্রৈণ বলে জানে। পুরুষমানুষ যে কী করে স্ত্রৈণ হতে পারে এতদিন তোমার দাদা সে কথা বুঝতেই পারত না। এইবার নিজের বোঝবার পালা এসেছে।"

"বল কী?"

"আমি তো দেখছি তোমাদের বংশে ও রোগটা আছে। এতদিন বড়োভাইয়ের ধাতটা ধরা পড়ে নি। অনেক কাল জমা হয়ে ছিল বলে তার ঝাঁজটা খুব বেশি হবে, দেখে নিয়ো এই আমি বলে দিলাম। যে জোরের সঙ্গে জগৎ-সংসার ভুলে টাকার থলে আঁকড়ে বসেছিল, ঠিক সেই জোরটাই পড়বে বউয়ের উপর।"

"তাই পড়ুক। বড়ো স্ত্রৈণটি আসর জমান কিন্তু মেজো স্ত্রৈণটি বাঁচবে কাকে নিয়ে?"

"সে ভাবনার ভার আমার উপরে। এখন আমি তোমাকে যা বলি তাই করো। ওঁর দেরাজ তোমাকে সন্ধান করতে হবে।"

নবীন হাত জোড় করে বললে, "দোহাই তোমার মেজোবউ— সাপের গর্তে হাত দিতে যদি বলতে আমি দিতুম, কিন্তু দেরাজে না।"

"সাপের গর্তে যদি হাত দিতে হত তবে নিজে দিতুম কিন্তু দেরাজটা সন্ধান তোমাকেই করতে হবে। তুমি তো জান এ বাড়ির সব চিঠিই প্রথমে ওঁকে না দেখিয়ে কাউকে দেবার হুকুম নেই। আমার মন বলছে ওঁর হাতে চিঠি এসেছে।"

"আমারও মন তাই বলছে, কিন্তু সেইসঙ্গে এও বলছে ও চিঠিতে যদি আমি হাত ঠেকাই তা হলে দাদা উপযুক্ত দণ্ড খুঁজেই পাবে না। বোধ হয় সাত বছর সশ্রম ফাঁসির হুকুম হবে।"

"কিছু তোমাকে করতে হবে না, চিঠিতে হাত দিয়ো না, কেবল একবার দেখে এসো দিদির নামে চিঠি আছে কি না।"

মেজোবউয়ের প্রতি নবীনের ভক্তি সুগভীর, এমন-কি, নিজেকে তার স্ত্রীর অযোগ্য বলেই মনে করে। সেইজন্যেই তার জন্যে কোনো একটা দুরূহ কাজ করবার উপলক্ষ জুটলে যতই ভয় করুক সেইসঙ্গে খুশিও হয়।

সেই রাত্রেই নবীনের কাছে মেজোবউ খবর পেল যে, কুমুর নামে একটা চিঠি ও একটা টেলিগ্রাম দেরাজে আছে।

যে উত্তেজনার প্রথম ধাক্কায় কুমু তার শোবার ঘর ছেড়ে দাস্যবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার বেগ থেমেছে। অপমানের বিরক্তি কমে এসে বিষাদের ম্লানতায় এখন তার মন ছায়াচ্ছন্ন। বুঝতে পারছে চিরদিনের ব্যবস্থা এ নয়। অথচ সেরকম একটা ব্যবস্থা না হলে কুমু বাঁচবে কী করে? সংসারে আমৃত্যুকাল দিনরাত্রি জোর করে এরকম অসংলগ্নভাবে থাকা তো সম্ভবপর নয়।

এই কথাই সে ভাবছিল তার ঘরের দরজা বন্ধ করে। ঘরটা বারান্দার এক কোণে, কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। প্রবেশের দ্বার ছাড়া বাকি সমস্ত কুঠরি অবরুদ্ধ। দেয়ালের গায়ে উপর পর্যন্ত কাঠের থাক বসানো। সেই থাকে আলো জ্বালাবার বিচিত্র সরঞ্জাম। তৈলাক্ত মলিনতায় ঘরটা আগাগোড়া ক্লিন্ন। দেয়ালের যে অংশে দরজা সেই দিকে বাতির মোড়ক থেকে কাটা ছবিগুলো এঁটে দিয়ে কোনো এক ভৃত্য সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তিসাধন করেছিল। এক কোণে টিনের বাক্সে আছে গুঁড়ো-করা খড়ি, তার পাশে ঝুড়িতে শুকনো তেঁতুল, এবং কতকগুলো ময়লা ঝাড়ন; আর সারি সারি কেরোসিনের টিন, অধিকাংশই খালি, গুটি দুই-তিন ভরা।

অনিপুণ হস্তে আজ সকাল থেকে কুমু তার কাজে লেগেছিল। ভাঁড়ারের কর্তব্য শেষ করে মোতির মা উঁকি মেরে একবার কুমুর কর্মতপস্যার দুঃসাধ্য সংকটটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। বুঝতে পারলে দুই-একটা ক্ষণভঙ্গুর জিনিসের অপঘাত আসন্ন। এ বাড়িতে জিনিসপত্রের সামান্য ক্ষুণ্ণতাও দৃষ্টি অথবা হিসাব এড়ায় না।

মোতির মা আর থাকতে পারলে না; বললে, "কাজ নেই হাতে, তাই এলুম। ভাবলুম দিদির কাজটাতে একটু হাত লাগাই, পুণ্যি হবে।" এই বলেই কাঁচের গ্লোব ও চিমনির ঝুড়ি নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাজা-মোছায় লেগে গেল।

আপত্তি করতে কুমুর আর তেজ নেই, কেননা ইতিমধ্যে আপন অক্ষমতা সম্বন্ধে আত্ম-আবিষ্কার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। মোতির মার সহায়তা পেয়ে বেঁচে গেল। কিন্তু মোতির মারও অশিক্ষিতপটুত্বের সীমা আছে। কেরোসিন ল্যাম্পে হিসাব করে ফিতে যোজনা তার পক্ষে অসাধ্য। কাজটা হয় তারই তত্ত্বাবধানে, বরাদ্দ অনুসারে তেল প্রভৃতির মাপ তারই স্বহস্তে, কিন্তু হাতে-কলমে সলতে কাটা আজ

পর্যন্ত তার দ্বারা হয় নি। তাই অগত্যা বুড়ো বঙ্কু ফরাশকে সহযোগিতার জন্যে ডাকবার প্রস্তাব তুললে।

হার মানতে হল। বঙ্কু ফরাশ এল, এবং দ্রুতহস্তে অল্পকালের মধ্যেই কাজ সমাধা করে দিলে। সন্ধ্যার পূর্বেই দীপগুলো ঘরে ঘরে ভাগ করে দিয়ে আসতে হয়। সেই কাজের জন্যে পূর্বনিয়মমত তাকে যথাসময়ে আসতে হবে কি না বঙ্কু জিজ্ঞাসা করলে। লোকটা সরল প্রকৃতির বটে কিন্তু তবু প্রশ্নের মধ্যে একটু শ্লেষ ছিল-বা। কুমুর কানের ডগা লাল হয়ে উঠল।

সে কোনো জবাব করবার আগেই মোতির মা বললে, "আসবি না তো কী?" কুমুর বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, কাজ করতে গিয়ে কেবল সে কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

৩১

দুপুরবেলা আহারের পর দরজা বন্ধ করে কুমু বসে পণ করতে লাগল, মনের মধ্যে কিছুতে সে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠতে দেবে না। কুমু বললে, 'আজকের দিনটা লাগবে মনকে স্থির করে নিতে; ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে কাল সকাল থেকে সংসারধর্মের সত্যপথে প্রবৃত্ত হব।' মধ্যাহ্নে আহারের পর তার কাঠের ঘরে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে চলল নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া। এই কাজে সবচেয়ে সহায় ছিল তার দাদার স্মৃতি। সে যে দেখেছে তার দাদার ধৈর্যের আশ্চর্য গভীরতা; তাঁর মুখে সেই বিষাদ, যেটি তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের ছায়া— তার সেই দাদা, তখনকার কালে শিক্ষিতসমাজে প্রচলিত পজিটিভিজ্‌ম্‌ যাঁর ধর্ম ছিল, দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা যাঁর অভ্যাস ছিল না, অথচ দেবতা আপনিই যাঁর জীবন পূর্ণ করে আবির্ভূত।

অপরাহ্নে বঙ্কু ফরাশ যখন দরজায় আঘাত করলে, ঘর খুলে কুমু বেরিয়ে গেল। মোতির মাকে বললে, আজ রাত্রে সে খাবে না। মনকে বিশুদ্ধ করে নেবার জন্যেই তার এই উপবাস। মোতির মা কুমুর মুখ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে মুখে আজ চিত্তজ্বালার রক্তচ্ছটা ছিল না। ললাটে চক্ষুতে ছিল প্রশান্ত স্নিগ্ধ দীপ্তি। এখনই যেন সে পূজা সেরে তীর্থস্নান করে এল। অন্তর্যামী দেবতা যেন তার সব অভিমান হরণ করে নিলেন; হৃদয়ের মাঝখানে যেন সে এনেছে নির্মাল্যের ফুল বহন করে, তারই সুগন্ধ রয়েছে তাকে ঘিরে। তাই কুমু যখন উপবাসী থাকতে চাইলে তখন

মোতির মা বুঝলে, এ অভিমানের আত্মপীড়ন নয়। তাই সে আপত্তিমাত্র করলে না।

কুমু তার ঠাকুরের মূর্তিকে অন্তরের মধ্যে বসিয়ে ছাদের এক কোণে গিয়ে আসন নিল। আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, দুঃখ যদি তাকে এমন করে ধাক্কা না দিত তা হলে সে আপন দেবতার এত কাছে কখনোই আসতে পারত না। অস্তসূর্যের আভার দিকে তাকিয়ে কুমু হাত জোড় করে বললে, "ঠাকুর, আর কখনও যেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ না ঘটে ; তুমি আমাকে কাঁদিয়ে তোমার আপন করে রাখো।"

শীতের দিন দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে এল। ধূলি কুয়াশা ও কলের ধোঁয়াতে মিশ্রিত একটা বিবর্ণ আবরণে সন্ধ্যার স্বচ্ছ তিমির-গম্ভীর মহিমা আচ্ছন্ন। ওই আকাশটা যেমন একটা পরিব্যাপ্ত মলিনতার বোঝা নিয়ে মাটির দিকে নেমে পড়েছে, তেমনি দাদার জন্যে একটা দুশ্চিন্তার দুঃসহ ভার কুমুর মনটাকে যেন নীচের দিকে নামিয়ে ধরে রেখে দিলে।

এমনি করে এক দিকে কুমু অভিমানের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্তির আনন্দ, আর-এক দিকে দাদার জন্যে ভাবনায় পীড়িত হৃদয়ের ভার, দুইই একসঙ্গে নিয়ে আবার তার সেই কোটরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। বড়ো ইচ্ছা, এই নিরুপায় ভাবনার বোঝাটাকেও একান্ত বিশ্বাসে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দেয়। কিন্তু নিজেকে বার বার ধিক্‌কার দিয়েও কিছুতেই সেই নির্ভর পায় না। টেলিগ্রাফ তো করা হয়েছে, তার উত্তর আসে না কেন, এই প্রশ্ন অনবরত মনে লেগেই রইল।

নারীহৃদয়ের আত্মসমর্পণের সূক্ষ্ম বাধায় মধুসূদন কোথাও হাত লাগাতে পারছে না। যে বিবাহিত স্ত্রীর দেহমনের উপর তার সম্পূর্ণ দাবি সেও তার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম। ভাগ্যের এমন অভাবনীয় চক্রান্তকে সে কোন্ দিক থেকে কেমন করে আক্রমণ করবে ভেবে পায় না। কখনও কোনো কারণেই মধুসূদন নিজের ব্যাবসার প্রতি লেশমাত্র অমনোযোগী হয় নি, এখন সেই দুর্লক্ষণও দেখা দিল। নিজের মার পীড়া ও মৃত্যুতেও মধুসূদনের কর্মে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নি এ কথা সকলেই জানে। তখন তার অবিচলিত দৃঢ়চিত্ততায় অনেকে তাকে ভক্তি করেছে। মধুসূদন আজ হঠাৎ নিজের একটা নূতন পরিচয় পেয়ে নিজে স্তম্ভিত হয়ে গেছে, বাঁধা-পথের বাইরে যে শক্তি তাকে এমন করে টানছে সে যে তাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছে না।

রাত্রের আহার সেরে মধুসূদন ঘরে শুতে এল। যদিও বিশ্বাস করে নি, তবু আশা

করেছিল আজ হয়তো কুমুকে শোবার ঘরে দেখতে পাবে। সেইজন্যেই নিয়মিত সময় অতিক্রম করেই মধুসূদন এল। সুস্থ শরীরে চিরাভ্যাসমত একেবারে ঘড়ি-ধরা সময়ে মধুসূদন ঘুমিয়ে পড়ে, এক মুহূর্ত দেরি হয় না। পাছে আজ তেমনি ঘুমিয়ে পড়ার পর কুমু ঘরে আসে তার পরে চলে যায়, এই ভয়ে বিছানায় শুতে গেল না। সোফায় খানিকটা বসে রইল, ছাদে খানিকটা পায়চারি করতে লাগল। মধুসূদনের ঘুমোবার সময় ন'টা— আজ একসময়ে চমকে উঠে শুনলে তার দেউড়ির ঘণ্টায় এগারোটা বাজছে। লজ্জা বোধ হল। কিন্তু বিছানার সামনে দু-তিনবার এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছুতে শুতে যেতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন স্থির করলে বাইরের ঘরে গিয়ে সেই রাত্রেই নবীনের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করে নেবে।

বাইরের ঘরের সামনের বারান্দায় পৌঁছিয়ে দেখে ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। সেও ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময়ে দেখে নবীন লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। দিনের বেলা হলে দেখতে পেত এক মুহূর্তে নবীনের মুখ কী রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "এত রাত্রে তুমি যে এখানে?"

নবীনের মাথায় বুদ্ধি জোগাল, সে বললে, "শুতে যাবার আগেই তো আমি ঘড়িতে দম দিয়ে যাই, আর তারিখের কার্ড ঠিক করে দিই।"

"আচ্ছা, ঘরে এসে শোনো।"

নবীন ত্রস্ত হয়ে কাঠগড়ার আসামির মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মধুসূদন বললে, "বড়োবউয়ের কানে মন্ত্র ফোসলাবার কেউ থাকে এটা আমি পছন্দ করি নে। আমার ঘরের বউ আমার ইচ্ছেমত চলবে, আর-কারও পরামর্শ-মত চলবে না— এইটে হল নিয়ম।"

নবীন গম্ভীরভাবে বললে, "সে তো ঠিক কথা।"

"তাই আমি বলছি, মেজোবউকে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

নবীন খুব যেন নিশ্চিন্ত হল এমনি ভাবে বললে, "ভালো হল দাদা, আমি আরও ভাবছিলুম পাছে তোমার মত না হয়।"

মধুসূদন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তার মানে?"

নবীন বললে, "ক'দিন ধরে দেশে যাবার জন্যে মেজোবউ অস্থির করে তুলেছে, জিনিসপত্র সব গোছানোই আছে, একটা ভালো দিন দেখলেই বেরিয়ে পড়বে।"

বলা বাহুল্য, কথাটা সম্পূর্ণ বানানো। তার বাড়িতে মধুসূদন যাকে ইচ্ছে

বিদায় করে দেবে, তাই বলে কেউ নিজের ইচ্ছায় বিদায় হতে চাইবে এটা সম্পূর্ণ বেদস্তুর। বিরক্তির স্বরে বললে, "কেন, যাবার জন্যে তার এত তাড়া কিসের?"

নবীন বললে, "বাড়ির গিন্নি এ বাড়িতে এসেছেন, এখন এ বাড়ির সমস্ত ভার তো তাঁকেই নিতে হবে। মেজোবউ বললে, আমি মাঝে থাকলে কী জানি কখন কী কথা ওঠে।"

মধুসূদন বললে, "এ-সব কথার বিচারভার কি তারই উপরে?"

নবীন ভালোমানুষের মতো বললে, "কী করব বলো, মেয়েমানুষের জেদ। কী জানি, তার মনে হয়েছে, কোন্ কথা নিয়ে তুমি হয়তো একদিন হঠাৎ তাকে সরিয়ে দেবে, সে অপমান তার সইবে না— তাই সে একেবারে পণ করে বসেছে সে যাবেই। আসছে ত্রয়োদশী তিথিতে দিন পড়েছে— এর মধ্যে কাজকর্ম সব গুছিয়ে দিয়ে হিসাবপত্র চুকিয়ে সে চলে যেতে চায়।"

মধুসূদন বললে, "দেখো নবীন, মেজোবউকে আদর দিয়ে তুমিই বিগড়ে দিয়েছ। তাকে একটু কড়া করেই বোলো, সে কিছুতেই যেতে পারবে না। তুমি পুরুষমানুষ, ঘরে তোমার নিজের শাসন চলবে না, এ আমি দেখতে পারি নে।"

নবীন মাথা চুলকিয়ে বললে, "চেষ্টা করে দেখব দাদা, কিন্তু—"

"আচ্ছা, আমার নাম করে বোলো, এখন তার যাওয়া চলবে না। যখন সময় বুঝব তখন যাবার দিন আমিই ঠিক করে দেব।"

নবীন বললে, "তুমি বললে কিনা মেজোবউকে দেশে পাঠাতে হবে তাই ভাবছি—"

মধুসূদন উত্তেজিত হয়ে বললে, "আমি কি বলেছি, এই মুহূর্তেই পাঠিয়ে দিতে হবে?"

নবীন ধীরে ধীরে চলে গেল। মধুসূদন একটা গ্যাসের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে লম্বা কেদারায় ঠেসান দিয়ে বসে রইল। বাড়ির চৌকিদার রাত্রে এক-একবার বাড়ির ঘরগুলোর সামনে দিয়ে টহলিয়ে আসে। মধুসূদনের অল্প একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল, এমন সময় হঠাৎ চমকিয়ে উঠে দেখে চৌকিদার ঘরে ঢুকে লণ্ঠন তুলে ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। হয়তো সে ভাবছিল, মহারাজ মূর্ছাই গেছে, না মারাই গেছে। মধুসূদন লজ্জিত হয়ে ধড়ফড় করে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। বাইরের আপিসঘরে বসে সদ্যোবিবাহিত রাজাবাহাদুরের রাত্রিযাপনের শোকাবহ দৃশ্যটা চৌকিদারের কাছে যে অসম্মানকর এ কথাটা মুহূর্তেই তাকে যেন মারলে। উঠেই কিছু রাগের স্বরে চৌকিদারকে বললে, "ঘর বন্ধ করো।" যেন ঘর বন্ধ না

থাকাটাতে তারই অপরাধ ছিল। দেউড়ির ঘণ্টাতে বাজল দুটো।

মধুসূদন ঘর ছেড়ে যাবার আগে একবার তার দেরাজ খুললে। ইতস্তত করতে করতে কুমুর নামের টেলিগ্রামটা পকেটে পুরে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল। তেতালায় ওঠবার সিঁড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

গভীর রাত্রে প্রথম ঘুম থেকে জেগে মানুষ আপনার সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণ পায় না। তাই তার দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ। এই রাত্রি দুটোর সময় চারি দিকে লোকের দৃষ্টি বলে যখন কিছুই নেই, সে যখন বিশ্বসংসারে একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া আর কারও কাছেই দায়ী নয়, তখন কুমুর কাছে মনে মনে হার-মানা তার পক্ষে অসম্ভব হল না।

৩২

সিঁড়ির তলা থেকে মধুসূদন ফিরল, বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করতে লাগল। একটা কোন্ রুদ্ধ ঘরের সামনে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছিল। সেইটে তুলে নিয়ে চুপি চুপি তেলবাতির কুঠরির বাইরে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখলে দরজা ভেজানো; দরজা খুলে গেল। সেই মাদুরের উপর গায়ে একখানা চাদর দিয়ে কুমু গভীর ঘুমে মগ্ন— বাঁ হাতখানি বুকের উপর তোলা। দেয়ালের কোণে লণ্ঠন রেখে মধুসূদন কুমুর মুখের দিকে মুখ করে বাঁ পাশে এসে বসল। এই মুখটি যে মনকে এমন প্রবল শক্তিতে টানে তার কারণ, মুখের মধ্যে তার একটি অনির্বচনীয় সম্পূর্ণতা। কুমুর আপনার মধ্যে আপনার কোনোদিন বিরোধ ঘটে নি। দাদার সংসারে অভাবের দুঃখে সে পীড়িত হয়েছে কিন্তু সেটা বাহ্য অবস্থাঘটিত ব্যাপারে, সেটাতে তার প্রকৃতিকে আঘাত করে নি। যে সংসারে সে ছিল সে সংসার তার স্বভাবের পক্ষে সব দিকেই অনুকূল। এইজন্যেই তার মুখভাবে এমন একটি অনবচ্ছিন্ন সরলতা, তার চলাফেরায় তার ব্যবহারে এমন একটা অক্ষুণ্ণ মর্যাদা। যে মধুসূদনকে জীবনের সাধনায় কেবল প্রাণপণ লড়াই করতে হয়েছে, প্রতিদিন উদ্যত সংশয় নিয়ে নিরন্তর যাকে সতর্ক থাকতে হয়, তার কাছে কুমুর এই সর্বাঙ্গীণ সুপরিণতির অপূর্ব গাম্ভীর্য পরম বিস্ময়ের বিষয়। সে নিজে একটুও সহজ নয়, আর কুমু যেন একেবারে দেবতার মতো সহজ। তার সঙ্গে কুমুর এই বৈপরীত্যই তাকে এমন প্রবল বেগে টানছে। বিয়ের পরে বধূ শ্বশুরবাড়িতে প্রথম আসবামাত্রই যে কাণ্ডটি ঘটল তার সমস্ত ছবিটি যখন সে মনের মধ্যে দেখে তখন দেখতে পায়

তার নিজের দিকে ব্যর্থ প্রভুত্বের ক্রুদ্ধ অক্ষমতা, অন্য দিকে বধূর মনের মধ্যে অনমনীয় আত্মমর্যাদার সহজ প্রকাশ। সাধারণ মেয়েদের মতো তার ব্যবহারে কোথাও কিছুমাত্র অশোভন প্রগল্‌ভতা দেখা গেল না। এ যদি না হত তা হলে তাকে অপমান করবার যে-স্বামিত্ব তার আছে সেই অধিকার খাটাতে মধুসূদন লেশমাত্র দ্বিধা করত না। কিন্তু কী যে হল তা সে নিজে বুঝতেই পারে না; কী একটা অদ্ভুত কারণে কুমুকে সে আপনার ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেলে না।

মধুসূদন মনে স্থির করলে, কুমুকে না জাগিয়ে সমস্ত রাত্রি ওর পাশে এমনি করে জেগে বসে থাকবে। কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে আর কিছুতেই থাকতে পারলে না— আস্তে আস্তে কুমুর বুকের উপর থেকে তার হাতটি নিজের হাতের উপর তুলে নিলে। কুমু ঘুমের ঘোরে উস্‌খুস্‌ করে হাতটা টেনে নিয়ে মধুসূদনের উলটো দিকে পাশ ফিরে শুল।

মধুসূদন আর থাকতে পারলে না, কুমুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে, "বড়োবউ, তোমার দাদার টেলিগ্রাম এসেছে।"

অমনি ঘুম ভেঙে কুমু দ্রুত উঠে বসল, বিস্মিত চোখ মেলে মধুসূদনের মুখের দিকে অবাক হয়ে রইল চেয়ে। মধুসূদন টেলিগ্রামটা সামনে ধরে বললে, "তোমার দাদার কাছ থেকে এসেছে।" ব'লে ঘরের কোণ থেকে লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে এল।

কুমু টেলিগ্রামটা পড়ে দেখলে, তাতে ইংরেজিতে লেখা আছে, "আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হোয়ো না; ক্রমশই সেরে উঠছি; তোমাকে আমার আশীর্বাদ।" কঠিন উদ্বেগের নিরতিশয় পীড়নের মধ্যে এই সান্ত্বনার কথা পড়ে এক মুহূর্তে কুমুর চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে উঠল। চোখ মুছে টেলিগ্রামখানি যত্ন করে আঁচলের প্রান্তে বাঁধলে। সেইটেতে মধুসূদনের হৃৎপিণ্ডে যেন মোচড় লাগল। তার পরে কী যে বলবে কিছুই ভেবে পায় না। কুমুই বলে উঠল, "দাদার কি চিঠি আসে নি?"

এর পরে কিছুতেই মধুসূদন বলতে পারলে না যে চিঠি এসেছে। ধাঁ করে বলে ফেললে, "না, চিঠি তো নেই।"

এই ঘরটার মধ্যে রাত্রে দুজনে এমন করে বসে থাকতে কুমুর সংকোচ বোধ হল। সে যখন উঠব-উঠব করছে, মধুসূদন হঠাৎ বলে উঠল, "বড়োবউ, আমার উপর রাগ কোরো না।"

এ তো প্রভুর উপরোধ নয়, এ যে প্রণয়ীর মিনতি, আর তার মধ্যে যেন আছে অপরাধীর আত্মগ্লানি। কুমু বিস্মিত হয়ে গেল, তার মনে হল এ দৈবেরই লীলা। কেননা, সে যে দিনের বেলা বারবার নিজেকে বলেছে, 'তুই রাগ

করিস নে।' সেই কথাটাই আজ অর্ধরাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কে মধুসূদনকে দিয়ে বলিয়ে নিলে।

মধুসূদন আবার তাকে বললে, "তুমি কি এখনও আমার উপর রাগ করে আছ?"

কুমু বললে, "না, আমার রাগ নেই, একটুও না।"

মধুসূদন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। ও যেন মনে মনে কথা কইছে; অমুদ্দিষ্ট কারও সঙ্গে যেন ওর কথা।

মধুসূদন বললে, "তা হলে এ-ঘর থেকে এসো তোমার আপন ঘরে।"

কুমু আজ রাত্রে প্রস্তুত ছিল না। ঘুমের থেকে জেগে উঠেই হঠাৎ মনকে বেঁধে তোলা কঠিন। কাল সকালে স্নান করে দেবতার কাছে তার প্রতিদিনের প্রার্থনা-মন্ত্র পড়ে তবে কাল থেকে সংসারে তার সাধনা আরম্ভ হবে এই সংকল্প সে করেছিল। তখন ওর মনে হল, 'ঠাকুর আমাকে সময় দিলেন না, আজ এই গভীর রাত্রেই ডাক দিলেন। তাঁকে কেমন করে বলব যে, "না"।' মনের ভিতরে যে একটা প্রকাণ্ড অনিচ্ছা হচ্ছিল তাকে অপরাধ বলে কুমু ভয় পেলে। এই অনিচ্ছার বাধা তাকে টেনে রাখছিল বলেই কুমু জোরের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালে, বললে, "চলো।"

উপরে উঠে তার শোবার ঘরের সামনে একটু থমকে দাঁড়িয়ে সে বললে, "আমি এখনই আসছি, দেরি করব না।"

বলে ছাদের কোণে গিয়ে বসে পড়ল। কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড চাঁদ তখন মধ্য-আকাশে।

নিজের মনে মনে কুমু বার বার করে বলতে লাগল, 'প্রভু, তুমি ডেকেছ আমাকে, তুমি ডেকেছ। আমাকে ভোল নি বলেই ডেকেছ। আমাকে কাঁটাপথের উপর দিয়েই নিয়ে যাবে— সে তুমিই, সে তুমিই, সে আর কেউ নয়।'

আর-সমস্তকেই কুমু লুপ্ত করে দিতে চায়। আর সমস্তই মায়া, আর-সমস্তই যদি কাঁটাও হয় তবু সে পথেরই কাঁটা, আর সে তাঁরই পথের কাঁটা। সঙ্গে পাথেয় আছে, তার দাদার আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ সে যে আঁচলে বেঁধে নিয়েছে। সেই আঁচলে বাঁধা আশীর্বাদ বার বার মাথায় ঠেকালে। তার পরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলে। এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠল, পিছন থেকে মধুসূদন বলে উঠল, "বড়োবউ, ঠাণ্ডা লাগবে, ঘরে এসো।" অন্তরের মধ্যে কুমু যে বাণী শুনতে চায় তার সঙ্গে এ কণ্ঠের সুর তো মেলে না! এই তো তার পরীক্ষা, ঠাকুর আজ তাকে বাঁশি দিয়েও ডাকবেন না। তিনি রইবেন আজ ছদ্মবেশে।

৩৩

যেখানে কুমু ব্যক্তিগত মানুষ সেখানে যতই তার মন ধিক্কারে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে, যতই তার সংসার সেখানে আপন গায়ের জোরের রূঢ় অধিকারে তাকে অপমানিত করছে ততই সে আপনার চারি দিকে একটা আবরণ তৈরি করছে। এমন একটা আবরণ যাতে করে নিজের কাছে তার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সত্যতাকে লুপ্ত করে, অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে কমিয়ে দেয়। এ হচ্ছে ক্লোরোফর্মের বিধান। কিন্তু এ তো দু-তিন ঘণ্টার ব্যবস্থা নয়, সমস্ত দিনরাত্রি বেদনাবোধকে বিতৃষ্ণাবোধকে তাড়িয়ে রাখতে হবে। এই অবস্থায় মেয়েরা যদি কোনোমতে একজন গুরুকে পায় তবে তার আত্মবিস্মৃতির চিকিৎসা সহজ হয়; সে তো সম্ভব হল না। তাই মনে মনে পূজার মন্ত্রকে নিয়তই বাজিয়ে রাখতে চেষ্টা করলে। তার এই দিনরাত্রির মন্ত্রটি ছিল—

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহমীশমীড্যং
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

হে আমার পূজনীয়, তোমার কাছে আমার সমস্ত শরীর প্রণত করে এই প্রসাদটি চাই যে, পিতা যেমন করে পুত্রকে, সখা যেমন করে সখাকে, প্রিয় যেমন করে প্রিয়াকে সহ্য করতে পারেন, হে দেব, তুমিও যেন আমাকে তেমনি করে সইতে পার। তুমি যে তোমার ভালোবাসায় আমাকে সহ্য করতে পার তার প্রমাণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, তোমার ভালোবাসায় আমিও সমস্ত ক্ষমা করতে পারি। কুমু চোখ বুজে মনে মনে তাঁকে ডেকে বলে, 'তুমি তো বলেছ, যে মানুষ আমাকে সব জায়গায় দেখে, আমার মধ্যে সমস্তকে দেখে, সেও আমাকে ত্যাগ করে না, আমিও তাকে ত্যাগ করি নে। এই সাধনায় আমার যেন একটুও শৈথিল্য না হয়।'

আজ সকালে স্নান করে চন্দন-গোলা জল দিয়ে তার শরীরকে অনেকক্ষণ ধরে অভিষিক্ত করে নিলে। দেহকে নির্মল করে সুগন্ধি করে সে তাঁকে উৎসর্গ করে দিলে— মনে মনে একাগ্রতার সঙ্গে ধ্যান করতে লাগল যে, নিমেষে নিমেষে তার হাতে তাঁর হাত আছে, তার সমস্ত শরীরে তাঁর সর্বব্যাপী স্পর্শ অবিরাম বিরাজমান। এ দেহকে সত্যরূপে সম্পূর্ণরূপে তিনিই পেয়েছেন, তাঁর পাওয়ার বাইরে যে শরীরটা সে তো মিথ্যা, সে তো মায়া, সে তো মাটি, দেখতে দেখতে মাটিতে মিশিয়ে যাবে।

যতক্ষণ তাঁর স্পর্শকে অনুভব করি ততক্ষণ এ দেহ কিছুতেই অপবিত্র হতে পারে না। এই কথা মনে করতে করতে আনন্দে তার চোখের পাতা ভিজে এল— তার দেহটা যেন মুক্তি পেলে মাংসের স্থূল বন্ধন থেকে। পুণ্যসম্মিলনের নিত্যক্ষেত্র বলে আপন দেহের উপর তার যেন ভক্তি এল। যদি কুন্দফুলের মালা হাতের কাছে পেত তা হলে এখনই আজ সে পরত গলায়, বাঁধত কবরীতে। স্নান করে পরল সে একটি শুভ্র শাড়ি, খুব মোটা লাল পাড় দেওয়া। ছাদে যখন বসল তখন মনে হল সূর্যের আলো হয়ে আকাশপূর্ণ একটি পরম স্পর্শ তার দেহকে অভিনন্দিত করলে।

মোতির মার কাছে এসে কুমু বললে, "আমাকে তোমার কাজে লাগিয়ে দাও।"

মোতির মা হেসে বললে, "এসো তবে তরকারি কুটবে।"

মস্ত মস্ত বারকোশ, বড়ো বড়ো পিতলের থোরা, ঝুড়ি ঝুড়ি শাকসব্জি, দশ-পনেরোটা বঁটি পাতা— আত্মীয়া-আশ্রিতারা গল্প করতে করতে দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত খণ্ডবিখণ্ডিত তরকারিগুলো স্তূপাকার হয়ে উঠছে। তারই মধ্যে কুমু এক জায়গায় বসে গেল। সামনে গরাদের ভিতর দিয়ে দেখা যায় পাশের বস্‌তির এক বৃদ্ধ তেঁতুল গাছ তার চিরচঞ্চল পাতাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো চূর্ণ চূর্ণ করে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

মোতির মা মাঝে মাঝে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে আর ভাবে, ও কি কাজ করছে, না, ওর আঙুলের গতি আশ্রয় করে ওর মন চলে যাচ্ছে কোন্ এক তীর্থের পথে? ওকে দেখে মনে হয় যেন পালের নৌকো, আকাশে-তোলা পালটাতে হাওয়া এসে লাগছে, নৌকোটা যেন সেই স্পর্শেই ভোর, আর তার খোলের দু ধারে যে জল কেটে কেটে পড়ছে সেটা যেন খেয়ালের মধ্যেই নেই। ঘরে অন্য যারা কাজ করছে তারা যে কুমুর সঙ্গে গল্পগুজব করবে এমন যেন একটা সহজ রাস্তা পাচ্ছে না। শ্যামাসুন্দরী একবার বললে, "বউ, সকালেই যদি স্নান কর, গরম জল বলে দাও না কেন? ঠাণ্ডা লাগবে না তো?"

কুমু বললে, "আমার অভ্যেস আছে।"

আলাপ আর এগোল না। কুমুর মনের মধ্যে তখন একটা নীরব জপের ধারা চলছে—

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্

তরকারি-কোটা ভাঁড়ার-দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেল, মেয়েরা স্নানের জন্যে অন্দরের উঠোনে কলতলায় গিয়ে কলরব তুললে।

মোতির মাকে একলা পেয়ে কুমু বললে, "দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাফের জবাব পেয়েছি।"

মোতির মা কিছু আশ্চর্য হয়ে বললে, "কখন পেলে ?"

কুমু বললে, "কাল রাত্তিরে।"

"রাত্তিরে !"

"হাঁ, অনেক রাত। তখন উনি নিজে এসে আমার হাতে দিলেন।"

মোতির মা বললে, "তা হলে চিঠিখানাও নিশ্চয় পেয়েছ।"

"কোন্ চিঠি ?"

"তোমার দাদার চিঠি।"

ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "না, আমি তো পাই নি। দাদার চিঠি এসেছে নাকি ?"

মোতির মা চুপ করে রইল।

কুমু তার হাত চেপে ধরে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, "কোথায় দাদার চিঠি, আমাকে এনে দাও-না।"

মোতির মা চুপি চুপি বললে, "সে চিঠি আনতে পারব না, সে বড়োঠাকুরের বাইরের ঘরের দেরাজে আছে।"

"আমার চিঠি কেন আমাকে এনে দিতে পারবে না ?"

"তাঁর দেরাজ খুলেছি জানতে পারলে প্রলয়-কাণ্ড হবে।"

কুমু অস্থির হয়ে বললে, "দাদার চিঠি তা হলে আমি পড়তে পাব না ?"

"বড়োঠাকুর যখন আপিসে যাবেন তখন সে চিঠি পড়ে আবার দেরাজে রেখে দিয়ো।"

রাগ তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মনটা গরম হয়ে উঠল। বললে, "নিজের চিঠিও কি চুরি করে পড়তে হবে ?"

"কোন্‌টা নিজের কোন্‌টা নিজের নয়, সে বিচার এ বাড়ির কর্তা করে দেন।"

কুমু তার পণ ভুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ মনের ভিতরটা তর্জনী তুলে বলে উঠল, 'রাগ কোরো না।' ক্ষণকালের জন্যে কুমু চোখ বুজলে। নিঃশব্দ বাক্যে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।'

কুমু বললে, "আমার চিঠি কেউ যদি চুরি করেন করুন, আমি তাই বলে চুরি করে চুরির শোধ দিতে চাই নে।"

বলেই কুমুর তখনই মনে হল কথাটা কঠিন হয়েছে। বুঝতে পারলে, ভিতরে যে রাগ আছে নিজের অগোচরে সে আপনাকে প্রকাশ করে। তাকে উন্মূলিত

করতে হবে। তার সঙ্গে লড়াই করতে চাইলে সব সময় তো তার নাগাল পাওয়া যায় না। গুহার মধ্যে সে দুর্গ তৈরি করে থাকে, বাইরে থেকে সেখানে প্রবেশের পথ কই? তাই এমন একটি প্রেমের বন্যা নামিয়ে আনা চাই যাতে রুদ্ধকে মুক্ত করে, বদ্ধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনেক ভুলিয়ে দেবার ওর একটি উপায় হাতে ছিল, সে হচ্ছে সংগীত। কিন্তু এ বাড়িতে এসরাজ বাজাতে ওর লজ্জা করে। সঙ্গে এসরাজ আনেও নি। কুমু গান গাইতে পারে, কিন্তু কুমুর গলায় তেমন জোর নেই। গানের ধারায় আকাশ ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করল, অভিমানের গান। যে গানে ও বলতে পারে, 'আমি তো তোমারই ডাকে এসেছি, তবে তুমি কেন লুকোলে? আমি তো নিমেষের জন্যে দ্বিধা করি নি, তবে আজ আমাকে কেন এমন সংশয়ের মধ্যে ফেললে?' এই-সব কথা খুব গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওর বলতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, তা হলেই যেন সুরে এর উত্তর পাবে।

৩৪

কুমুর পালাবার একটিমাত্র জায়গা আছে, এ বাড়ির ছাদ। সেইখানে চলে গেল। বেলা হয়েছে, প্রখর রৌদ্রে ছাদ ভরে গেছে, কেবল প্রাচীরের গায়ে এক জায়গায় একটুখানি ছায়া। সেইখানে গিয়ে বসল। একটি গান মনে পড়ল, তার সুরটি আসাবরী। সে গানের আরম্ভটি হচ্ছে, 'বাঁশরী হমারি রে'— কিন্তু বাকিটুকু ওস্তাদের মুখে মুখে বিকৃত বাণী— তার মানে বুঝতে পারা যায় না। কুমু ওই অসম্পূর্ণ অংশ আপন ইচ্ছামত নূতন নূতন তান দিয়ে ভরিয়ে পালটে পালটে গাইতে লাগল। ওই একটু-খানি কথা অর্থে ভরে উঠল। ওই বাক্যটি যেন বলছে, 'ও আমার বাঁশি, তোমাতে সুর ভরে উঠছে না কেন? অন্ধকার পেরিয়ে পৌঁচচ্ছে না কেন যেখানে দুয়ার রুদ্ধ, যেখানে ঘুম ভাঙল না? বাঁশরী হমারি রে, বাঁশরী হমারি রে!'

মোতির মা যখন এসে বললে "চলো ভাই, খেতে যাবে" তখন সেই ছাদের কোণের একটুখানি ছায়া গেছে লুপ্ত হয়ে, কিন্তু তখন ওর মন সুরে ভরপুর, সংসারে কে ওর 'পরে কী অন্যায় করেছে সে সমস্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে। ওর চিঠি নিয়ে মধুসূদনের যে ক্ষুদ্রতা, যে ক্ষুদ্রতায় ওর মনে তীব্র অবজ্ঞা উদ্যত হয়ে উঠেছিল, সে যেন এই রোদ-ভরা আকাশে একটা পতঙ্গের মতো কোথায় বিলীন হয়ে গেল, তার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন মিলিয়ে গেল অসীম আকাশে। কিন্তু চিঠির মধ্যে দাদার যে স্নেহবাক্য আছে সেটুকু পাবার জন্যে তার মনের আগ্রহ তো যায় না।

ওই ব্যগ্রতাটা তার মনে লেগে রইল। খাওয়া হয়ে গেলে আর সে থাকতে পারলে না। মোতির মাকে বললে, "আমি যাই বাইরের ঘরে, চিঠি পড়ে আসি।"

মোতির মা বললে, "আর একটু দেরি হোক, চাকররা সবাই যখন ছুটি নিয়ে খেতে যাবে, তখন যেয়ো।"

কুমু বললে, "না, না, সে বড়ো চুরি করে যাওয়ার মতো হবে। আমি সকলের সামনে দিয়ে যেতে চাই, তাতে যে যা মনে করে করুক।"

মোতির মা বললে, "তা হলে চলো আমিও সঙ্গে যাই।"

কুমু বলে উঠল, "না, সে কিছুতেই হবে না। তুমি কেবল বলে দাও কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে।"

মোতির মা অন্তঃপুরের ঝরকা-দেওয়া বারান্দা দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিলে। কুমু বেরিয়ে এল। ভৃত্যেরা সচকিত হয়ে উঠে তাকে প্রণাম করলে। কুমু ঘরে ঢুকে ডেস্কের দেরাজ খুলে দেখলে তার চিঠি। তুলে নিয়ে দেখলে লেফাফা খোলা। বুকের ভিতরটা ফুলে উঠতে লাগল, একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। যে বাড়িতে কুমু মানুষ হয়েছে সেখানে এরকম অবমাননা কোনোমতেই কল্পনা পর্যন্ত করা যেত না। নিজের আবেগের এই তীব্র প্রবলতাতেই তাকে ধাক্কা মেরে সচেতন করে তুলল। সে বলে উঠল, 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্'— তবু তুফান থামে না— তাই বারবার বললে। বাইরে যে আরদালি ছিল, আপিসঘরে তাদের বউরানীর এই আপন-মনে মন্ত্র-আবৃত্তি শুনে সে অবাক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বলতে বলতে কুমুর মন শান্ত হয়ে এল। তখন চিঠিখানি সামনে রেখে চৌকিতে বসে হাত জোড় করে স্থির হয়ে রইল। চিঠি সে চুরি করে পড়বে না এই তার পণ।

এমন সময়ে মধুসূদন ঘরে ঢুকেই চমকে উঠে দাঁড়াল— কুমু তার দিকে চাইলেও না। কাছে এসে দেখলে, ডেস্কের উপর সেই চিঠি। জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এখানে যে!"

কুমু নীরবে শান্ত দৃষ্টিতে মধুসূদনের মুখের দিকে চাইলে। তার মধ্যে নালিশ ছিল না। মধুসূদন আবার জিজ্ঞাসা করলে, "এ ঘরে তুমি কেন?"

এই বাহুল্যপ্রশ্নে কুমু অধৈর্যের স্বরেই বললে, "আমার নামে দাদার চিঠি এসেছে কি না তাই দেখতে এসেছিলেম।"

সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন, এমনতরো প্রশ্নের রাস্তা কাল রাত্তিরে মধুসূদন আপনি বন্ধ করে দিয়েছে। তাই বললে, "এ চিঠি আমিই তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলুম, সেজন্যে তোমার এখানে আসবার তো দরকার ছিল না।"

কুমু একটুখানি চুপ করে রইল, মনকে শান্ত করে তার পরে বললে, "এ চিঠি তুমি আমাকে পড়তে দিতে ইচ্ছে কর নি, সেইজন্যে এ চিঠি আমি পড়ব না। এই আমি ছিঁড়ে ফেললুম। কিন্তু এমন কষ্ট আমাকে আর কখনও দিয়ো না। এর চেয়ে কষ্ট আমার আর কিছু হতে পারে না।"

এই বলে সে মুখে কাপড় দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।

ইতিপূর্বে আজ মধ্যাহ্নে আহারের পর মধুসূদনের মনটা আলোড়িত হয়ে উঠছিল। আন্দোলন কিছুতে থামাতে পারছিল না। কুমুর খাওয়া হলেই তাকে ডাকিয়ে পাঠাবে বলে ঠিক করে রেখেছে। আজ সে মাথার চুল আঁচড়ানো সম্বন্ধে একটু বিশেষ যত্ন নিলে। আজ সকালেই একটি ইংরেজ নাপিতের দোকান থেকে স্পিরিট-মেশানো সুগন্ধি কেশতৈল ও দামি এসেন্স কিনিয়ে আনিয়েছিল। জীবনে এই প্রথম সেগুলি সে ব্যবহার করেছে। সুগন্ধি ও সুসজ্জিত হয়ে সে প্রস্তুত ছিল। আপিসের সময় আজ অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেই মধুসূদন চমকে উঠে বসল। হাতের কাছে আর-কিছু না পেয়ে একখানা পুরোনো খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতাটা নিয়ে এমন-ভাবে সেটাকে দেখতে লাগল যেন তার আপিসেরই কাজের অঙ্গ। এমন-কি পকেট থেকে একটা মোটা নীল পেন্সিল বের করে দুটো-একটা দাগও টেনে দিলে।

এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করলে শ্যামাসুন্দরী। ভ্রূকুঞ্চিত করে মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে। শ্যামাসুন্দরী বললে, "তুমি এখানে বসে আছ ; বউ যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"খুঁজে বেড়াচ্ছে! কোথায়?"

"এই যে দেখলুম, বাইরে তোমার আপিসঘরে গিয়ে ঢুকল। তা এতে অত আশ্চর্য হচ্ছ কেন ঠাকুরপো— সে ভেবেছে তুমি বুঝি—"

তাড়াতাড়ি মধুসূদন বাইরে চলে গেল। তার পরেই সেই চিঠির ব্যাপার।

পালের নৌকায় হঠাৎ পাল ফেটে গেলে তার যে দশা মধুসূদনের তাই হল। তখন আর দেরি করবার লেশমাত্র অবকাশ ছিল না। আপিসে চলে গেল। কিন্তু সকল কাজের ভিতরে ভিতরে তার অসম্পূর্ণ ভাঙা চিন্তার তীক্ষ্ণ ধারগুলো কেবলই যেন ঠেলে ঠেলে বিঁধে বিঁধে উঠছে। এই মানসিক ভূমিকম্পের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা সেদিন তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আপিসে জানিয়ে দিলে উৎকট মাথা ধরেছে, কার্যশেষের অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এল।

৩৫

এ দিকে নবীন ও মোতির মা বুঝেছে এবারে ভিত গেল ভেঙে, পালিয়ে বাঁচবার আশ্রয় তাদের আর কোথাও রইল না। মোতির মা বললে, "এখানে যেরকম খেটে খাচ্ছি সেরকম খেটে খাবার জায়গা সংসারে আমার মিলবে। আমার দুঃখ এই যে, আমি গেলে এ বাড়িতে দিদিকে দেখবার লোক আর কেউ থাকবে না।"

নবীন বললে, "দেখো মেজোবউ, এ সংসারে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছি, এ বাড়ির অন্নজলে অনেকবার আমার অরুচি হয়েছে। কিন্তু এইবার অসহ্য হচ্ছে যে, এমন বউ ঘরে পেয়েও কী করে তাকে নিতে হয়, রাখতে হয়, তা দাদা বুঝলে না— সমস্ত নষ্ট করে দিলে। ভালো জিনিসের ভাঙা টুকরো দিয়েই অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।"

মোতির মা বললে, "সে কথা তোমার দাদার বুঝতে দেরি হবে না। কিন্তু তখন ভাঙা আর জোড়া লাগবে না।"

নবীন বললে, "লক্ষ্মণ-দেওর হবার ভাগ্য আমার ঘটল না, এইটেই আমার মনে বাজছে। যা হোক, তুমি জিনিসপত্তর এখনই গুছিয়ে ফেলো, এ বাড়িতে যখন সময় আসে তখন আর তর সয় না।"

মোতির মা চলে গেল। নবীন আর থাকতে পারলে না, আস্তে আস্তে তার বউ-দিদির ঘরের বাইরে এসে দেখলে কুমু তার শোবার ঘরের মেজের বিছানার উপর পড়ে আছে। যে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলেছে তার বেদনা কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না।

নবীনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। নবীন বললে, "বউদিদি, প্রণাম করতে এসেছি, একটু পায়ের ধুলো দাও।"

বউদিদির সঙ্গে নবীনের এই প্রথম কথাবার্তা।

কুমু বললে, "এসো, বোসো।"

নবীন মাটিতে বসে বললে, "তোমাকে সেবা করতে পারব এই খুশিতে বুক ভরে উঠেছিল। কিন্তু নবীনের কপালে এতটা সৌভাগ্য সইবে কেন? ক-টা দিন মাত্র তোমাকে পেয়েছি, কিছুই করতে পারি নি এই আপসোস মনে রয়ে গেল।"

কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

নবীন বললে, "দাদা আমাদের দেশেই পাঠাবে। এর পরে তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবার সুবিধা হবে না, তাই প্রণাম করে বিদায় নিতে এসেছি।" বলে যেই সে প্রণাম করলে মোতির মা ছুটে এসে বললে, "শীঘ্র চলে এসো। কর্তা তোমার খোঁজ করছেন।"

নবীন তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। মোতির মাও গেল তার সঙ্গে।

সেই বাইরের ঘরে দাদা তার ডেস্কের কাছে বসে; নবীন এসে দাঁড়াল। অন্যদিনে এমন অবস্থায় তার মুখে যেরকম আশঙ্কার ভাব থাকত আজ তা কিছুই নেই।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "ডেস্কের চিঠির কথা বড়োবউকে কে বললে?"

নবীন বললে, "আমিই বলেছি।"

"হঠাৎ তোমার এত সাহস বেড়ে উঠল কোথা থেকে?"

"বড়োবউরানী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর দাদার চিঠি এসেছে কি না। এ বাড়ির চিঠি তো তোমার কাছে এসে প্রথমটা ওই ডেস্কেই জমা হয়, তাই আমি দেখতে এসেছিলুম।"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করতে সবুর সয় নি?"

"তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই—"

"তাই আমার হুকুম উড়িয়ে দিতে হবে?"

"তিনি তো এ বাড়ির কর্ত্রী, কেমন করে জানব তাঁর হুকুম এখানে চলবে না? তিনি যা বলবেন আমি তা মানব না এতবড়ো আস্পর্ধা আমার নেই। এই আমি তোমার কাছে বলছি, তিনি তো শুধু আমার মনিব নন তিনি আমার গুরুজন, তাঁকে যে মানব সে নিমক খেয়ে নয়, সে আমার ভক্তি থেকে।"

"নবীন, তোমাকে তো এতটুকু বেলা থেকে দেখছি, এ-সব বুদ্ধি তোমার নয়। জানি তোমার বুদ্ধি কে জোগায়। যাই হোক, আজ আর সময় নেই, কাল সকালের ট্রেনে তোমাদের দেশে যেতে হবে।"

"যে আজ্ঞে" বলেই নবীন দ্বিরুক্তি না করেই দ্রুত চলে গেল।

এত সংক্ষেপে 'যে আজ্ঞে' মধুসূদনের একটুও ভালো লাগল না। নবীনের কান্নাকাটি করা উচিত ছিল; যদিও তাতে মধুসূদনের সংকল্পের ব্যত্যয় হত না। নবীনকে আবার ফিরে ডেকে বললে, "মাইনে চুকিয়ে নিয়ে যাও, কিন্তু এখন থেকে তোমাদের খরচপত্র জোগাতে পারব না।"

নবীন বললে, "তা জানি, দেশে আমার অংশে যে জমি আছে তাই আমি চাষ করে খাব।"

বলেই অন্য কোনো কথার অপেক্ষা না করেই সে চলে গেল।

মানুষের প্রকৃতি নানা বিরুদ্ধ ধাতু মিশোল করে তৈরি, তার একটা প্রমাণ এই যে, মধুসূদন নবীনকে গভীরভাবে স্নেহ করে। তার অন্য দুই ভাই রজবপুরে বিষয়সম্পত্তির কাজ নিয়ে পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে, মধুসূদন তাদের বড়ো একটা খোঁজ

রাখে না। পিতার মৃত্যুর পর নবীনকে মধুসূদন কলকাতায় আনিয়ে পড়াশুনো করিয়েছে এবং তাকে বরাবর রেখেছে নিজের কাছে। সংসারের কাজে নবীনের স্বাভাবিক পটুতা। তার কারণ সে খুব খাঁটি। আর একটা হচ্ছে, তার কথাবার্তায় ব্যবহারে সকলেই তাকে ভালোবাসে। এ বাড়িতে যখন কোনো ঝগড়াঝাঁটি বাধে তখন নবীন সেটাকে সহজে মিটিয়ে দিতে পারে। নবীন সব কথায় হাসতে জানে, আর লোকদের শুধু কেবল সুবিচার করে না, এমন ব্যবহার করে যাতে প্রত্যেকেই মনে করে তারই 'পরে বুঝি ওর বিশেষ পক্ষপাত।

নবীনকে মধুসূদন যে মনের সঙ্গে স্নেহ করে তার একটা প্রমাণ, মোতির মাকে মধুসূদন দেখতে পারে না। যার প্রতি ওর মমতা তার প্রতি ওর একাধিপত্য চাই। সেই কারণে মধুসূদন কেবল কল্পনা করে মোতির মা যেন নবীনের মন ভাঙাতেই আছে। ছোটো ভাইয়ের প্রতি ওর যে পৈত্রিক অধিকার, বাইরে থেকে এক মেয়ে এসে সেটাতে কেবলই বাধা ঘটায়। নবীনকে মধুসূদন যদি বিশেষ ভালো না বাসত তা হলে অনেক দিন আগেই মোতির মার নির্বাসনদণ্ড পাকা হত।

মধুসূদন ভেবেছিল এইটুকু কাজ সেরেই আবার একবার আপিসে চলে যাবে। কিন্তু কোনোমতেই মনের মধ্যে জোর পেলে না। কুমু সেই-যে চিঠিখানা ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল সেই ছবিটি তার মনে গভীর করে আঁকা হয়ে গেছে। সে এক আশ্চর্য ছবি, এমনতরো কিছু সে কখনও মনে করতে পারত না। একবার তার চিরকালের সন্দেহ-করা স্বভাববশত মধুসূদন ভেবেছিল নিশ্চয়ই কুমু চিঠিখানা আগেই পড়ে নিয়েছে, কিন্তু কুমুর মুখে এমন একটি নির্মল সত্যের দীপ্তি আছে যে, বেশিক্ষণ তাকে অবিশ্বাস করা মধুসূদনের পক্ষেও অসম্ভব।

কুমুকে কঠিনভাবে শাসন করবার শক্তি মধুসূদন দেখতে দেখতে হারিয়ে ফেলেছে, এখন তার নিজের তরফে যে-সব অপূর্ণতা তাই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে। তার বয়স বেশি এ কথা আজ সে ভুলতে পারছে না। এমন-কি তার যে চুলে পাক ধরেছে সেটা সে কোনোমতে গোপন করতে পারলে বাঁচে। তার রঙটা কালো, বিধাতার সেই অবিচার এতকাল পরে তাকে তীব্র করে বাজছে। কুমুর মনটা কেবলই তার মুষ্টি থেকে ফসকে যাচ্ছে, তার কারণ মধুসূদনের রূপ ও যৌবনের অভাব, এতে তার সন্দেহ নেই। এইখানেই সে নিরস্ত্র সে দুর্বল। চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাবে বিধাতা আগে থাকতেই যার কাছে তার হার মানিয়ে রেখে দিয়েছেন, এ সে মনেও করে নি

অথচ এ কথা বলবারও জোর মনে নেই যে তার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হলেই ভালো হত, যার উপরে তার শাসন খাটত।

মধুসূদন কেবল একটা বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে। সে তার ধনে। তাই আজ সকালেই ঘরে জহরি এসেছিল। তার কাছ থেকে তিনটে আংটি নিয়ে রেখেছে, দেখতে চায় কোন্‌টাতে কুমুর পছন্দ। সেই আংটির কৌটা তিনটি পকেটে নিয়ে সে তার শোবার ঘরে গেল। একটা চুনি, একটা পান্না, একটা হীরের আংটি। মধুসূদন মনে মনে একটি দৃশ্য কল্পনাযোগে দেখতে পাচ্ছে। প্রথমে সে যেন চুনির আংটির কৌটা অতি ধীরে ধীরে খুললে, কুমুর লুব্ধ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার পরে বেরোল পান্না, তাতে চক্ষু আরও প্রসারিত। তার পর হীরে, তার বহুমূল্য উজ্জ্বলতায় রমণীর বিস্ময়ের সীমা নেই। মধুসূদন রাজকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে, 'তোমার যেটা ইচ্ছে পছন্দ করে নাও।' হীরেটাই কুমু যখন পছন্দ করলে তখন তার লুব্ধতার ক্ষীণ সাহস দেখে ঈষৎ হাস্য করে মধুসূদন তিনটে আংটিই কুমুর তিন আঙুলে পরিয়ে দিলে। তার পরেই রাত্রে শয়নমঞ্চের যবনিকা উঠল।

মধুসূদনের অভিপ্রায় ছিল এই ব্যাপারটা আজ রাত্রের আহারের পর হবে। কিন্তু দুপুরবেলাকার দুর্যোগের পর মধুসূদন আর সবুর করতে পারলে না। রাত্রের ভূমিকাটা আজ অপরাহ্ণে সেরে নেবার জন্যে অন্তঃপুরে গেল।

গিয়ে দেখে কুমু একটা টিনের তোরঙ্গ খুলে শোবার ঘরের মেজেতে বসে গোছাচ্ছে। পাশে জিনিসপত্র কাপড়চোপড় ছড়ানো।

"এ কী কাণ্ড! কোথাও যাচ্ছ নাকি?"

"হাঁ।"

"কোথায়?"

"রজবপুরে।"

"তার মানে কী হল?"

"তোমার দেরাজ খোলা নিয়ে ঠাকুরপোদের শাস্তি দিয়েছ। সে শাস্তি আমারই পাওনা।"

'যেয়ো না' বলে অনুরোধ করতে বসা একেবারেই মধুসূদনের স্বভাববিরুদ্ধ। তার মনটা প্রথমেই বলে উঠল— যাক-না দেখি কতদিন থাকতে পারে। এক মুহূর্ত দেরি না করে হন্ হন্ করে ফিরে চলে গেল।

৩৬

মধুসূদন বাইরে গিয়ে নবীনকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, "বড়োবউকে তোরা খেপিয়েছিস।"

"দাদা, কালই তো আমরা যাচ্ছি, তোমার কাছে ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলে কথা কব না। আমি আজ এই স্পষ্ট বলে যাচ্ছি, বড়োবউরানীকে খেপাবার জন্যে সংসারে আর কারও দরকার হবে না— তুমি একাই পারবে। আমরা থাকলে তবু যদি-বা কিছু ঠাণ্ডা রাখতে পারতুম, কিন্তু সে তোমার সইল না।"

মধুসূদন গর্জন করে উঠে বললে, "জ্যাঠামি করিস নে। রজবপুরে যাবার কথা তোরাই ওকে শিখিয়েছিস।"

"এ কথা ভাবতেই পারি নে তো শেখাব কি ?"

"দেখ্, এই নিয়ে যদি ওকে নাচাস তোদের ভালো হবে না স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।"

"দাদা, এ-সব কথা বলছ কাকে ? যেখানে বললে কাজে লাগে বলো গে।"

"তোরা কিছু বলিস নি ?"

"এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কল্পনাও করি নি।"

"বড়োবউ যদি জেদ ধরে বসে তা হলে কী করবি তোরা ?"

"তোমাকে ডেকে আনব। তোমার পাইক বরকন্দাজ পেয়াদা আছে, তুমি ঠেকাতে পার। তার পরে তোমার শত্রুপক্ষেরা এই যুদ্ধের সংবাদ যদি কাগজে রটায় তা হলে মেজোবউকে সন্দেহ করে বোসো না।"

মধুসূদন আবার তাকে ধমক দিয়ে বললে, "চুপ কর্! বড়োবউ যদি রজবপুরে যেতে চায় তো যাক, আমি ঠেকাব না।"

"আমরা তাঁকে খাওয়াব কী করে ?"

"তোমার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে। যা, যা বলছি! বেরো বলছি ঘর থেকে।"

নবীন বেরিয়ে গেল। মধুসূদন ওডিকলোন ভিজনো পটি কপালে জড়িয়ে আবার একবার আপিসে যাবার সংকল্প মনে দৃঢ় করতে লাগল।

নবীনের কাছে মোতির মা সব কথা শুনে দৌড়ে গেল কুমুর শোবার ঘরে। দেখলে তখনও সে কাপড়-চোপড় পাট করছে তোলবার জন্যে। বললে, "এ কী করছ বউরানী ?"

"তোমাদের সঙ্গে যাব।"

"তোমাকে নিয়ে যাবার সাধ্য কী আমার!"

"কেন ?"

"বড়োঠাকুর তা হলে আমাদের মুখ দেখবেন না।"

"তা হলে আমারও দেখবেন না।"

"তা সে যেন হল, আমরা যে বড়ো গরিব।"

"আমিও কম গরিব না, আমারও চলে যাবে।"

"লোকে যে বড়োঠাকুরকে নিয়ে হাসবে।"

"তা বলে আমার জন্যে তোমরা শাস্তি পাবে এ আমি সইব না।"

"কিন্তু দিদি, তোমার জন্যে তো শাস্তি নয়, এ আমাদের নিজের পাপের জন্যেই।"

"কিসের পাপ তোমাদের ?"

"আমরাই তো খবর দিয়েছি তোমাকে।"

"আমি যদি খবর জানতে চাই তা হলে খবর দেওয়াটা অপরাধ ?"

"কর্তাকে না জানিয়ে দেওয়াটা অপরাধ।"

"তাই ভালো, অপরাধ তোমরাও করেছ আমিও করেছি। একসঙ্গেই ফল ভোগ করব।"

"আচ্ছা বেশ, তা হলে বলে দেব তোমার জন্যে পালকি। বড়োঠাকুরের হুকুম হয়েছে তোমাকে বাধা দেওয়া হবে না। এখন তবে তোমার জিনিসগুলি গুছিয়ে দিই। ওগুলো নিয়ে যে ঘেমে উঠলে !"

দুজনে গোছাতে লেগে গেল।

এমন সময়ে কানে এল বাইরে জুতোর মচ্ মচ্ ধ্বনি। মোতির মা দিল দৌড়।

মধুসূদন ঘরে ঢুকেই বললে, "বড়োবউ, তুমি যেতে পারবে না।"

"কেন যেতে পারব না ?"

"আমি হুকুম করছি বলে।"

"আচ্ছা, তা হলে যাব না। তার পরে আর কী হুকুম বলো।"

"বন্ধ করো তোমার জিনিস প্যাক করা।"

"এই বন্ধ করলুম।" বলে কুমু উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মধুসূদন বললে, "শোনো, শোনো।"

তখনই কুমু ফিরে এসে বললে, "কী বলো।"

বিশেষ কিছুই বলবার ছিল না। তবু একটু ভেবে বললে, "তোমার জন্যে আংটি এনেছি।"

"আমার যে-আংটির দরকার ছিল সে তুমি পরতে বারণ করেছ, আর আমার আংটির দরকার নেই।"

"একবার দেখোই না চেয়ে।"

মধুসূদন একে একে কৌটো খুলে দেখালে। কুমু একটি কথাও বললে না।

"এর যেটা তোমার পছন্দ সেইটেই তুমি পরতে পার।"

"তুমি যেটা হুকুম করবে সেইটেই পরব।"

"আমি তো মনে করি তিনটেই তিন আঙুলে মানাবে।"

"হুকুম কর তিনটেই পরব।"

"আমি পরিয়ে দিই।"

"দাও পরিয়ে।"

মধুসূদন পরিয়ে দিলে। কুমু বললে, "আর কিছু হুকুম আছে?"

"বড়োবউ, রাগ করছ কেন?"

"আমি একটুও রাগ করছি নে।" বলে কুমু আবার ঘর থেকে চলে গেল।

মধুসূদন অস্থির হয়ে বলে উঠল, "আহা, যাও কোথায়? শোনো, শোনো।"

কুমু তখনই ফিরে এসে বললে, "কী বলো।"

ভেবে পেলে না কী বলবে। মধুসূদনের মুখ লাল হয়ে উঠল। ধিক্‌কার দিয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা যাও।" রেগে বললে, "দাও আংটিগুলো ফিরিয়ে দাও।"

তখনই কুমু তিনটে আংটি খুলে টিপায়ের উপর রাখলে।

মধুসূদন ধমক দিয়ে বললে, "যাও চলে।"

কুমু তখনই চলে গেল।

এইবার মধুসূদন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে যে, সে আপিসে যাবেই। তখন কাজের সময় প্রায় উত্তীর্ণ। ইংরেজ কর্মচারীরা সকলেই চলে গেছে টেনিস খেলায়। উচ্চতন বড়োবাবুদের দল উঠি-উঠি করছে। এমন সময় মধুসূদন আপিসে উপস্থিত হয়ে একেবারে খুব কষে কাজে লেগে গেল। ছটা বাজল, সাতটা বাজল, আটটা বাজে, তখন খাতাপত্র বন্ধ করে উঠে পড়ল।

৩৭

এতদিন মধুসূদনের জীবনযাত্রায় কখনও কোনো খেই ছিঁড়ে যেত না। প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তই নিশ্চিত নিয়মে বাঁধা ছিল। আজ হঠাৎ একটা অনিশ্চিত এসে সব গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে। এই-যে আজ আপিস থেকে বাড়ির দিকে চলেছে, রাত্তিরটা যে ঠিক কী ভাবে প্রকাশ পাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মধুসূদন

ভয়ে ভয়ে বাড়িতে এল, আস্তে আস্তে আহার করলে। আহার করে তখনই সাহস হল না শোবার ঘরে যেতে। প্রথমে কিছুক্ষণ বাইরের দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। শোবার সময় নটা যখন বাজল তখন গেল অন্তঃপুরে। আজ ছিল দৃঢ় পণ— যথাসময়ে বিছানায় শোবে, কিছুতেই অন্যথা হবে না। শূন্য শোবার ঘরে ঢুকেই মশারি খুলেই একেবারে ঝপ্ করে বিছানার উপরে পড়ল। ঘুম আসতে চায় না। রাত্রি যতই নিবিড় হয় ততই ভিতরকার উপবাসী জীবটা অন্ধকারে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। তখন তাকে তাড়া করবার কেউ নেই, পাহারাওআলারা সকলেই ক্লান্ত।

ঘড়িতে একটা বাজল, চোখে একটুও ঘুম নেই ; আর থাকতে পারল না, বিছানা থেকে উঠে ভাবতে লাগল কুমু কোথায় ? বঙ্কু ফরাশের উপর কড়া হুকুম, ফরাশখানা তালাচাবি দিয়ে বন্ধ। ছাদ ঘুরে এল, কেউ নেই। পায়ের জুতো খুলে ফেলে নীচের তলায় বারান্দা বেয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। মোতির মার ঘরের সামনে এসে মনে হল যেন কথাবার্তার শব্দ। হতে পারে, কাল চলে যাবে, আজ স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ চলছে। বাইরে চুপ করে দরজায় কান পেতে রইল। দুজনে গুন্ গুন্ করে আলাপ চলছে। কথা শোনা যায় না, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল দুটিই মেয়ের গলা। তবে তো বিচ্ছেদের পূর্বরাত্রে মোতির মায়ের সঙ্গে কুমুরই মনের কথা হচ্ছে। রাগে ক্ষোভে ইচ্ছে করতে লাগল লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে একটা কাণ্ড করে। কিন্তু নবীনটা তা হলে কোথায় ? নিশ্চয় বাইরে।

অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার ঝিলমিল-দেওয়া রাস্তাটাতে লণ্ঠনে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে, সেইখানে এসেই মধুসূদন দেখলে একখানা লাল শাল গায়ে জড়িয়ে শ্যামা দাঁড়িয়ে। তার কাছে লজ্জিত হয়ে মধুসূদন রেগে উঠল। বললে, "কী করছ এত রাত্রে এখানে ?"

শ্যামা উত্তর করলে, "শুয়েছিলুম। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ভয় হল, ভাবলুম বুঝি—"

মধুসূদন তর্জন করে বলে উঠল, "আস্পর্ধা বাড়ছে দেখছি। আমার সঙ্গে চালাকি করতে চেয়ো না, সাবধান করে দিচ্ছি। যাও শুতে।"

শ্যামাসুন্দরী কয়দিন থেকে একটু একটু করে তার সাহসের ক্ষেত্র বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলছিল। আজ বুঝলে, অসময়ে অজায়গায় পা পড়েছে। অত্যন্ত করুণ মুখ করে একবার সে মধুসূদনের দিকে চাইলে, তার পরে মুখ ফিরিয়ে আঁচলটা টেনে চোখ মুছলে। চলে যাবার উপক্রম করে আবার সে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, "চালাকি করব না ঠাকুরপো। যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখে ঘুম আসে না।

আমরা তো আজ আসি নি, কতকালের সম্বন্ধ, আমরা সইব কী করে?" বলে শ্যামা দ্রুতপদে চলে গেল।

মধুসূদন একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পরে চলল বাইরের ঘরে। ঠিক একেবারে পড়ল চৌকিদারের সামনে, সে তখন টহল দিতে বেরিয়েছে। এমনি নিয়মের কঠিন জাল যে, নিজের বাড়িতে যে চুপি চুপি সঞ্চরণ করবে তার জো নেই। চারি দিকেই সতর্ক দৃষ্টির ব্যূহ। রাজাবাহাদুর এই রাত্রে বিছানা ছেড়ে খালি-পায়ে অন্ধকারে বাইরের বারান্দায় ভূতের মতো বেরিয়েছে এ যে একেবারে অভূতপূর্ব! প্রথমে দূর থেকে যখন চিনতে পারে নি, চৌকিদার বলে উঠেছিল, "কোন্ হ্যায়?" কাছে এসে জিভ কেটে মস্ত প্রণাম করলে, বললে, "রাজাবাহাদুর, কিছু হুকুম আছে?"

মধুসূদন বললে, "দেখতে এলুম ঠিকমত চলছে কি না।" কথাটা মধুসূদনের পক্ষে অসংগত নয়।

তার পরে মধুসূদন বৈঠকখানাঘরে গিয়ে দেখে যা ভেবেছিল তাই, নবীন বসবার ঘরে গদির উপর তাকিয়া আঁকড়ে নিদ্রা দিচ্ছে। মধুসূদন ঘরে একটা গ্যাসের আলো জ্বেলে দিলে, তাতেও নবীনের ঘুম ভাঙল না। তাকে ঠেলা দিতেই ধড়্ফড়্ করে জেগে সে উঠে বসল। মধুসূদন তার কোনোরকম কৈফিয়ত তলব না করেই বললে, "এখনই যা, বড়োবউকে বল্ গে আমি তাকে শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছি।" বলে তখনই সে অন্তঃপুরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই কুমু শোবার ঘরে এসে প্রবেশ করলে। মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে। সাদাসিধে একখানি লালপেড়ে শাড়ি পরা। শাড়ির প্রান্তটি মাথার উপর টানা। এই নির্জন ঘরের অল্প আলোয় এ কী অপরূপ আবির্ভাব! কুমু ঘরের প্রান্তের সোফাটির উপরে বসল।

মধুসূদন তখনই এসে বসল মেজের উপরে তার পায়ের কাছে। কুমু সংকুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করবামাত্র মধুসূদন হাতে ধরে তাকে টেনে বসালে; বললে, "উঠো না, শোনো আমার কথা। আমাকে মাপ করো, আমি দোষ করেছি।"

মধুসূদনের এই অপ্রত্যাশিত বিনতি দেখে কুমু অবাক হয়ে রইল। মধুসূদন আবার বললে, "নবীনকে মেজোবউকে রজবপুরে যেতে আমি বারণ করে দেব। তারা তোমার সেবাতেই থাকবে।"

কুমু কী যে বলবে কিছুই ভেবে পেলে না। মধুসূদন ভাবলে, নিজের মান খর্ব

করে আমি বড়োবউয়ের মান ভাঙব। হাত ধরে মিনতি করে বললে, "আমি এখনই আসছি। বলো তুমি চলে যাবে না।"

কুমু বললে, "না, যাব না।"

মধুসূদন নীচে চলে গেল। মধুসূদন যখন ক্ষুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা কুমুদিনীর পক্ষে তেমন কঠিন নয়। কিন্তু আজ তার এই নম্রতা, এই তার নিজেকে খর্ব করা, এর সম্বন্ধে কুমুর যে কী উত্তর তা সে ভেবে পায় না। হৃদয়ের যে দান নিয়ে সে এসেছিল সে তো সব স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে, আর তো তা ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কাজ চলবে না। আবার সে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল, 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।'

খানিক বাদে মধুসূদন নবীন ও মোতির মাকে সঙ্গে নিয়ে কুমুর সামনে উপস্থিত করলে। তাদের সম্বোধন করে বললে, "কাল তোমাদের রজবপুরে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু তার দরকার নেই। কাল থেকে বড়োবউয়ের সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত করে দিচ্ছি।"

শুনে ওরা দুজনে অবাক হয়ে গেল। একে তো এমন হুকুম প্রত্যাশা করে নি, তার পরে এত রাত্তিরে ওদের ডেকে এনে এ কথা বলবার জরুরি দরকার কী ছিল।

মধুসূদনের ধৈর্য সবুর মানছিল না। আজ রাত্তিরেই কুমুর মনকে ফেরাবার জন্যে উপায় প্রয়োগ করতে কার্পণ্য বা সংকোচ করতে পারলে না। এমন করে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ সে জীবনে কখনও করে নি। সে যা চেয়েছিল তা পাবার জন্যে তার পক্ষে সবচেয়ে দুঃসাধ্য মূল্য সে দিলে। তার ভাষায় সে কুমুকে বুঝিয়ে দিলে, তোমার কাছে আমি অসংকোচে হার মানছি।

এইবার কুমুর মনে বড়ো একটা সংকোচ এল, সে ভাবতে লাগল এই জিনিসটাকে কেমন করে সে গ্রহণ করবে? এর বদলে কী আছে তার দেবার? বাইরে থেকে জীবনে যখন বাধা আসে তখন লড়াই করবার জোর পাওয়া যায়, তখন স্বয়ং দেবতাই হন সহায়। হঠাৎ সেই বাইরের বিরুদ্ধতা একেবারে নিরস্ত হলে যুদ্ধ থামে কিন্তু সন্ধি হতে চায় না। তখন বেরিয়ে পড়ে নিজের ভিতরের প্রতিকূলতা। কুমু হঠাৎ দেখতে পেলে মধুসূদন যখন উদ্ধত ছিল তখন তার সঙ্গে ব্যবহার অপ্রিয় হোক তবুও তা সহজ ছিল; কিন্তু মধুসূদন যখন নম্র হয়েছে তখন তার সঙ্গে ব্যবহার কুমুর পক্ষে বড়ো শক্ত হয়ে উঠল। এখন তার ক্ষুব্ধ অভিমানের আড়াল থাকে না, তার সেই ফরাশখানার আশ্রয় চলে যায়, এখন দেবতার কাছে হাত জোড় করবার কোনো মানে নেই।

মোতির মাকে কোনো ছুতোয় কুমু যদি রাখতে পারত তা হলে সে বেঁচে যেত। কিন্তু নবীন গেল চলে, হতবুদ্ধি মোতির মাও আস্তে আস্তে চলল তার পিছনে দরজার কাছে এসে একবার মুখ আড় করে উদ্বিগ্নভাবে কুমুদিনীর মুখের দিকে চেয়ে গেল। স্বামীর প্রসন্নতার হাত থেকে এই মেয়েটিকে এখন কে বাঁচাবে?

মধুসূদন বললে, "বড়োবউ, কাপড় ছেড়ে শুতে আসবে না?"

কুমু ধীরে ধীরে উঠে পাশের নাবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে— মুক্তির মেয়াদ যতটুকু পারে বাড়িয়ে নিতে চায়। সে ঘরে দেওয়ালের কাছে একটা চৌকি ছিল সেইটেতে বসে রইল। তার ব্যাকুল দেহটা যেন নিজের মধ্যে নিজের অন্তরাল খুঁজছে। মধুসূদন মাঝে মাঝে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায় আর হিসেব করতে থাকে কাপড় ছাড়বার জন্যে কতটা সময় দরকার। ইতিমধ্যে আয়নাতে নিজের মুখটা দেখলে, মাথার তেলোর যে জায়গাটাতে কড়া চুলগুলো বেমানান রকম খাড়া হয়ে থাকে বৃথা তার উপরে কয়েকবার বুরুশের চাপ লাগালে আর গায়ের কাপড়ে অনেকখানি দিলে ল্যাভেণ্ডার ঢেলে।

পনেরো মিনিট গেল; বেশ-বদলের পক্ষে সে সময়টা যথেষ্ট। মধুসূদন চুপি চুপি একবার নাবার ঘরের দরজার কাছে কান দিয়ে দাঁড়াল, ভিতরে নড়াচড়ার কোনো শব্দ নেই— মনে ভাবলে কুমু হয়তো চুলটার বাহার করছে, খোঁপাটা নিয়ে ব্যস্ত। মেয়েরা সাজ করতে ভালোবাসে মধুসূদনেরও এ আন্দাজটা ছিল, অতএব সবুর করতেই হবে। আধঘণ্টা হল— মধুসূদন আর-একবার দরজার উপর কান লাগালে, এখনও কোনো শব্দ নেই। ফিরে এসে কেদারায় বসে পড়ে খাটের সামনের দেয়ালে বিলিতি যে ছবিটা ঝোলানো ছিল তার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ এক সময়ে ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে রুদ্ধ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে, "বড়োবউ, এখনও হয় নি?"

একটু পরেই আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। কুমুদিনী বেরিয়ে এল, যেন সে স্বপ্নে-পাওয়া। যে কাপড় পরা ছিল তাই আছে; এ তো রাত্রে শোবার সাজ নয়। গায়ে একখানা প্রায় পুরো হাতা-ওআলা ব্রাউন রঙের সার্জের জামা, একটা লালপেড়ে বাদামি রঙের আলোয়ানের আঁচল মাথার উপর টেনে-দেওয়া। দরজার একটা পাল্লায় বাঁ হাত রেখে যেন কী দ্বিধার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল— একখানি অপরূপ ছবি! নিটোল গৌরবর্ণ হাতে মকরমুখো প্লেন সোনার বালা— সেকেলে ছাঁদের— বোধ হয় এককালে তার মায়ের ছিল। এই মোটা ভারী বালা তার সুকুমার হাতকে যে-ঐশ্বর্যের মর্যাদা দিয়েছে সেটি ওর পক্ষে এত সহজ যে, ওই অলংকারটা ওর শরীরে

একটুমাত্র আড়ম্বরের সুর দেয় নি। মধুসূদন ওকে আবার যেন নতুন করে দেখলে। ওর মহিমায় আবার সে বিস্মিত হল। মধুসূদনের চিরার্জিত সমস্ত সম্পদ এতদিন পরে শ্রীলাভ করেছে এ কথা না মনে করে সে থাকতে পারলে না। সংসারে যে-সব লোকের সঙ্গে মধুসূদনের সর্বদা দেখাসাক্ষাৎ তাদের অধিকাংশের চেয়ে নিজেকে ধনগৌরবে অনেক বড়ো মনে করা তার অভ্যাস। আজ গ্যাসের আলোতে শোবার ঘরের দরজার পাশে ওই যে মেয়েটি শুব্ধ দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে মধুসূদনের মনে হল, আমার যথেষ্ট ধন নেই— মনে হল, যদি রাজচক্রবর্তী সম্রাট হতুম তা হলেই ওকে এ ঘরে মানাত। যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলে এর স্বভাবটি জন্মাবধি লালিত একটি বিশুদ্ধ বংশমর্যাদার মধ্যে— অর্থাৎ এ যেন এর জন্মের পূর্ববর্তী বহু দীর্ঘকালকে অধিকার করে দাঁড়িয়ে। সেখানে বাইরে থেকে যে-সে প্রবেশ করতেই পারে না— সেখানেই আপন স্বাভাবিক স্বত্ব নিয়ে বিরাজ করছে বিপ্রদাস— তাকেও ওই কুমুর মতোই একটি আত্মবিস্মৃত সহজ গৌরব সর্বদা ঘিরে রয়েছে।

মধুসূদন এই কথাটাই কিছুতে সহ্য করতে পারে না। বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নেই, আছে একটা দূরত্ব। অতিবড়ো আত্মীয়ও যে হঠাৎ এসে তার পিঠ চাপড়িয়ে বলতে পারে 'কী হে, কেমন?' এ যেন অসম্ভব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে কী রকম খাটো হয়ে থাকে সেইটেতে তার রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরে মধুসূদন জোর করতে পারছে না— আপন সংসারে যেখানে সবচেয়ে তার কর্তৃত্ব করবার অধিকার সেইখানেই সে যেন সবচেয়ে হটে গিয়েছে। কিন্তু এখানে তার রাগ হয় না— কুমুর প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ কুমুকে দেখে মধুসূদন স্পষ্টই বুঝলে কুমু তৈরি হয়ে আসে নি— একটা অদৃশ্য আড়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কী সুন্দর! কী একটা দীপ্যমান শুচিতা, শুভ্রতা! যেন নির্জন তুষারশিখরের উপরে নির্মল উষা দেখা দিয়েছে।

মধুসূদন একটু কাছে এগিয়ে এসে ধীর স্বরে বললে, "শুতে আসবে না বড়োবউ?"

কুমু আশ্চর্য হয়ে গেল। সে নিশ্চয় মনে করেছিল মধুসূদন রাগ করবে, তাকে অপমানের কথা বলবে। হঠাৎ একটা চিরপরিচিত সুর তার মনে পড়ে গেল— তার বাবা স্নিগ্ধ গলায় কেমন করে তার মাকে বড়োবউ বলে ডাকতেন। সেইসঙ্গেই মনে পড়ল— মা তার বাবাকে কাছে আসতে বাধা দিয়ে কেমন করে চলে গিয়েছিলেন। এক মুহূর্তে তার চোখ ছল্‌ছলিয়ে এল— মাটিতে মধুসূদনের পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে উঠল, "আমাকে মাপ করো।"

মধুসূদন তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে তুলে চৌকির উপরে বসিয়ে বললে, "কী দোষ করেছ যে তোমাকে মাপ করব ?"

কুমু বললে, "এখনও আমার মন তৈরি হয় নি। আমাকে একটুখানি সময় দাও।"

মধুসূদনের মনটা শক্ত হয়ে উঠল ; বললে, "কিসের জন্যে সময় দিতে হবে বুঝিয়ে বলো।"

"ঠিক বলতে পারছি নে, কাউকে বুঝিয়ে বলা শক্ত—"

মধুসূদনের কণ্ঠে আর রস রইল না। সে বললে, "কিছুই শক্ত না। তুমি বলতে চাও, আমাকে তোমার ভালো লাগছে না।"

কুমুর পক্ষে মুশকিল হল। কথাটা সত্যি অথচ সত্যি নয়। হৃদয় ভরে নৈবেদ্য দেবার জন্যেই সে পণ করে আছে, কিন্তু সে নৈবেদ্য এখনও এসে পৌঁছোল না। মন বলছে, একটু সবুর করলেই, পথে বাধা না দিলে, এসে পৌঁছোবে ; দেরি যে আছে তাও না। তবুও এখনও ডালা যে শূন্য সে কথা মানতেই হবে।

কুমু বললে, "তোমাকে ফাঁকি দিতে চাই নে বলেই বলছি, একটু আমাকে সময় দাও।"

মধুসূদন ক্রমেই অসহিষ্ণু হতে লাগল— কড়া করেই বললে, "সময় দিলে কী সুবিধে হবে! তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীর ঘর করতে চাও!"

মধুসূদনের তাই বিশ্বাস। সে ভেবেছে বিপ্রদাসের অপেক্ষাতেই কুমুর সমস্ত ঠেকে আছে। দাদা যেমনটি চালাবে, ও তেমনি চলবে। বিদ্রূপের সুরে বললে, "তোমার দাদা তোমার গুরু!"

কুমুদিনী তখনই মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "হ্যাঁ, আমার দাদা আমার গুরু।"

"তাঁর হুকুম না হলে আজ কাপড় ছাড়বে না, বিছানায় শুতে আসবে না! তাই নাকি ?"

কুমুদিনী হাতের মুঠো শক্ত করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"তা হলে টেলিগ্রাফ করে হুকুম আনাই— রাত অনেক হল।"

কুমু কোনো জবাব না দিয়ে ছাতে যাবার দরজার দিকে চলল।

মধুসূদন গর্জন করে ধমকে উঠে বললে, "যেয়ো না বলছি।"

কুমু তখনই ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "কী চাও, বলো।"

"এখনই কাপড় ছেড়ে এসো।" ঘড়ি খুলে বললে, "পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।"

কুমু তখনই নাবার ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে শাড়ির উপর একখানা মোটা চাদর

জড়িয়ে চলে এল। এখন দ্বিতীয় হুকুমের জন্যে তার অপেক্ষা। মধুসূদন দেখে বেশ বুঝলে এও রণসাজ। রাগ বেড়ে উঠল, কিন্তু কী করতে হবে ভেবে পায় না। প্রবল ক্রোধের মুখেও মধুসূদনের মনে ব্যবস্থাবুদ্ধি থাকে; তাই সে থমকে গেল। বললে, "এখন কী করতে চাও আমাকে বলো।"

"তুমি যা বলবে তাই করব।"

মধুসূদন হতাশ হয়ে বসে পড়ল চৌকিতে। ওই চাদরে-জড়ানো মেয়েটিকে দেখে মনে হল, এ যেন বিধবার মূর্তি— ওর স্বামী আর ওর মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ মৃত্যুর সমুদ্র। তর্জন করে এ সমুদ্র পার হওয়া যায় না। পালে কোন্ হাওয়া লাগলে তরী ভাসবে? কোনো দিন কি ভাসবে?

চুপ করে বসে রইল। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া ঘরে একটুও শব্দ নেই। কুমুদিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না— আবার ফিরে বাইরে ছাতের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তার মোড় থেকে একটা মাতালের, গদ্‌গদ কণ্ঠের গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আর প্রতিবেশীর আস্তাবলে একটা কুকুরের বাচ্ছাকে বেঁধে রেখেছে— রাত্রির শান্তি ঘুলিয়ে দিয়ে উঠছে তারই অশ্রান্ত আর্তনাদ।

সময় একটা অতলস্পর্শ গর্তের মতো শূন্য হয়ে যেন হাঁ করে আছে। মধুসূদনের সংসারের কলের সমস্ত চাকাই যেন বন্ধ। কাল তার আপিসের অনেক কাজ, ডাইরেকটারদের মীটিং— কতকগুলো কঠিন প্রস্তাব অনেকের বাধা সত্ত্বেও কৌশলে পাস করিয়ে নিতে হবে। সে-সমস্ত জরুরি ব্যাপার আজ তার কাছে একেবারে ছায়ার মতো। আগে হলে কালকের দিনের কার্যপ্রণালী আজ রাত্রে নোটবইয়ে টুকে রাখত। সব চিন্তা দূর হয়ে গেল, জগতে যে কঠিন সত্য সুনিশ্চিত সে হচ্ছে চাদর দিয়ে ঢাকা ওই মেয়ে, ঘরের থেকে বেরিয়ে যাবার পথে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। খানিক বাদে মধুসূদন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, ঘরটা যেন ধ্যান ভেঙে চমকে উঠল। দ্রুত চৌকি থেকে উঠে কুমুর কাছে গিয়ে বললে, "বড়োবউ, তোমার মন কি পাথরে গড়া?"

ওই বড়োবউ শব্দটা কুমুর মনে মন্ত্রের মতো কাজ করে। নিজের মধ্যে তার মায়ের জীবনের অনুবৃত্তি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই ডাকে তার মা কতদিন কত সহজে সাড়া দিয়েছিলেন, তারই অভ্যাসটা যেন কুমুরও রক্তের মধ্যে। তাই চকিতে সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। মধুসূদন গভীর কাতরতার সঙ্গে বললে, "আমি তোমার অযোগ্য, কিন্তু আমাকে কি দয়া করবে না?"

কুমুদিনী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "ছি ছি অমন করে বোলো না।" মাটিতে পড়ে মধুসূদনের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "আমি তোমার দাসী, আমাকে তুমি আদেশ করো।"

মধুসূদন তাকে হাত ধরে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বললে, "না, তোমাকে আদেশ করব না, তুমি আপন ইচ্ছাতে আমার কাছে এসো।"

কুমুদিনী মধুসূদনের বাহুবন্ধনে হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলে না। মধুসূদন রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললে, "না, তোমাকে আদেশ করব না, তবু তুমি আমার কাছে এসো।" এই বলে কুমুদিনীকে ছেড়ে দিলে।

কুমুদিনীর গৌরবর্ণ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে চোখ নিচু করে বললে, "তুমি আদেশ করলে আমার কর্তব্য সহজ হয়। আমি নিজে ভেবে কিছু করতে পারি নে।"

"আচ্ছা, তুমি তোমার ওই গায়ের চাদরখানা খুলে ফেলো— ওটাকে আমি দেখতে পারছি নে।"

সসংকোচে কুমুদিনী চাদরখানা খুলে ফেললে। গায়ে ছিল একখানি ডুরে শাড়ি, সরু পাড়ের। কালো ডোরার ধারাগুলি কুমুদিনীর তনুদেহটিকে ঘিরে, যেন তারা রেখার ঝরনা— থেমে আছে মনে হয় না, কেবলই যেন চলছে— যেন কোনো একটি কালো দৃষ্টি আপন অশ্রান্ত গতির চিহ্ন রেখে রেখে ওর অঙ্গকে ঘিরে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে, কিছুতে শেষ করতে পারছে না। মুগ্ধ হয়ে গেল মধুসূদন, অথচ সেই মুহূর্তে একটু লক্ষ্য না করে থাকতে পারলে না যে, ওই শাড়িটি এখানকার দেওয়া নয়। কুমুদিনীকে যতই মানাক না কেন, এর দাম তুচ্ছ এবং এটা ওর বাপের বাড়ির। ওই নাবার ঘরের সংলগ্ন কাপড় ছাড়বার ঘরে আছে দেরাজওআলা মেহগিনি কাঠের মস্ত আলমারি, তার আয়না-দেওয়া পাল্লা— বিবাহের পূর্ব হতেই নানা রকমের দামি কাপড়ে ঠাসা। সেগুলির উপরে লোভ নেই— মেয়ের এত গর্ব! মনে পড়ে গেল সেই তিনটে আংটির কথা, অসহ্য ঔদাসীন্যে তাকে কুমু গ্রহণ করে নি, অথচ একটা লক্ষ্মীছাড়া নীলার আংটির জন্যে কত আগ্রহ! বিপ্রদাস আর মধুসূদনের মধ্যে কুমুর মমতার কত মূল্যভেদ! চাদর খোলবামাত্র এই-সমস্ত কথা দমকা ঝড়ের মতো মধুসূদনকে প্রকাণ্ড ধাক্কা দিলে। কিন্তু হায় রে, কী সুন্দর, কী আশ্চর্য সুন্দর! আর এই দৃপ্ত অবজ্ঞা, সেও যেন ওর অলংকার। এই মেয়েই তো পারে ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করতে। সহজ সম্পদে মহীয়সী হয়ে জন্মেছে— ওকে ধনের দাম কষতে হয় না, হিসেব রাখতে হয় না— মধুসূদন ওকে কী দিয়ে লোভ দেখাতে পারে!

মধুসূদন বললে, "যাও, তুমি শুতে যাও।"

কুমু ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল— নীরব প্রশ্ন এই যে, 'তুমি আগে বিছানায় যাবে না ?'

মধুসূদন দৃঢ়স্বরে পুনরায় বললে, "যাও, আর দেরি কোরো না।" কুমু বিছানায় যখন প্রবেশ করলে মধুসূদন সোফার উপরে বসে বললে, "এইখানেই বসে রইলুম, যদি আমাকে ডাক তবেই যাব। বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে রাজি আছি।"

কুমুর সমস্ত গা এল ঝিম্ ঝিম্ করে— এ কী পরীক্ষা তার ! কার দরজায় সে আজ মাথা কুটবে ? দেবতা তো তাকে সাড়া দিলেন না। যে পথ দিয়ে সে এখানে এল সে তো একেবারেই ভুল পথ। বিছানায় বসে বসে মনে মনে সে বললে, 'ঠাকুর, তুমি আমাকে কখনও ভোলাতে পার না, এখনও তোমাকে বিশ্বাস করব। ধ্রুবকে তুমিই বনে এনেছিলে, বনের মধ্যে তাকে দেখা দেবে বলে।'

সেই নিস্তব্ধ ঘরে আর শব্দ নেই ; রাস্তার মোড়ে সেই মাতালটার গলা শোনা যায় না ; কেবল সেই বন্দী কুকুরটা যদিও শ্রান্ত তবু মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠছে।

অল্প সময়কেও অনেক সময় বলে মনে হল, স্তব্ধতার ভারগ্রস্ত প্রহর যেন নড়তে পারছে না। এই কি তার দাম্পত্যের অনন্তকালের ছবি ? দু পারে দুজনে নীরবে বসে— রাত্রির শেষ নেই— মাঝখানে একটা অলঙ্ঘনীয় নিস্তব্ধতা ! অবশেষে এক সময়ে কুমু তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করে নিয়ে বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "আমাকে অপরাধিনী কোরো না।"

মধুসূদন গম্ভীরকণ্ঠে বললে, "কী চাও বলো, কী করতে হবে ?" শেষ কথাটুকু পর্যন্ত একেবারে নিংড়ে বের করে নিতে চায়।

কুমু বললে, "শুতে এসো।"

কিন্তু একেই কি বলে জিত ?

৩৮

পরের দিন সকালে মোতির মা যখন কুমুর জন্যে এক বাটি দুধ নিয়ে এল, দেখলে কুমুর দুই চোখ লাল, ফুলে আছে, মুখের রঙ হয়েছে পাঁশের মতো। সকালে ছাদের যে কোণে আসন পেতে পুব দিকে মুখ করে সে মানসিক পূজায় বসে, ভেবেছিল সেইখানে কুমুকে দেখতে পাবে। কিন্তু আজ সেখানে নেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যে একটুখানি ঢাকা ছাদ, সেইখানেই দেয়ালের গায়ে অবসন্নভাবে ঠেসান দিয়ে সে মাটিতে বসে। আজ বুঝি ঠাকুরের উপরে রাগ করেছে। নিরপরাধ ছেলেকে নিষ্ঠুর বাপ

যখন অকারণ মারে তখন সে যেমন কিছুই বুঝতে পারে না, অভিমান করে আঘাত গায়ে পেতে নেয়, প্রতিবাদ করবারও চেষ্টা করতে মুখে বাধে, ঠাকুরের 'পরে কুমুর আজ সেইরকম ভাব। যে আহ্বানকে সে দৈব বলে মেনেছিল, সে কি এই অশুচিতার মধ্যে, এই আন্তরিক অসতীত্বে? ঠাকুর নারীবলি চান বলেই শিকার ভুলিয়ে এনেছেন নাকি ; যে শরীরটার মধ্যে মন নেই সে'ই মাংসপিণ্ডকে করবেন তাঁর নৈবেদ্য ? আজ কিছুতে ভক্তি জাগল না। এতদিন কুমু বার বার করে বলেছে, আমাকে তুমি সহ্য করো— আজ বিদ্রোহিণীর মন বলছে, তোমাকে আমি সহ্য করব কী করে ? কোন্ লজ্জায় আনব তোমার পূজা ? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রি করে দিলে কোন্ দাসীর হাটে— যে হাটে মাছমাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, যেখানে নির্মাল্য নেবার জন্যে কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।

মোতির মা যখন দুধ খাবার জন্যে অনুরোধ করলে, কুমু বললে, "থাক্।"

মোতির মা বললে, "কেন, থাকবে কেন ? আমার দুধের বাটির অপরাধ কী ?"

কুমু বললে, "এখনও স্নান করি নি, পূজা করি নি।"

মোতির মা বললে, "যাও তুমি স্নান করতে, আমি অপেক্ষা করে থাকব।"

কুমু স্নান সেরে এল। মোতির মা ভাবলে এইবার সে খোলা ছাদের কোণটাতে গিয়ে বসবে। কুমু মুহূর্তের জন্যে অভ্যাসের টানে ছাদের দিকে যেতে পা বাড়িয়েছিল, গেল না, ফিরে আবার সেই মাটিতে এসে বসল। তার মন তৈরি ছিল না।

মোতির মাকে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "দাদার চিঠি কি আসে নি ?"

চিঠি খুব সম্ভব এসেছে মনে করেই আজ খুব ভোরে মোতির মা নিজে লুকিয়ে আপিসঘরে গিয়ে চিঠির দেরাজটা টানতে নিয়ে দেখলে সেটা চাবি দিয়ে বন্ধ। অতএব এখন থেকে চুরির উপর বাটপাড়ি করবার রাস্তা আটক রইল।

মোতির মা বললে, "ঠিক বলতে তো পারি নে, খবর নিয়ে দেখব।"

এমন সময় হঠাৎ শ্যামা এসে উপস্থিত ; বললে, "বউ, তোমাকে এমন শুকনো দেখি যে, অসুখ করে নি তো ?"

কুমু বললে, "না।"

"বাড়ির জন্যে মনটা কেমন করছে। আহা, তা তো হতেই পারে। তা তোমার দাদা তো আসছেন, দেখা হবে।"

কুমু চমকে উঠে শ্যামার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলে।

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "এ খবর তুমি কোথায় পেলে বকুলফুল ?"

"ওই শোনো! এ তো সবাই জানে। আমাদের রান্নাঘরের পার্বতী যে বললে, ওঁর বাপের বাড়ির সরকার এসেছিল রাজাবাহাদুরের কাছে, বউয়ের খবর নিতে। তার কাছে শুনেছে, চিকিৎসার জন্যে বউয়ের দাদা আজকালের মধ্যেই কলকাতায় আসছেন।"

কুমু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তাঁর ব্যামো কি বেড়েছে?"

"তা বলতে পারি নে। তবে এমন কিছু ভাবনার কথা নেই, তা হলে শুনতুম।"

শ্যামা বুঝেছিল ওর দাদার খবর মধুসূদন কুমুকে দেয় নি, যে বউয়ের মন পায় নি পাছে সে বাড়িমুখো হয়ে আরও অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কুমুর মনটাকে উসকিয়ে দিয়ে বললে, "তোমার দাদার মতো মানুষ হয় না এই কথা সবার কাছেই শুনি। বকুলফুল, চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভাঁড়ার দিতে হবে। আপিসের রান্না চড়াতে দেরি হলে মুশকিল বাধবে।"

মোতির মা দুধের বাটিটা আর-একবার কুমুর কাছে এগিয়ে নিয়ে বললে, "দিদি, দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে ফেলো লক্ষ্মীটি।"

এবার কুমু দুধ খেতে আপত্তি করলে না।

মোতির মা কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "ভাঁড়ারঘরে যাবে আজ?"

কুমু বললে, "আজ থাক্— গোপালকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও।"

একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস করছে রাহুর মতো। যে পরিণত বয়স শান্ত স্নিগ্ধ শুভ্র সুগম্ভীর, এ তো তা নয়; যা লালায়িত, যার সংযমের শক্তি শিথিল, যার প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়, তারই স্বেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এত বিতৃষ্ণা। ওর স্বামীর বয়স বেশি বলে কুমুর কোনো আক্ষেপ ছিল না, কিন্তু সেই বয়স নিজের মর্যাদা ভুলেছে বলে তার এত পীড়া। সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন একটা ফলের মতো, আলো-হাওয়ায় মুক্তির মধ্যে সে পাকে, কাঁচা ফলকে জাঁতায় পিষলেই তো পাকে না। সময় পেল না বলেই আজ ওদের সম্বন্ধ কুমুকে এমন করে মারছে, এত অপমান করছে। কোথায় পালাবে! মোতির মাকে ওই যে বললে, গোপালকে ডেকে দাও, সে এই পালাবার পথ খোঁজা— বৃদ্ধ অশুচিতার কাছ থেকে নবীন নির্মলতার মধ্যে, দূষিত নিশ্বাসবাষ্প থেকে ফুলের বাগানের হাওয়ায়।

একটা পাতলা তুলো-ভরা ছিটের জামা গায়ে দিয়ে হাবলু সিঁড়ির দরজার কাছে এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল। ওর মায়ের মতোই বড়ো বড়ো কালো চোখ, তেমনিই জল-ভরা মেঘের মতো সরস শামলা রঙ, গাল দুটো ফুলো ফুলো, প্রায় ন্যাড়া করে চুল ছাঁটা।

কুমু উঠে গিয়ে সংকুচিত হাবলুকে টেনে এনে বুকে চেপে ধরলে; বললে, "দুষ্টু ছেলে, এ দুদিন আস নি কেন?"

হাবলু কুমুর গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে বললে "জ্যাঠাইমা, তোমার জন্যে কী এনেছি বলো দেখি ?"

কুমু তার গালে চুমো খেয়ে বললে, "মানিক এনেছ গোপাল।"

"আমার পকেটে আছে।"

"আচ্ছা তবে বের করো।"

"তুমি বলতে পারলে না।"

"আমার বুদ্ধি নেই, যা চোখে দেখি তাও বুঝতে পারি নে, যা না দেখি তা আরও ভুল বুঝি।"

তখন হাবলু খুব আস্তে আস্তে পকেট থেকে ব্রাউন কাগজের একটা পুঁটুলি বের করে কুমুর কোলের উপর রেখে দৌড়ে পালাবার উপক্রম করলে।

"না, তোমাকে পালাতে দেব না।"

পুঁটুলিটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে হাবলু বললে, "তা হলে এখন দেখো না।"

"না, ভয় নেই, তুমি চলে গেলে তখন খুলব।"

"আচ্ছা জ্যাঠাইমা, তুমি জটাইবুড়িকে দেখেছ ?"

"কী জানি, হয়তো দেখে থাকব, কিন্তু চিনতে সময় লাগে।"

"একতলায় উঠোনের পাশে কয়লার ঘরে সন্ধের সময় চামচিকের পিঠে চড়ে সে আসে।"

"চামচিকের পিঠে চড়ে সে আসে !"

"ইচ্ছে করলেই সে খুব ছোট্টো হতে পারে, চোখে প্রায় দেখাই যায় না।"

"সেই মন্তরটা তার কাছে শিখে নিতে হবে তো।"

"কেন, জ্যাঠাইমা ?"

"আমি যদি পালাবার জন্যে কয়লার ঘরে ঢুকি তবুও যে আমাকে দেখতে পাওয়া যায়।"

হাবলু এ কথাটার কোনো মানে বুঝতে পারলে না। বললে, "কয়লার মধ্যে সিঁদুরের কৌটো লুকিয়ে রেখেছে। সেই সিঁদুর কোথা থেকে এনেছে জান ?"

"বোধ হয় জানি।"

"আচ্ছা, বলো দেখি।"

"ভোরবেলাকার মেঘের ভিতর থেকে।"

হাবলু থমকে গেল। তাকে ভাবিয়ে দিলে। বিশেষ-সংবাদদাতা তাকে সাগরপারের দৈত্যপুরীর কথা বলেছিল। কিন্তু জ্যাঠাইমার কথাটা মনে হল বিশ্বাস-

যোগ্য, তাই কোনো বিরুদ্ধ তর্ক না তুলে বললে, "যে মেয়ে সেই কৌটো খুঁজে বের করে সিঁদুরটিপ কপালে পরবে সে হবে রাজরানী।"

"সর্বনাশ! কোনো হতভাগিনী খবর পেয়েছে নাকি?"

"সেজোপিসিমার মেয়ে খুদি জানে। ঝুড়ি নিয়ে ছন্নু যখন সকালে কয়লা বের করতে যায়, রোজ খুদি সেইসঙ্গে যায়— ও একটুও ভয় করে না।"

"ও যে ছেলেমানুষ, তাই রাজরানী হতেও ভয় নেই।"

বাইরে ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়া দিচ্ছিল তাই মোতিকে নিয়ে কুমু ঘরে গেল; সেখানে সোফায় বসে ওকে কোলে তুলে নিলে। পাশের তেপাইয়ে ছোটো রুপোর থালিতে ছিল শীতকালের ফুল— গাঁদা, কুন্দ, দোপাটি, জবা। প্রতিদিনের জোগানমত এই ফুলই মালীর তোলা। কুমু ছাদের কোণে বসে সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে দেবতাকে উৎসর্গ করে দেবে বলে এরা অপেক্ষা করে আছে। আজ তার সেই অনিবেদিত ফুল থালাসুদ্ধ নিয়ে সে হাবলুর কাছে ধরল; বললে, "নেবে ফুল?"

"হাঁ, নেব।"

"কী করবে বলো তো?"

"পুজো-পুজো খেলব।"

কুমুর কোমরে একটা সিল্কের রুমাল গোঁজা ছিল, সেইটেতে ফুলগুলি বেঁধে দিয়ে ওকে চুমো খেয়ে বললে, "এই নাও।" মনে মনে ভাবলে, 'আমারও পুজো-পুজো খেলা হল।' বললে, "গোপাল, এর মধ্যে কোন্ ফুল তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে, বলো তো?"

হাবলু বললে, "জবা।"

"কেন জবা ভালো লাগে বলব?"

"বলো দেখি।"

"ও যে ভোর না হতেই জটাইবুড়ির সিঁদুরের কৌটো থেকে রঙ চুরি করেছে।"

হাবলু খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে ভাবলে। হঠাৎ বলে উঠল, "জ্যাঠাইমা, জবা-ফুলের রঙ ঠিক তোমার শাড়ির এই লাল পাড়ের মতো।" এইটুকুতে ওর মনের সব কথা বলা হয়ে গেল।

এমন সময় হঠাৎ পিছনে দেখে মধুসূদন। পায়ের শব্দ পাওয়া যায় নি। এখন অন্তঃপুরে আসবার সময় নয়। এই সময়টাতে বাইরের আপিসঘরে ব্যাবসাঘটিত কর্মের যত উচ্ছিষ্ট পরিশিষ্ট এসে জোটে; এই সময় দালাল আসে, উমেদার আসে, যত রকম খুচরো খবর ও কাগজপত্র নিয়ে সেক্রেটারি আসে। আসল কাজের চেয়ে এই-সব উপরি-কাজের ভিড় কম নয়।

৩৯

যে ভিক্ষুকের ঝুলিতে কেবল তুষ জমেছে চাল জোটে নি, তারই মতো মন নিয়ে আজ সকালে মধুসূদন খুব রুক্ষভাবেই বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু অতৃপ্তির আকর্ষণ বড়ো প্রচণ্ড। বাধাতেই বাধার উপর টেনে আনে।

ওকে দেখেই হাবলুর মুখ শুকিয়ে গেল, বুক উঠল কেঁপে, পালাবার উপক্রম করলে। কুমু জোর করে চেপে ধরলে, উঠতে দিলে না।

সেটা মধুসূদন বুঝতে পারলে। হাবলুকে খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, "এখানে কী করছিস? পড়তে যাবি নে?"

গুরুমশায়ের আসবার সময় হয় নি এ কথা বলবার সাহস হাবলুর ছিল না— ধমকটাকে নিঃশব্দে স্বীকার করে নিয়ে মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে উঠে চলল।

তাকে বাধা দেবার জন্যে উদ্যত হয়েই কুমু থেমে গেল। বললে, "তোমার ফুল ফেলে গেলে যে, নেবে না?" বলে সেই রুমালের পুঁটুলিটা ওর সামনে তুলে ধরলে। হাবলু না নিয়ে ভয়ে ভয়ে তার জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মধুসূদন ফস্ করে পুঁটুলিটা কুমুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ রুমালটা কার?"

মুহূর্তের মধ্যে কুমুর মুখ লাল হয়ে উঠল; বললে, "আমার।"

এ রুমালটা যে সম্পূর্ণই কুমুর, তাতে সন্দেহ নেই— অর্থাৎ বিবাহের পূর্বের সম্পত্তি। এতে রেশমের কাজ করা যে পাড়টা সেও কুমুর নিজের রচনা।

ফুলগুলো বের করে মাটিতে ফেলে মধুসূদন রুমালটা পকেটে পুরলে; বললে, "এটা আমিই নিলুম— ছেলেমানুষ এ নিয়ে কী করবে? যা তুই।"

মধুসূদনের এই রূঢ়তায় কুমু একেবারে স্তম্ভিত। ব্যথিতমুখে হাবলু চলে গেল, কুমু কিছুই বললে না।

তার মুখের ভাব দেখে মধুসূদন বললে, "তুমি তো দানসত্র খুলে বসেছ, ফাঁকি কি আমারই বেলায়? এ রুমাল রইল আমারই; মনে থাকবে কিছু পেয়েছি তোমার কাছ থেকে।"

মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা।

কুমু চোখ নিচু করে সোফার প্রান্তে নীরবে বসে রইল। শাড়ির লাল পাড় তার মাথা ঘিরে মুখটিকে বেষ্টন করে নেমে এসেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে নেমেছে তার ভিজে এলো চুল। কণ্ঠের নিটোল কোমলতাকে বেষ্টন করে আছে একগাছি সোনার হার।

এই হারটি ওর মায়ের, তাই সর্বদা পরে থাকে। তখনও জামা পরে নি, ভিতরে কেবল একটি শেমিজ, হাত দুখানি খোলা, কোলের উপরে স্তব্ধ। অতি সুকুমার শুভ্র হাত, সমস্ত দেহের বাণী ওইখানে যেন উদ্‌বেল। মধুসূদন নতনেত্রে অভিমানিনীকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, আর চোখ ফেরাতে পারলে না মোটা সোনার কাঁকন -পরা ওই দুখানি হাতের থেকে। সোফায় ওর পাশে বসে একখানি হাত টেনে নিতে চেষ্টা করলে— অনুভব করলে বিশেষ একটা বাধা। কুমু হাত সরাতে চায় না— ওর হাত দিয়ে চাপা আছে একটা কাগজের মোড়ক।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "ওই কাগজে কী মোড়া আছে ?"

"জানি নে।"

"জান না, তার মানে কী ?"

"তার মানে আমি জানি নে।"

মধুসূদন কথাটা বিশ্বাস করলে না ; বললে, "আমাকে দাও, আমি দেখি।"

কুমু বললে, "ও আমার গোপন জিনিস, দেখাতে পারব না।"

তীরের মতো তীক্ষ্ণ একটা রাগ এক মুহূর্তে মধুসূদনের মাথায় চড়ে উঠল। বললে, "কী! আস্পর্ধা তো কম নয়।" বলে জোর করে সেই কাগজের মোড়ক কেড়ে নিয়ে খুলে ফেললে— দেখে যে কিছুই নয়, কতকগুলি এলাচদানা। মাতার সস্তা ব্যবস্থায় হাবলুর জন্যে যে জলখাবার বরাদ্দ তার মধ্যে এইটেই বোধ করি সবচেয়ে হাবলুর পক্ষে লোভনীয়— তাই সে গর্ব করে মুড়ে এনেছিল।

মধুসূদন অবাক! ব্যাপারখানা কী! ভাবলে বাপের বাড়িতে এইরকম জলখাবারই কুমুর অভ্যস্ত— তাই লুকিয়ে আনিয়ে নিয়েছে, লজ্জায় প্রকাশ করতে চায় না। মনে মনে হাসলে ; ভাবলে, লক্ষ্মীর দান গ্রহণ করতে সময় লাগে। ধাঁ করে একটা প্ল্যান মাথায় এল। দ্রুত উঠে বাইরে গেল চলে।

কুমু তখন দেরাজ খুলে বের করলে তার একটি ছোটো চৌকো চন্দনকাঠের বাক্স, তার মধ্যে এলাচদানাগুলি রেখে তার দাদাকে চিঠি লিখতে বসল। দু-চার লাইন লেখা হতেই মধুসূদন ঘরে এসে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়ে কুমু শক্ত হয়ে বসল। মধুসূদনের হাতে রুপোয় সোনায় মিনের কাজ-করা হাতল-দেওয়া একটি ফলদানি, তার উপরে ফুলকাটা সুগন্ধি একটি রেশমের রুমাল। হাসিমুখে ডেস্কে সেটি কুমুর সামনে রাখলে। বললে, "খুলে দেখো তো।"

কুমু রুমালটা তুলে নিয়ে দেখে সেই দামি ফলদানিতে কানায়-কানায় ভরা এলাচদানা। যদি একলা থাকত হেসে উঠত। কোনো কথা না বলে কুমু গম্ভীর

হয়ে চুপ করে রইল। এর চেয়ে হাসা ভালো ছিল।

মধুসূদন বললে, "এলাচদানা লুকিয়ে খাবার কী দরকার? এতে লজ্জা কী বলো! রোজ আনিয়ে দেব— কত চাও? আমাকে আগে বললে না কেন?"

কুমু বললে, "তুমি পারবে না আনিয়ে দিতে।"

"পারব না! অবাক করলে তুমি।"

"না, পারবে না।"

"অসম্ভব দাম নাকি এর!"

"হাঁ, টাকায় মেলে না।"

শুনেই মধুর মাথায় চট করে একটা সন্দেহ জাগল— বললে, "তোমার দাদা পার্সেল করে পাঠিয়েছেন বুঝি?"

এ প্রশ্নের জবাব দিতে কুমুর ইচ্ছে হল না। ফলদানিটা ঠেলে দিয়ে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। মধুসূদন হাত ধরে আবার জোর করে তাকে বসিয়ে দিলে।

মধুসূদনকে কোনো কথা বলতে না দিয়েই কুমু তাকে প্রশ্ন করলে, "দাদার বাড়ি থেকে তোমার কাছে লোক এসেছিল তাঁর খবর নিয়ে?"

এ কথাটা কুমু আগেই শুনে ফেলেছে জেনে মধুর মন ভারি বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে, "সেই খবর দেবার জন্যেই তো আজ সকালে তোমার কাছে এসেছি।" বলা বাহুল্য এটা মিথ্যে কথা।

"দাদা কবে আসবেন?"

"হপ্তাখানেকের মধ্যে।"

মধু নিশ্চিত জানত কালই বিপ্রদাস আসবে, 'হপ্তাখানেক' কথাটা ব্যবহার করে খবরটাকে অনির্দিষ্ট করে রেখে দিলে।

"দাদার শরীর কি আরও খারাপ হয়েছে?"

"না, তেমন কিছু তো শুনলুম না।"

এ কথাটার মধ্যেও একটুখানি পাশ-কাটানো ছিল। বিপ্রদাস চিকিৎসার জন্যই কলকাতায় আসছে— তার অর্থ, শরীর অন্তত ভালো নেই।

"দাদার চিঠি কি এসেছে?"

"চিঠির বাক্স তো এখনও খুলি নি, যদি থাকে তোমাকে পাঠিয়ে দেব।"

কুমু মধুসূদনের কথা অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করে নি, সুতরাং এ কথাটাও মেনে নিলে।

"দাদার চিঠি এসেছে কি না একবার খোঁজ করবে কি?"

"যদি এসে থাকে, খাওয়ার পরে দুপুরবেলা নিজেই নিয়ে আসব।"

কুমু অধৈর্য দমন করে নীরবে সম্মত হল। তখন আর-একবার মধুসূদন কুমুর হাতখানা টেনে নেবার উপক্রম করছে এমন সময় শ্যামা হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকেই বলে উঠল, "ওমা, ঠাকুরপো যে!" বলেই বেরিয়ে যেতে উদ্যত।

মধুসূদন বললে, "কেন, কী চাই তোমার?"

"বউকে ভাঁড়ারে ডাকতে এসেছি। রাজরানী হলেও ঘরের লক্ষ্মী তো বটে; তা আজ না-হয় থাক্।" মধুসূদন সোফা থেকে উঠে কোনো কথা না বলে দ্রুত বাইরে চলে গেল।

আহারের পর যথারীতি শোবার ঘরের খাটে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে মধুসূদন কুমুকে ডেকে পাঠালে। তাড়াতাড়ি কুমু চলে এল। সে জানে আজ দাদার চিঠি পাবে। শোবার ঘরে ঢুকে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

মধুসূদন গুড়গুড়ির নলটা রেখে পাশে দেখিয়ে দিয়ে বললে, "বোসো।"

কুমু বসল। মধুসূদন তাকে যে চিঠি দিলে তাতে কেবল এই কয়টি কথা আছে—

প্রাণপ্রতিমাসু

শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু

চিকিৎসার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছি। সুস্থ হইলে তোমাকে দেখিতে যাইব। গৃহকর্মের অবকাশমত মাঝে মাঝে কুশলসংবাদ দিলে নিরুদ্বিগ্ন হই।

এই ছোটো চিঠিটুকু মাত্র পেয়ে কুমুর মনে প্রথমে একটা ধাক্কা লাগল। মনে মনে বললে, 'পর হয়ে গেছি।' অভিমানটা প্রবল হতে না হতেই মনে এল, 'দাদার হয়তো শরীর ভালো নেই, আমার কী ছোটো মন! নিজের কথাটাই সব-আগে মনে পড়ে।'

মধুসূদন বুঝতে পারলে কুমু উঠি-উঠি করছে; বললে, "যাচ্ছ কোথায়, একটু বোসো।"

কুমুকে তো বসতে বললে, কিন্তু কী কথা বলবে মাথায় আসে না। অবিলম্বে কিছু বলতেই হবে, তাই সকাল থেকে যে কথাটা নিয়ে ওর মনে খটকা রয়েছে সেইটেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বললে, "সেই এলাচদানার ব্যাপারটা নিয়ে এত হাঙ্গামা করলে কেন? ওতে লজ্জার কথা কী ছিল?"

"ও আমার গোপন কথা।"

"গোপন কথা! আমার কাছেও বলা চলে না?"

"না।"

মধুসূদনের গলা কড়া হয়ে এল, বললে, "এ তোমাদের নূরনগরি চাল, দাদার ইস্কুলে শেখা।"

কুমু কোনো জবাব করলে না। মধুসূদন তাকিয়া ছেড়ে উঠে বসল, "ওই চাল তোমার না যদি ছাড়াতে পারি তা হলে আমার নাম মধুসূদন না।"

"কী তোমার হুকুম, বলো।"

"সেই মোড়ক কে তোমাকে দিয়েছিল বলো।"

"হাবলু।"

"হাবলু! তা নিয়ে এত ঢাকাঢাকি কেন?"

"ঠিক বলতে পারি নে।"

"আর কেউ তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে?"

"না।"

"তবে?"

"ওই পর্যন্তই; আর কোনো কথা নেই।"

"তবে এত লুকোচুরি কেন?"

"তুমি বুঝতে পারবে না।"

কুমুর হাত চেপে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে মধু বললে, "অসহ্য তোমার বাড়াবাড়ি।"

কুমুর মুখ লাল হয়ে উঠল, শান্ত স্বরে বললে, "কী চাও তুমি, বুঝিয়ে বলো। তোমাদের চাল আমার অভ্যেস নেই সে কথা মানি।"

মধুসূদনের কপালের শিরদুটো ফুলে উঠল। কোনো জবাব ভেবে না পেয়ে ইচ্ছে হল ওকে মারে। এমন সময় বাইরে থেকে গলা-খাঁকারি শোনা গেল, সেই সঙ্গে আওয়াজ এল, "আপিসের সায়েব এসে বসে আছে।" মনে পড়ল আজ ডাইরেক্টরদের মীটিং। লজ্জিত হল যে সে এজন্যে প্রস্তুত হয় নি— সকালটা প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ গেছে। এত-বড়ো শৈথিল্য এতই ওর স্বভাব ও অভ্যাস -বিরুদ্ধ যে, এটা সম্ভব হল দেখে ও নিজে স্তম্ভিত।

৪০

মধুসূদন চলে যেতেই কুমু খাট থেকে নেমে মেজের উপর বসে পড়ল। চিরজীবন ধরে এমন সমুদ্রে কি তাকে সাঁতার কাটতে হবে যার কূল কোথাও নেই? মধুসূদন

ঠিকই বলেছে ওদের সঙ্গে তার চাল তফাত। আর সকল রকম তফাতের চেয়ে এইটেই দুঃসহ। কী উপায় আছে এর ?

এক সময়ে হঠাৎ কী মনে পড়ল, কুমু চলল, নীচের তলায় মোতির মার ঘরের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখে শ্যামাসুন্দরী উপরে উঠে আসছে।

"কী বউ, চলেছ কোথায় ? আমি যাচ্ছিলুম তোমার ঘরেই।"

"কোনো কথা আছে ?"

"এমন কিছু নয়। দেখলুম ঠাকুরপোর মেজাজ কিছু চড়া, ভাবলুম তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করে জানি, নতুন প্রণয়ে খটকা বাধল কোন্‌খানটাতে। মনে রেখো বউ, ওর সঙ্গে কী রকম করে বনিয়ে চলতে হয় সে পরামর্শ আমরাই দিতে পারি। বকুলফুলের ঘরে চলেছ বুঝি ? তা যাও, মনটা খোলসা করে এসো গে।"

আজ হঠাৎ কুমুর মনে হল শ্যামাসুন্দরী আর মধুসূদন একই মাটিতে গড়া এক কুমোরের চাকে। কেন এ কথা মাথায় এল বলা শক্ত। চরিত্র বিশ্লেষণ করে কিছু বুঝেছে তা নয়, আকারে-প্রকারে বিশেষ যে মিল তাও নয়, তবু দুজনের ভাবগতিকের একটা অনুপ্রাস আছে, যেন শ্যামাসুন্দরীর জগতে আর মধুসূদনের জগতে একই হাওয়া। শ্যামাসুন্দরী যখন বন্ধুত্ব করতে আসে তাও কুমুকে উলটো দিকে ঠেলা দেয়, গা কেমন করে ওঠে।

মোতির মার শোবার ঘরে ঢুকেই কুমু দেখলে নবীনে তাতে মিলে কী একটা নিয়ে হাত-কাড়াকাড়ি চলছে। ফিরে যাবে যাবে মনে করছে, এমন সময় নবীন বলে উঠল, "বউদিদি, যেয়ো না যেয়ো না। তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম, নালিশ আছে।"

"কিসের নালিশ ?"

"একটু বোসো, দুঃখের কথা বলি।"

তক্তপোশের উপর কুমু বসল।

নবীন বললে, "বড়ো অত্যাচার! এই ভদ্রমহিলা আমার বই রেখেছেন লুকিয়ে।"

"এমন শাসন কেন ?"

"ঈর্ষা— যেহেতু নিজে ইংরেজি পড়তে পারেন না। আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে, কিন্তু উনি স্বামী-জাতির এডুকেশনের বিরোধী। আমার বুদ্ধির যতই উন্নতি হচ্ছে, ওঁর বুদ্ধির সঙ্গে ততই গরমিল হওয়াতে ওঁর আক্রোশ। অনেক করে বোঝালেম যে, এতবড়ো যে সীতা তিনিও রামচন্দ্রের পিছনে পিছনেই চলতেন ; বিদ্যেবুদ্ধিতে আমি যে তোমার চেয়ে অনেক দূরে এগিয়ে এগিয়ে চলছি এতে বাধা দিয়ো না।"

"তোমার বিদ্যের কথা মা সরস্বতী জানেন, কিন্তু বুদ্ধির বড়াই করতে এসো না বলছি।"

নবীনের মহা বিপদের ভান করা মুখভঙ্গি দেখে কুমু খিল খিল করে হেসে উঠল। এ বাড়িতে এসে অবধি এমন মন খুলে হাসি এই ওর প্রথম। এই হাসি নবীনের বড়ো মিষ্টি লাগল। সে মনে মনে বললে, 'এই আমার কাজ হল, আমি বউরানীকে হাসাব।'

কুমু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ভাই, ঠাকুরপোর বই লুকিয়ে রেখেছ?"

"দেখো তো দিদি, শোবার ঘরে কি ওঁর পাঠশালার গুরুমশায় বসে আছেন? খেটেখুটে রাত্তিরে ঘরে এসে দেখি একটা পিদ্দিম জ্বলছে, তার সঙ্গে আর-একটা বাতির সেজ, মহাপণ্ডিত পড়তে বসে গেছেন। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাগিদের পর তাগিদ, হুঁশ নেই।"

"সত্যি ঠাকুরপো?"

"বউরানী, খাবার ভালোবাসি নে এতবড়ো তপস্বী নই, কিন্তু তার চেয়ে ভালোবাসি ওঁর মুখের মিষ্টি তাগিদ। সেইজন্যেই ইচ্ছে করে খেতে দেরি হয়ে যায়, বই পড়াটা একটা অছিলে।"

"ওঁর সঙ্গে কথায় হার মানি।"

"আর আমি হার মানি যখন উনি কথা বন্ধ করেন।"

"তাও কখনও ঘটে নাকি ঠাকুরপো?"

"দুটো একটা খুব তাজা দৃষ্টান্ত দিই তা হলে। অশ্রুজলের উজ্জ্বল অক্ষরে মনে লেখা রয়েছে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না। এখন আমার চাবি কোথায় বলো। দেখো তো দিদি, আমার চাবি লুকিয়ে রেখেছেন।"

"ঘরের লোকের নামে তো পুলিস-কেস করতে পারি নে, তাই চোরকে চুরি দিয়ে শাসন করতে হয়। আগে দাও আমার বই।"

"তোমাকে দেব না, দিদিকে দিচ্ছি।" ঘরের কোণে একটা ঝুড়িতে রেশম-পশম, টুকরা কাপড় ছেঁড়া মোজা জমে ছিল; তারই তলা থেকে একখানা ইংরেজি সংক্ষিপ্ত এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার দ্বিতীয় খণ্ড বের করে মোতির মা কুমুর কোলের উপর রেখে বললে, "তোমার ঘরে নিয়ে যাও দিদি, ওঁকে দিয়ো না; দেখি তোমার সঙ্গে কী রকম রাগারাগি করেন।"

নবীন মশারির চালের উপর থেকে চাবি তুলে নিয়ে কুমুর হাতে দিয়ে বললে, "আর কাউকে দিয়ো না বউদিদি, দেখব আর কেউ তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করেন।"

কুমু বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে, "এই বইয়ে বুঝি ঠাকুরপোর শখ ?"

"ওঁর শখ নেই এমন বই নেই। সেদিন দেখি কোথা থেকে একখানা গো-পালন জুটিয়ে নিয়ে পড়তে বসে গেছেন।"

"নিজের দেহরক্ষার জন্যে ওটা পড়ি নে, অতএব এতে লজ্জার কারণ কিছু নেই।"

"দিদি, তোমার কী একটা কথা বলবার আছে। চাও তো, এই বাচালটিকে এখনই বিদায় করে দিই।"

"না, তার দরকার নেই। আমার দাদা দুই-একদিনের মধ্যে আসবেন শুনেছি।"

নবীন বললে, "হাঁ, তিনি কালই আসবেন।"

"কাল!" বিস্মিত হয়ে কুমু খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। নিশ্বাস ফেলে বললে, "কী করে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ?"

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি বড়োঠাকুরকে কিছু বল নি ?"

কুমু মাথা নেড়ে জানালে যে, না।

নবীন বললে, "একবার বলে দেখবে না ?"

কুমু চুপ করে রইল। মধুসূদনের কাছে দাদার কথা বলা বড়ো কঠিন। দাদার প্রতি অপমান ওর ঘরের মধ্যে উদ্যত; তাকে একটুও নাড়া দিতে ওর অসহ্য সংকোচ।

কুমুর মুখের ভাব দেখে নবীনের মন ব্যথিত হয়ে উঠল। বললে, "ভাবনা কোরো না বউদিদি, আমরা সব ঠিক করে দেব, তোমাকে কিছু বলতে কইতে হবে না।"

দাদার কাছে নবীনের শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একটা ভীরুতা আছে। বউদিদি এসে আজ সেই ভয়টা ওর মন থেকে ভাঙালে বুঝি!

কুমু চলে গেলে মোতির মা নবীনকে বললে, "কী উপায় করবে বলো দেখি ? সেদিন রাত্রে তোমার দাদা যখন আমাদের ডেকে নিয়ে এসে বউয়ের কাছে নিজেকে খাটো করলেন তখনই বুঝেছিলুম সুবিধে হল না। তার পর থেকে তোমাকে দেখলেই তো মুখ ফিরিয়ে চলে যান।"

"দাদা বুঝেছেন যে, ঠকা হল; ঝোঁকের মাথায় থলি উজাড় করে আগাম দান দেওয়া হয়ে গেছে, এদিকে ওজনমত জিনিস মিলল না। আমরা ওঁর বোকামির সাক্ষী ছিলুম তাই আমাদের সইতে পারছেন না।"

মোতির মা বললে, "তা হোক, কিন্তু বিপ্রদাসবাবুর উপরে রাগটা ওঁকে যেন পাগলামির মতো পেয়ে বসেছে, দিনে দিনে বেড়েই চলল। এ কী অনাছিষ্টি বলো দিকি!"

নবীন বললে, "ও-মানুষের ভক্তির প্রকাশ ওই রকমই। এই জাতের লোকেরাই ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানে বাইরে তাকে মারে। কেউ কেউ বলে রামের প্রতি রাবণের অসাধারণ ভক্তি ছিল, তাই বিশ হাত দিয়ে নৈবেদ্য চালাত। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি দাদার সঙ্গে বউরানীর দেখাসাক্ষাৎ সহজে হবে না।"

"তা বললে চলবে না, কিছু উপায় করতেই হবে।"

"উপায় মাথায় এসেছে।"

"কী বলো দেখি।"

"বলতে পারব না।"

"কেন বলো তো?"

"লজ্জা বোধ করছি।"

"আমাকেও লজ্জা?"

"তোমাকেই লজ্জা।"

"কারণটা শুনি?"

"দাদাকে ঠকাতে হবে। সে তোমার শুনে কাজ নেই।"

"যাকে ভালোবাসি তার জন্যে ঠকাতে একটুও সংকোচ করি নে।"

"ঠকানো বিদ্যেয় আমার উপর দিয়েই হাত পাকিয়েছ বুঝি?"

"ও-বিদ্যে সহজে খাটাবার উপযুক্ত এমন মানুষ পাব কোথায়?"

"ঠাকরুন, রাজিনামা লিখে-পড়ে দিচ্ছি, যখন খুশি ঠকিয়ো।"

"এত ফূর্তি কেন শুনি?"

"বলব? বিধাতা তোমাদের হাতে ঠকাবার যে-সব উপায় দিয়েছেন তাতে মধু দিয়েছেন ঢেলে। সেই মধুময় ঠকানোকেই বলে মায়া।"

"সেটা তো কাটানোই ভালো।"

"সর্বনাশ! মায়া গেলে সংসারে রইল কী? মূর্তি রঙ খসিয়ে ফেললে বাকি থাকে খড়মাটি। দেবী, অবোধকে ভোলাও, ঠকাও, চোখে ঘোর লাগাও, মনে নেশা জাগাও, যা খুশি করো।"

এর পরে যা কথাবার্তা চলল সে একেবারেই কাজের কথা নয়, এ গল্পের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

৪১

মীটিঙে এইবার মধুসূদনের প্রথম হার। এ পর্যন্ত ওর কোনো প্রস্তাব কোনো ব্যবস্থা কেউ কখনও টলায় নি। নিজের 'পরে ওর বিশ্বাস যেমন, ওর প্রতি ওর সহযোগীদেরও তেমনি বিশ্বাস। এই ভরসাতেই মীটিঙে কোনো জরুরি প্রস্তাব পাকা করে নেবার আগেই কাজ অনেকদূর এগিয়ে রাখে। এবারে পুরোনো নীলকুঠি-ওআলা একটা পত্তনি তালুক ওদের নীলের কারবারের শামিল কিনে নেবার বন্দোবস্ত করছিল। এ নিয়ে খরচপত্রও হয়ে গেছে। প্রায় সমস্তই ঠিকঠাক ; দলিল স্ট্যাম্পে চড়িয়ে রেজেস্টারি করে দাম চুকিয়ে দেবার অপেক্ষা ; যে-সব লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক তাদের আশা দিয়ে রাখা হয়েছে ; এমন সময় এই বাধা। সম্প্রতি ওদের কোনো ট্রেজারারের পদ খালি হওয়াতে সম্পর্কীয় একটি জামাতার জন্য উমেদারি চলেছিল, অযোগ্য-উদ্ধারণে উৎসাহ না থাকাতে মধুসূদন কান দেয় নি। সেই ব্যাপারটা বীজের মতো মাটি চাপা থেকে হঠাৎ বিরুদ্ধতার আকারে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। একটু ছিদ্রও ছিল। তালুকের মালেক মধুসূদনের দূরসম্পর্কীয় পিসির ভাশুরপো। পিসি যখন হাতে পায়ে এসে ধরে তখন ও হিসেব করে দেখলে নেহাত সস্তায় পাওয়া যাবে, মুনফাও আছে, তার উপরে আত্মীয়দের কাছে মুরুব্বিয়ানা করবার গৌরব। যাঁর অযোগ্য জামাই ট্রেজারার-পদ থেকে বঞ্চিত, তিনিই মধুসূদনের স্বজনবাৎসল্যের প্রমাণ বহু সন্ধানে আবিষ্কার ও যথাস্থানে প্রচার করেছেন। তা ছাড়া কোম্পানির সকল রকম কেনাবেচায় মধুসূদন যে গোপনে কমিশন নিয়ে থাকেন, এই মিথ্যা সন্দেহ কানে কানে সঞ্চারিত করবার ভারও তিনিই নিয়েছিলেন। এ-সকল নিন্দার প্রমাণ অধিকাংশ লোক দাবি করে না, কারণ তাদের নিজের ভিতরে যে লোভ আছে সেই হচ্ছে অন্তরতম ও প্রবলতম সাক্ষী। লোকের মনকে বিগড়িয়ে দেওয়া একটা কারণে সহজ ছিল, সে কারণ হচ্ছে মধুসূদনের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি, এবং তার খাঁটি চরিত্রের অসহ্য সুখ্যাতি। মধুসূদনও ডুবে ডুবে জল খায় এই অপবাদে সেই লোলুপরা পরম শান্তি পেল, গভীর জলে ডুব দেবার আকাঙ্ক্ষায় যাদের মনটা পানকৌড়ি-বিশেষ অথচ হাতের কাছে যাদের জলাশয় নেই।

মালেককে মধুসূদন পাকা কথা দিয়েছিল। ক্ষতির আশঙ্কায় কথা খেলাপ করবার লোক সে নয়। তাই নিজে কিনবে ঠিক করেছে, আর পণ করেছে কোম্পানিকে দেখিয়ে দেবে, না কিনে তারা ঠকল।

মধুসূদন বিলম্বে বাড়ি ফিরে এল। নিজের ভাগ্যের প্রতি মধুসূদনের অন্ধ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, আজ তার ভয় লাগল যে, জীবনযাত্রার গাড়িটাকে অদৃষ্ট এক

পর্যায়ের লাইন থেকে আর-এক পর্যায়ের লাইনে চালান করে দিচ্ছে বা। প্রথম ঝাঁকানিতেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। মীটিং থেকে ফিরে এসে আপিসঘরে কেদারা হেলান দিয়ে গুড়গুড়ির ধূমকুণ্ডলের সঙ্গে নিজের কালো রঙের চিন্তাকে কুণ্ডলায়িত করতে লাগল।

নবীন এসে খবর দিলে বিপ্রদাসের বাড়ি থেকে লোক এসেছে দেখা করতে। মধুসূদন ঝেঁকে উঠে বললে, "যেতে বলে দাও, আমার এখন সময় নেই।"

নবীন মধুসূদনের ভাবগতিক দেখে বুঝলে মীটিঙে একটা অপঘাত ঘটেছে। বুঝলে দাদার মন এখন দুর্বল। দৌর্বল্য স্বভাবত অনুদার, দুর্বলের আত্মগরিমা ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার রূপ ধরে। দাদার আহত মন বউরানীকে কঠিনভাবে আঘাত করতে চাইবে এতে নবীনের সন্দেহমাত্র ছিল না। এ আঘাত যে করেই হোক ঠেকাতেই হবে। এর পূর্ব পর্যন্ত ওর মনে দ্বিধা ছিল, সে দ্বিধা সম্পূর্ণ গেল কেটে। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে আবার ঘরে এসে দেখলে ওর দাদা ঠিকানাওআলা নামের ফর্দর খাতা নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে। নবীন এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন মুখ তুলে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আবার কিসের দরকার? তোমাদের বিপ্রদাসবাবুর মোক্তারি করতে এসেছ বুঝি?"

নবীন বললে, "না দাদা, সে ভয় নেই। ওদের লোকটা এমন তাড়া খেয়ে গেছে যে তুমি নিজেও যদি ডেকে পাঠাও তবু সে এ-বাড়িমুখো হবে না।"

এ কথাটাও মধুসূদনের সহ্য হল না। বলে উঠল, "কড়ে আঙুলটা নাড়লেই পায়ের কাছে এসে পড়তে হবে। লোকটা এসেছিল কী করতে?"

"তোমাকে খবর দিতে যে বিপ্রদাসবাবুর কলকাতা আসা দুদিন পিছিয়ে গেল। শরীর আর-একটু সেরে তবে আসবেন।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্যে আমার তাড়া নেই।"

নবীন বললে, "দাদা, কাল সকালে ঘণ্টা দুয়ের জন্যে ছুটি চাই।"

"কেন?"

"শুনলে তুমি রাগ করবে।"

"না শুনলে আরও রাগ করব।"

"কুম্ভকোনাম থেকে এক জ্যোতিষী এসেছেন তাঁকে দিয়ে একবার ভাগ্যপরীক্ষা করাতে চাই।"

মধুসূদনের বুকটা ধড়াস্ করে উঠল, ইচ্ছে করল এখনই ছুটে তার কাছে যায়। মুখে তর্জন করে বললে, "তুমি বিশ্বাস কর?"

"সহজ অবস্থায় করি নে, ভয় লাগলেই করি।"

"ভয়টা কিসের শুনি ?"

নবীন কোনো জবাব না করে মাথা চুলকোতে লাগল।

"ভয়টা কাকে বলোই না।"

"এ সংসারে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করি নে। কিছুদিন থেকে তোমার ভাবগতিক দেখে মন সুস্থির হচ্ছে না।"

সংসারের লোক মধুসূদনকে বাঘের মতো ভয় করে এইটেতে তার ভারি তৃপ্তি। নবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে সে গুড়গুড়ি টানতে টানতে নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করতে লাগল।

নবীন বললে, "তাই একবার স্পষ্ট করে জানতে চাই গ্রহ কী করতে চান আমাকে নিয়ে। আর তিনি ছুটিই বা দেবেন কোন্ নাগাত।"

"তোমার মতো নাস্তিক, তুমি কিছু বিশ্বাস কর না, শেষকালে—"

"দেবতার 'পরে বিশ্বাস থাকলে গ্রহকে বিশ্বাস করতুম না দাদা। ডাক্তারকে যে মানে না হাতুড়েকে মানতে তার বাধে না।"

নিজের গ্রহকে যাচাই করে নেবার জন্যে মধুসূদনের যে পরিমাণ আগ্রহ হল, সেই পরিমাণ ঝাঁজের সঙ্গে বললে, "লেখাপড়া শিখে বাঁদর, তোমার এই বিদ্যে ? যে যা বলে তাই বিশ্বাস কর ?"

"লোকটার কাছে যে ভৃগুসংহিতা রয়েছে— যেখানে যে কেউ যে কোনো কালে জন্মেছে, জন্মাবে, সকলের কুষ্ঠি একেবার তৈরি, সংস্কৃত ভাষায় লেখা, এর উপর তো আর কথা চলে না। হাতে হাতে পরীক্ষা করে দেখে নাও।"

"বোকা ভুলিয়ে যারা খায়, বিধাতা তাদের পেট ভরাবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে তোমাদের মতো বোকাও সৃষ্টি করে রাখেন।"

"আবার সেই বোকাদের বাঁচাবার জন্যে তোমাদের মতো বুদ্ধিমানও সৃষ্টি করেন। যে মারে তার উপরে তাঁর যেমন দয়া, যাকে মারে তার উপরেও তেমনি। ভৃগুসংহিতার উপরে তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চালিয়ে দেখোই না।"

"আচ্ছা, বেশ, কাল সকালেই আমাকে নিয়ে যেয়ো, দেখব তোমার কুম্ভকোনামের চালাকি।"

"তোমার যেরকম জোর অবিশ্বাস দাদা, ওতে গণনায় গোল হয়ে যেতে পারে। সংসারে দেখা যায় মানুষকে বিশ্বাস করলে মানুষ বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। গ্রহদেরও ঠিক সেই দশা, দেখো না কেন সাহেবগুলো গ্রহ মানে না বলে গ্রহের ফল ওদের উপর

খাটে না। সেদিন তেরোস্পর্শে বেরিয়ে তোমাদের ছোটোসাহেব ঘোড়দৌড়ে বাজি জিতে এল— আমি হলে বাজি জেতা দূরস্তাং ঘোড়াটা ছিটকে এসে আমার পেটে লাথি মেরে যেত। দাদা, এই সব গ্রহনক্ষত্রের হিসেবের উপর তোমাদের বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না,' একটু বিশ্বাস মনে রেখো।"

মধুসূদন খুশি হয়ে স্মিতহাস্যে গুড়গুড়িতে মনোযোগ দিলে।

পরদিন সকাল সাতটার মধ্যে মধুসূদন নবীনের সঙ্গে এক সরু গলির আবর্জনার ভিতর দিয়ে বেঙ্কট শাস্ত্রীর বাসায় গিয়ে উপস্থিত। অন্ধকার একতলার ভাপ্‌সা ঘর; লোনাধরা দেয়াল ক্ষতবিক্ষত, যেন সাংঘাতিক চর্মরোগে আক্রান্ত, তক্তপোশের উপর ছিন্ন মলিন একখানা শতরঞ্চ, এক প্রান্তে কতকগুলো পুঁথি এলোমেলো জড়ো-করা, দেয়ালের গায়ে শিবপার্বতীর এক পট। নবীন হাঁক দিলে, "শাস্ত্রীজি"। ময়লা ছিটের বালাপোশ গায়ে, সামনের মাথা কামানো, ঝুঁটিওআলা, কালো বেঁটে রোগা এক ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকল; নবীন তাকে ঘটা করে প্রণাম করলে। চেহারা দেখে মধুসূদনের একটুও ভক্তি হয় নি— কিন্তু দৈবের সঙ্গে দৈবজ্ঞের কোনোরকম ঘনিষ্ঠতা আছে জেনে ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা আধাআধি রকম অভিবাদন সেরে নিলে। নবীন মধুসূদনের একটি ঠিকুজি জ্যোতিষীর সামনে ধরতেই সেটা অগ্রাহ্য করে শাস্ত্রী মধুসূদনের হাত দেখতে চাইলে। কাঠের বাক্স থেকে কাগজ-কলম বের করে নিয়ে নিজে একটা চক্র তৈরি করে নিলে। মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে বললে, "পঞ্চম বর্গ।" মধুসূদন কিছুই বুঝলে না। জ্যোতিষী আঙুলের পর্ব গুনতে গুনতে আউড়ে গেল, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ। এতেও মধুসূদনের বুদ্ধি খোলসা হল না। জ্যোতিষী বললে, "পঞ্চম বর্ণ।" মধুসূদন ধৈর্য ধরে চুপ করে রইল। জ্যোতিষী আওড়াল, প, ফ, ব, ভ, ম। মধুসূদন এর থেকে এইটুকু বুঝলে যে, ভৃগুমুনি ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় থেকেই তার সংহিতা শুরু করেছেন। এমন সময় বেঙ্কট শাস্ত্রী বলে উঠল, "পঞ্চাক্ষরকং।"

নবীন চকিত হয়ে মধুসূদনের কাছে চুপি চুপি বললে, "বুঝেছি দাদা।"

"কী বুঝলে?"

"পঞ্চম বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম, তার পরে পঞ্চ অক্ষর ম-ধু-সূ-দ-ন। জন্ম-গ্রহের অদ্ভুত কৃপায় তিনটে পাঁচ এক জায়গায় মিলেছে।"

মধুসূদন স্তম্ভিত। বাপ মায়ে নাম রাখবার কত হাজার বছর আগেই নামকরণ ভৃগুমুনির খাতায়! নক্ষত্রদের এ কী কাণ্ড! তার পরে হতবুদ্ধি হয়ে শুনে গেল ওর জীবনের সংক্ষিপ্ত অতীত ইতিহাস সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ভাষা যত কম বুঝলে,

ভক্তি ততই বেড়ে উঠল। জীবনটা আগাগোড়া ঋষিবাক্য মূর্তিমান। নিজের বুকের উপর হাত বুলিয়ে দেখলে, দেহটা অনুস্বার-বিসর্গ-তদ্ধিত-প্রত্যয়ের মসলা দিয়ে তৈরি কোন্ তপোবনে লেখা একটা পুঁথির মতো। তার পর দৈবজ্ঞের শেষ কথাটা এই যে, মধুসূদনের ঘরে একদা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে বলে পূর্ব হতেই ঘরে অভাবনীয় সৌভাগ্যের সূচনা। অল্পদিন হল তিনি এসেছেন নববধূকে আশ্রয় করে। এখন থেকে সাবধান। কেননা ইনি যদি মনঃপীড়া পান, ভাগ্য কুপিত হবে।

বেঙ্কট শাস্ত্রী বললে, কোপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। জাতক যদি এখনও সতর্ক না হয় বিপদ বেড়ে চলবে। মধুসূদন স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। মনে পড়ে গেল বিবাহের দিনই প্রকাণ্ড সেই মুনফার খবর; আর তার কয়দিনের মধ্যেই এই পরাভব। লক্ষ্মী স্বয়ং আসেন সেটা সৌভাগ্য, কিন্তু তার দায়িত্বটা কম ভয়ংকর নয়।

ফেরবার সময় মধুসূদন গাড়িতে স্তব্ধ হয়েই বসে রইল। এক সময় নবীন বলে উঠল, "ওই বেঙ্কট শাস্ত্রীর কথা একটুও বিশ্বাস করি নে; নিশ্চয় ও কারও কাছ থেকে, তোমার সমস্ত খবর পেয়েছে।"

"ভারি বুদ্ধি তোমার! যেখানে যত মানুষ আছে আগেভাগে তার খবর নিয়ে রেখে দিচ্ছে; সোজা কথা কিনা!"

"মানুষ জন্মাবার আগেই তার কোটি কোটি কুষ্ঠি লেখার চেয়ে এটা অনেক সোজা। ভৃগুমুনি এত কাগজ পাবেন কোথায়, আর বেঙ্কট স্বামীর ওই ঘরে এত জায়গা হবে কেমন করে?"

"এক আঁচড়ে হাজারটা কথা লিখতে জানতেন তাঁরা।"

"অসম্ভব।"

"যা তোমার বুদ্ধিতে কুলোয় না তাই অসম্ভব। ভারি তোমার সায়ান্স! এখন তর্ক রেখে দাও, সেদিন ওদের বাড়ি থেকে যে সরকার এসেছিল, তাকে তুমি নিজে গিয়ে ডেকে এনো। আজই, দেরি কোরো না।"

দাদাকে ঠকিয়ে নবীনের মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ হতে লাগল। ফন্দিটা এত সহজ, এর সফলতাটা দাদার পক্ষে এত হাস্যকর যে, তারই অমর্যাদায় ওকে লজ্জা ও কষ্ট দিলে। দাদাকে উপস্থিতমত ছোটো অনেক ফাঁকি অনেকবার দিতে হয়েছে, কিছু মনে হয় নি; কিন্তু এত করে সাজিয়ে এতবড়ো ফাঁকি গড়ে তোলার গ্লানি ওর চিত্তকে অশুচি করে রেখে দিলে।

৪২

মধুসূদনের মন থেকে মস্ত একটা ভার গেল নেমে, আত্মগৌরবের ভার— যে কঠোর গৌরব-বোধ ওর বিকাশোন্মুখ অনুরক্তিকে কেবলই পাথর-চাপা দিয়েছে। কুমুর প্রতি ওর মন যখন মুগ্ধ তখনও সেই বিহ্বলতার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে চলেছিল লড়াই। যতই অনন্যগতি হয়ে কুমুর কাছে ধরা দিয়েছে, ততই নিজের অগোচরে কুমুর 'পরে ওর ক্রোধ জমেছে। এমন সময় স্বয়ং নক্ষত্রদের কাছ থেকে যখন আদেশ এল যে, লক্ষ্মী এসেছেন ঘরে, তাঁকে খুশি করতে হবে, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে ওর দেহমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল; বার বার আপন মনে আবৃত্তি করতে লাগল— লক্ষ্মী, আমারই ঘরে লক্ষ্মী, আমার ভাগ্যের পরম দান। ইচ্ছে করতে লাগল— এখনই সমস্ত সংকোচ ভাসিয়ে দিয়ে কুমুর কাছে স্তুতি জানিয়ে আসে, বলে আসে, 'যদি কোনো ভুল করে থাকি, অপরাধ নিয়ো না।' কিন্তু আজ আর সময় নেই, ব্যবসায়ের ভাঙন সারবার কাজে এখনই আপিসে ছুটতে হবে, বাড়িতে খেয়ে যাবার অবকাশ পর্যন্ত জুটল না।

এদিকে সমস্তদিন কুমুর মনের মধ্যে তোলপাড় চলেছে। সে জানে কাল দাদা আসবেন, শরীর তাঁর অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাটা সহজ হবে কি না নিশ্চিত জানবার জন্যে মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। নবীন কোথায় কাজে গেছে, এখনও এল না। সে নিঃসন্দেহ জানত আজ স্বয়ং মধুসূদন এসে বউরানীকে সকল রকমে প্রসন্ন করবে; আগেভাগে কোনো আভাস দিয়ে রসভঙ্গ করতে চায় না।

আজ ছাতে বসবার সুবিধা ছিল না। কাল সন্ধ্যা থেকে মেঘ করে আছে, আজ দুপুর থেকে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি শুরু হল। শীতকালের বাদলা, অনিচ্ছিত অতিথির মতো। মেঘে রঙ নেই, বৃষ্টিতে ধ্বনি নেই, ভিজে বাতাসটা যেন মনমরা, সূর্যালোক-হীন আকাশের দৈন্যে পৃথিবী সংকুচিত। সিঁড়ি থেকে উঠেই শোবার ঘরে ঢোকবার পথে যে ঢাকা ছাদ আছে সেইখানে কুমু মাটিতে বসে। থেকে থেকে গায়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। আজ এই ছায়াম্লান আর্দ্র একঘেয়ে দিনে কুমুর মনে হল, তার নিজের জীবনটা তাকে যেন অজগরের মতো গিলে ফেলেছে, তারই ক্লেদাক্ত জঠরের রুদ্ধতার মধ্যে কোথাও একটুমাত্র ফাঁক নেই। যে দেবতা ওকে ভুলিয়ে আজ এই নিরুপায় নৈরাশ্যের মধ্যে এনে ফেললে তার উপরে যে অভিমান ওর মনে ধোঁয়াচ্ছিল আজ সেটা ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠল। হঠাৎ দ্রুত উঠে পড়ল। ডেস্ক খুলে বের করলে সেই যুগল-রূপের পট। রঙিন রেশমের ছিট দিয়ে সেটা মোড়া।

সেই পট আজ ও নষ্ট করে ফেলতে চায়। যেন চীৎকার করে বলতে চায়, তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করি নে। হাত কাঁপছে, তাই গ্রন্থি খুলতে পারছে না; টানাটানিতে সেটা আরও আঁট হয়ে উঠল, অধীর হয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেললে। অমনি চিরপরিচিত সেই মূর্তি অনাবৃত হতেই আর সে থাকতে পারলে না; তাকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে উঠল। কাঠের ফ্রেম বুকে যত বাজে ততই আরও বেশি চেপে ধরে।

এমন সময়ে শোবার ঘরে এল মুরলী বেহারা বিছানা করতে। শীতে কাঁপছে তার হাত। গায়ে একখানা জীর্ণ ময়লা র‍্যাপার। মাথায় টাক, রগ টেপা, গাল বসা, কিছুকালের না-কামানো কাঁচাপাকা দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। অনতিকাল পূর্বেই সে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিল, শরীরে রক্ত নেই বললেই হয়, ডাক্তার বলেছিল কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে যেতে, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি।

কুমু বললে, "শীত করছে মুরলী?"

"হাঁ মা, বাদল করে ঠাণ্ডা পড়েছে।"

"গরম কাপড় নেই তোমার?"

"খেতাব পাবার দিনে মহারাজা দিয়েছিলেন, নাতির খাঁসির বেমারি হতেই ডাক্তারের কথায় তাকে দিয়েছি মা।"

কুমু একটি পুরোনো ছাই রঙের আলোয়ান পাশের ঘরের আলমারি থেকে বের করে এনে বললে, "আমার এই কাপড়টি তোমাকে দিলুম।"

মুরলী গড় হয়ে বললে, "মাপ করো মা, মহারাজা রাগ করবেন।"

কুমুর মনে পড়ে গেল, এ বাড়িতে দয়া করবার পথ সংকীর্ণ। কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে নিজের জন্যেও যে ওর দয়া চাই, পুণ্যকর্ম তারই পথ। কুমু ক্ষোভের সঙ্গে আলোয়ানটা মাটিতে ফেলে দিলে।

মুরলী হাত জোড় করে বললে, "রানীমা, তুমি মা লক্ষ্মী, রাগ কোরো না। গরম কাপড়ে আমার দরকার হয় না। আমি থাকি হুঁকাবরদারের ঘরে, সেখানে গামলায় গুলের আগুন, আমি বেশ গরম থাকি।"

কুমু বললে, "মুরলী, নবীন ঠাকুরপো যদি বাড়ি এসে থাকেন তাঁকে ডেকে দাও।"

নবীন ঘরে ঢুকতেই কুমু বললে, "ঠাকুরপো, তোমাকে একটি কাজ করতেই হবে। বলো, করবে?"

"নিজের অনিষ্ট যদি হয় এখনই করব, কিন্তু তোমার অনিষ্ট হলে কিছুতেই করব না।"

"আমার আর কত অনিষ্ট হবে? আমি ভয় করি নে।" বলে নিজের হাত থেকে মোটা সোনার বালাজোড়া খুলে বললে, "আমার এই বালা বেচে দাদার জন্যে স্বস্ত্যয়ন করাতে হবে।"

"কিছু দরকার হবে না, বউরানী, তুমি তাঁকে যে ভক্তি করো তারই পুণ্যে প্রতি-মুহূর্তে তাঁর জন্যে স্বস্ত্যয়ন হচ্ছে।"

"ঠাকুরপো, দাদার জন্যে আর কিছুই করতে পারব না। কেবল যদি পারি দেবতার দ্বারে তাঁর জন্যে সেবা পৌঁছিয়ে দেব।"

"তোমাকে কিছু করতে হবে না, বউরানী। আমরা সেবক আছি কী করতে?"

"তোমরা কী করতে পার বলো?"

"আমরা পাপিষ্ঠ, পাপ করতে পারি। তাই করেও যদি তোমার কোনো কাজে লাগি তা হলে ধন্য হব।"

"ঠাকুরপো, এ কথা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না।"

"একটুও ঠাট্টা নয়। পুণ্য করার চেয়ে পাপ করা অনেক শক্ত কাজ, দেবতা যদি তা বুঝতে পারেন তা হলে পুরস্কার দেবেন।"

নবীনের কথার ভাবে দেবতার প্রতি উপেক্ষা কল্পনা করে কুমুর মনে স্বভাবত আঘাত লাগতে পারত, কিন্তু তার দাদাও যে মনে মনে দেবতাকে শ্রদ্ধা করে না, এই অভক্তির 'পরে সে রাগ করতে পারে না যে। ছোটো ছেলের দুষ্টুমির 'পরেও মায়ের যেমন সকৌতুক স্নেহ, এই রকম অপরাধের 'পরে ওরও সেই ভাব।

কুমু একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, "ঠাকুরপো, সংসারে তোমরা নিজের জোরে কাজ করতে পার; আমাদের যে সেই নিজের জোর খাটাবার জো নেই। যাদের ভালোবাসি অথচ নাগাল মেলে না, তাদের কাজ করব কী করে? দিন যে কাটে না, কোথাও যে রাস্তা খুঁজে পাই নে। আমাদের কী দয়া করবার কোথাও কেউ নেই?"

নবীনের চোখ জলে ভেসে উঠল।

"দাদাকে উদ্দেশ করে আমাকে কিছু করতেই হবে ঠাকুরপো, কিছু দিতেই হবে। এই বালা আমার মায়ের, সেই আমার মায়ের হয়েই এ বালা আমার দেবতাকে আমি দেব।"

"দেবতাকে হাতে করে দিতে হয় না বউরানী, তিনি এমনি নিয়েছেন। দুদিন অপেক্ষা করো, যদি দেখ তিনি প্রসন্ন হন নি, তা হলে যা বলবে তাই করব। যে দেবতা তোমাকে দয়া করেন না তাঁকেও ভোগ দিয়ে আসব।"

রাত্রি অন্ধকার হয়ে এল— বাইরে সিঁড়িতে ওই সেই পরিচিত জুতোর শব্দ। নবীন চমকে উঠল, বুঝলে দাদা আসছে। পালিয়ে গেল না, সাহস করে দাদার জন্যে অপেক্ষা করেই রইল। এদিকে কুমুর মন এক মুহূর্তে নিরতিশয় সংকুচিত হয়ে উঠল। এই অদৃশ্য বিরোধের ধাক্কাটা এমন প্রবল বেগে যখন তার প্রত্যেক নাড়িকে চমকিয়ে তুললে বড়ো ভয় হল। এ পাপ কেন তাকে এত দুর্জয় বলে পেয়ে বসেছে ?

হঠাৎ কুমু নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরপো, কাউকে জান যিনি আমাকে গুরুর মতো উপদেশ দিতে পারেন ?"

"কী হবে বউরানী ?"

"নিজের মনকে নিয়ে যে পেরে উঠছি নে।"

"সে তোমার মনের দোষ নয়।"

"বিপদটা বাইরের, দোষটা মনের, দাদার কাছে এই কথা বার বার শুনেছি।"

"তোমার দাদাই তোমাকে উপদেশ দেবেন—ভয় কোরো না।"

"সেদিন আমার আর আসবে না।"

মধুসূদনের বিষয়বুদ্ধির সঙ্গে তার ভালোবাসার আপস হয়ে যেতেই সেই ভালোবাসা মধুসূদনের সমস্ত কাজকর্মের উপর দিয়েই যেন উপছে বয়ে যেতে লাগল। কুমুর সুন্দর মুখে তার ভাগ্যের বরাভয় দান। পরাভবটি কেটে যাবে আজই পেল তার আভাস। কাল যারা বিরুদ্ধে মত দিয়েছিল আজ তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ সুর ফিরিয়ে ওকে চিঠি লিখেছে। মধুসূদন যেই তালুকটা নিজের নামে কিনে নেবার প্রস্তাব করলে অমনি কারও কারও মনে হল ঠকলুম বুঝি। কেউ কেউ এমনও ভাব প্রকাশ করলে যে, কথাটা আর একবার বিচার করা উচিত।

গরহাজির অপরাধে আপিসের দারোয়ানের অর্ধেক মাসের মাইনে কাটা গিয়েছিল, আজ টিফিনের সময় মধুসূদনের পা জড়িয়ে ধরবামাত্র মধুসূদন তাকে মাপ করে দিলে। মাপ করবার মানে নিজের পকেট থেকে দারোয়ানের ক্ষতিপূরণ ; যদিচ খাতায় জরিমানা রয়ে গেল। নিয়মের ব্যত্যয় হবার জো নেই।

আজকের দিনটা মধুর পক্ষে বড়ো আশ্চর্যের দিন। বাইরে আকাশটা মেঘে ঘোলা, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু এতে করে ওর ভিতরের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিলে। আপিস থেকে ফিরে এসে রাত্রে আহারের সময়ের পূর্বে পর্যন্ত মধুসূদন বাইরের ঘরে কাটাত। বিয়ের পরে কয়দিন অসময়ে নিয়মের বিরুদ্ধে অন্তঃপুরে যাবার বেলায় লোকের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করেছে। আজ সশব্দ পদক্ষেপে বাড়িসুদ্ধ

সবাইকে যেন জানিয়ে দিতে চাইলে যে, সে চলেছে কুমুর সঙ্গে দেখা করতে। আজ বুঝেছে পৃথিবীর লোকে ওকে ঈর্ষা করতে পারে এতবড়ো ওর সৌভাগ্য।

খানিকক্ষণের জন্যে বৃষ্টি ধরে গেছে। তখনও সব ঘরে আলো জ্বলে নি। আন্দিবুড়ি ধুনুচি হাতে ধুনো দিয়ে বেড়াচ্ছে; একটা চামচিকে উঠোনের উপরের আকাশ থেকে লণ্ঠনজ্বালা অন্তঃপুরের পথ পর্যন্ত কেবলই চক্রপথে ঘুরছে। বারান্দায় পা মেলে দিয়ে দাসীরা উরুর উপরে প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি উঠে ঘোমটা টেনে দৌড় দিলে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল শ্যামাসুন্দরী, হাতে বাটাতে ছিল পান। মধুসূদন আপিস থেকে এলে নিয়মমত এই পান সে বাইরে পাঠিয়ে দিত। সবাই জানে, ঠিক মধুসূদনের রুচির মতো পান শ্যামাসুন্দরীই সাজতে পারে; এইটে জানার মধ্যে আরও কিছু-একটু জানার ইশারা ছিল। সেই জোরে পথের মধ্যে শ্যামা মধুর সামনে বাটা খুলে ধরে বললে, "ঠাকুরপো, তোমার পান সাজা আছে, নিয়ে যাও।" আগে হলে এই উপলক্ষে ছুটো-একটা কথা হত, আর সেই কথায় অল্প একটু মধুর রসের আমেজও লাগত। আজ কী হল কে জানে পাছে দূর থেকেও শ্যামার ছোঁয়াচ লাগে সেইটে এড়িয়ে পান না নিয়ে মধুসূদন দ্রুত চলে গেল। শ্যামার বড়ো বড়ো চোখদুটো অভিমানে জ্বলে উঠল, তার পরে ভেসে গেল অশ্রুজলের মোটা মোটা ফোঁটায়। অন্তর্যামী জানেন শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনকে ভালোবাসে।

মধুসূদন ঘরে ঢুকতেই নবীন কুমুর পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "গুরুর কথা মনে রইল, খোঁজ করে দেখব।" দাদাকে বললে, "বউরানী গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্র-উপদেশ শুনতে চান। আমাদের গুরুঠাকুর আছেন, কিন্তু—"

মধুসূদন উত্তেজনার স্বরে বলে উঠল, "শাস্ত্র-উপদেশ! আচ্ছা সে দেখব এখন, তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

নবীন চলে গেল।

মধুসূদন আজ সমস্ত পথ মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে এসেছিল, "বড়োবউ, তুমি এসেছ আমার ঘর আলো হয়েছে।" এরকম ভাবের কথা বলবার অভ্যাস ওর একেবারেই নেই। তাই ঠিক করেছিল, ঘরে ঢুকেই দ্বিধা না করে প্রথম ঝোঁকেই সে বলবে। কিন্তু নবীনকে দেখেই কথাটা গেল ঠেকে। তার উপরে এল শাস্ত্র-উপদেশের প্রসঙ্গ, ওর মুখ দিলে একেবারে বন্ধ করে। অন্তরে যে আয়োজনটা চলছিল, এই একটুখানি বাধাতেই নিরস্ত হয়ে গেল। তার পরে কুমুর মুখে দেখলে একটা ভয়ের ভাব, দেহমনের একটা সংকোচ। অন্যদিন হলে এটা চোখে পড়ত না।

আজ ওর মনে যে একটা আলো জ্বলেছে তাতে দেখবার শক্তি হয়েছে প্রবল, কুমু সম্বন্ধে চিত্তের স্পর্শবোধ হয়েছে সূক্ষ্ম। আজকের দিনেও কুমুর মনে এই বিমুখতা, এটা ওর কাছে নিষ্ঠুর অবিচার বলে ঠেকল। তবু মনে মনে পণ করলে বিচলিত হবে না, কিন্তু যা সহজে হতে পারত সে আর সহজ রইল না।

একটু চুপ করে থেকে মধুসূদন বললে, "বড়োবউ, চলে যেতে ইচ্ছে করছ? একটুক্ষণ থাকবে না?"

মধুসূদনের কথা আর তার গলার স্বর শুনে কুমু বিস্মিত। বললে, "না, যাব কেন?"

"তোমার জন্যে একটি জিনিস এনেছি খুলে দেখো।" বলে তার হাতে ছোটো একটি সোনার কৌটো দিলে।

কৌটো খুলে কুমু দেখলে দাদার দেওয়া সেই নীলার আংটি। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, কী করবে ভেবে পেল না।

"এই আংটি তোমায় পরিয়ে দিতে দেবে?"

কুমু হাত বাড়িয়ে দিলে। মধুসূদন কুমুর হাত কোলের উপর ধরে খুব আস্তে আস্তে আংটি পরাতে লাগল। ইচ্ছে করেই সময় নিলে একটু বেশি। তার পরে হাতটি তুলে ধরে চুমো খেলে, বললে, "ভুল করেছিলুম তোমার হাতের আংটি খুলে নিয়ে। তোমার হাতে কোনো জহরতে কোনো দোষ নেই।"

কুমুকে মারলে এর চেয়ে কম বিস্মিত হত। ছেলেমানুষের মতো কুমুর এই বিস্ময়ের ভাব দেখে মধুসূদনের লাগল ভালো। দানটা যে সামান্য নয় কুমুর মুখভাবে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু মধুসূদন আরও কিছু হাতে রেখেছে, সেইটে প্রকাশ করলে; বললে, "তোমাদের বাড়ির কালু মুখুজ্যে এসেছে, তাকে দেখতে চাও?"

কুমুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, "কালুদা!"

"তাকে ডেকে দিই। তোমরা কথাবার্তা কও, ততক্ষণ আমি খেয়ে আসি গে।"

কৃতজ্ঞতায় কুমুর চোখ ছল্ ছল্ করে এল।

৪৩

চাটুজ্যে জমিদারদের সঙ্গে কালুর পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধ। সমস্ত বিশ্বাসের কাজ এর হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়। এর কোনো এক পূর্বপুরুষ চাটুজ্যেদের জন্যে জেল খেটেছে। কালু আজ বিপ্রদাসের হয়ে এক কিস্তি সুদ দিয়ে রসিদ নিতে

মধুসূদনের আপিসে এসেছিল। বেঁটে, গৌরবর্ণ, পরিপুষ্ট চেহারা, ঈষৎ কটা, ড্যাবড্যাবা চোখ, তার উপরে ঝুঁকে-পড়া রোমশ কাঁচাপাকা মোটা ভুরু, মস্ত ঘন পাকা গোঁফ অথচ মাথার চুল প্রায় কাঁচা, সযত্নে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি পরা এবং প্রভু-পরিবারের মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত পুরানো দামি জামিয়ার গায়ে। আঙুলে একটা আংটি— তার পাথরটা নেহাত কম দামি নয়।

কালু ঘরে প্রবেশ করতে কুমু তাকে প্রণাম করলে। দুজনে বসল কার্পেটের উপর। কালু বললে, "ছোটো খুকি, এই তো সেদিন চলে এলে দিদি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কত বৎসর দেখি নি।"

"দাদা কেমন আছে আগে বলো।"

"বড়োবাবুর জন্যে বড়ো ভাবনায় কেটেছে। তুমি যেদিন চলে এলে তার পরের দিনে খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল। কিন্তু অসম্ভব জোরালো শরীর কিনা, দেখতে দেখতে সামলে নিলেন। ডাক্তাররা আশ্চর্য হয়ে গেছে।"

"দাদা কাল আসছেন ?"

"তাই কথা ছিল। কিন্তু আরও দুটো দিন দেরি হবে। পূর্ণিমা পড়েছে, সকলে তাঁকে বারণ করলে, কী জানি যদি আবার জ্বর আসে। সে যেন হল, কিন্তু তুমি কেমন আছ দিদি ?"

"আমি বেশ ভালোই আছি।"

কালু কিছু বলতে ইচ্ছে করল না, কিন্তু কুমুর মুখের সে লাবণ্য গেল কোথায় ? চোখের নীচে কালি কেন ? অমন চিকন রঙ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল কী জন্যে ? কুমুর মনে একটা প্রশ্ন জাগছে, সেটা সে মুখ ফুটে বলতে পারছে না, 'দাদা আমাকে মনে করে কি কিছু বলে পাঠান নি ?' তার সেই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তরের মতোই যেন কালু বললে, "বড়োবাবু আমার হাত দিয়ে তোমাকে একটি জিনিস পাঠিয়েছেন।"

কুমু ব্যগ্র হয়ে বললে, "কী পাঠিয়েছেন, কই সে ?"

"সেটা বাইরে রেখে এসেছি।"

"আনলে না কেন ?"

"ব্যস্ত হোয়ো না দিদি। মহারাজা বললেন, তিনি নিজে নিয়ে আসবেন।"

"কী জিনিস বলো আমাকে।"

"ইনি যে আমাকে বলতে বারণ করলেন।" ঘরের চারি দিকে তাকিয়ে কালু বললে "বেশ আদর যত্নে তোমাকে রেখেছে— বড়োবাবুকে গিয়ে বলব, কত খুশি

হবেন। প্রথম দুদিন তোমার খবর পেতে দেরি হয়ে তিনি বড়ো ছট্‌ফট্‌ করেছেন। ডাকের গোলমাল হয়েছিল, শেষকালে তিনটে চিঠি একসঙ্গে পেলেন।"

ডাকের গোলমাল হবার কারণটা যে কোন্‌খানে কুমু তা আন্দাজ করতে পারলে।

কালুদাকে কুমু খেতে বলতে চায়, সাহস করতে পারছে না। একটু সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, "কালুদা, এখনও তোমার খাওয়া হয় নি ?"

"দেখেছি, কলকাতায় সন্ধের পর খেলে আমার সহ্য হয় না দিদি, তাই আমাদের রামদাস কবিরাজের কাছ থেকে মকরধ্বজ আনিয়ে খাচ্ছি। বিশেষ কিছু তো ফল হল না।"

কালু বুঝেছিল, বাড়ির নতুন বউ, এখনও কর্তৃত্ব হাতে আসে নি, মুখ ফুটে খাওয়াবার কথা বলতে পারবে না, কেবল কষ্ট পাবে।

এমন সময় মোতির মা দরজার আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে কুমুকে ডেকে নিয়ে বললে, "তোমাদের ওখান থেকে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন, তাঁর জন্যে খাবার তৈরি। নীচের ঘরে তাঁকে নিয়ে এসো, খাইয়ে দেবে।"

কুমু ফিরে এসেই বললে, "কালুদা, তোমার কবিরাজের কথা রেখে দাও, তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে।"

"কী বিভ্রাট! এ যে অত্যাচার! আজ থাক্‌, না-হয় আর-একদিন হবে।"

"না, সে হবে না— চলো।"

শেষকালে আবিষ্কার করা গেল, মকরধ্বজের বিশেষ ফল হয়েছে, ক্ষুধার লেশমাত্র অভাব প্রকাশ পেল না।

কালুদাদাকে খাওয়ানো শেষ হতেই কুমু শোবার ঘরে চলে এল। আজ মনটা বাপের বাড়ির স্মৃতিতে ভরা। এতদিনে নুরনগরে খিড়কির বাগানে আমের বোল ধরেছে। কুসুমিত জামরুল গাছের তলায় পুকুর-ধারের চাতালে কত নিভৃত মধ্যাহ্নে কুমু হাতের উপর মাথা রেখে এলোচুল ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে কাটিয়েছে— মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত, ছায়ায় আলোয় খচিত সেই দুপুরবেলা। বুকের মধ্যে একটা অকারণ ব্যথা লাগত, জানত না তার অর্থ কী। সেই ব্যথায় সন্ধেবেলাকার ব্রজের পথের গোখুর-ধূলিতে ওর স্বপ্ন রাঙা হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারে নি যে, ওর যৌবনের অপ্রাপ্ত দোসর জলে স্থলে দিয়েছে মায়া মেলে, ওর যুগল রূপের উপাসনায় সেই করেছে লুকোচুরি, তাকেই টেনে এনেছে ওর চিত্তের অলক্ষ্যপুরে এসরাজে মূলতানের মিড়ে মূর্ছনায়। ওর প্রথম-যৌবনের সেই না-পাওয়া মনের মানুষের কত আভাস ছিল ওদের সেখানকার বাড়ির কত জায়গায়,

সেখানকার চিলেকোঠায়, যেখান থেকে দেখা যেত গ্রামের বাঁকা রাস্তার ধারে ফুলের আগুন-লাগা সরষেখেত, খিড়কির পাঁচিলের ধারের সেই ঢিবিটা যেখানে বসে পাঁচিলের ছ্যাতলাপড়া সবুজে কালোয় মেশা নানা রেখায় যেন কোন্ পুরাতন বিস্মৃত কাহিনীর অস্পষ্ট ছবি— দোতালায় ওর শোবার ঘরের জানালায় সকালে ঘুম থেকে উঠেই দূরের রাঙা আকাশের দিকে সাদা পালগুলো দেখতে পেত দিগন্তের গায়ে গায়ে চলেছে যেন মনের নিরুদ্দেশ-কামনার মতো। প্রথম-যৌবনের সেই মরীচিকাই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কলকাতায় ওর পূজার মধ্যে, ওর গানের মধ্যে। সেই তো দৈবের বাণীর ভান করে ওকে অন্ধভাবে এই বিবাহের ফাঁসের মধ্যে টেনে আনলে। অথচ প্রখর রৌদ্রে নিজে গেল মিলিয়ে।

ইতিমধ্যে মধুসূদন কখন পিছনে এসে দেয়ালে-ঝোলানো আয়নায় কুমুর মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারলে কুমুর মন যেখানে হারিয়ে গেছে সেই অদৃশ্য অজানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিছুতেই চলবে না। অন্য দিন হলে কুমুর এই আনমনা ভাব দেখলে রাগ হত। আজ শান্ত বিষাদের সঙ্গে কুমুর পাশে এসে বসল ; বললে, "কী ভাবছ বড়োবউ ?"

কুমু চমকে উঠল। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মধুসূদন ওর হাত চেপে ধরে নাড়া দিয়ে বললে, "তুমি কি কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেবে না ?"

একথার উত্তর কুমু ভেবে পেলে না। কেন ধরা দিতে পারছে না সে প্রশ্ন ও যে নিজেকেও করে। মধুসূদন যখন কঠিন ব্যবহার করছিল তখন উত্তর সহজ ছিল, ও যখন নতি স্বীকার করে তখন নিজেকে নিন্দে করা ছাড়া কোনো জবাব পায় না। স্বামীকে মন প্রাণ সমর্পণ করতে না পারাটা মহাপাপ, এ সম্বন্ধে কুমুর সন্দেহ নেই, তবু ওর এমন দশা কেন হল ? মেয়েদের একটিমাত্র লক্ষ্য সতী-সাবিত্রী হয়ে ওঠা। সেই লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হওয়ার পরম দুর্গতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়— তাই আজ ব্যাকুল হয়ে কুমু মধুসূদনকে বললে, "তুমি আমাকে দয়া করো।"

"কিসের জন্যে দয়া করতে হবে ?"

"আমাকে তোমার করে নাও— হুকুম করো, শাস্তি দাও। আমার মনে হয় আমি তোমার যোগ্য নই।"

শুনে বড়ো দুঃখে মধুসূদনের হাসি পেল। কুমু সতীর কর্তব্য করতে চায়। কুমু যদি সাধারণ গৃহিণীমাত্র হত, তা হলে এইটুকুই যথেষ্ট হত, কিন্তু কুমু যে ওর কাছে মন্ত্র-পড়া স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি, সেই বেশিটুকুকে পাবার জন্যে ও যতই মূল্য

হাঁকছে সবই ব্যর্থ হচ্ছে। ধরা পড়ছে নিজের খর্বতা। কুমুর সঙ্গে নিজের দুর্লঙ্ঘ্য অসাম্য কেবলই ব্যাকুলতা বাড়িয়ে তুলছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মধুসূদন বললে, "একটি জিনিস যদি দিই তো কী দেবে বলো।"

কুমু বুঝতে পারলে দাদার দেওয়া সেই জিনিস, ব্যগ্রতার সঙ্গে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"যেমন জিনিসটি তারই উপযুক্ত দাম নেব কিন্তু," বলে খাটের নীচে থেকে রেশমের খোল দিয়ে মোড়া একটি এসরাজ বের করে তার মোড়কটি খুলে ফেললে। কুমুর সেই চিরপরিচিত এসরাজ, হাতির দাঁতে খচিত। বাড়ি থেকে চলে আসবার সময় এইটি ফেলে এসেছিল।

মধুসূদন বললে, "খুশি হয়েছ তো ? এইবার দাম দাও।"

মধুসূদন কী দাম চায় কুমু বুঝতে পারলে না, চেয়ে রইল। মধুসূদন বললে, "বাজিয়ে শোনাও আমাকে।"

এটা বেশি কিছু নয়, তবু বড়ো শক্ত দাবি। কুমু এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছে যে, মধুসূদনের মনে সংগীতের রস নেই। এর সামনে বাজানোর সংকোচ কাটিয়ে তোলা কঠিন। কুমু মুখ নিচু করে এসরাজের ছড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মধুসূদন বললে, "বাজাও না বড়োবউ, আমার সামনে লজ্জা কোরো না।"

কুমু বললে, "সুর বাঁধা নেই।"

"তোমার নিজের মনেরই সুর বাঁধা নেই, তাই বল না কেন ?"

কথাটার সত্যতায় কুমুর মনে তখনই ঘা লাগল; "যন্ত্রটা ঠিক করে রাখি, তোমাকে আর এক দিন শোনাব।"

"কবে শোনাবে ঠিক করে বলো। কাল ?"

"আচ্ছা, কাল।"

"সন্ধেবেলায় আপিস থেকে ফিরে এলে ?"

"হাঁ, তাই হবে।"

"এসরাজটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছ ?"

"খুব খুশি হয়েছি।"

শালের ভিতর থেকে একটা চামড়ার কেস বের করে মধুসূদন বললে, "তোমার জন্যে যে মুক্তার মালা কিনে এনেছি, এটা পেয়ে ততখানিই খুশি হবে না ?"

এমনতরো মুশকিলের প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করা? কুমু চুপ করে এসরাজের ছড়িটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

"বুঝেছি, দরখাস্ত নামঞ্জুর।"

কুমু কথাটা ঠিক বুঝলে না।

মধুসূদন বললে, "তোমার বুকের কাছে আমার অন্তরের এই দরখাস্তটি লটকিয়ে দেব ইচ্ছে ছিল— কিন্তু তার আগেই ডিস্‌মিস্‌।"

কুমুর সামনে মেজের উপর গয়নাটা রইল খোলা। দুজনে কেউ একটিও কথা বললে না। থেকে থেকে কুমু যেরকম স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে যায়, তেমনি হয়ে রইল। একটু পরে যেন সচেতন হয়ে মালাটা তুলে নিয়ে গলায় পরলে, আর মধুসূদনকে প্রণাম করলে। বললে, "তুমি আমার বাজনা শুনবে?"

মধুসূদন বললে, "হাঁ শুনব।"

"এখনই শোনাব" বলে এসরাজের সুর বাঁধলে। কেদারায় আলাপ আরম্ভ করলে; ভুলে গেল ঘরে কেউ আছে, কেদারা থেকে পৌঁছোল ছায়ানটে। যে গানটি সে ভালোবাসে সেইটি ধরল, 'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।' সুরের আকাশে রঙিন ছায়া ফেলে এল সেই অপরূপ আবির্ভাব, যাকে কুমু গানে পেয়েছে, প্রাণে পেয়েছে, কেবল চোখে পাবার তৃষ্ণা নিয়ে যার জন্যে মিনতি চিরদিন রয়ে গেল— 'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।'

মধুসূদন সংগীতের রস বোঝে না, কিন্তু কুমুর বিশ্ববিস্মৃত মুখের উপর যে সুর খেলছিল, এসরাজের পর্দায় পর্দায় কুমুর আঙুল-ছোঁয়ার যে ছন্দ নেচে উঠছিল তাই তার বুকে দোল দিলে, মনে হতে লাগল ওকে যেন কে বরদান করছে। আনমনে বাজাতে বাজাতে কুমু হঠাৎ একসময়ে দেখতে পেলে মধুসূদন তার মুখের উপর একদৃষ্টে চেয়ে, অমনি হাত গেল থেমে, লজ্জা এল, বাজনা বন্ধ করে দিলে।

মধুসূদনের মন দাক্ষিণ্যে উদ্বেল হয়ে উঠল, বললে, "বড়োবউ, তুমি কী চাও বলো।" কুমু যদি বলত, কিছুদিন দাদার সেবা করতে চাই, মধুসূদন তাতেও রাজি হতে পারত; কেননা আজ কুমুর গীতমুগ্ধ মুখের দিকে কেবলই চেয়ে চেয়ে সে নিজেকে বলছিল, 'এই তো আমার ঘরে এসেছে, এ কী আশ্চর্য সত্য!'

কুমু এসরাজ মাটিতে রেখে, ছড়ি ফেলে চুপ করে রইল।

মধুসূদন আর-একবার অনুনয় করে বললে, "বড়োবউ, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাও তাই পাবে।"

কুমু বললে, "মুরলী বেয়ারাকে একখানা শীতের কাপড় দিতে চাই।"

কুমু যদি বলত কিছু চাই নে, সেও ছিল ভালো, কিন্তু মুরলী বেহারার জন্যে গায়ের কম্বল! যে দিতে পারে মাথার মুকুট, তার কাছে চাওয়া জুতোর ফিতে!

মধুসূদন অবাক। রাগ হল বেহারাটার উপর। বললে, "লক্ষ্মীছাড়া মুরলী বুঝি তোমাকে বিরক্ত করছে?"

"না আমি আপনিই ওকে একটা আলোয়ান দিতে গেলুম, ও নিল না। তুমি যদি হুকুম কর তবে সাহস করে নেবে।"

মধুসূদন স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিক পরে বললে, "ভিক্ষে দিতে চাও! আচ্ছা দেখি, কই তোমার আলোয়ান?"

কুমু তার সেই অনেক দিনের পরা বাদামি রঙের আলোয়ান নিয়ে এল। মধুসূদন সেটা নিয়ে নিজের গায়ে জড়াল। টিপায়ের উপরকার ছোটো ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে একজন বুড়ি দাসী এল; তাকে বললে, "মুরলী বেহারাকে ডেকে দাও।"

মুরলী এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল; শীতে ও ভয়ে তার জোড়া হাত কাঁপছে।

"তোমার মাজি তোমাকে বকশিশ দিয়েছেন", বলে মধুসূদন পকেট-কেস থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে তার ভাঁজ খুলে সেটা দিলে কুমুর হাতে। এরকম অকারণে অযাচিত দান মধুসূদনের দ্বারা জীবনে কখনও ঘটে নি। অসম্ভব ব্যাপারে মুরলী বেহারার ভয় আরও বেড়ে উঠল, দ্বিধাকম্পিত স্বরে বললে, "হুজুর—"

"হুজুর কী রে বেটা! বোকা, নে তোর মায়ের হাত থেকে। এই টাকা দিয়ে যত খুশি গরম কাপড় কিনে নিস।"

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হল— সেই সঙ্গে সেদিনকার আর সমস্তই যেন শেষ হয়ে গেল। যে স্রোতে কুমুর মন ভেসেছিল সে গেল হঠাৎ বন্ধ হয়ে, মধুসূদনের মনে আত্মত্যাগের যে ঢেউ চিত্তসংকীর্ণতার কূল ছাপিয়ে উঠেছিল তাও সামান্য বেহারার জন্য তুচ্ছ প্রার্থনায় ঠেকে গিয়ে আবার তলায় গেল নেমে। এর পরে সহজে কথাবার্তা কওয়া দুই পক্ষেই অসাধ্য। আজ সন্ধের সময় সেই তালুক-কেনা ব্যাপার নিয়ে লোক এসে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে, এ কথাটা মধুসূদনের মনেই ছিল না। এতক্ষণ পরে চমকে উঠে ধিক্‌কার হল নিজের উপরে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কাজ আছে, আসি।" দ্রুত চলে গেল।

পথের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর ঘরের সামনে এসে বেশ প্রকাশ্য কণ্ঠস্বরেই বললে, "ঘরে আছ?"

শ্যামাসুন্দরী আজ খায় নি; একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে মেজেয় মাদুরের উপর

অবসন্ন ভাবে শুয়েছিল। মধুসূদনের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কী ঠাকুরপো ?"

"পান দিলে না আমাকে ?"

৪৪

বাইরে অন্ধকারে দরজার আড়ালে একটি মানুষ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল— হাবলু। কম সাহস না। মধুসূদনকে যমের মতো ভয় করে, তবু ছিল কাঠের পুতুলের মতো স্তব্ধ হয়ে। সেদিন মধুসূদনের কাছে তাড়া খাওয়ার পর থেকে জ্যাঠাইমার কাছে আসবার সুবিধে হয় নি, মনের ভিতর ছট্‌ফট্‌ করেছে। আজ এই সন্ধ্যাবেলায় আসা নিরাপদ ছিল না। কিন্তু ওকে বিছানায় শুইয়ে রেখে মা যখন ঘরকন্নার কাজে চলে গেছে এমন সময় কানে এল এসরাজের সুর। কী বাজছে জানত না, কে বাজাচ্ছে বুঝতে পারে নি, জ্যাঠাইমার ঘর থেকে আসছে এটা নিশ্চিত ; জ্যাঠামশায় সেখানে নেই এই তার বিশ্বাস, কেননা তাঁর সামনে কেউ বাজনা বাজাতে সাহস করবে এ কথা সে মনেই করতে পারে না। উপরের তলায় দরজার কাছে এসে জ্যাঠামশায়ের জুতোজোড়া দেখেই পালাবার উপক্রম করলে। কিন্তু যখন বাইরে থেকে চোখে পড়ল ওর জ্যাঠাইমা নিজে বাজাচ্ছেন, তখন কিছুতেই পালাতে পা সরল না। দরজার আড়ালে লুকিয়ে শুনতে লেগেছে। প্রথম থেকেই জ্যাঠাইমাকে ও জানে আশ্চর্য, আজ বিস্ময়ের অন্ত নেই। মধুসূদন চলে যেতেই মনের উচ্ছ্বাস আর ধরে রাখতে পারলে না— ঘরে ঢুকেই কুমুর কোলে গিয়ে বসে গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে বললে, "জ্যাঠাইমা।"

কুমু তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, "এ কী, তোমার হাত যে ঠাণ্ডা! বাদলার হাওয়া লাগিয়েছ বুঝি ?"

হাবলু কোনো উত্তর করলে না, ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে জ্যাঠাইমা এখনই বুঝি বিছানায় শুতে পাঠিয়ে দেবে। কুমু তাকে শালের মধ্যে ঢেকে নিয়ে নিজের দেহের তাপে গরম করে বললে, "এখনও শুতে যাও নি গোপাল ?"

"তোমার বাজনা শুনতে এসেছিলুম। কেমন করে বাজাতে পারলে জ্যাঠাইমা ?"

"তুমি যখন শিখবে তুমিও পারবে।"

"আমাকে শিখিয়ে দেবে ?"

এমন সময় মোতির মা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেই বলে উঠল, "এই বুঝি দস্যি,

এখানে লুকিয়ে বসে। আমি ওকে সাতরাজ্যি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এদিকে সন্ধ্যা-বেলায় ঘরের বাইরে দু পা চলতে গা ছম্ ছম্ করে, জ্যাঠাইমার কাছে আসবার সময় ভয়ডর থাকে না। চল্ শুতে চল্।"

হাবলু কুমুকে আঁকড়ে ধরে রইল।

কুমু বললে, "আহা, থাক্-না আর-একটু।"

"এমন করে সাহস বেড়ে গেলে শেষকালে বিপদে পড়বে। ওকে শুইয়ে আমি এখনই আসছি।"

কুমুর বড়ো ইচ্ছে হল হাবলুকে কিছু দেয়, খাবার কিম্বা খেলার জিনিস। কিন্তু দেবার মতো কিছু নেই, তাই ওকে চুমো খেয়ে বললে, "আজ শুতে যাও, লক্ষ্মী ছেলে, কাল দুপুরবেলা তোমাকে বাজনা শোনাব।"

হাবলু করুণ মুখে উঠে মায়ের সঙ্গে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই মোতির মা ফিরে এল। নবীনের ষড়যন্ত্রের কী ফল হল তাই জানবার জন্যে মন অস্থির হয়ে আছে। কুমুর কাছে বসেই চোখে পড়ল, তার হাতে সেই নীলার আংটি। বুঝলে যে কাজ হয়েছে। কথাটা উত্থাপন করবার উপলক্ষ স্বরূপ বললে, "দিদি, তোমার এই বাজনাটা পেলে কেমন করে?"

কুমু বললে, "দাদা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"বড়োঠাকুর তোমাকে এনে দিলেন বুঝি?"

কুমু সংক্ষেপে বললে, "হাঁ।"

মোতির মা কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে উল্লাস বা বিস্ময়ের চিহ্ন খুঁজে পেলে না।

"তোমার দাদার কথা কিছু বললেন কি?"

"না।"

"পরশু তিনি তো আসবেন, তাঁর কাছে তোমার যাবার কথা উঠল না?"

"না, দাদার কোনো কথা হয় নি।"

"তুমি নিজেই চাইলে না কেন, দিদি?"

"আমি ওঁর কাছে আর যা-কিছু চাই নে কেন, এটা পারব না।"

"তোমার চাবার দরকার হবে না, তুমি অমনিই ওঁর কাছে চলে যেয়ো। বড়ো-ঠাকুর কিছুই বলবেন না।"

মোতির মা এখনও একটা কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি যে মধুসূদনের অনুকূলতা কুমুর পক্ষে সংকট হয়ে উঠেছে; এর বদলে মধুসূদন যা চায় তা ইচ্ছে করলেও কুমু

দিতে পারে না। ওর হৃদয় হয়ে গেছে দেউলে। এইজন্যেই মধুসূদনের কাছে দান গ্রহণ করে ঋণ বাড়াতে এত সংকোচ। কুমুর এমনও মনে হয়েছে যে, দাদা যদি আর কিছুদিন দেরি করে আসে তো সেও ভালো।

একটু অপেক্ষা করে থেকে মোতির মা বললে, "আজ মনে হল বড়োঠাকুরের মন যেন প্রসন্ন।"

সংশয়ব্যাকুল চোখে কুমু মোতির মার মুখে তাকিয়ে বললে, "এ প্রসন্নতা কেন ঠিক বুঝতে পারি নে, তাই আমার ভয় হয়; কী করতে হবে ভেবে পাই নে।"

কুমুর চিবুক ধরে মোতির মা বললে, "কিছুই করতে হবে না; এটুকু বুঝতে পারছ না, এতদিন উনি কেবল কারবার করে এসেছেন, তোমার মতো মেয়েকে কোনোদিন দেখেন নি। একটু একটু করে যতই চিনছেন ততই তোমার আদর বাড়ছে।"

"বেশি দেখলে বেশি চিনবেন, এমন কিছুই আমার মধ্যে নেই ভাই। আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি আমার ভিতরটা শূন্য। সেই ফাঁকটাই দিনে দিনে ধরা পড়বে। সেইজন্যেই হঠাৎ যখন দেখি উনি খুশি হয়েছেন, আমার মনে হয় উনি বুঝি ঠকেছেন। যেই সেটা ফাঁস হবে সে-ই আরও রেগে উঠবেন। সেই রাগটাই যে সত্য, তাই তাকে আমি তেমন ভয় করি নে।"

"তোমার দাম তুমি কী জান দিদি! যেদিন এদের বাড়িতে এসেছ, সেইদিনই তোমার পক্ষ থেকে যা দেওয়া হল, এরা সবাই মিলে তা শুধতে পারবে না। আমার কর্তাটি তো একেবারে মরিয়া, তোমার জন্যে সাগর লঙ্ঘন না করতে পারলে স্থির থাকতে পারছেন না। আমি যদি তোমাকে না ভালোবাসতুম তবে এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যেত।"

কুমু হাসলে, বললে, "কত ভাগ্যে এমন দেবর পেয়েছি।"

"আর তোমার এই জা-টি বুঝি ভাগ্যস্থানে রাহু না কেতু।"

"তোমাদের একজনের নাম করলে আর-একজনের নাম করবার দরকার হয় না।"

মোতির মা ডান হাত দিয়ে কুমুর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে।"

"কী বলো।"

"আমার সঙ্গে তুমি 'মনের কথা' পাতাও।"

"সে বেশ কথা, ভাই! প্রথম থেকে মনে মনে পাতানো হয়েই গেছে।"

"তা হলে আমার কাছে কিছু চেপে রেখো না। আজ তুমি অমন মুখটি করে কেন আছ কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

খানিকক্ষণ মোতির মার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কুমু বললে, "ঠিক কথা বলব ? নিজেকে আমার কেমন ভয় করছে।"

"সে কী কথা ! নিজেকে কিসের ভয় ?"

"আমি এতদিন নিজেকে যা মনে করতুম আজ হঠাৎ দেখছি তা নই। মনের মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই এসেছিলুম। দাদারা যখন দ্বিধা করেছেন, আমি জোর করেই নতুন পথে পা বাড়িয়েছি। কিন্তু যে মানুষটা ভরসা করে বেরোল তাকে আজ কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে।"

"তুমি ভালোবাসতে পারছ না। আচ্ছা, আমার কাছে লুকিয়ো না, সত্যি করে বলো কাউকে কি ভালোবেসেছ ? ভালোবাসা কাকে বলে তুমি কি জান ?"

"যদি বলি জানি, তুমি হাসবে। সূর্য ওঠবার আগে যেমন আলো হয় আমার সমস্ত আকাশ ভরে ভালোবাসা তেমনি করেই জেগেছিল। কেবলই মনে হয়েছে সূর্য উঠল বলে। সেই সূর্যোদয়ের কল্পনা মাথায় করেই আমি বেরিয়েছি, তীর্থের জল নিয়ে— ফুলের সাজি সাজিয়ে। যে দেবতাকে এতদিন সমস্ত মন দিয়ে মেনে এসেছি, মনে হয়েছে তাঁর উৎসাহ পেলুম। যেমন করে অভিসারে বেরোয় তেমনি করেই বেরিয়েছি। অন্ধকার রাত্রিকে অন্ধকার বলে মনেই হয় নি, আজ আলোতে চোখ মেলে অন্তরেই বা কী দেখলুম, বাইরেই বা কী দেখছি ! এখন বছরের পর বছর, মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটবে কী করে ?"

"তুমি কি বড়োঠাকুরকে ভালোবাসতে পারবে না মনে কর ?"

"পারতুম ভালোবাসতে। মনের মধ্যে এমন কিছু এনেছিলুম যাতে সবই পছন্দমত করে নেওয়া সহজ হত। গোড়াতেই সেইটেকে তোমার বড়োঠাকুর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। আজ সব জিনিস কড়া হয়ে আমাকে বাজছে। আমার শরীরের উপরকার নরম ছালটাকে কে যেন ঘষড়ে তুলে দিল, তাই চারি দিকে সবই আমাকে লাগছে, কেবলই লাগছে, যা কিছু ছুঁই তাতেই চমকে উঠি ; এর পরে কড়া পড়ে গেলে কোনো একদিন হয়তো সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আর আনন্দ পাব না তো।"

"বলা যায় না ভাই।"

"খুব বলা যায়। আজ আমার মনে একটুমাত্র মোহ নেই। আমার জীবনটা একেবারে নির্লজ্জের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। নিজেকে একটু ভোলাবার মতো আড়াল কোথাও বাকি রইল না। মরণ ছাড়া মেয়েদের কি আর কোথাও নড়ে বসবার একটুও জায়গা নেই ? তাদের সংসারটাকে নিষ্ঠুর বিধাতা এত আঁট করেই তৈরি করেছে।"

এতক্ষণ ধরে এমনতরো উত্তেজনার কথা কুমুর মুখে মোতির মা আর কোনোদিন শোনে নি। বিশেষ করে আজ যেদিন বড়োঠাকুরকে ওরা কুমুর প্রতি এতটা প্রসন্ন করে এনেছে, সেইদিনই কুমুর এই তীব্র অধৈর্য দেখে মোতির মা ভয় পেয়ে গেল। বুঝলে লতার একেবারে গোড়ায় ঘা লেগেছে, উপর থেকে অনুগ্রহের জল ঢেলে মালী আর একে তাজা করে তুলতে পারবে না।

একটু পরে কুমু বলে উঠল, "জানি, স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারছি নে এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্ছে না যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে করে।"

মোতির মা কোনো উত্তর না ভেবে পেয়ে হতবুদ্ধির মতো বসে রইল। একটু চুপ করে থেকে কুমু বললে, "তোমার কত ভাগ্যি ভাই, কত পুণ্যি করেছিলে, ঠাকুরপোকে এমন সমস্ত মনটা দিয়ে ভালোবাসতে পেরেছ। আগে মনে করতুম, ভালোবাসাই সহজ— সব স্ত্রী সব স্বামীকে আপনিই ভালোবাসে। আজ দেখতে পাচ্ছি ভালোবাসতে পারাটাই সবচেয়ে দুর্লভ, জন্মজন্মান্তরের সাধনায় ঘটে। আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো সব স্ত্রীই কি স্বামীকে ভালোবাসে?"

মোতির মা একটু হেসে বললে, "ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, নইলে সংসার চলবে কী করে?"

"সেই আশ্বাস দাও আমাকে। আর কিছু না হই ভালো স্ত্রী যেন হতে পারি। পুণ্য তাতেই বেশি, সেইটেই কঠিন সাধনা।"

"বাইরে থেকে তাতেও বাধা পড়ে।"

"অন্তর থেকে সে বাধা কাটিয়ে উঠতে পারা যায়। আমি পারব, আমি হার মানব না।"

"তুমি পারবে না তো কে পারবে?"

বৃষ্টি জোর করে চেপে এল। বাতাসে ল্যাম্পের আলো থেকে থেকে চকিত হয়ে ওঠে। দমকা হাওয়া যেন একটা ভিজে নিশাচর পাখির মতো পাখা ঝাপ্‌টে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কুমুর শরীরটা মনটা শির্ শির্ করে উঠল। সে বললে, "আমার ঠাকুরের নামে আর জোর পাচ্ছি নে। মন্ত্র আবৃত্তি করে যাই, মনটা মুখ ফিরিয়ে থাকে, কিছুতে সাড়া দিতে চায় না। তাতেই সবচেয়ে ভয় হয়।"

বানানো কথায় মিথ্যে ভরসা দিতে মোতির মার ইচ্ছে হল না। কোনো উত্তর না করে সে কুমুকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলে। এমন সময় বাইরে থেকে আওয়াজ পাওয়া গেল, "মেজোবউ।"

কুমু খুশি হয়ে উঠে বললে, "এসো, এসো ঠাকুরপো।"

"সন্ধ্যাবেলাকার ঘরের আলোটিকে ঘরে দেখতে পেলুম না, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি।"

মোতির মা বললে, "হায় হায়, মণিহারা ফণী যাকে বলে।"

"কে মণি আর কে ফণী তা চক্র নাড়া দেখলেই বোঝা যায়, কী বল বউরানী।"

"আমাকে সাক্ষী মেনো না ঠাকুরপো।"

"জানি, তা হলে আমি ঠকব।"

"তা তোমার হারাধনকে তুমি উদ্ধার করে নিয়ে যাও, আমি ধরে রাখব না।"

"হারাধনের জন্যে ওঁর কোনো উৎসাহ নেই দিদি, ছুতো করে বউরানীর চরণ দর্শন করতে এসেছেন।"

"ছুতোর কি কোনো দরকার আছে? চরণ আপনি ধরা দিয়েছে। সবচেয়ে যা অসাধ্য তার সাধনা করবে কে? সে যখন আসে সহজেই আসে। পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ আছে আমার চেয়ে যোগ্য, তবু অমন সুন্দর পা দুখানি আমিই পারলুম ছুঁতে, তারা তো পারলে না। নবীনের জন্ম সার্থক হয়ে গেল বিনামূল্যে।"

"আঃ, কী বল ঠাকুরপো, তার ঠিক নেই। তোমার এনসাইক্লোপীডিয়া থেকে বুঝি—"

"অমন কথা বলতে পারবে না, বউরানী। চরণ বলতে কী বোঝায় তা ওরা জানবে কী করে? ছাগলের খুরের মতো সরু সরু ঠেকোওআলা জুতোর মধ্যে লক্ষ্মীদের পা কড়া জেনানার মধ্যে ওরা বন্দী করে রেখেছে। সাইক্লোপীডিয়া-ওআলার সাধ্য কী পায়ের মহিমা বোঝে। লক্ষ্মণ চোদ্দটা বৎসর কেবল সীতার পায়ের দিকে তাকিয়েই নির্বাসন কাটিয়ে দিলেন, তার মানে আমাদের দেশের দেওররাই জানে। তা পায়ের উপর শাড়ি টেনে দিচ্ছ তো দাও। ভয় নেই তোমার, পদ্ম সন্ধেবেলায় মুদে থাকে বলে তো বরাবর মুদেই থাকে না— আবার তো পাপড়ি খোলে।"

"ভাই মনের কথা, এমনিতরো স্তব করেই বুঝি ঠাকুরপো তোমার মন ভুলিয়েছেন?"

"একটুও না দিদি, মিষ্টি কথার বাজে খরচ করবার লোক নন উনি।"

"স্তুতির বুঝি দরকার হয় না?"

"বউরানী, স্তুতির ক্ষুধা দেবীদের কিছুতেই মেটে না, দরকার খুব আছে। কিন্তু শিবের মতো আমি তো পঞ্চানন নই, এই একটিমাত্র মুখের স্তুতি পুরোনো হয়ে গেছে, এতে উনি আর রস পাচ্ছেন না।"

এমন সময় মুরলী বেয়ারা এসে নবীনকে খবর দিলে, "কর্তা-মহারাজা বাইরের আপিসঘরে ডাক দিয়েছেন।"

শুনে নবীনের মন খারাপ হয়ে গেল। সে ভেবেছিল মধুসূদন আজ আপিস থেকে ফিরেই একেবারে সোজা তার শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হবে। নৌকো বুঝি আবার ঠেকে গেল চড়ায়।

নবীন চলে গেলে মোতির মা আস্তে আস্তে বললে, "বড়োঠাকুর কিন্তু তোমাকে ভালোবাসেন সে কথা মনে রেখো।"

কুমু বললে, "সেইটেই তো আমার আশ্চর্য ঠেকে।"

"বল কী, তোমাকে ভালোবাসা আশ্চর্য কেন? উনি কি পাথরের?"

"আমি ওঁর যোগ্য না।"

"তুমি যাঁর যোগ্য নও সে পুরুষ কোথায় আছে?"

"ওঁর কতবড়ো শক্তি, কত সম্মান, কত পাকা বুদ্ধি, উনি কত মস্ত মানুষ। আমার মধ্যে উনি কতটুকু পেতে পারেন? আমি যে কী অসম্ভব কাঁচা, তা এখানে এসে দুদিনে বুঝতে পেরেছি। সেইজন্যেই যখন উনি ভালোবাসেন তখনই আমার সবচেয়ে বেশি ভয় করে। আমি নিজের মধ্যে যে কিছুই খুঁজে পাই নে। এতবড়ো ফাঁকি নিয়ে আমি ওঁর সেবা করব কী করে? কাল রাত্তিরে বসে বসে মনে হল আমি যেন বেয়ারিং লেফাফা, আমাকে দাম দিয়ে নিতে হয়েছে, খুলে ফেললেই ধরা পড়বে যে ভিতরে চিঠিও নেই।"

"দিদি হাসালে। বড়োঠাকুরের মস্তবড়ো কারবার, কারবারি বুদ্ধিতে ওঁর সমান কেউ নেই, সব জানি। কিন্তু তুমি কি ওঁর কারবারের ম্যানেজারি করতে এসেছ যে, যোগ্যতা নেই বলে ভয় পাবে? বড়োঠাকুর যদি মনের কথা খোলসা করে বলেন তবে নিশ্চয় বলবেন, তিনিও তোমার যোগ্য নন।"

"সে কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন।"

"বিশ্বাস হয় নি?"

"না। উলটে আমার ভয় হয়েছিল। মনে হয়েছিল আমার সম্বন্ধে ভুল করলেন, সে ভুল ধরা পড়বে।"

"কেন তোমার এমন মনে হল বলো দেখি।"

"বলব? এই-যে আমার হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল, এ তো সমস্ত আমি নিজে ঘটিয়ে তুললুম— কিন্তু কী অদ্ভুত মোহে, কী ছেলেমানুষি করে! যা-কিছুতে আমাকে সেদিন ভুলিয়েছিল তার মধ্যে সমস্তই ছিল ফাঁকি। অথচ এমন দৃঢ় বিশ্বাস,

এমন বিষম জেদ যে, সেদিন আমাকে কিছুতেই কেউ ঠেকাতে পারত না। দাদা তা নিশ্চিত্ত জানতেন বলেই বৃথা বাধা দিলেন না; কিন্তু কত ভয় পেয়েছেন, কত উদ্বিগ্ন হয়েছেন, তা কি আমি বুঝতে পারি নি? বুঝতে পেরেও নিজের ঝোঁকটাকে একটুও সামলাই নি, এতবড়ো অবুঝ আমি। আজ থেকে চিরদিন আমি কেবলই কষ্ট পাব, কষ্ট দেব, আর প্রতিদিন মনে জানব এ সমস্তই আমার নিজের সৃষ্টি।"

মোতির মা কী যে বলবে কিছুই ভেবে পেলে না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা দিদি, তুমি যে বিয়ে করতে মন স্থির করলে, কী ভেবে?"

"তখন নিশ্চিত জানতুম, স্বামী ভালোমন্দ যাই হোক না কেন, স্ত্রীর সতীত্বগৌরব প্রমাণের একটা উপলক্ষমাত্র। মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে, প্রজাপতি যাকেই স্বামী বলে ঠিক করে দিয়েছেন তাকেই ভালোবাসবই। ছেলেবেলা থেকে কেবল মাকে দেখেছি, পুরাণ পড়েছি, কথকতা শুনেছি, মনে হয়েছে শাস্ত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলা খুব সহজ।"

"দিদি, উনিশ বছরের কুমারীর জন্যে শাস্ত্র লেখা হয় নি।"

"আজ বুঝতে পেরেছি সংসারে ভালোবাসাটা উপরি-পাওনা। ওটাকে বাদ দিয়েই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে সংসারসমুদ্রে ভাসতে হবে। ধর্ম যদি সরস হয়ে ফুল না দেয়, ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হয়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।"

মোতির মা নিজে বিশেষ কিছু না বলে কুমুকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিতে লাগল।

৪৫

মধুসূদন আপিসে গিয়েই দেখলে খবর ভালো নয়। মাদ্রাজের এক বড়ো ব্যাঙ্ক ফেল করেছে, তাদের সঙ্গে এদের কারবার। তার পরে কানে এল যে, কোনো ডাইরেক্টরের তরফ থেকে কোনো কর্মচারী মধুসূদনের অজানিতে খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। এতদিন কেউ মধুসূদনকে সন্দেহ করতে সাহস করে নি, একজন যেই ধরিয়ে দিয়েছে অমনি যেন একটা মন্ত্রশক্তি ছুটে গেল। বড়ো কাজের ছোটো ত্রুটি ধরা সহজ, যারা মাতব্বর সেনাপতি তারা কত খুচরো হারের ভিতর দিয়ে মোটের উপর মস্ত করেই জেতে। মধুসূদন বরাবর তেমনি জিতেই এসেছে— তাই বেছে বেছে খুচরো হার কারও নজরেই পড়ে নি। কিন্তু বেছে বেছে তারই একটা ফর্দ বানিয়ে সেটা সাধারণ লোকের নজরে তুললে তারা নিজের বুদ্ধির তারিফ করে, বলে আমরা হলে এ ভুল করতুম না। কে

তাদের বোঝাবে যে, ফুটো নৌকো নিয়েই মধুসূদন পাড়ি দিয়েছে, নইলে পাড়ি দেওয়াই হত না, আসল কথাটা এই যে কূলে পৌঁছোল। আজ নৌকোটা ডাঙায় তুলে ফুটোগুলোর বিচার করবার বেলায়, যারা নিরাপদে এসেছে ঘাটে, তাদের গা শিউরে উঠছে। এমনতরো টুকরো সমালোচনা নিয়ে আনাড়িদের ধাঁধা লাগানো সহজ। সাধারণত আনাড়িদের সুবিধে এই যে, তারা লাভ করতে চায়, বিচার করতে চায় না। কিন্তু যদি দৈবাৎ বিচার করতে বসে তবে মারাত্মক হয়ে ওঠে। এই-সব বোকাদের উপর মধুসূদনের নিরতিশয় অবজ্ঞা- মিশ্রিত ক্রোধের উদয় হল। কিন্তু বোকাদের যেখানে প্রাধান্য সেখানে তাদের সঙ্গে রফা করা ছাড়া গতি নেই। জীর্ণ মই মচ্ মচ্ করে, দোলে, ভাঙার ভয় দেখায়, যে ব্যক্তি উপরে চড়ে তাকে এই পায়ের তলার অবলম্বনটাকে বাঁচিয়ে চলতেই হয়। রাগ করে লাথি মারতে ইচ্ছে করে, তাতে মুশকিল আরও বাড়বারই কথা।

• শাবকের বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সিংহিনী নিজের আহারের লোভ ভুলে যায়, ব্যাবসা সম্বন্ধে মধুসূদনের সেইরকম মনের অবস্থা। এ যে তার নিজের সৃষ্টি; এর প্রতি তার যে দরদ সে প্রধানত টাকার দরদ নয়। যার রচনাশক্তি আছে, আপন রচনার মধ্যে সে নিজেকেই নিবিড় করে পায়, সেই পাওয়াটা যখন বিপন্ন হয়ে ওঠে তখন জীবনের আর-সমস্ত সুখদুঃখকামনা তুচ্ছ হয়ে যায়। কুমু মধুসূদনকে কিছুদিন থেকে প্রবল টানে টেনেছিল, সেটা হঠাৎ আলগা হয়ে গেল। জীবনে ভালোবাসার প্রয়োজনটা মধুসূদন প্রৌঢ় বয়সে খুব জোরের সঙ্গে অনুভব করেছিল। এই উপসর্গ যখন অকালে দেখা দেয় তখন উদ্দাম হয়েই ওঠে। মধুসূদনকে ধাক্কা কম লাগে নি, কিন্তু আজ তার বেদনা গেল কোথায়?

নবীন ঘরে আসতেই মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "আমার প্রাইভেট জমাখরচের খাতা বাইরের কোনো লোকের হাতে পড়েছে কি, জান?"

নবীন চমকে উঠল, বললে, "সে কী কথা?"

"তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে খাতাঞ্জির ঘরে কেউ আনাগোনা করছে কি না।"

"রতিকান্ত বিশ্বাসী লোক, সে কি কখনও—"

"তার অজানতে মুহুরিদের সঙ্গে কেউ কথা চালাচালি করছে বলে সন্দেহের কারণ ঘটেছে। খুব সাবধানে খবরটা জানা চাই কারা এর মধ্যে আছে।"

চাকর এসে খবর দিলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মধুসূদন সে কথায় মন না দিয়ে নবীনকে বললে, "শীঘ্র আমার গাড়িটা তৈরি করে আনতে বলে দাও।"

নবীন বললে, "খেয়ে বেরোবে না ? রাত হয়ে আসছে।"

"বাইরেই খাব, কাজ আছে।"

নবীন মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এল। সে যে কৌশল করেছিল ফেঁসে গেল বুঝি।

হঠাৎ মধুসূদন নবীনকে ফিরে ডেকে বললে, "এই চিঠিখানা কুমুকে দিয়ে এসো।"

নবীন দেখলে বিপ্রদাসের চিঠি। বুঝলে এ চিঠি আজ সকালেই এসেছে, সন্ধেবেলায় নিজের হাতে কুমুকে দেবে বলে মধুসূদন রেখেছিল। এমনি করে প্রত্যেকবার মিলন উপলক্ষে একটা-কিছু অর্ঘ্য হাতে করে আনবার ইচ্ছে। আজ আপিসের কাজে হঠাৎ তুফান উঠে তার এই আদরের আয়োজনটুকু গেল ডুবে।

মাদ্রাজে যে ব্যাঙ্ক ফেল করেছে সেটার উপরে সাধারণের নিশ্চিত আস্থা ছিল। তার সঙ্গে ঘোষাল-কোম্পানির যে যোগ সে সম্বন্ধে অধ্যক্ষদের বা অংশিদারদের কারও মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। যেই কল বিগড়ে গেল অমনি অনেকেই বলাবলি করতে আরম্ভ করলে যে, আমরা গোড়া থেকেই ঠাউরেছিলুম, ইত্যাদি।

সাংঘাতিক আঘাতের সময় ব্যাবসাকে যখন একজোট হয়ে রক্ষার চেষ্টা দরকার, সেই সময়েই পরাজয়ের সম্বন্ধে দোষারোপ প্রবল হয়ে ওঠে এবং যাদের প্রতি কারও ঈর্ষা আছে তাদেরকে অপদস্থ করবার চেষ্টায় টলমলে ব্যাবসাকে কাত করে ফেলা হয়। সেইরকম চেষ্টা চলবে মধুসূদন তা বুঝেছিল। মাদ্রাজ-ব্যাঙ্কের বিপর্যয়ে ঘোষাল-কোম্পানির লোকসানের পরিমাণ যে কতটা দাঁড়াবে এখনও তা নিশ্চিত জানবার সময় হয় নি, কিন্তু মধুসূদনের প্রতিপত্তি নষ্ট করবার আয়োজনে এও যে একটা মসলা জোগাবে তাতে সন্দেহ ছিল না। যাই হোক, সময় খারাপ, এখন অন্য সব কথা ভুলে এইটেতেই মধুসূদনকে কোমর বাঁধতে হবে।

রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে আলাপ হবার পর নবীন ফিরে এসে দেখলে কুমুর সঙ্গে মোতির মার তখনও কথা চলছে। নবীন বললে, "বউরানী, তোমার দাদার চিঠি আছে।"

কুমু চমকে উঠে চিঠিখানা নিলে। খুলতে হাত কাঁপতে লাগল। ভয় হল হয়তো কিছু অপ্রিয় সংবাদ আছে। হয়তো এখন আসাই হবে না। খুব ধীরে ধীরে খাম খুলে পড়ে দেখলে। একটু চুপ করে রইল। মুখ দেখে মনে হল যেন কোথায় ব্যথা বেজেছে। নবীনকে বললে, "দাদা আজ বিকেলে তিনটের সময় কলকাতায় এসেছেন।"

"আজই এসেছেন। তাঁর তো—"

"লিখেছেন দুই-একদিন পরে আসবার কথা ছিল কিন্তু বিশেষ কারণে আগেই আসতে হল।"

কুমু আর কিছু বললে না। চিঠির শেষ দিকে ছিল, একটু সেরে উঠলেই বিপ্রদাস কুমুকে দেখতে আসবে, সেজন্যে কুমু যেন ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন না হয়। এই কথাটাই আগেকার চিঠিতেও ছিল। কেন, কী হয়েছে? কুমু কী অপরাধ করেছে? এ যেন একরকম স্পষ্ট করেই বলা, তুমি আমাদের বাড়িতে এসো না। ইচ্ছে করল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে খানিকটা কেঁদে নেয়। কান্না চেপে পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল।

নবীন বুঝলে চিঠির মধ্যে একটা কী কঠিন মার আছে। কুমুর মুখ দেখে করুণায় ওর মন ব্যথিত হয়ে উঠল। বললে, "বউরানী, তাঁর কাছে তো কালই তোমার যাওয়া চাই।"

"না, আমি যাব না।" যেমনি বলা অমনি আর থাকতে পারলে না, দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

মোতির মা কোনো প্রশ্ন না করে কুমুকে বুকের কাছে টেনে নিলে, কুমু রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, "দাদা আমাকে যেতে বারণ করেছেন।"

নবীন বললে, "না না, বউরানী তুমি নিশ্চয় ভুল বুঝেছ।"

কুমু খুব জোরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে যে, সে একটুও ভুল বোঝে নি।

নবীন বললে, "তুমি কোথায় ভুল বুঝেছ বলব? বিপ্রদাসবাবু মনে করেছেন আমার দাদা তোমাকে তাঁদের ওখানে যেতে দিতে চাইবেন না। চেষ্টা করতে গিয়ে পাছে তোমাকে অপমানিত হতে হয়, পাছে তুমি কষ্ট পাও সেইটে বাঁচাবার জন্যে তিনি নিজে থেকে তোমার রাস্তা সোজা করে দিয়েছেন।"

কুমু এক মুহূর্তে গভীর আরাম পেলে। তার ভিজে চোখের পল্লব নবীনের মুখের দিকে তুলে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চুপ করে চেয়ে রইল। নবীনের কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য তাতে একটুও সন্দেহ রইল না। দাদার স্নেহকে ক্ষণকালের জন্যেও ভুল বুঝতে পেরেছে বলে নিজের উপর ধিক্‌কার হল। মনে খুব একটা জোর পেলে। এখনই দাদার কাছে ছুটে না গিয়ে দাদার আসার জন্যে সে অপেক্ষা করতে পারবে। সেই ভালো।

মোতির মা চিবুক ধরে কুমুর মুখ তুলে ধরে বললে, "বাস্ রে, দাদার কথার একটু আড় হাওয়া লাগলেই একেবারে অভিমানের সমুদ্র উথলে ওঠে।"

নবীন বললে, "বউরানী, কাল তা হলে তোমার যাবার আয়োজন করি গে।"

"না, তার দরকার নেই।"

"দরকার নেই তো কী ? তোমার দরকার না থাকে তো আমার দরকার আছে বই-কি।"

"তোমার আবার কিসের দরকার ?"

"বা! আমার দাদাকে তোমার দাদা যা-কিছু ঠাওরাবেন সেটা বুঝি অমনি সয়ে যেতে হবে! আমার দাদার পক্ষ নিয়ে আমি লড়ব। তোমার কাছে হার মানতে পারব না। কাল তোমাকে ওঁর কাছে যেতেই হচ্ছে।"

কুমু হাসতে লাগল।

"বউরানী, এ ঠাট্টার কথা নয়। আমাদের বাড়ির অপবাদে তোমার অগৌরব। এখন চোখে মুখে একটু জল দিয়ে এসো, খেতে যাবে। ম্যানেজার-সাহেবের ওখানে দাদার আজ নিমন্ত্রণ। আমার বিশ্বাস তিনি আজ বাড়ির ভিতরে শুতে আসবেন না, দেখলুম বাইরের কামরায় তাঁর বিছানা তৈরি।"

এই খবরটা পেয়ে কুমু মনে মনে আরাম পেলে, তার পরক্ষণেই এতটা আরাম পেলে বলে লজ্জা বোধ হল।

রাত্রে শোবার ঘরে মোতির মার সঙ্গে নবীনের ওই কথাটা নিয়ে পরামর্শ চলল। মোতির মা বললে, "তুমি তো দিদিকে আশ্বাস দিলে। তার পরে ?"

"তার পরে আবার কী ? নবীনের যেমন কথা তেমনি কাজ। বউরানীকে যেতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হবে।"

নতুন-গড়া রাজাদের পারিবারিক মর্যাদাবোধ খুবই উগ্র। এঁরা নিশ্চয় ঠিক করে আছেন যে, বিবাহ করে নববধূ তার পূর্ব-পদবীর চেয়ে অনেক উপরে উঠেছে ; অতএব বাপের বাড়ি বলে কোনো বালাই আছে এ কথা একেবারে ভুলতে দেওয়াই সংগত। এ অবস্থায় দুই দিক রক্ষা করা যদি অসম্ভব হয় তবে একটা দিক তো রাখতেই হবে। সেই দিকটা যে কোন্‌টা তা নবীন মনে মনে পাকা করে রাখলে। যেখানে দাদার অধিকার চরম, সেখানে ও কোনোদিন দাদার সঙ্গে লড়াই বাধাতে সাহস করতে পারবে এ কথা আর কিছুদিন আগে নবীন স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।

স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ করে স্থির হল যে, কাল সকালে কুমু একবার মাত্র বিপ্রদাসের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা করে আসবে, এই প্রস্তাব মধুসূদনের কাছে করা হবে। যদি রাজি হয় এবং কুমুকে সেখানে পাঠানো যায় তা হলে তার পরে সেখান থেকে দু-চার দিনের মধ্যে তাকে না ফেরাবার সংগত কারণ বানানো শক্ত হবে না।

মধুসূদন বাড়ি ফিরল অনেক রাত্রে, সঙ্গে একরাশ কাগজপত্রের বোঝা। নবীন উঁকি মেরে দেখলে, মধুসূদন শুতে না গিয়ে চোখে চশমা এঁটে নীল পেনসিল হাতে আপিসঘরের ডেস্কে কোনো দলিলে বা দাগ দিচ্ছে, নোটবইয়ে বা নোট নিচ্ছে। নবীন সাহস করে ঘরে ঢুকেই বললে, "দাদা, আমি কি তোমার কোনো কাজ করে দিতে পারি ?" মধুসূদন সংক্ষেপে বললে, "না।" ব্যাবসার এই সংকটের অবস্থাটাকে মধুসূদন সম্পূর্ণ নিজে আয়ত্ত করে নিতে চায়, সবটা তার একার চোখে প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার ; এ কাজে অন্যের দৃষ্টির সহায়তা নিতে গেলে নিজেকে দুর্বল করা হবে।

নবীন কোনো কথা বলবার ছিদ্র না পেয়ে বেরিয়ে গেল। শীঘ্র যে সুযোগ পাওয়া যাবে এমন তো ভাবে বোধ হল না। নবীনের পণ, কাল সকালেই বউরানীকে রওনা করে দেবে। আজ রাত্রেই সম্মতি আদায় করা চাই।

খানিকক্ষণ বাদে নবীন একটা ল্যাম্প হাতে করে দাদার টেবিলের উপরে রেখে বললে, "তোমার আলো কম হচ্ছে।"

মধুসূদন অনুভব করলে, এই দ্বিতীয় ল্যাম্পে তার কাজের অনেকখানি সুবিধা হল। কিন্তু এই উপলক্ষেও কোনো কথার সূচনা হতে পারল না। আবার নবীনকে বেরিয়ে আসতে হল।

একটু পরেই মধুসূদনের অভ্যস্ত গুড়গুড়িতে তামাক সেজে তার চৌকির বাঁ পাশে বসিয়ে নলটা টেবিলের উপর আস্তে আস্তে তুলে রাখলে। মধুসূদন তখনই অনুভব করলে এটারও দরকার ছিল। ক্ষণকালের জন্যে পেনসিলটা রেখে তামাক টানতে লাগল।

এই অবকাশে নবীন কথা পাড়লে, "দাদা, শুতে যাবে না ? অনেক রাত হয়েছে। বউরানী তোমার জন্যে হয়তো জেগে বসে আছেন।"

'জেগে বসে আছেন' কথাটা এক মুহূর্তে মধুসূদনের মনের ভিতরে গিয়ে লাগল। ঢেউয়ের উপর দিয়ে জাহাজ যখন টল্‌মল্‌ করতে করতে চলেছে, একটি ছোটো ডাঙার পাখি উড়ে এসে যেন মাস্তুলে বসল ; ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভিতর ক্ষণকালের জন্যে মনে এনে দিলে শ্যামল দ্বীপের নিভৃত বনচ্ছায়ার ছবি। কিন্তু সে কথায় মন দেবার সময় নয়, জাহাজ চালাতে হবে।

মধুসূদন আপন মনের এইটুকু চাঞ্চল্যে ভীত হল। তখনই সেটা দমন করে বললে, "বড়োবউকে শুতে যেতে বলো, আজ আমি বাইরে শোব।"

"তাঁকে না হয় এখানে ডেকে দিই" বলে নবীন গুড়গুড়ির কলকেটাতে ফুঁ দিতে লাগল।

মধুসূদন হঠাৎ ঝোঁকে উঠে বলে উঠল, "না না।"

নবীন তাতেও না দমে বললে, "তিনি যে তোমার কাছে দরবার করবেন বলে বসে আছেন।"

রুক্ষস্বরে মধুসূদন বললে, "এখন দরবারের সময় নেই।"

"তোমার তো সময় নেই দাদা, তাঁরও তো সময় কম।"

"কী, হয়েছে কী?"

"বিপ্রদাসবাবু আজ কলকাতায় এসেছেন খবর পাওয়া গেছে, তাই বউরানী কাল সকালে—"

"সকালে যেতে চান?"

"বেশিক্ষণের জন্যে না, একবার কেবল—"

মধুসূদন হাত ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বললে, "তা যান-না, যান। বাস্‌, আর নয়, তুমি যাও।"

হুকুম আদায় করেই নবীন ঘর থেকে এক দৌড়। বাইরে আসতেই মধুসূদনের ডাক কানে এসে পৌঁছোল, "নবীন।"

ভয় লাগল আবার বুঝি দাদা হুকুম ফিরিয়ে নেয়। ঘরে এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন বললে, "বড়োবউ এখন কিছুদিন তাঁর দাদার ওখানে গিয়েই থাকবেন, তুমি তার জোগাড় করে দিয়ো।"

নবীনের ভয় লাগল, দাদার এই প্রস্তাবে তার মুখে পাছে একটুও উৎসাহ প্রকাশ পায়। এমন-কি, সে একটু দ্বিধার ভাব দেখিয়ে মাথা চুলকোতে লাগল। বললে, "বউরানী গেলে বাড়িটা বড়ো খালি-খালি ঠেকবে।"

মধুসূদন কোনো উত্তর না করে গুড়গুড়ির নলটা নামিয়ে রেখে কাজে লেগে গেল। বুঝতে পারলে প্রলোভনের রাস্তা এখনও খোলা আছে— ওদিকে একেবারেই না।

নবীন আনন্দিত হয়ে চলে গেল। মধুসূদনের কাজ চলতে লাগল। কিন্তু কখন এই কাজের ধারার পাশ দিয়ে আর-একটা উলটো মানস-ধারা খুলে গেছে তা সে অনেকক্ষণ নিজেই বুঝতে পারে নি। এক সময়ে নীল পেনসিল প্রয়োজন শেষ না হতেই ছুটি নিল, গুড়গুড়ির নলটা উঠল মুখে। দিনের বেলায় মধুসূদনের মনটা কুমুর ভাবনা সম্বন্ধে যখন সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নিয়েছিল, তখন আগেকার দিনের মতো নিজের 'পরে নিজের একাধিপত্য ফিরে পেয়ে মধুসূদন খুব আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু যত রাত হচ্ছে ততই সন্দেহ হতে লাগল যে, শত্রু-দুর্গ ছেড়ে পালায় নি। সুড়ঙ্গের ঘরে আছে গা ঢাকা দিয়ে।

বৃষ্টি থেমে গেছে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বাগানের কোণে এক প্রাচীন সিসু গাছের উপরে আকাশে উঠে আর্দ্র পৃথিবীকে বিহ্বল করে দিয়েছে। হাওয়াটা ঠাণ্ডা, মধুসূদনের দেহটা বিছানার ভিতরে একটা গরম কোমল স্পর্শের জন্যে দাবি জানাতে আরম্ভ করেছে। নীল পেনসিলটা চেপে ধরে খাতাপত্রের উপর সে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু মনের গভীর আকাশে একটা কথা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট আওয়াজে বাজছে, 'বউরানী হয়তো এতক্ষণ জেগে বসে আছেন।'

মধুসূদন পণ করেছিল, একটা বিশেষ কাজ আজ রাত্রের মধ্যেই শেষ করে রাখবে। সেটা কাল সকালের মধ্যে সারতে পারলে যে খুব বেশি অসুবিধা হত তা নয়। কিন্তু পণ রক্ষা করা ওর ব্যবসায়ের ধর্মনীতি। তার থেকে কোনো কারণে যদি ভ্রষ্ট হয় তবে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। এতদিন ধর্মকে খুব কঠিনভাবেই রক্ষা করেছে। তার পুরস্কারও পেয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু ইদানীং দিনের মধুসূদনের সঙ্গে রাত্রের মধুসূদনের সুরের কিছু কিছু তফাত ঘটে আসছে— এক বীণায় দুই তারের মতো। যে দৃঢ় পণ করে ডেস্কের উপর ও ঝুঁকে পড়ে বসেছিল— রাত্রি যখন গভীর হয়ে এল, সেই পণের কোন্ একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে একটা উক্তি ভ্রমরের মতো ভন্ ভন্ করতে শুরু করলে, 'বউরানী হয়তো জেগে বসে আছেন।'

উঠে পড়ল। বাতি না নিভিয়ে খাতাপত্র যেমন ছিল তেমনি ভাবেই রেখে চলল শোবার ঘরের দিকে। অন্তঃপুরের আঙিনা-ঘেরা যে বারান্দা দিয়ে তেতালার ঘরে যেতে হয় সেই বারান্দায় রেলিঙের ধারে শ্যামাসুন্দরী মেজের উপর বসে। চাঁদ তখন মধ্য-আকাশে, তার আলো এসে তাকে ঘিরেছে। তাকে দেখাচ্ছে যেন কোন্ এক গল্পের বইয়ের ছবির মতো। অর্থাৎ সে যেন প্রতিদিনের মানুষ নয়, অতিনিকটের অতিপরিচয়ের কঠোর আবরণ থেকে যেন একটা দূরত্বের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে। সে জানত মধুসূদন এই পথ দিয়েই শোবার ঘরে যায়— সেই যাওয়ার দৃশ্যটা ওর কাছে অতি তীব্র বেদনার, সেইজন্যেই তার আকর্ষণটা এত প্রবল। কিন্তু শুধু হৃদয়টাকে ব্যর্থ বেদনায় বিদ্ধ করবার পাগলামিই যে এই প্রতীক্ষার মধ্যে আছে তা নয়, এর মধ্যে একটা প্রত্যাশাও আছে— যদি ক্ষণকালের মধ্যে একটা কিছু ঘটে যায়; অসম্ভব কখন সম্ভব হয়ে যাবে এই আশায় পথের ধারে জেগে থাকা।

মধুসূদন ওর দিকে একবার কটাক্ষ করে উপরে চলে গেল। শ্যামাসুন্দরী নিজের ভাগ্যের উপর রাগ করে রেলিং শক্ত করে ধরে তার উপরে মাথা ঠুকতে লাগল।

শোবার ঘরে গিয়ে মধুসূদন দেখে যে কুমু জেগে বসে নেই। ঘর অন্ধকার,

নাবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে অল্প একটু আলো আসছে। মধুসূদন একবার ভাবল ফিরে চলে যাই, কিন্তু পারল না। গ্যাসের আলোটা জ্বালিয়ে দিলে। কুমু বিছানার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে— আলো জ্বালাতেও ঘুম ভাঙল না। কুমুর এই আরামে ঘুমোনোর উপর ওর রাগ ধরল। অধৈর্যের সঙ্গে মশারি খুলে ধপ্ করে বিছানার উপর বসে পড়ল। খাটটা শব্দ করে কেঁপে উঠল।

কুমু চমকে উঠে বসল। আজ মধুসূদন আসবে না বলেই জানত। হঠাৎ তাকে দেখে মুখে এমন একটা ভাব এল যে, তাই দেখে মধুসূদনের বুকের ভিতর দিয়ে যেন একটা শেল বিঁধল। মাথায় রক্ত চড়ে গেল, বলে উঠল, "আমাকে কোনোমতেই সইতে পারছ না, না?"

এমনতরো প্রশ্নের কী উত্তর দেবে কুমু তা ভেবেই পেলে না। সত্যিই হঠাৎ মধুসূদনকে দেখে ওর বুক কেঁপে উঠেছিল আতঙ্কে। তখন ওর মনটা সতর্ক ছিল না। যে ভাবটাকে ও নিজের কাছেও সর্বদা চেপে রাখতে চায়, যার প্রবলতা নিজেও কুমু সম্পূর্ণ জানে না সে তখন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মধুসূদন চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, "দাদার কাছে যাবার জন্যে তোমার দরবার?"

কুমু এই মুহূর্তেই ওর পায়ে পড়তে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু ওর মুখে দাদার নাম শুনেই শক্ত হয়ে উঠল। বললে, "না।"

"তুমি যেতে চাও না?"

"না, আমি চাই নে।"

"নবীনকে আমার কাছে দরবার করতে পাঠাও নি?"

"না, পাঠাই নি।"

"দাদার কাছে যাবার ইচ্ছে তাকে তুমি জানাও নি?"

"আমি তাঁকে বলেছিলুম, দাদাকে দেখতে আমি যাব না।"

"কেন?"

"তা আমি বলতে পারি নে।"

"বলতে পার না? আবার তোমার সেই নুরনগরি চাল?"

"আমি যে নুরনগরেরই মেয়ে।"

"যাও, তাদের কাছেই যাও। যোগ্য নও তুমি এখানকার। অনুগ্রহ করেছিলেম, মর্যাদা বুঝলে না। এখন অনুতাপ করতে হবে।"

কুমু কাঠ হয়ে বসে রইল, কোনো উত্তর করলে না। কুমুর হাত ধরে অসহ একটা ঝাঁকানি দিয়ে মধুসূদন বললে, "মাপ চাইতেও জান না?"

"কিসের জন্মে ?"

"তুমি যে আমার এ বিছানার উপরে শুতে পেরেছ তার জন্মে।"

কুমু তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

মধুসূদন বাইরের ঘরে যাবার পথে দেখলে শ্যামাসুন্দরী সেই বারান্দায় উপুড় হয়ে পড়ে। মধুসূদন পাশে এসে নিচু হয়ে তার হাত ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করে বললে, "কী করছ, শ্যামা ?" অমনি শ্যামা উঠে বসে মধুসূদনের দুই পা বুকে জড়িয়ে ধরলে, গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে, "আমাকে মেরে ফেলো তুমি।"

মধুসূদন তাকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করালে, বললে, "ইস্‌, তোমার গা যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। চলো তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি গে।" বলে তাকে নিজের শালের এক অংশে আবৃত করে ডান হাত দিয়ে সবলে চেপে ধরে শোবার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। শ্যামা চুপি চুপি বললে, "একটু বসবে না ?"

মধুসূদন বললে, "কাজ আছে।"

রাতের বেলা কোথা থেকে ভূত চেপে এতক্ষণ মধুসূদনের কাজ নষ্ট করে দেবার জোগাড় করেছে— আর নয়। কুমুর কাছ থেকে যে উপেক্ষা পেয়েছে তার ক্ষতি-পূরণের ভাণ্ডার অন্য কোথাও জমা আছে এটুকু সে বুঝে নিলে। ভালোবাসার ভিতর দিয়ে মানুষ আপনার যে পরম মূল্য উপলব্ধি করে, আজ রাত্রে সেই অনুভব করবার প্রয়োজন মধুসূদনের ছিল। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত জীবনমন দিয়ে ওর জন্মে অপেক্ষা করে আছে, সেই আশ্বাসটুকু পেয়ে মধুসূদন আজ রাত্রে কাজের জোর পেলে, যে অমর্যাদার কাঁটা ওর মনের মধ্যে বিঁধে আছে তার বেদনা অনেকটা কমিয়ে দিলে।

এদিকে রাত্রে কুমু যে ধাক্কা পেলে তার মধ্যে ওর একটা সান্ত্বনা ছিল। যতবার মধুসূদন তাকে ভালোবাসা দেখিয়েছে, ততবারই কুমুর মনে একটা টানাটানি এসেছে ; ভালোবাসার মূল্যেই এর প্রতিশোধ করা চাই এই কর্তব্যবোধে ওকে অত্যন্ত অস্থির করেছে। এ লড়াইয়ে কুমুর জেতবার কোনো আশা ছিল না। কিন্তু পরাভবটা কুশ্রী, সেটাকে কেবলই চাপা দেবার জন্মে এতদিন কুমু প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। কাল রাত্রে সেই চাপা-দেওয়া পরাভবটা এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেল। কুমুর অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে যে কুমুর সমস্ত প্রকৃতি মধুসূদনের প্রকৃতির বিরুদ্ধ ; এইটে নিশ্চিত জানা হয়ে গেল সে ভালো, তার পরে পরস্পরের যা কর্তব্য সেটা অকপটভাবে করা সম্ভব হবে। মধুসূদন ওকে কামনা করে, সেইখানেই সমস্যা ; ক্ষোভের সঙ্গে ওকে যে বর্জন করতে চায় সেইখানেই সত্য। সত্যই মধুসূদনের

বিছানায় শোবার অধিকার ওর নেই। শুয়ে ও কেবলই ফাঁকি দিচ্ছে। এ বাড়িতে ওর যে পদ সেটা বিড়ম্বনা।

আজ রাত্রে এই একটা প্রশ্ন বারবার কুমুর মনে উঠেছে— কুমুকে নিয়ে মধুসূদনের কেন এত নির্বন্ধ? ও তো কথায় কথায় নুরনগরি চালের প্রসঙ্গ তুলে কুমুকে খোঁটা দেয়, তার মানে কুমুর সঙ্গে ওদের একেবারে ধাতের তফাত, জাতের তফাত, কিন্তু মধুসূদন কেন তবে ওকে ভালোবাসা জানায়? একি কখনও সত্য ভালোবাসা হতে পারে? কুমুর নিশ্চয় বিশ্বাস, আজ মধুসূদন যাই মনে করুক না কেন, কুমুকে দিয়ে কখনোই ওর মন ভরতে পারে না। যত শীঘ্র মধুসূদন তা বোঝে ততই সকল পক্ষের মঙ্গল।

নবীন কাল রাত্রে দাদার কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে যত আনন্দ করে শুতে গেল, আজ সকালে তার আর বড়ো-কিছু বাকি রইল না। কাল রাত্রি তখন আড়াইটা। মধুসূদন কাজ শেষ করে তখনই নবীনকে ডেকে পাঠিয়েছিল। হুকুম, এই যে, কুমুদিনীকে বিপ্রদাসের ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যতদিন মধুসূদন না আপনি ডেকে পাঠায় ততদিন ফিরে আসবার দরকার নেই। নবীন বুঝলে এটা নির্বাসনদণ্ড।

আঙিনা-ঘেরা চৌকো বারান্দার যে অংশে কাল রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার সাক্ষাৎ হয়েছিল, ঠিক তার বিপরীত দিকের বারান্দার সংলগ্ন নবীনের শোবার ঘর। তখন ওরা স্বামীস্ত্রী কুমুর সম্বন্ধেই আলোচনা করছিল। এমন সময় গলার শব্দ শুনে মোতির মা ঘরের দরজা খুলতেই জ্যোৎস্নার আলোতে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার মিলনের ছবি দেখতে পেলে। বুঝতে পারলে কুমুর ভাগ্যের জালে এই রাত্রে নিঃশব্দে আর-একটা শক্ত গিঁঠ পড়ল।

নবীনকে মোতির মা বললে, "ঠিক এই সংকটের সময় কি দিদির চলে যাওয়া ভালো হচ্ছে?"

নবীন বললে, "এতদিন তো বউরানী ছিলেন না, কাণ্ডটা তো এতদূর কখনোই এগোয় নি। বউরানী আছেন বলেই এটা ঘটেছে।"

"কী বল তুমি!"

"বউরানী যে ঘুমন্ত ক্ষুধাকে জাগিয়েছেন তার অন্ন জোগাতে পারেন নি, তাই সে অনর্থপাত করতে বসেছে। আমি তো বলি এই সময়টায় ওর দূরে থাকাই ভালো, তাতে আর-কিছু না হোক অন্তত উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন।"

"তবে এটা কি এমনি ভাবেই চলবে?"

"যে আগুন নেবাবার কোনো উপায় নেই, সেটাকে আপনি জ্বলে ছাই হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে হবে।"

পরদিন সকালে হাবলু সমস্তক্ষণ কুমুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরলে। গুরুমশায় যখন পড়ার জন্যে ওকে বাইরে ডেকে পাঠালে, ও কুমুর মুখের দিকে চাইলে। কুমু যদি যেতে বলত তো ও যেত, কিন্তু কুমু বেহারাকে বলে দিলে আজ হাবলুর ছুটি।

বধূ কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি যাচ্ছে সেই সুরটি আজ কুমুর যাত্রার সময় লাগল না। এ বাড়ি যেন ওকে আজ হারাতে বসেছে। যে পাখিকে খাঁচায় বন্দী করা হয়েছিল, আজ যেন দরজা একটু ফাঁক করতেই সে উড়ে পড়ল, আর যেন এ খাঁচায় সে ঢুকবে না।

নবীন বললে, "বউরানী, ফিরে আসতে দেরি কোরো না এই কথাটা সব মন দিয়ে বলতে পারলে বেঁচে যেতুম, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোল না। যাদের কাছে তোমার যথার্থ সম্মান সেইখানেই তুমি থাকো গে। কোনো কালে নবীনকে যদি কোনো কারণে দরকার হয় স্মরণ কোরো।"

মোতির মা নিজের হাতে তৈরি আমসত্ত্ব আচার প্রভৃতি একটা হাঁড়িতে সাজিয়ে পালকিতে তুলে দিলে। বিশেষ কিছু বললে না। কিন্তু মনে তার বেশ একটু আপত্তি ছিল। যতদিন বাধা ছিল স্থূল, যতদিন মধুসূদন কুমুকে বাহির থেকে অপমান করেছে, মোতির মার সমস্ত মন ততদিন ছিল কুমুর পক্ষে; কিন্তু যে বাধা সূক্ষ্ম, যা মর্মগত, বিশ্লেষণ করে যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন, তারই শক্তি যে প্রবলতম, এ কথাটা মোতির মার কাছে সহজ নয়। স্বামী যে মুহূর্তে প্রসন্ন হবে সেই মুহূর্তে অবিলম্বে স্ত্রী সেটাকে সৌভাগ্য বলে গণ্য করবে, মোতির মা, এইটেকেই স্বাভাবিক বলে জানে। এর ব্যতিক্রমকে সে বাড়াবাড়ি মনে করে। এমন-কি, এখনও যে বউরানী সম্বন্ধে নবীনের দরদ আছে, এটাতে তার রাগ হয়। কুমুর প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা যে একান্ত অকৃত্রিম, এটা যে অহংকার নয়, এমন-কি এইটে নিয়ে যে কুমুর নিজের সঙ্গে নিজের দুর্জয় বিরোধ, সাধারণত মেয়েদের পক্ষে এটা স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। যে চীনে মেয়ে প্রথার অনুসরণে নিজের পা বিকৃত করতে আপত্তি করে নি, সে যদি শোনে জগতে এমন মেয়ে আছে যে আপনার এই পদসংকোচ-পীড়নকে স্বীকার করা অপমানজনক বলে মনে করে তবে নিশ্চয় সেই কুণ্ঠাকে সে হেসে উড়িয়ে দেয়, নিশ্চয় বলে ওটা ন্যাকামি। যেটা নিগূঢ়ভাবে স্বাভাবিক, সেইটেকেই সে জানে অস্বাভাবিক। মোতির মা একদিন কুমুর দুঃখে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিল, বোধ করি সেইজন্যই আজ

তার মন এত কঠিন হতে আরম্ভ করেছে। প্রতিকূল ভাগ্য যখন বরদান করতে আসে, তখন তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে যে মেয়ে অবিলম্বে সে বর গ্রহণ করতে না পারে, তাকে মমতা করা মোতির মার পক্ষে অসম্ভব— এমন-কি মার্জনা করাও।

৪৬

বাড়ির সামনে আসতেই পালকির দরজা একটু ফাঁক করে কুমু উপরের দিকে চেয়ে দেখলে। রোজ এই সময়টা বিপ্রদাস রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ত, আজ দেখলে সেখানে কেউ নেই। আজ যে কুমু এখানে আসবে সে খবর এ বাড়িতে পাঠানো হয় নি। পালকির সঙ্গে মহারাজার তকমা-পরা দরোয়ানকে দেখে এ বাড়ির দরোয়ান ব্যস্ত হয়ে উঠল, বুঝলে যে দিদিঠাকরুন এসেছে। বা'র-বাড়ির আঙিনা পার হয়ে অন্তঃপুরের দিকে পালকি চলেছিল। কুমু থামিয়ে দ্রুতপদে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে চলল। তার ইচ্ছে তাকে আর কেউ দেখবার আগে সব প্রথমেই দাদার সঙ্গে তার দেখা হয়। নিশ্চয় সে জানত, বাইরের আরাম-কামরাতেই রোগীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে জানলা থেকে বাগানের কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন ও অশথ গাছের একটি কুঞ্জসভা দেখতে পাওয়া যায়। সকালের রোদ্দুর ডালপালার ভিতর দিয়ে এই ঘরেই প্রথম দেখা দেয়। এই ঘরটিই বিপ্রদাসের পছন্দ।

কুমু সিঁড়ির কাছে আসতেই সর্বাগ্রে টম কুকুর ছুটে এসে ওর গায়ের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে লেজ ঝাপ্‌টিয়ে অস্থির করে দিলে। কুমুর সঙ্গে সঙ্গেই লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে চেঁচাতে টম চলল। বিপ্রদাস একটা মুড়ে-তোলা কৌচের পিঠে হেলান দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায়, পায়ের উপর একটা ছিটের বালাপোশ টানা ; একখানা বই নিয়ে ডান হাতটা বিছানার উপর এলিয়ে আছে, যেন ক্লান্ত হয়ে একটু আগে পড়া বন্ধ করেছে। চায়ের পেয়ালা আর ভুক্তাবশিষ্ট রুটি-সমেত একটা পিরিচ পাশে মেজের উপরে পড়ে। শিয়রের কাছে দেয়ালের গায়ের শেলফে বইগুলো উলটপালট এলোমেলো। রাত্রে যে ল্যাম্প জ্বলেছিল সেটা ধোঁয়ায় দাগি অবস্থায় ঘরের কোণে এখনও পড়ে আছে।

কুমু বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। ওর এমন বিবর্ণ রুগ্ন মূর্তি কখনও দেখে নি। সেই বিপ্রদাসের সঙ্গে এই বিপ্রদাসের যেন কত যুগের তফাত! দাদার পায়ের তলায় মাথা রেখে কুমু কাঁদতে লাগল।

"কুমু যে, এসেছিস? আয় এইখানে আয়।" বলে বিপ্রদাস তাকে পাশে টেনে নিয়ে এল। যদিও চিঠিতে বিপ্রদাস তাকে আসতে একরকম বারণ করেছিল, তবু তার মনে আশা ছিল যে কুমু আসবে। আসতে পেরেছে দেখে ওর মনে হল, তবে হয়তো কোনো বাধা নেই— তবে কুমুর পক্ষে তার ঘরকন্না সহজ হয়ে গেছে। এদের পক্ষ থেকেই কুমুকে আনবার জন্যে প্রস্তাব, পালকি ও লোক পাঠানোই নিয়ম— কিন্তু তা না হওয়া সত্ত্বেও কুমু এল, এটাতে ওর যতটা স্বাধীনতা কল্পনা করে নিলে ততটা মধুসূদনের ঘরে বিপ্রদাস একেবারেই প্রত্যাশা করে নি।

কুমু তার দুই হাত দিয়ে বিপ্রদাসের আলুথালু চুল একটু পরিপাটি করতে করতে বললে, "দাদা, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে!"

"আমার চেহারা ভালো হবার মতো ইদানীং তো কোনো ঘটনা ঘটে নি— কিন্তু তোর এ কী রকম শ্রী! ফ্যাকাশে হয়ে গেছিস যে।"

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ক্ষেমা পিসি এসে উপস্থিত। সেই সঙ্গে দরজার কাছে একদল দাসী চাকর ভিড় করে জমা হল। ক্ষেমা পিসিকে প্রণাম করতেই পিসি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলে। দাসদাসীরা এসে প্রণাম করলে। সকলের সঙ্গে কুশলসম্ভাষণ হয়ে গেলে পর কুমু বললে, "পিসি, দাদার চেহারা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে।"

"সাধে হয়েছে! তোমার হাতের সেবা না পেলে ওর দেহ যে কিছুতেই ভালো হতে চায় না। কতদিনের অভ্যেস!"

বিপ্রদাস বললে, "পিসি, কুমুকে খেতে বলবে না?"

"খাবে না তো কী! সেও কি বলতে হবে? ওদের পালকির বেহারা-দরোয়ান সবাইকে বসিয়ে এসেছি, তাদের খাইয়ে দিয়ে আসি গে। তোমরা দুজনে এখন গল্প করো, আমি চললুম।"

বিপ্রদাস ক্ষেমা পিসিকে ইশারা করে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু বলে দিলে। কুমু বুঝলে ওদের বাড়ির লোকদের কী ভাবে বিদায় করতে হবে তারই পরামর্শ। এই পরামর্শের মধ্যে কুমু আজ অপর পক্ষ হয়ে উঠেছে। ওর কোনো মত নেই। এটা ওর একটুও ভালো লাগল না। কুমুও তার শোধ তুলতে বসল। এ বাড়িতে তার চিরকালের স্থান ফিরে দখলের কাজ শুরু করে দিলে।

প্রথমত, দাদার খানসামা গোকুলকে ফিস্ ফিস্ করে কী একটা হুকুম করলে, তার পরে লাগল নিজের মনের মতো করে ঘর গোছাতে। বাইরের বারান্দায় সরিয়ে দিলে পিরিচ পেয়ালা, ল্যাম্প, খালি সোডা-ওআটারের বোতল, একখানা

বেত-ছেঁড়া চৌকি, গোটাকতক ময়লা তোয়ালে এবং গেঞ্জি। শেলফের উপর বইগুলো ঠিকমত সাজালে, দাদার হাতের কাছাকাছি একখানি টিপাই সরিয়ে এনে তার উপরে গুছিয়ে রাখলে পড়বার বই, কলমদান, ব্লটিংপ্যাড, খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাস, ছোটো একটি আয়না এবং চিরুনি-ব্রুশ।

ইতিমধ্যে গোকুল একটা পিতলের জগে গরম জল, একটা পিতলের চিলেমচি, আর সাফ তোয়ালে বেতের মোড়ার উপর এনে রাখলে। কিছুমাত্র সম্মতির অপেক্ষা না রেখে কুমু গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে বিপ্রদাসের মুখ-হাত মুছিয়ে দিয়ে তার চুল আঁচড়িয়ে দিলে, বিপ্রদাস শিশুর মতো চুপ করে সহ্য করল। কখন কী ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং পথ্যের নিয়ম কী সমস্ত জেনে নিয়ে এমন ভাবে গুছিয়ে বসল যেন ওর জীবনে আর কোথাও কোনো দায়িত্ব নেই।

বিপ্রদাস মনে মনে ভাবতে লাগল এর অর্থটা কী? ভেবেছিল, দেখা করতে এসেছে আবার চলে যাবে, কিন্তু সেরকম ভাব তো নয়। শ্বশুরবাড়িতে কুমুর সম্বন্ধটা কী রকম দাঁড়িয়েছে সেটা বিপ্রদাস জানতে চায়, কিন্তু স্পষ্ট করে প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করে। কুমুর নিজের মুখ থেকেই শুনবে এই আশা করে রইল। কেবল আস্তে আস্তে একবার জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তোকে কখন যেতে হবে?"

কুমু বললে, "আজ যেতে হবে না।"

বিপ্রদাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এতে তোর শ্বশুরবাড়িতে কোনো আপত্তি নেই?"

"না, আমার স্বামীর সম্মতি আছে।"

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। কুমু ঘরের কোণের টেবিলটাতে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর ওষুধের শিশি বোতল প্রভৃতি গুছিয়ে রাখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, "তোকে কি তবে কাল যেতে হবে?"

"না, এখন আমি কিছুদিন তোমার কাছে থাকব।"

টম কুকুরটা কৌচের নীচে শান্ত হয়ে নিদ্রার সাধনায় নিযুক্ত ছিল, কুমু তাকে আদর করে তার প্রীতি-উচ্ছ্বাসকে অসংযত করে তুললে। সে লাফিয়ে উঠে কুমুর কোলের উপরে দুই পা তুলে কলভাষায় উচ্চস্বরে আলাপ আরম্ভ করে দিলে। বিপ্রদাস বুঝতে পারলে কুমু হঠাৎ এই গোলমালটা সৃষ্টি করে তার পিছনে একটু আড়াল করলে আপনাকে।

খানিক বাদে কুকুরের সঙ্গে খেলা বন্ধ করে কুমু মুখ তুলে বললে, "দাদা, তোমার বার্লি খাবার সময় হয়েছে, এনে দিই।"

"না সময় হয় নি" বলে কুমুকে ইশারা করে বিছানার পাশের চৌকিতে বসালে। আপনার হাতে তার হাত তুলে নিয়ে বললে, "কুমু, আমার কাছে খুলে বল্, কী রকম চলছে তোদের।"

তখনই কুমু কিছু বলতে পারলে না। মাথা নিচু করে বসে রইল, দেখতে দেখতে মুখ হল লাল, শিশুকালের মতো করে বিপ্রদাসের প্রশস্ত বুকের উপর মুখ রেখে কেঁদে উঠল; বললে, "দাদা, আমি সবই ভুল বুঝেছি, আমি কিছুই জানতুম না।"

বিপ্রদাস আস্তে আস্তে কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। খানিক বাদে বললে, "আমি তোকে ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারি নি। মা থাকলে তোকে তোর শ্বশুরবাড়ির জন্যে প্রস্তুত করে দিতে পারতেন।"

কুমু বললে, "আমি বরাবর কেবল তোমাদেরই জানি, এখান থেকে অন্য জায়গা যে এত বেশি তফাত তা আমি মনে করতে পারতুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি যা-কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয় নি। মাকে অনেক সময়ে বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা, তার আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়। এখানে সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার যেন অপমান।"

বিপ্রদাস কোনো কথা না বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। মধুসূদন যে ওদের থেকে সম্পূর্ণ আর-এক জগতের মানুষ, তা সেই বিবাহ-অনুষ্ঠানের আরম্ভ থেকেই বুঝতে পেরেছে। তারই বিষম উদ্বেগে ওর শরীর যেন কোনোমতেই সুস্থ হয়ে উঠছে না। এই দিঙ্‌নাগের স্থূলহস্তাবলেপ থেকে কুমুকে উদ্ধার করবার তো কোনো উপায় নেই। সকলের চেয়ে মুশকিল এই যে, এই মানুষের কাছে ঋণে ওর সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা। এই অপমানিত সম্বন্ধের ধাক্কা যে কুমুকেও লাগছে। এতদিন রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে বিপ্রদাস কেবলই ভেবেছে মধুসূদনের এই ঋণের বন্ধন থেকে কেমন করে সে নিষ্কৃতি পাবে। ওর কলকাতায় আসবার ইচ্ছে ছিল না, পাছে কুমুর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওদের সহজ ব্যবহার অসম্ভব হয়। কুমুর উপর ওর যে স্বাভাবিক স্নেহের অধিকার আছে, পাছে তা পদে পদে লাঞ্ছিত হতে থাকে, তাই ঠিক করেছিল নুরনগরেই বাস করবে। কলকাতায় আসতে বাধ্য হয়েছে অন্য কোনো মহাজনের কাছ থেকে ধার নেবার ব্যবস্থা করবে বলে। জানে যে এটা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই এর দুশ্চিন্তার বোঝা ওর বুকের উপর চেপে বসে আছে।

খানিক বাদে কুমু বিপ্রদাসের থেকে অন্যদিকে ঘাড় একটু বেঁকিয়ে বললে, "আচ্ছা দাদা, স্বামীর 'পরে কোনোমতে মন প্রসন্ন করতে পারছি নে, এটা কি আমার পাপ ?"

"কুমু, তুই তো জানিস, পাপপুণ্য সম্বন্ধে আমার মতামত শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না।"

অন্যমনস্কভাবে কুমু একটা ছবিওআলা ইংরেজি মাসিক পত্রের পাতা ওলটাতে লাগল। বিপ্রদাস বললে, "ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবন তার ঘটনায় ও অবস্থায় এতই ভিন্ন হতে পারে যে, ভালোমন্দর সাধারণ নিয়ম অত্যন্ত পাকা করে বেঁধে দিলে অনেক সময়ে সেটা নিয়মই হয়, ধর্ম হয় না।"

কুমু মাসিক পত্রটার দিকে চোখ নিচু করে বললে, "যেমন মীরাবাইএর জীবন।"

নিজের মধ্যে কর্তব্য-অকর্তব্যের দ্বন্দ্ব যখনই কঠিন হয়ে উঠেছে, কুমু তখনই ভেবেছে মীরাবাইএর কথা। একান্ত মনে ইচ্ছা করেছে কেউ ওকে মীরাবাইএর আদর্শটা ভালো করে বুঝিয়ে দেয়।

কুমু একটু চেষ্টা করে সংকোচ কাটিয়ে বলতে লাগল, "মীরাবাই আপনার যথার্থ স্বামীকে অন্তরের মধ্যে পেয়েছিলেন বলেই সমাজের স্বামীকে মন থেকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু সংসারকে ছাড়বার সেই বড়ো অধিকার কি আমার আছে ?"

বিপ্রদাস বললে, "কুমু, তোর ঠাকুরকে তুই তো সমস্ত মন দিয়েই পেয়েছিস।"

"এক সময়ে তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু যখন সংকটে পড়লুম তখন দেখি প্রাণ আমার কেমন শুকিয়ে গেছে, এত চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতে তাঁকে যেন আমার কাছে সত্য করে তুলতে পারছি নে। আমার সবচেয়ে দুঃখ সেই।"

"কুমু, মনের মধ্যে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। কিছু ভয় করিস নে, রাত্তির মাঝে মাঝে আসে, দিন তা বলে তো মরে না। যা পেয়েছিস তোর প্রাণের সঙ্গে তা এক হয়ে গেছে।"

"সেই আশীর্বাদ করো, তাঁকে যেন না হারাই। নির্দয় তিনি দুঃখ দেন, নিজেকে দেবেন বলেই। দাদা, আমার জন্যে ভাবিয়ে আমি তোমাকে ক্লান্ত করছি।"

"কুমু, তোর শিশুকাল থেকে তোর জন্যে ভাবা যে আমার অভ্যেস। আজ যদি তোর কথা জানা বন্ধ হয়ে যায়, তোর জন্যে ভাবতে না পাই, তা হলে শূন্য ঠেকে। সেই শূন্যতা হাতড়াতে গিয়েই তো মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

কুমু বিপ্রদাসের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "আমার জন্যে তুমি কিন্তু

কিছু ভেবো না দাদা। আমাকে যিনি রক্ষা করবেন তিনি ভিতরেই আছেন, আমার বিপদ নেই।"

"আচ্ছা, থাক্ ও-সব কথা। তোকে যেমন গান শেখাতুম, ইচ্ছে করছে তেমনি করে আজ তোকে শেখাই।"

"ভাগ্যি শিখিয়েছিলে দাদা, ওতেই আমাকে বাঁচায়। কিন্তু আজ নয়, তুমি আগে একটু জোর পাও। আজ আমি বরঞ্চ তোমাকে একটা গান শোনাই।"

দাদার শিয়রের কাছে বসে কুমু আস্তে আস্তে গাইতে লাগল,

পিয়া ঘর আয়ে, সোহী পীতম পিয় প্যার রে।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
চরণকমল বলিহার রে।

বিপ্রদাস চোখ বুজে শুনতে লাগল। গাইতে গাইতে কুমুর দুই চক্ষু ভরে উঠল এক অপরূপ দর্শনে। ভিতরের আকাশ আলো হয়ে উঠল। প্রিয়তম ঘরে এসেছেন, চরণকমল বুকের মধ্যে ছুঁতে পাচ্ছে। অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠল অন্তরলোক, যেখানে মিলন ঘটে। গান গাইতে গাইতে ও সেইখানে পৌঁচেছে। 'চরণকমল বলিহার রে'— সমস্ত জীবন ভরে দিলে সেই চরণকমল, অন্ত নেই তার— সংসারে দুঃখ-অপমানের জায়গা রইল কোথায়! 'পিয়া ঘর আয়ে' তার বেশি আর কী চাই। এই গান কোনোদিন যদি শেষ না হয় তা হলে তো চিরকালের মতো রক্ষা পেয়ে গেল কুমু।

কিছু রুটি-টোস্ট আর এক পেয়ালা বার্লি গোকুল টিপাইএর উপর রেখে দিয়ে গেল। কুমু গান থামিয়ে বললে, "দাদা, কিছুদিন আগে মনে মনে গুরু খুঁজছিলুম, আমার দরকার কী? তুমি যে আমাকে গানের মন্ত্র দিয়েছ।"

"কুমু, আমাকে লজ্জা দিস নে। আমার মতো গুরু রাস্তায় ঘাটে মেলে, তারা অন্যকে যে মন্ত্র দেয় নিজে তার মানেই জানে না। কুমু, কতদিন এখানে থাকতে পারবি ঠিক করে বল্ দেখি?"

"যতদিন না ডাক পড়ে।"

"তুই এখানে আসতে চেয়েছিলি?"

"না, আমি চাই নি।"

"এর মানে কী?"

"মানের কথা ভেবে লাভ নেই দাদা। চেষ্টা করলেও বুঝতে পারব না। তোমার

কাছে আসতে পেরেছি এই যথেষ্ট। যতদিন থাকতে পারি সেই ভালো। দাদা, তোমার খাওয়া হচ্ছে না, খেয়ে নাও।"

চাকর এসে খবর দিলে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন। বিপ্রদাস একটু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, "ডেকে দাও।"

৪৭

কালু ঘরে ঢুকতেই কুমু তাকে প্রণাম করলে।

কালু বললে, "ছোটোখুকি, এসেছ? এইবার দাদার সেরে উঠতে দেরি হবে না।"

কুমুর চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। অশ্রু সামলে নিয়ে বললে, "দাদা, তোমার বার্লিতে নেবুর রস দেবে না?"

বিপ্রদাস উদাসীন ভাবে হাত ওল্‌টালে, অর্থাৎ না হলেই বা ক্ষতি কী? কুমু জানে বিপ্রদাস বার্লি খেতে ভালোবাসে না, তাই ও যখনই দাদাকে বার্লি খাইয়েছে বার্লিতে নেবুর রস এবং অল্প একটু গোলাপজল মিশিয়ে বরফ দিয়ে শরবতের মতো বানিয়ে দিত। সে আয়োজন আজ নেই, তবু বিপ্রদাস আপন ইচ্ছে কাউকে জানায়ও নি, যা পেয়েছে তাই বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেয়েছে।

বার্লি ঠিকমত তৈরি করে আনবার জন্যে কুমু চলে গেল।

বিপ্রদাস উদ্বিগ্নমুখে জিজ্ঞাসা করলে, "কালুদা, খবর কী বলো।"

"তোমার একলার সইয়ে টাকা ধার দিতে কেউ রাজি হয় না, সুবোধের সই চায়। মাড়োয়ারি ধনীদের কেউ কেউ দিতে পারে, কিন্তু সেটা নিতান্ত বাজিখেলার মতো করে— অত্যন্ত বেশি সুদে চায়, সে আমাদের পোষাবে না।"

"কালুদা, সুবোধকে তার করতে হবে আসবার জন্যে। আর দেরি করলে তো চলবে না।"

"আমারও ভালো ঠেকছে না। সেবারে তোমার সেই আংটি-বেচা টাকা নিয়ে যখন মূল দেনার এক অংশ শোধ করতে গেলুম, মধুসূদন নিতে রাজিই হল না; তখনই বুঝলুম সুবিধে নয়। নিজের মর্জিমত একদিন হঠাৎ কখন ফাঁস এঁটে ধরবে।"

বিপ্রদাস চুপ করে ভাবতে লাগল।

কালু বললে, "দাদা, ছোটোখুকি যে হঠাৎ আজ সকালে চলে এল, রাগারাগি করে

আসে নি তো? মধুসূদনকে চটাবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, এটা মনে রাখতে হবে।"

"কুমু বলছে ওর স্বামীর সম্মতি পেয়েছে।"

"সম্মতিটার চেহারা কী রকম না জানলে মন নিশ্চিন্ত হচ্ছে না। কত সাবধানে ওর সঙ্গে ব্যবহার করি সে আর তোমাকে কী বলব দাদা। রাগে সর্ব অঙ্গ যখন জ্বলছে তখনও ঠাণ্ডা হয়ে সব সয়েছি, গৌরীশংকরের পাহাড়টার মতো দুপুর-রোদ্দুরেও তার বরফ গলে না। একে মহাজন তাতে ভগ্নীপতি, একে সামলে চলা কি সোজা কথা!"

বিপ্রদাস কোনো জবাব না করে চুপ করে ভাবতে লাগল।

কুমু এল বার্লি নিয়ে। বিপ্রদাসের মুখের কাছে পেয়ালা ধরে বললে, "দাদা, খেয়ে নাও।"

বিপ্রদাস তার ভাবনা থেকে হঠাৎ চমকে উঠল। কুমু বুঝতে পারলে, গভীর একটা উদ্বেগের মধ্যে দাদা এতক্ষণ ডুবে ছিল।

কালু যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুমু তার পিছন পিছন গিয়ে বারান্দায় ওকে ধরে বললে, "কালুদা, আমাকে সব কথা বলতে হবে।"

"কী কথা বলতে হবে দিদি?"

"তোমাদের কী একটা নিয়ে ভাবনা চলছে।"

"বিষয় আছে ভাবনা নেই, সংসারে এও কি কখনও সম্ভব হয় খুকি? ও যে কাঁটাগাছের ফল, খিদের চোটে পেড়ে খেতেও হয়, পাড়তে গিয়ে সর্বাঙ্গ ছড়েও যায়।"

"সে-সব কথা পরে হবে, আমাকে বলো কী হয়েছে।"

"বিষয়কর্মের কথা মেয়েদের বলতে নিষেধ।"

"আমি নিশ্চয় জানি তোমাদের কী নিয়ে কথা হচ্ছে। বলব?"

"আচ্ছা, বলো।"

"আমার স্বামীর কাছে দাদার ধার আছে, সেই নিয়ে।"

কোনো জবাব না দিয়ে কালু তার বড়ো বড়ো দুই চোখ সকৌতুক বিস্ময়হাস্যে বিস্ফারিত করে কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমাকে বলতেই হবে, ঠিক বলেছি কি না।"

"দাদারই বোন তো, কথা না বলতেই কথা বুঝে নেয়।"

বিয়ের পরে প্রথম যেদিন বিপ্রদাসের মহাজন বলে মধুসূদন আস্ফালন করে শাসিয়ে কথা বলেছিল, সেইদিন থেকেই কুমু বুঝেছিল দাদার সঙ্গে স্বামীর সম্বন্ধের

অগৌরব। প্রতিদিনই একান্তমনে ইচ্ছে করেছিল এটা যেন ঘুচে যায়। বিপ্রদাসের মনে এর অসম্মান যে বিঁধে আছে তাতে কুমুর সন্দেহ ছিল না। সেদিন নবীন যেই বিপ্রদাসের চিঠির ব্যাখ্যা করলে, অমনি কুমুর মনে এল সমস্তর মূলে আছে এই দেনাপাওনার সম্বন্ধ। দাদার শরীর কেন যে এত ক্লান্ত, কোন্ কাজের বিশেষ তাগিদে দাদা কলকাতায় চলে এসেছে, কুমু সমস্তই স্পষ্ট বুঝতে পারলে।

"কালুদা, আমার কাছে লুকিয়ো না, দাদা টাকা ধার করতে এসেছে।"

"তা, ধার করেই তো ধার শুধতে হবে; টাকা তো আকাশ থেকে পড়ে না। কুটুম্বদের খাতক হয়ে থাকাটা তো ভালো নয়।"

"সে তো ঠিক কথা, তা টাকার জোগাড় করতে পেরেছ?"

"ঘুরে ঘেরে দেখছি, হয়ে যাবে, ভয় কী।"

"না, আমি জানি, সুবিধে করতে পার নি।"

"আচ্ছা ছোটোখুকি, সবই যদি জান, আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? ছেলেবেলায় একদিন আমার গোঁফ টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলে, গোঁফ হল কেমন করে? বলেছিলুম, সময় বুঝে গোঁফের বীজ বুনেছিলুম বলে। তাতেই প্রশ্নটার তখনই নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এখন হলে জবাব দেবার জন্যে ডাক্তার ডাকতে হত। সব কথাই যে তোমাকে স্পষ্ট করে জানাতে হবে সংসারের এমন নিয়ম নয়।"

"আমি তোমাকে বলে রাখছি কালুদা, দাদার সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানতে হবে।"

"কী করে দাদার গোঁফ উঠল, তাও?"

"দেখো, অমন করে কথা চাপা দিতে পারবে না। আমি দাদার মুখ দেখেই বুঝেছি টাকার সুবিধে করতে পার নি।"

"নাই যদি পেরে থাকি, সেটা জেনে তোমার লাভ হবে কী?"

"সে আমি বলতে পারি নে, কিন্তু আমাকে জানতেই হবে। টাকা ধার পাও নি তুমি?"

"না, পাই নি।"

"সহজে পাবে না?"

"পাব নিশ্চয়ই, কিন্তু সহজে নয়। তা দিদি, তোমার কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে পাবার চেষ্টায় বেরোলে কাজ হয়তো কিছু এগোতে পারে। আমি চললুম।"

খানিকটা গিয়েই আবার ফিরে এসে কালু বললে, "খুকি, এখানে যে তুমি আজ চলে এলে, তার মধ্যে তো কোনো কাঁটা খোঁচা নেই? ঠিক সত্যি করে বলো।"

"আছে কি না তা আমি খুব স্পষ্ট করে জানি নে।"

"স্বামীর সম্মতি পেয়েছ ?"

"না চাইতেই তিনি সম্মতি দিয়েছেন।"

"রাগ করে ?"

"তাও আমি ঠিক জানি নে ; বলেছেন, ডেকে পাঠাবার আগে আমার যাবার দরকার নেই।"

"সে কোনো কাজের কথা নয়, তার আগেই যেয়ো, নিজে থেকেই যেয়ো।"

"গেলে হুকুম মানা হবে না।"

"আচ্ছা, সে আমি দেখব।"

দাদা আজ এই যে বিষম বিপদে পড়েছে, এর সমস্ত অপরাধ কুমুর, এ কথা না মনে করে কুমু থাকতে পারল না। নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে, খুব কঠিন মার। শুনেছে এমন সন্ন্যাসী আছে যারা কণ্টকশয্যায় শুয়ে থাকে, ও সেইরকম করে শুতে রাজি, যদি তাতে কোনো ফল পায়। কোনো যোগী কোনো সিদ্ধপুরুষ যদি ওকে রাস্তা দেখিয়ে দেয় তা হলে চিরদিন তার কাছে বিকিয়ে থাকতে পারে। নিশ্চয়ই তেমন কেউ আছে, কিন্তু কোথায় তাকে পাওয়া যায়? যদি মেয়েমানুষ না হত তা হলে যা হয় একটা কিছু উপায় সে করতই। কিন্তু মেজদাদা কী করছেন ? একলা দাদার ঘাড়ে সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কোন্ প্রাণে ইংলণ্ডে বসে আছেন ?

কুমু ঘরে ঢুকে দেখে বিপ্রদাস কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বিছানায় পড়ে আছে। এমন করলে শরীর কি সারতে পারে! বিরুদ্ধ ভাগ্যের দুয়ারে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করে।

দাদার শিয়রের কাছে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কুমু বললে, "মেজদাদা কবে আসবেন ?"

"তা তো বলতে পারি নে।"

"তাঁকে আসতে লেখো-না।"

"কেন বল্ দেখি!"

"সংসারের সমস্ত দায় একলা তোমারই ঘাড়ে, এ তুমি বইবে কী করে ?"

"কারও-বা থাকে দাবি, কারও-বা থাকে দায় ; এই দুই নিয়ে সংসার। দায়টাকেই আমি আমার করেছি, এ আমি অন্যকে দেব কেন ?"

"আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম জোর করে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতুম।"

"তা হলেই তো বুঝতে পারছিস কুমু, দায় ঘাড়ে নেবার একটা লোভ আছে। তুই

নিজে নিতে পারছিস নে বলেই তোর মেজদাদাকে দিয়ে সাধ মেটাতে চাস। কেন আমিই বা কী অপরাধ করেছি।"

"দাদা, তুমি টাকা ধার করতে এসেছ?"

"কিসের থেকে বুঝলি?"

"তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি। আচ্ছা, আমি কি কিছুই করতে পারি নে?"

"কী করে বলো?"

"এই মনে করো, কোনো দলিলে সই করে। আমার সইয়ের কি কোনো দামই নেই?"

"খুবই দাম আছে; সে আমাদের কাছে, মহাজনের কাছে নয়।"

"তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বলো, আমি কী করতে পারি।"

"লক্ষ্মী হয়ে শান্ত হয়ে থাক্, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর্, মনে রাখিস সংসারে সেও একটা মস্ত কাজ। তুফানের মুখে নৌকো ঠিক রাখাও যেমন একটা কাজ, মাথা ঠিক রাখাও তেমনি। আমার এসরাজটা নিয়ে আয়, একটু বাজা।"

"দাদা, আমার বড়ো ইচ্ছে করছে একটা কিছু করি।"

"বাজানোটা বুঝি একটা কিছু নয়।"

"আমি চাই খুব একটা শক্ত কাজ।"

"দলিলে নাম সই করার চেয়ে এসরাজ বাজানো অনেক বেশি শক্ত। আন্ যন্ত্রটা।"

৪৮

একদিন মধুসূদনকে সকলেই যেমন ভয় করত, শ্যামাসুন্দরীরও ভয় ছিল তেমনি। ভিতরে ভিতরে মধুসূদন তার দিকে কখনও কখনও যেন টলেছে, শ্যামাসুন্দরী তা আন্দাজ করেছিল। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে যে ওর কাছে যাওয়া যায় তা ঠাহর করতে পারত না। হাতড়ে হাতড়ে মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছে, প্রত্যেকবার ফিরেছে ধাক্কা খেয়ে। মধুসূদন একনিষ্ঠ হয়ে ব্যাবসা গড়ে তুলছিল, কাঞ্চনের সাধনায় কামিনীকে সে অত্যন্তই তুচ্ছ করেছে, মেয়েরা সেইজন্যে ওকে অত্যন্তই ভয় করত। কিন্তু এই ভয়েরও একটা আকর্ষণ আছে। রুক্ষ রুক্ষ বক্ষ এবং সংকুচিত ব্যবহার নিয়েই শ্যামাসুন্দরী ঈষৎ একটা আবরণের আড়ালে মুগ্ধমনে মধুসূদনের কাছে কাছে ফিরেছে। এক একবার যখন অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিয়েছে, সেই সময়েই যথার্থ ভয়ের

কারণ ঘটেছে ; তার অনতিপরেই কিছুদিন ধরে বিপরীত দিক থেকে মধুসূদন প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে ওর জীবনে মেয়েরা একেবারেই হেয়। তাই এতকাল শ্যামাসুন্দরী নিজেকে খুবই সংযত করে রেখেছিল।

মধুসূদনের বিয়ের পর থেকে সে আর থাকতে পারছিল না। কুমুকে মধুসূদন যদি অন্য সাধারণ মেয়ের মতোই অবজ্ঞা করত, তা হলে সেটা একরকম সহ্য হত। কিন্তু শ্যামা যখন দেখলে রাশ আলগা দিয়ে মধুসূদনও কোনো মেয়েকে নিয়ে অন্ধবেগে মেতে উঠতে পারে, তখন সংযম রক্ষা তার পক্ষে আর সহজ রইল না। এ কয়দিন সাহস করে যখন তখন একটু একটু এগিয়ে আসছিল, দেখেছিল এগিয়ে আসা চলে। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প বাধা পেয়েছে কিন্তু সেও দেখলে কেটে যায়। মধুসূদনের দুর্বলতা ধরা পড়েছে, সেইজন্যেই শ্যামার নিজের মধ্যেও ধৈর্য বাঁধ মানতে আর পারে না। কুমু চলে আসবার আগের রাত্রে মধুসূদন শ্যামাকে যত কাছে টেনেছিল এমন তো আর কখনোই হয় নি। তার পরেই ওর ভয় হল পাছে উলটো ধাক্কাটা জোরে এসে লাগে। কিন্তু এটুকু শ্যামা বুঝে নিয়েছে যে, ভীরুতা যদি না করে তবে ভয়ের কারণ আপনি কেটে যাবে।

সকালেই মধুসূদন বেরিয়ে গিয়েছিল, বেলা একটা পেরিয়ে বাড়ি এসেছে। ইদানীং অনেক কাল ধরে ওর স্নানাহারের নিয়মের এমন ব্যতিক্রম ঘটে নি। আজ বড়োই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বাড়িতে যেই এল, প্রথম কথাই মনে হল, কুমু তার দাদার ওখানে চলে গেছে এবং খুশি হয়েই চলে গেছে। এতকাল মধুসূদন আপনাতে আপনি খাড়া ছিল, কখন এক সময়ে ঢিল দিয়েছে, শরীরমনের আতুরতার সময় কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আশ্রয় করবার সুপ্ত ইচ্ছা ওর মনে উঠেছে জেগে, সেইজন্যেই অনায়াসে কুমুর চলে যাওয়াতে ওর এমন ধিক্‌কার লাগল। আজ ওর খাবার সময়ে শ্যামাসুন্দরী ইচ্ছা করেই কাছে এসে বসে নি ; কী জানি কাল রাত্রে নিজেকে ধরা দেবার পরে মধুসূদন নিজের উপর পাছে বিরক্ত হয়ে থাকে। খাবার পর মধুসূদন শূন্য শোবার ঘরে এসে একটুখানি চুপ করে থাকল, তার পরে নিজেই শ্যামাকে ডেকে পাঠালে। শ্যামা লাল রঙের একটা বিলিতি শাল গায়ে দিয়ে যেন একটু সংকুচিতভাবে ঘরে ঢুকে একধারে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। মধুসূদন ডাকলে, "এসো, এইখানে এসো, বসো।"

শ্যামা শিয়রের কাছে বসে "তোমাকে যে বড়ো রোগা দেখাচ্ছে আজ" বলে একটু ঝুঁকে পড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মধুসূদন বললে, "আঃ, তোমার হাত বেশ ঠাণ্ডা।"

রাত্রে মধুসূদন যখন শুতে এল শ্যামাসুন্দরী অনাহূত ঘরে ঢুকে বললে, "আহা, তুমি একলা।"

শ্যামাসুন্দরী একটু যেন স্পর্ধার সঙ্গেই কোনো আর আবরণ রাখতে দিলে না। যেন অসংকোচে সবাইকে সাক্ষী রেখেই ও আপনার অধিকার পাকা করে তুলতে চায়। সময় বেশি নেই, কবে আবার কুমু এসে পড়বে, তার মধ্যে দখল সম্পূর্ণ হওয়া চাই। দখলটা প্রকাশ্য হলে তার জোর আছে, কোনোখানে লজ্জা রাখলে চলবে না। অবস্থাটা দেখতে দেখতে দাসীচাকরদের মধ্যেও জানাজানি হল। মধুসূদনের মনে বহুকালের প্রবৃত্তির আগুন যতবড়ো জোরে চাপা ছিল, ততবড়ো জোরেই তা অবারিত হল, কাউকে কেয়ার করলে না, মত্ততা খুব স্থূলভাবেই সংসারে প্রকাশ করে দিলে।

নবীন মোতির মা দুজনেই বুঝলে এ বান আর ঠেকানো যাবে না।

"দিদিকে কি ডেকে আনবে না? আর কি দেরি করা ভালো?"

"সেই কথাই তো ভাবছি। দাদার হুকুম নইলে তো উপায় নেই। দেখি চেষ্টা করে।"

যেদিন সকালে কৌশলে দাদার কাছে কথাটা পাড়বে বলে নবীন এল, দেখে যে দাদা বেরোবার জন্যে প্রস্তুত, দরজার কাছে গাড়ি তৈরি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, "কোথাও বেরোচ্ছ নাকি?"

মধুসূদন একটু সংকোচ কাটিয়ে বললে, "সেই গনৎকার বেঙ্কটস্বামীর কাছে।"

নবীনের কাছে দুর্বলতা চাপা রাখতেই চেয়েছিল। হঠাৎ মনে হল ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই সুবিধা হতে পারে। তাই বললে, "চলো আমার সঙ্গে।"

নবীন ভাবলে, সর্বনাশ। বললে, "দেখে আসি গে সে বাড়িতে আছে কি না। আমার তো বোধ হচ্ছে সে দেশে চলে গেছে, অন্তত সেইরকম তো কথা।"

মধুসূদন বললে, "তা বেশ তো, দেখে আসা যাক-না।"

নবীন নিরুপায় হয়ে সঙ্গে চলল, কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গনলে।

গনৎকারের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই নবীন তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে একটু উঁকি মেরেই বললে, "বোধ হচ্ছে কেউ যেন বাড়িতে নেই।"

যেমন বলা, সেই মুহূর্তেই স্বয়ং বেঙ্কটস্বামী দাঁতন চিবোতে চিবোতে দরজার কাছে বেরিয়ে এল। নবীন দ্রুত তার গা ঘেঁষে প্রণাম করে বললে, "সাবধানে কথা কবেন।"

সেই এঁদো ঘরে তক্তপোশে সবাই বসল। নবীন বসল মধুসূদনের পিছনে। মধুসূদন কিছু বলবার আগেই নবীন বলে বসল, “মহারাজের সময় বড়ো খারাপ যাচ্ছে, কবে গ্রহশান্তি হবে বলে দাও শাস্ত্রীজি।”

মধুসূদন নবীনের এই ফাঁস-করে-দেওয়া প্রশ্নে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে তার উরুতে খুব একটা টিপনি দিলে।

বেঙ্কটস্বামী রাশিচক্র কেটে একেবারে স্পষ্টই দেখিয়ে দিলে মধুসূদনের ধনস্থানে শনির দৃষ্টি পড়েছে।

গ্রহের নাম জেনে মধুসূদনের কোনো লাভ নেই, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা শক্ত। যে যে মানুষ ওর সঙ্গে শত্রুতা করছে স্পষ্ট করে তাদেরই পরিচয় চাই, বর্ণমালার যে বর্গেই পড়ুক নাম বের করতে হবে। নবীনের মুশকিল এই যে, সে মধুসূদনের আপিসের ইতিবৃত্তান্ত কিছুই জানে না। ইশারাতেও সাহায্য খাটবে না। বেঙ্কটস্বামী মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায় আর মধুসূদনের মুখের দিকে আড়ে আড়ে চায়। আজকের দিনের নামের বেলায় ভৃগুমুনি সম্পূর্ণ নীরব। হঠাৎ শাস্ত্রী বলে বসল, শত্রুতা করছে একজন স্ত্রীলোক।

নবীন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেই স্ত্রীলোকটি যে শ্যামাসুন্দরী এইটে কোনোমতে খাড়া করতে পারলে আর ভাবনা নেই। মধুসূদন নাম চায়। শাস্ত্রী তখন বর্ণমালার বর্গ শুরু করলে। ‘ক’বর্গ শব্দটা বলে যেন অদৃশ্য ভৃগুমুনির দিকে কান পেতে রইল — কটাক্ষে দেখতে লাগল মধুসূদনের দিকে। ‘ক’বর্গ শুনেই মধুসূদনের মুখে ঈষৎ একটু চমক দিলে। ওদিকে পিছন থেকে ‘না’ সংকেত করে নবীন ডাইনে বাঁয়ে লাগাল ঘাড়-নাড়া। নবীনের জানাই নেই যে মান্দ্রাজে এ সংকেতের উলটো মানে। বেঙ্কটস্বামীর আর সন্দেহ রইল না— জোরগলায় বললে, ‘ক’বর্গ। মধুসূদনের মুখ দেখে ঠিক বুঝেছিল ‘ক’বর্গের প্রথম বর্ণটাই। তাই কথাটাকে আরও একটু ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রী বললে, এই কয়ের মধ্যেই মধুসূদনের সমস্ত কু।

এর পরে পুরো নাম জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি না করে ব্যগ্র হয়ে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, “এর প্রতিকার?”

বেঙ্কটস্বামী গম্ভীরভাবে বলে দিলে, “কণ্টকেনৈব কণ্টকং— অর্থাৎ উদ্ধার করবে অন্য একজন স্ত্রীলোক।”

মধুসূদন চকিত হয়ে উঠল। বেঙ্কটস্বামী মানবচরিত্রবিদ্যার চর্চা করেছে।

নবীন অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “স্বামীজি, ঘোড়দৌড়ে মহারাজার ঘোড়াটা কি জিতেছে?”

বেঙ্কটস্বামী জানে অধিকাংশ ঘোড়াই জেতে না, একটু হিসাবের ভান করে বলে দিলে, "লোকসান দেখতে পাচ্ছি।"

কিছুকাল আগেই মধুসূদনের ঘোড়া মস্ত জিত জিতেছে। মধুসূদনকে কোনো কথা বলবার সময় না দিয়ে মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ করে নবীন জিজ্ঞাসা করলে, "স্বামীজি, আমার কন্যাটার কী গতি হবে?" বলা বাহুল্য, নবীনের কন্যা নেই।

বেঙ্কটস্বামী নিশ্চয় ঠাওরালে পাত্র খুঁজছে। নবীনের চেহারা দেখেই বুঝলে, মেয়েটি অপ্সরা নয়। বলে দিলে, পাত্র শীঘ্র মিলবে না, অনেক টাকা ব্যয় করতে হবে।

মধুসূদনকে একটু অবসর না দিয়ে পরে পরে দশ-বারোটা অসংগত প্রশ্নের অদ্ভুত উত্তর বের করে নিয়ে নবীন বললে, "দাদা, আর কেন? এখন চলো।"

গাড়িতে উঠেই নবীন বলে উঠল, "দাদা, ওর সমস্ত চালাকি। ভণ্ড কোথাকার!"

"কিন্তু সেদিন যে—"

"সেদিন ও আগে থাকতে খবর নিয়েছিল।"

"কেমন করে জানলে যে আমি আসব?"

"আমারই বোকামি। ঘাট হয়েছে ওর কাছে তোমাকে এনেছিলুম।"

জ্যোতিষীর প্রতারণার প্রমাণ যতই পাক, 'ক'বর্গের কু মধুসূদনের মনে বিঁধে রইল। ভেবে দেখলে যে, নক্ষত্র অনাদর করে খুচরো প্রশ্নের যা তা জবাব দেয়, কিন্তু আদত প্রশ্নের জবাবে ভুল হয় না। মধুসূদন যার প্রত্যাশাই করে নি সেই দুঃসময় ওর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এল। এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কী হবে?

নবীন আস্তে আস্তে কথা পাড়ল, "দাদা, দুই সপ্তাহ তো কেটে গেল, এইবার বউরানীকে আনিয়ে নিই।"

"কেন, তাড়া কিসের? দেখো নবীন, তোমাকে বলে রাখলুম আর কখনোই এ-সব কথা আমার কাছে তুলবে না। যেদিন আমার খুশি আমি আনিয়ে নেব।"

নবীন দাদাকে চেনে, বুঝলে এ কথাটা খতম হয়ে গেল।

তবু সাহস করে জিজ্ঞাসা করলে, "মেজোবউ যদি বউরানীকে দেখতে যায় তা হলে কি দোষ আছে?"

মধুসূদন অবজ্ঞা করে সংক্ষেপে বললে, "যাক-না।"

৪৯

ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটা কেদারা দেখিয়ে দিয়ে বিপ্রদাস বললে, "আসুন নবীনবাবু, এইখানে বসুন।"

নবীন বললে, "আমার পরিচয়টা পান নি বোধ হচ্ছে। মনে করেছেন আমি রাজবাড়ির কোন্ আদুরে ছেলে। যিনি আপনার ছোটো বোন, আমি তাঁর অধম সেবক, আমাকে সম্মান করে আমায় আশীর্বাদটা ফাঁকি দেবেন না। কিন্তু করেছেন কী? আপনার অমন শরীরের কেবল ছায়াটি বাকি রেখেছেন!"

"শরীরটা সত্য নয়, ছায়া, মাঝে মাঝে সে খবরটা পাওয়া ভালো। ওতে শেষের পাঠ এগিয়ে থাকে।"

কুমু ঘরে ঢুকেই বললে, "ঠাকুরপো, চলো কিছু খাবে।"

"খাব, কিন্তু একটা শর্ত আছে। যতক্ষণ পূরণ না হবে, ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত তোমার দ্বারে পড়ে থাকবে।"

"শর্তটা কী শুনি।"

"আমাদের বাড়িতে থাকতেই দরবার জানিয়ে রেখেছিলুম কিন্তু সেখানে জোর পাই নি। ভক্তকে একখানি ছবি তোমায় দিতে হবে। সেদিন বলেছিলে নেই, আজ তা বলবার জো নেই, তোমার দাদার ঘরের দেয়ালে ওই তো সামনেই ঝুলছে।"

ভালো ছবি দৈবাৎ হয়ে থাকে, কুমুর ওই ছবিটি তেমনি যেন দৈবের রচনা। কপালে যে আলোটি পড়লে কুমুর মনের চেহারাটি মুখে প্রকাশ পায়, সেই আলোটিই পড়েছিল। ললাটে নির্মল বুদ্ধির দীপ্তি, চোখে গভীর সারল্যের সকরুণতা। দাঁড়ানো ছবি। কুমুর সুন্দর ডান হাতটি একটা শূন্য চৌকির হাতার উপরে। মনে হয় যেন সামনে ও আপনারই একটা দূরকালের ছায়া দেখতে পেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে।

নিজের এই ছবিটি কুমুর চোখে পড়ে নি। কলকাতা থেকে ছবিওআলা আনিয়ে বিবাহের কয়দিন আগে ওর দাদা এটি তুলিয়েছিল। তার পরে নিজের ঘরে ছবিটি টাঙিয়েছে, এইটেতে কুমুর হৃদয় আর্দ্র হয়ে গেল। ফোটোগ্রাফের কপি আরও নিশ্চয় আছে, তাই দাদার মুখের দিকে চাইলে। নবীন বললে, "বুঝতে পারছেন বিপ্রদাসবাবু, বউরানীর দয়া হয়েছে। দেখুন-না ওঁর চোখের দিকে চেয়ে। অযোগ্য বলেই আমার প্রতি ওঁর একটু বিশেষ করুণা।"

বিপ্রদাস হেসে বললে, "কুমু, আমার ওই চামড়ার বাক্সয় আরও খানকয়েক ছবি আছে. তোর ভক্তকে বরদান করতে চাস যদি তো অভাব হবে না।"

কুমু নবীনকে খাওয়াতে নিয়ে গেলে পর কালু এল ঘরে। বললে, "আমি মেজোবাবুকে তার করেছি, শীঘ্র চলে আসবার জন্যে।"

"আমার নামে?"

"হ্যাঁ, তোমারই নামে দাদা। আমি জানি, তুমি শেষ পর্যন্ত হাঁ-না করবে, এ দিকে সময় বড়ো কঠিন হয়ে আসছে। ডাক্তারের কাছে যা শোনা গেল, তোমার উপর এত চাপ সইবে না।"

ডাক্তার বলেছে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, শরীরমন শান্ত রাখা চাই। একসময়ে বিপ্রদাসের যে অতিরিক্ত কুস্তির নেশা ছিল এটা তারই ফল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মনের উদ্বেগ।

সুবোধকে এরকম জোর-তলব করে ধরে আনা ভালো হবে কি না বিপ্রদাস বুঝতে পারলে না; চুপ করে ভাবতে লাগল। কালু বললে, "বড়োবাবু, মিথ্যে ভাবছ, বিষয়কর্মের একটা শেষ ব্যবস্থা এখনই করা চাই, আর এতে তাঁকে না হলে চলবে না। বারো পার্সেন্ট সুদে মাড়োয়ারির হাতে মাথা বিকিয়ে দিতে পারব না। তারা আবার দু লাখ টাকা আগাম সুদ হিসেবে কেটে নেবে। তার উপর দালালি আছে।"

বিপ্রদাস বললে, "আচ্ছা, আসুক সুবোধ। কিন্তু আসবে তো?"

"যতবড়ো সাহেব হোক-না, তোমার তার পেলে সে না এসে থাকতে পারবে না। সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু দাদা, আর দেরি করা নয়, খুকিকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, বললে, "মধুসূদন না ডেকে পাঠালে যাবার বাধা আছে।"

"কেন, খুকি কি মধুসূদনের পাটথাটা মজুর? নিজের ঘরে যাবে তার আবার হুকুম কিসের?"

আহার সেরে নবীন একলা এল বিপ্রদাসের ঘরে। বিপ্রদাস বললে, "কুমু তোমাকে স্নেহ করে।"

নবীন বললে, "তা করেন। বোধ করি আমি অযোগ্য বলেই ওঁর স্নেহ এত বেশি।"

"তাঁর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে চাই, তুমি আমাকে কোনো কথা লুকিয়ো না।"

"কোনো কথা আমার নেই যা আপনাকে বলতে আমার বাধবে।"

"কুমু যে এখানে এসেছে আমার মনে হচ্ছে তার মধ্যে যেন বাঁকা কিছু আছে।"

"আপনি ঠিকই বুঝেছেন। যাঁর অনাদর কল্পনা করা যায় না সংসারে তাঁরও অনাদর ঘটে।"

"অনাদর ঘটেছে তবে ?"

"সেই লজ্জায় এসেছি। আর তো কিছুই পারি নে, পায়ের ধুলো নিয়ে মনে মনে মাপ চাই।"

"কুমু যদি আজই স্বামীর ঘরে ফিরে যায় তাতে ক্ষতি আছে কি ?"

"সত্যি কথা বলি, যেতে বলতে সাহস করি নে।"

ঠিক যে কী হয়েছে বিপ্রদাস সে কথা নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে না। মনে করলে, জিজ্ঞাসা করা অন্যায় হবে। কুমুকেও প্রশ্ন করে কোনো কথা বের করতে বিপ্রদাসের অভিরুচি নেই। মনের মধ্যে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। কালুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তো ওদের বাড়ি যাওয়া-আসা কর, মধুসূদনের সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় কিছু জান।"

"কিছু আভাস পেয়েছি, কিন্তু সম্পূর্ণ না জেনে তোমার কাছে কিছু বলতে চাই নে। আর দুটো দিন সবুর করো, খবর তোমাকে দিতে পারব।"

আশঙ্কায় বিপ্রদাসের মন ব্যথিত হয়ে উঠল। প্রতিকার করবার কোনো রাস্তা তার হাতে নেই বলে দুশ্চিন্তাটা ওর হৃৎপিণ্ডটাকে ক্ষণে ক্ষণে মোচড় দিতে লাগল।

৫০

কুমু অনেকদিন যেটা একান্ত ইচ্ছা করেছিল সে ওর পূর্ণ হল ; সেই পরিচিত ঘরে, সেই ওর দাদার স্নেহের পরিবেষ্টনের মধ্যে এল ফিরে, কিন্তু দেখতে পেলে ওর সেই সহজ জায়গাটি নেই। এক-একবার অভিমানে ওর মনে হচ্ছে যাই ফিরে, কেননা ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে সবারই মনে প্রতিদিন এই প্রশ্নটি রয়েছে, 'ও ফিরে যাচ্ছে না কেন, কী হয়েছে ওর ?' দাদার গভীর স্নেহের মধ্যে ওই একটা উৎকণ্ঠা, সেটা নিয়ে ওদের মধ্যে স্পষ্ট আলোচনা চলে না, তার বিষয় ও নিজে, অথচ ওর কাছে সেটা চাপা রইল।

বিকেল হয়ে আসছে, রোদ্দুর পড়ে এল। শোবার ঘরের জানালার কাছে কুমু ব'সে। কাকগুলো ডাকাডাকি করছে, বাইরের রাস্তায় গাড়ির শব্দ আর

লোকালয়ের নানা কলরব। নতুন বসন্তের হাওয়া শহরের ইঁটকাঠের উপর রঙ ধরাতে পারলে না। সামনের বাড়িটাকে অনেকখানি আড়াল করে একটা পাতবাদামের গাছ, অস্থির হাওয়া তারই ঘনসবুজ পাতায় দোল লাগিয়ে অপরাহ্ণের আলোটাকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে লাগল। এইরকম সময়েই পোষা হরিণী তার অজানা বনের দিকে ছুটে যেতে চায়, যেদিন হাওয়ার মধ্যে বসন্তের ছোঁওয়া লাগে, মনে হয় পৃথিবী যেন উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে নীল আকাশের দূর পথের দিকে। যা-কিছু চার দিকে বেড়ে আছে সেইটেকেই মনে হয় মিথ্যে, আর যার ঠিকানা পাওয়া যায় নি, যার ছবি আঁকতে গেলে রঙ যায় আকাশে ছড়িয়ে, মূর্তি উঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় জলস্থলের নানা ইশারার মধ্যে, মন তাকেই বলে সবচেয়ে সত্য। কুমুর মন হাঁপিয়ে উঠে আজ পালাই-পালাই করছে সব-কিছু থেকে, আপনার কাছ থেকে। কিন্তু এ কী বেড়া! আজ এ বাড়িতেও মুক্তি নেই। কল্পনায় মৃত্যুকেও মধুর করে তুললে। মনে মনে বললে, কালো যমুনার পারে, সেই কালোবরণ, চলেছি তারই অভিসারে, দিনের পর দিনে— কত দীর্ঘ পথ কত দুঃখের পথ। মনে পড়ে গেল, দাদার অসুখ বেড়েছে— সেবা করতে এসে আমিই অসুখ বাড়িয়েছি, এখন আমি যা করতে যাব তাতেই উলটো হবে। দুই হাতে মুখ চেপে ধরে কুমু খুব খানিকটা কেঁদে নিলে। কান্নার বেগ থামলে স্থির করলে বাড়ি ফিরে যাবে, তা যা হয় তাই হবে— সব সহ্য করবে— শেষকালে তো আছে মুক্তি, শীতল গভীর মধুর। সেই মৃত্যুর কল্পনা মনের মধ্যে যতই স্পষ্ট করে আঁকড়ে ধরল ততই ওর বোধ হল জীবনের ভার একেবারে দুর্বহ হবে না, গুন গুন করে গাইতে লাগল—

পথপর রয়নি আঁধেরী,
কুঞ্জপর দীপ উজিয়ারা।

দুপুরবেলা কুমু দাদাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে চলে এসেছিল, এতক্ষণে ওষুধ আর পথ্য খাওয়াবার সময় হয়েছে। ঘরে এসে দেখলে বিপ্রদাস উঠে বসে পোর্টফোলিয়ো কোলে নিয়ে সুবোধকে ইংরেজিতে এক লম্বা চিঠি লিখছে। ভর্ৎসনার সুরে কুমু তাকে বললে, "দাদা, আজ তুমি ভালো করে ঘুমোও নি।"

বিপ্রদাস বললে, "তুই ঠিক করে রেখেছিস ঘুমোলেই বিশ্রাম হয়! মন যখন চিঠি লেখার দরকার বোধ করে তখন চিঠি লিখলেই বিশ্রাম।"

কুমু বুঝলে, দরকারটা ওকে নিয়েই। সমুদ্রের এপারে এক ভাইকে ব্যাকুল করেছে, সমুদ্রের ওপারে আর-এক ভাইকে ছট্‌ফটিয়ে দেবে, কী ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিল

তাদের এই বোন! দাদাকে চা-খাওয়ানো হলে পর আস্তে আস্তে বললে, "অনেকদিন তো হয়ে গেল, এবার বাড়ি যাওয়া ঠিক করেছি।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে কথাটা কী ভাবের। এতদিন দুই ভাইবোনের মধ্যে যে স্পষ্ট বোঝাপড়া ছিল আজ আর তা নেই, এখন মনের কথার জন্যে হাতড়ে বেড়াতে হয়। বিপ্রদাস লেখা বন্ধ করলে। কুমুকে পাশে বসিয়ে কিছু না বলে তার হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কুমু তার ভাষা বুঝল। সংসারের গ্রন্থি কঠিন হয়েছে, কিন্তু ভালোবাসার একটুকুও অভাব হয় নি। চোখ দিয়ে জল পড়তে চাইল, জোর করে বন্ধ করে দিলে। কুমু মনে মনে বললে, এই ভালোবাসার উপর সে ভার চাপাবে না। তাই আবার বললে, "দাদা, আমি যাওয়া ঠিক করেছি।"

বিপ্রদাস কী জবাব দেবে ভেবে পেলে না, কেননা কুমুর যাওয়াটাই হয়তো ভালো, অন্তত সেটাই তো কর্তব্য। চুপ করে রইল। এমন সময় কুকুরটা ঘুম থেকে জেগে কুমুর কোলের উপর দুই পা তুলে বিপ্রদাসের প্রসাদ রুটির টুকরোর জন্যে কাকুতি জানালে।

রামস্বরূপ বেহারা এসে খবর দিলে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন। কুমু উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, "আজ দিনে তোমার ঘুম হয় নি, তার উপরে কালুদার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আমি বরঞ্চ যাই, কিছু যদি কথা থাকে শুনে নিই গে, তার পরে তোমাকে সময়মত এসে জানাব।"

"ভারি ডাক্তার হয়েছিস তুই! একজনের কথা যদি আর-একজন শুনে নেয় তাতে রোগীর মন খুব সুস্থির হয় ভেবেছিস?"

"আচ্ছা আমি শুনব না, কিন্তু আজ থাক্।"

"কুমু, ইংরেজ কবি বলেছে, শ্রুত সংগীত মধুর, অশ্রুত সংগীত মধুরতর। তেমনি শ্রুত সংবাদ ক্লান্তিকর হতে পারে, কিন্তু অশ্রুত সংবাদ আরও অনেক ক্লান্তিকর, অতএব অবিলম্বে শুনে নেওয়াই ভালো।"

"আমি কিন্তু পনেরো মিনিট পরেই আসব, আর তখনও যদি তোমাদের কথাবার্তা না থামে তবে আমি তার মধ্যেই এসরাজ বাজাব— ভীমপলশ্রী।"

"আচ্ছা, তাতেই রাজি।"

আধঘণ্টা পরে এসরাজ হাতে করেই কুমু ঘরে ঢুকল, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের ভাব দেখে তখনই এসরাজটা দেয়ালের কোণে ঠেকিয়ে রেখে দাদার পাশে বসে তার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে দাদা?"

কুমু এতদিন বিপ্রদাসের মধ্যে যে অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিল তার মধ্যে একটা গভীর বিষাদ ছিল। বিপ্রদাসের জীবনে দুঃখতাপ অনেক গেছে, কেউ তাকে সহজে বিচলিত হতে দেখে নি। বই পড়া, গানবাজনা করা, দুরবীন নিয়ে তারা দেখা, ঘোড়ায় চড়া, নানা জায়গা থেকে অজানা গাছপালা নিয়ে বাগান করা প্রভৃতি নানা বিষয়েই তার ঔৎসুক্য থাকাতে সে নিজের সম্বন্ধীয় দুঃখকষ্টকে নিজের মধ্যে কখনও জমতে দেয় নি। এবার রোগের দুর্বলতায় তাকে নিজের ছোটো গণ্ডির মধ্যে বড়ো বেশি করে বদ্ধ করেছে। এখন সে বাইরে থেকে সেবা ও সঙ্গ পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে, চিঠিপত্র ঠিকমত না পেলে উদ্বিগ্ন হয়, ভাবনাগুলো দেখতে দেখতে কালো হয়ে ওঠে। তাই দাদার 'পরে কুমুর স্নেহ আজ যেন মাতৃস্নেহের মতো রূপ ধরেছে— তার অমন ধৈর্যগম্ভীর আত্ম-সমাহিত দাদার মধ্যে কোথা থেকে যেন বালকের ভাব এল, এত আবদার, এত চাঞ্চল্য, এত জেদ। আর সেইসঙ্গে এমন গভীর বিষাদ আর উৎকণ্ঠা।

কিন্তু কুমু এসে দেখলে তার দাদার সেই আবেশটা কেটে গিয়েছে। তার চোখে যে আগুন জ্বলেছে সে যেন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের আগুনের মতো, নিজের কোনো বেদনার জন্যে নয়— সে তার দৃষ্টির সামনে বিশ্বের কোনো পাপকে দেখতে পাচ্ছে, তাকে দগ্ধ করা চাই। কুমুর কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে সামনের দেয়ালে অনিমেষ দৃষ্টি রেখে বিপ্রদাস চুপ করে বসে রইল।

কুমু আর খানিক বাদে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "দাদা, কী হয়েছে বলো।"

বিপ্রদাস যেন এক দূর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, "দুঃখ এড়াবার জন্যে চেষ্টা করলে দুঃখ পেয়ে বসে। ওকে জোরের সঙ্গে মানতে হবে।"

"তুমি উপদেশ দাও, আমি মানতে পারব দাদা।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়।"

কুমু ভালো করে তার দাদার কথার মানে বুঝতে পারলে না।

বিপ্রদাস বললে, "ব্যথাটাকে আমারই আপনার মনে করে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলুম, আজ বুঝতে পারছি, এর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, সকলের হয়ে।"

বিপ্রদাসের ফ্যাকাশে গৌরবর্ণ মুখের উপর লাল আভা এল। ওর কোলের উপর রেশমের কাজ-করা একটা চৌকো বালিশ ছিল সেটাকে ঠেলে হঠাৎ সরিয়ে ফেলে দিলে। বিছানা থেকে উঠে পাশের হাতাওআলা চৌকির উপর বসতে যাচ্ছিল, কুমু ওর হাত চেপে ধরে বললে, "শান্ত হও দাদা, উঠো না, তোমার

অসুখ বাড়বে।” বলে একটু জোর করেই পিঠের দিকের উঁচু-করা বালিশের উপর বিপ্রদাসকে হেলিয়ে শুইয়ে দিলে।

বিপ্রদাস গায়ের কাপড়টাকে মুঠো দিয়ে চেপে ধরে বললে, “সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোনো রাস্তা একেবারেই নেই বলেই তাদের উপর কেবলই মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে সহ্য করব না। কুমু, এখানেই তোর ঘর মনে করে থাকতে পারবি ? ও বাড়িতে তোর যাওয়া চলবে না।”

কালুর কাছ থেকে বিপ্রদাস আজ অনেক কথা শুনেছে।

শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মধুসূদনের যে সম্বন্ধ ঘটেছে তার মধ্যে অপ্রকাশ্যতা আর ছিল না। ওরা দুই পক্ষই অকুণ্ঠিত। লোকে ওদেরকে অপরাধী মনে করছে মনে করেই ওরা স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে। এই সম্বন্ধটার মধ্যে সূক্ষ্ম কাজ কিছুই ছিল না বলেই পরস্পরকে এবং লোকমতকে বাঁচিয়ে চলা ওদের পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। শোনা গেছে শ্যামাসুন্দরীকে মধুসূদন কখনও কখনও মেরেওছে, শ্যামা যখন তারস্বরে কলহ করেছে তখন মধুসূদন তাকে সকলের সামনেই বলেছে, ‘দূর হয়ে যা বজ্জাত, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।’ কিন্তু এতেও কিছু আসে যায় নি। শ্যামার সম্বন্ধে মধুসূদন আপন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে, ইচ্ছে করে মধুসূদন নিজে তাকে যা দিয়েছে শ্যামা যখনই তার বেশি কিছুতে হাত দিতে গেছে অমনি খেয়েছে ধমক। শ্যামার ইচ্ছে ছিল সংসারের কাজে মোতির মার জায়গাটা সে'ই দখল করে, কিন্তু তাতেও বাধা পেলে; মধুসূদন মোতির মাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, শ্যামাসুন্দরীকে বিশ্বাস করে না। শ্যামার সম্বন্ধে ওর কল্পনায় রঙ লাগে নি, অথচ খুব মোটা রকমের একটা আসক্তি জন্মেছে। যেন শীতকালের বহুব্যবহৃত ময়লা রেজাইটার মতো, তাতে কারুকাজের সম্পূর্ণ অভাব, বিশেষ যত্ন করবার জিনিস নয়, খাট থেকে ধুলোয় পড়ে গেলেও আসে যায় না। কিন্তু ওতে আরাম আছে। শ্যামাকে সামলিয়ে চলবার একটুও দরকার নেই; তা ছাড়া শ্যামা সমস্ত মনপ্রাণের সঙ্গে ওকে যে বড়ো বলে মানে, ওর জন্যে সব সইতে সব করতে সে রাজি, এটা নিঃসংশয়ে জানার দরুন মধুসূদনের আত্মমর্যাদা সুস্থ আছে। কুমু থাকতে প্রতিদিন ওর এই আত্মমর্যাদা বড়ো বেশি নাড়া খেয়েছিল।

মধুসূদনের এই আধুনিক ইতিহাসটা জানবার জন্যে কালুকে খুব বেশি সন্ধান করতে হয় নি। ওদের বাড়িতে লোকজনের মধ্যে এই নিয়ে যথেষ্ট বলাবলি চলেছিল, অবশেষে নিতান্ত অভ্যস্ত হওয়াতে বলাবলির পালাও একরকম শেষ হয়ে এসেছে।

খবরটা শোনবামাত্র বিপ্রদাসকে যেন আগুনের তীর মারলে। মধুসূদন কিছু ঢাকবার চেষ্টামাত্র করে নি, নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্যে অপমান করা এতই সহজ— স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করতে বাহিরের বাধা এতই কম। স্ত্রীকে নিরুপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয় নি। এরই নিদারুণ দুঃখ ও অসম্মান ঘরে ঘরে যুগে যুগে কী রকম ব্যাপ্ত হয়ে আছে এক মুহূর্তে বিপ্রদাস তা যেন দেখতে পেলে। সতীত্বগরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এত সস্তা, এত অকিঞ্চিৎকর!

বিপ্রদাস বললে, "কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবি করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।"

কুমু বললে, "দাদা, তুমি কোন্ অপমানের কথা বলছ ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

বিপ্রদাস বললে, "তুই কি তবে সব কথা জানিস নে?"

কুমু বললে, "না।"

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। একটু পরে বললে, "মেয়েদের অপমানের দুঃখ আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে। কেন তা জানিস?"

কুমু কিছু না বলে দাদার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক পরে বললে, "চির-জীবন মা যা দুঃখ পেয়েছিলেন আমি তা কোনোমতে ভুলতে পারি নে, আমাদের ধর্মবুদ্ধিহীন সমাজ সেজন্যে দায়ী।"

এইখানে ভাইবোনের মধ্যে প্রভেদ আছে। কুমু তার বাবাকে খুব বেশি ভালোবাসত, জানত তাঁর হৃদয় কত কোমল। সমস্ত অপরাধ কাটিয়েও তার বাবা ছিলেন খুব বড়ো এ কথা না মনে করে সে থাকতে পারত না, এমন-কি তার বাবার জীবনে যে শোচনীয় পরিণাম ঘটেছিল সেজন্যে সে তার মাকেই মনে মনে দোষ দিয়েছে।

বিপ্রদাসও তার বাবাকে বড়ো বলেই ভক্তি করেছে। কিন্তু বারে বারে স্খলনের দ্বারা তার মাকে তিনি সকলের কাছে অসম্মানিত করতে বাধা পান নি এটা সে কোনোমতে ক্ষমা করতে পারলে না। তার মাও ক্ষমা করেন নি বলে বিপ্রদাস মনের মধ্যে গৌরব বোধ করত।

বিপ্রদাস বললে, "আমার মা যে অপমান পেয়েছিলেন তাতে সমস্ত স্ত্রীজাতির

অসম্মান। কুমু, তুই ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতে হার মানবি নে।"

কুমু মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে বললে, "বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসতেন সে কথা ভুলো না দাদা। সেই ভালোবাসায় অনেক পাপের মার্জনা হয়।"

বিপ্রদাস বললে, "তা মানি, কিন্তু এত ভালোবাসা সত্ত্বেও তিনি এত সহজে মায়ের সম্মানহানি করতে পারতেন, সে পাপ সমাজের। সমাজকে সেজন্য ক্ষমা করতে পারব না, সমাজের ভালোবাসা নেই, আছে কেবল বিধান।"

"দাদা, তুমি কি কিছু শুনেছ?"

"হাঁ শুনেছি, সে-সব কথা তোকে আস্তে আস্তে পরে বলব।"

"সেই ভালো। আমার ভয় হচ্ছে আজকেকার এই-সব কথাবার্তায় তোমার শরীর আরও দুর্বল হয়ে যাবে।"

"না কুমু, ঠিক তার উলটো। এতদিন দুঃখের অবসাদে শরীরটা যেন এলিয়ে পড়ছিল। আজ যখন মন বলছে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করতে হবে, আমার শরীরের ভিতর থেকে শক্তি আসছে।"

"কিসের লড়াই দাদা?"

"যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশি ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই।"

"তুমি তার কী করতে পার দাদা?"

"আমি তাকে না মানতে পারি। তা ছাড়া আরও আরও কী করতে পারি সে আমাকে ভাবতে হবে, আজ থেকেই শুরু হল কুমু। এই বাড়িতে তোর জায়গা আছে, সে সম্পূর্ণ তোর নিজের, আর-কারও সঙ্গে আপস করে নয়। এইখানেই তুই নিজের জোরে থাকবি।"

"আচ্ছা দাদা, সে হবে, কিন্তু আর তুমি কথা কোয়ো না।"

এমন সময় খবর এল, মোতির মা এসেছে।

৫১

শোবার ঘরে কুমু মোতির মাকে নিয়ে বসল। কথা কইতে কইতে অন্ধকার হয়ে এল, বেহারা এল আলো জ্বালতে, কুমু নিষেধ করে দিলে।

কুমু সব কথাই শুনলে; চুপ করে রইল।

মোতির মা বললে, "বাড়িকে ভূতে পেয়েছে বউরানী, ওখানে টিঁকে থাকা দায়। তুমি কি যাবে না ?"

"আমার কি ডাক পড়েছে ?"

"না, ডাকবার কথা বোধ হয় মনেও নেই। কিন্তু তুমি না গেলে তো চলবেই না।"

"আমার কী করবার আছে ? আমি তো তাঁকে তৃপ্ত করতে পারব না। ভেবে দেখতে গেলে আমার জন্যেই সমস্ত কিছু হয়েছে, অথচ কোনো উপায় ছিল না। আমি যা দিতে পারতুম সে তিনি নিতে পারলেন না। আজ আমি শূন্য হাতে গিয়ে কী করব ?"

"বল কী বউরানী, সংসার যে তোমারই, সে তো তোমার হাতছাড়া হলে চলবে না।"

"সংসার বলতে কী বোঝ ভাই ? ঘরদুয়োর, জিনিসপত্র, লোকজন ? লজ্জা করে এ কথা বলতে যে, তাতে আমার অধিকার আছে। মহলে অধিকার খুইয়েছি, এখন কি ওই-সব বাইরের জিনিস নিয়ে লোভ করা চলে ?"

"কী বলছ ভাই বউরানী ? ঘরে কি তুমি একেবারেই ফিরবে না ?"

"সব কথা ভালো করে বুঝতে পারছি নে। আর কিছুদিন আগে হলে ঠাকুরের কাছে সংকেত চাইতুম, দৈবজ্ঞের কাছে শুধোতে যেতুম। কিন্তু আমার সে-সব ভরসা ধুয়েমুছে গেছে। আরম্ভে সব লক্ষণই তো ভালো ছিল। শেষে কোনোটাই তো একটুও খাটল না। আজ কতবার বসে বসে ভেবেছি দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘটত না। তবুও মনের মধ্যে যে দেবতাকে নিয়ে দ্বিধা উঠেছে, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে এড়াতে পারি নে। ফিরে ফিরে সেইখানে এসে লুটিয়ে পড়ি।"

"তোমার কথা শুনে যে ভয় লাগে। ঘরে কি যাবেই না ?"

"কোনো কালেই যাব না সে কথা ভাবা শক্ত, যাবই সে কথাও সহজ নয়।"

"আচ্ছা, তোমার দাদার কাছে একবার কথা বলে দেখব। দেখি তিনি কী বলেন। তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে তো ?"

"চলো না, এখনই নিয়ে যাচ্ছি।"

বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকেই তার চেহারা দেখে মোতির মা থমকে দাঁড়াল, মনে হল যেন ভূমিকম্পের পরেকার আলো-নেবা চুড়ো-ভাঙা মন্দির। ভিতরে একটা অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মেজের উপর বসল।

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে বললে, "এই যে চৌকি আছে।"

মোতির মা মাথা নেড়ে বললে, "না, এখানে বেশ আছি।"

ঘোমটার ভিতর থেকে তার চোখ ছল্ ছল্ করতে লাগল। বুঝতে পারলে দাদার এই অবস্থায় কুমুকে ব্যথাই বাজছে।

কুমু প্রসঙ্গটা সহজ করে দেবার জন্যে বললে, "দাদা, ইনি বিশেষ করে এসেছেন তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে।"

মোতির মা বললে, "না না, মত জিজ্ঞাসা পরের কথা, আমি এসেছি ওঁর চরণ দর্শন করতে।"

কুমু বললে, "উনি জানতে চান, ওঁদের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে কি না।"

বিপ্রদাস উঠে বসল ; বললে, "সে তো পরের বাড়ি, সেখানে কুমু গিয়ে থাকবে কী করে ?" যদি ক্রোধের স্বরে বলত তা হলে কথাটার ভিতরকার আগুন এমন করে জ্বলে উঠত না। শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ নেই।

মোতির মা ফিস্ ফিস্ করে কী বললে। তার অভিপ্রায় ছিল পাশে বসে কুমু তার কথাগুলো বিপ্রদাসের কানে পৌঁছিয়ে দেবে। কুমু সম্মত হল না, বললে, "তুমিই গলা ছেড়ে বলো।"

মোতির মা স্বর আর-একটু স্পষ্ট করে বললে, "যা ওঁর আপনারই, কেউ তাকে পরের করে দিতে পারে না, তা সে যেই হোক-না।"

"সে কথা ঠিক নয়। উনি আশ্রিত মাত্র। ওঁর নিজের অধিকারের জোর নেই। ওঁকে ঘরছাড়া করলে হয়তো নিন্দা করবে, বাধা দেবে না। যত শাস্তি সমস্তই কেবল ওঁর জন্যে। তবু অনুগ্রহের আশ্রয়ও সহ্য করা যেত যদি তা মহদাশ্রয় হত।"

এমন কথার কী জবাব দেবে মোতির মা ভেবে পেলে না। স্বামীর আশ্রয়ে বিঘ্ন ঘটলে মেয়ের পক্ষের লোকেরাই তো পায়ে ধরাধরি করে, এ যে উলটো কাণ্ড।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "কিন্তু আপন সংসার না থাকলে মেয়েরা যে বাঁচে না ; পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো।"

"স্থিতি কোথায় ? অসম্মানের মধ্যে ? আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারও নেই, চক্রবর্তী-সম্রাটেরও না।"

কুমুকে মোতির মা খুবই ভালোবাসে, ভক্তি করে, কিন্তু তবু কোনো মেয়ের এত মূল্য থাকতে পারে যে তার গৌরব স্বামীকে ছাপিয়ে যাবে এ কথা মোতির মার কানে ঠিক লাগল না। সংসারে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি চলুক, স্ত্রীর ভাগ্যে অনাদর-অপমানও না হয় যথেষ্ট ঘটল, এমন-কি তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে স্ত্রী আফিম খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে সেও বোঝা যায়, কিন্তু তাই বলে স্বামীকে একেবারে বাদ

দিয়ে স্ত্রী নিজের জোরে থাকবে এটাকে মোতির মা স্পর্ধা বলেই মনে করে। মেয়ে-জাতের এত গুমর কেন? মধুসূদন যত অযোগ্য হোক যত অন্যায় করুক, তবু সে তো পুরুষমানুষ; এক জায়গায় সে তার স্ত্রীর চেয়ে আপনিই বড়ো, সেখানে কোনো বিচার খাটে না। বিধাতার সঙ্গে মামলা করে জিতবে কে?

মোতির মা বললে, "একদিন ওখানে যেতে তো হবেই, আর তো রাস্তা নেই।"

"যেতে হবেই এ কথা ক্রীতদাস ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে খাটে না।"

"মন্ত্র পড়ে স্ত্রী যে কেনা হয়েই গেছে। সাত পাক যেদিন ঘোরা হল সেদিন সে যে দেহে মনে বাঁধা পড়ল, তার তো আর পালাবার জো রইল না। এ বাঁধন যে মরণের বাড়া। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন এ জন্মের মতো মেয়ের ভাগ্য তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যায় না।"

বিপ্রদাস বুঝতে পারলে মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এইজন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে বসে আছে। তার পরে কেবলই মরছে ভয়ে, কেবলই মরছে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলই খাচ্ছে মার, আর মনে করছে সেইটে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রীজন্মের সর্বোচ্চ চরিতার্থতা। না— মানুষের এত লাঞ্ছনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সমাজ যাকে এতদূর নামিয়ে দিলে সমাজকেই সে প্রতিদিন নামিয়ে দিচ্ছে।

বিপ্রদাসের খাটের পাশেই মেজের উপর কুমু মুখ নিচু করে বসে ছিল। বিপ্রদাস মোতির মাকে কিছু না বলে কুমুর মাথায় হাত দিয়ে বললে, "একটা কথা তোকে বলি কুমু, বোঝবার চেষ্টা করিস। ক্ষমতা জিনিসটা যেখানে পড়ে-পাওয়া জিনিস, যার কোনো যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবলই হীনতার সৃষ্টি করে। এ কথা তোকে অনেকবার বলেছি, তোর সংস্কার তুই কাটাতে পারিস নি, কষ্ট পেয়েছিস। তুই যখন বিশেষ করে ব্রাহ্মণভোজন করাতিস কোনোদিন বাধা দিই নি, কেবল বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, অবিচারে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নেওয়ার দ্বারা শুধু যে তারই অনিষ্ট তা নয়, তাতে করে সমাজে শ্রেষ্ঠতার আদর্শকেই খাটো করে। এরকম অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নিজেরই মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করি এ কথা কেউ ভাবে না কেন? তুই তো ইংরেজি সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছিস, বুঝতে পারছিস নে, এইরকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ

লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে। যত-সব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেছে, তারই বাসা ভাঙবার দিন এল।"

কুমু মাথা নিচু করেই বললে, "দাদা, তুমি কি বল স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে?"

"অন্যায় অতিক্রম করা মাত্রকেই দোষ দিচ্ছি। স্বামীও স্ত্রীকে অতিক্রম করবে না— এই আমার মত।"

"যদি করে, স্ত্রী কি তাই বলে—"

কুমুর কথা শেষ না হতেই বিপ্রদাস বললে, "স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে করে অন্যায় করা হবে। এমনি করে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে। অত্যাচারের পথ পাকা হয়েছে।"

মোতির মা একটু অধৈর্যের স্বরেই বললে, "আমাদের বউরানী সতীলক্ষ্মী, অপমান করলে সে অপমান ওঁকে স্পর্শ করতেও পারে না।"

বিপ্রদাসের কণ্ঠ এইবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, "তোমরা সতীলক্ষ্মীর কথাই ভাবছ। আর যে কাপুরুষ তাকে অবাধে অপমান করবার অধিকার পেয়ে সেটাকে প্রতিদিন খাটাচ্ছে তার দুর্গতির কথা ভাবছ না কেন?"

কুমু তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাসের চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে বুলোতে বললে, "দাদা, তুমি আর কথা কোয়ো না। তুমি যাকে মুক্তি বল, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারি নে। যতই ঘা খাই ঘুরে ফিরে আটকা পড়ি। তোমরা অনেক জান তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায়, আমরা অনেক মানি তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে। তুমি যখন বুঝিয়ে দাও তখন বুঝতে পারি হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা, আর ভুল ছাড়তে পারা কি একই? লতার আঁকড়ির মতো আমাদের মমত্ব সব কিছুকেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তার পরে আর তাকে ছাড়তে পারি নে।"

বিপ্রদাস বললে, "সেইজন্যেই তো সংসারে কাপুরুষের পূজার পূজারিনীর অভাব হয় না। তারা জানবার বেলা অপবিত্রকে অপবিত্র বলেই জানে, কিন্তু মানবার বেলায় তাকে পবিত্রের মতো করেই মানে।"

কুমু বললে, "কী করব দাদা, সংসারকে দুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে বলেই আমাদের সৃষ্টি। তাই আমরা গাছকেও আঁকড়ে ধরি, শুকনো কুটোকেও। গুরুকেও মানতে আমাদের যতক্ষণ লাগে, ভণ্ডকে মানতেও ততক্ষণ। জ্ঞান যে আমাদের নিজের ভিতরেই। দুঃখ থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে কে? সেইজন্যেই

ভাবি দুঃখ যদি পেতেই হয়, তাকে মেনে নিয়েও তাকে ছাড়িয়ে ওঠবার উপায় করতে হবে। তাই তো মেয়েরা এত করে ধর্মকে আশ্রয় করে থাকে।"

বিপ্রদাস কিছুই বললে না, চুপ করে বসে রইল।

সেই ওর চুপ করে বসে থাকাটাও কুমুকে কষ্ট দিলে। কুমু জানে কথা বলার চেয়েও এর ভার অনেক বেশি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মোতির মা কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কী ঠিক করলে বউরানী?"

কুমু বললে, "যেতে পারব না। তা ছাড়া, আমাকে তো ফিরে যাবার অনুমতি দেন নি।"

মোতির মা মনে মনে কিছু বিরক্তই হল। শ্বশুরবাড়ির প্রতি ওর শ্রদ্ধা যে বেশি তা নয়, তবু শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে দীর্ঘকালের মমত্ববোধ ওর হৃদয়কে অধিকার করে আছে। সেখানকার কোনো বউ যে তাকে লঙ্ঘন করবে এটা তার কিছুতেই ভালো লাগল না। কুমুকে যা বললে তার ভাবটা এই, পুরুষমানুষের প্রকৃতিতে দরদ কম আর তার অসংযম বেশি, গোড়া থেকেই এটা তো ধরা কথা। সৃষ্টি তো আমাদের হাতে নেই, যা পেয়েছি তাকে নিয়েই ব্যবহার করতে হবে। 'ওরা ওই রকমই' বলে মনটাকে তৈরি করে নিয়ে যেমন করে হোক সংসারটাকে চালানোই চাই। কেননা সংসারটাই মেয়েদের। স্বামী ভালোই হোক মন্দই হোক, সংসারটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তা যদি একেবারে অসম্ভব হয় তা হলে মরণ ছাড়া আর গতিই নেই।

কুমু হেসে বললে, "না হয় তাই হল। মরণের অপরাধ কী?"

মোতির মা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠল, "অমন কথা বোলো না।"

কুমু জানে না, অল্পদিন হল ওদেরই পাড়াতে একটি সতেরো বছরের বউ কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার এম. এ. পাস-করা স্বামী— গবর্মেণ্ট আপিসে বড়ো চাকরি করে। স্ত্রী খোঁপায় গোঁজবার একটা রুপোর চিরুনি হারিয়ে ফেলেছে, মার কাছ থেকে এই নালিশ শুনে লোকটা তাকে লাথি মেরেছিল। মোতির মার সেই কথা মনে পড়ে গায়ে কাঁটা দিলে।

এমন সময় নবীনের প্রবেশ। কুমু খুশি হয়ে উঠল। বললে, "জানতুম ঠাকুরপোর আসতে বেশি দেরি হবে না।"

নবীন হেসে বললে, "ন্যায়শাস্ত্রে বউরানীর দখল আছে, আগে দেখেছেন শ্রীমতী ধোঁয়াকে, তার থেকে শ্রীমান আগুনের আবির্ভাব হিসেব করতে শক্ত ঠেকে নি।"

মোতির মা বললে, "বউরানী, তুমিই ওকে নাই দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছ। ও বুঝে নিয়েছে ওকে দেখলে তুমি খুশি হও, সেই দেমাকে—"

"আমাকে দেখলেও খুশি হতে পারেন যিনি, তাঁর কি কম ক্ষমতা? যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও নিজের হাতের কাজ দেখে অনুতাপ করেন, আর যিনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন তাঁর মনের ভাব দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!"

"ঠাকুরপো, তোমরা দু জনে মিলে কথা-কাটাকাটি করো, তৃতীয় ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ করতে চায় না, আমি এখন চললুম।"

মোতির মা বললে, "সে কী কথা ভাই! এখানে তৃতীয় ব্যক্তিটা কে? তুমি না আমি? গাড়িভাড়া করে ও কি আমাকে দেখতে এসেছে ভেবেছ?"

"না, ওর জন্যে খাবার বলে দিই গে।" বলে কুমু চলে গেল।

৫২

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু খবর আছে বুঝি?"

"আছে। দেরি করতে পারলুম না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলুম। তুমি তো চলে এলে, তার পরে দাদা হঠাৎ আমার ঘরে এসে উপস্থিত। মেজাজটা খুবই খারাপ। সামান্য দামের একটা গিল্টি-করা চুরোটের ছাইদান টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়েছে। সম্প্রতি যার অধিকারে সেটা এসেছে তিনি নিশ্চয়ই সেটাকে সোনা বলেই ঠাউরেছেন, নইলে পরকাল খোয়াতে যাবেন কোন্ সাধে। জান তো তুচ্ছ একটা জিনিস নড়ে গেলে দাদার বিপুল সম্পত্তির ভিতটাতে যেন নাড়া লাগে, সে তিনি সইতে পারেন না। আজ সকালে আপিসে যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন শ্যামাকে দেশে পাঠাতে। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই সেই পবিত্র কাজে লেগেছিলুম। ঠিক করেছিলুম তিনি আপিস থেকে ফেরবার আগেই কাজ সেরে রাখব। এমন সময়ে বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ দাদা একদমে আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন। বললেন, এখনকার মতো থাক্। যেই ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছেন, আমার ডেস্কের উপর বউরানীর সেই ছবিটি চোখে পড়ল। থমকে গেলেন। বুঝলুম আড়-চাহনিটাকে সিধে করে নিয়ে ছবিটিকে দেখতে দাদার লজ্জা বোধ হচ্ছে। বললুম, "দাদা, একটু বোসো, একটা ঢাকাই কাপড় তোমাকে দেখাতে চাই। মোতির মার ছোটো ভাজের সাধ, তাই তাকে

দিতে হবে। কিন্তু গণেশরাম দামে আমাকে ঠকাচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে সেটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই। আমার যতটা আন্দাজ তাতে মনে হয় না তো তেরো টাকা তার দাম হতে পারে। খুব বেশি হয় তো ন-টাকা সাড়ে ন-টাকার মধ্যেই হওয়া উচিত।"

মোতির মা অবাক হয়ে বললে, "ও আবার তোমার মাথায় কোথা থেকে এল? আমার ছোটো ভাজের সাধ হবার কোনো উপায়ই নেই। তার কোলের ছেলেটির বয়স তো সবে দেড় মাস। বানিয়ে বলতে তোমার আজকাল দেখছি কিছুই বাধে না। এই তোমার নতুন বিদ্যে পেলে কোথায়?"

"যেখান থেকে কালিদাস তাঁর কবিত্ব পেয়েছেন, বাণী বীণাপাণির কাছ থেকে।"

"বীণাপাণি তোমাকে যতক্ষণ না ছাড়েন ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে ঘর করা যে দায় হবে।"

"পণ করেছি, স্বর্গারোহণকালে নরকদর্শন করে যাব, বউরানীর চরণে এই আমার দান।"

"কিন্তু সাড়ে ন-টাকা দামের ঢাকাই কাপড় তখনই-তখনই তোমার জুটল কোথায়?"

"কোথাও না। কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এসে বললুম, গণেশরাম সে কাপড় আমাকে না বলেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দাদার মুখ দেখে বুঝলুম, ইতিমধ্যে ছবিটা তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকে স্বপ্নের রূপ ধরেছে। কী জানি কেন, পৃথিবীতে আমারই কাছে দাদার একটু আছে চক্ষুলজ্জা, আর কারও হলে ছবিটা ধাঁ করে তুলে নিতে তাঁর বাধত না।"

"তুমিও তো লোভী কম নও। দাদাকে না হয় সেটা দিতেই।"

"তা দিয়েছি, কিন্তু সহজ মনে দিই নি। বললেম, দাদা, এই ছবিটা থেকে একটা অয়েলপেন্টিং করিয়ে নিয়ে তোমার শোবার ঘরে রেখে দিলে হয় না? দাদা যেন উদাসীনভাবে বললে, আচ্ছা দেখা যাবে। বলেই ছবিটা নিয়ে উপরের ঘরে চলে গেল। তার পরে কী হল ঠিক জানি নে। বোধ করি আপিসে যাওয়া হয় নি, আর ওই ছবিটাও ফিরে পাবার আশা রাখি নে।"

"তোমার বউরানীর জন্যে স্বর্গটাই খোওয়াতে যখন রাজি আছ, তখন না হয় একখানা ছবিই বা খোওয়ালে।"

"স্বর্গটা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ছবিটা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ ছিল না। এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে দুর্লভ লগ্নে ওঁর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ নেমেছিল ঠিক সেই

শুভযোগটি ওই ছবিতে ধরা পড়ে গেছে। এক-একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে ওই ছবিটি দেখেছি। প্রদীপের আলোয় ওর ভিতরকার রূপটি যেন আরও বেশি করে দেখা যায়।"

"দেখো, আমার কাছে অত বাড়াবাড়ি করতে তোমার একটুও ভয় নেই ?"

"ভয় যদি থাকত তা হলেই তোমার ভাবনার কথাও থাকত। ওঁকে দেখে আমার আশ্চর্য কিছুতে ভাঙে না। মনে করি আমাদের ভাগ্যে এটা সম্ভব হল কী করে ? আমি যে ওঁকে বউরানী বলতে পারছি এ ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। আর উনি যে সামান্য নবীনের মতো মানুষকেও হাসিমুখে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এও এত সহজ হল কী করে ? আমাদের পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য আমার দাদা। যাকে সহজে পেলেন তাকে কঠিন করে বাঁধতে গিয়েই হারালেন।"

"বাস্ রে, বউরানীর কথায় তোমার মুখ যখন খুলে যায় তখন থামতে চায় না।"

"মেজোবউ, জানি তোমার মনে একটুখানি বাজে।"

"না, কক্‌খনো না।"

"হাঁ, অল্প একটু। কিন্তু এই উপলক্ষে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। নুরনগরে স্টেশনে প্রথম বউরানীর দাদাকে দেখে যে-সব কথা বলেছিলে চলতি ভাষায় তাকেও বাড়াবাড়ি বলা চলে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ও-সব তর্ক থাক্, এখন কী বলতে চাচ্ছিলে বলো।"

"আমার বিশ্বাস আজকালের মধ্যেই দাদা বউরানীকে ডেকে পাঠাবেন। বউরানী যে এত আগ্রহে বাপের বাড়ি চলে এলেন, আর তার পর থেকে এতদিন ফেরবার নাম নেই, এতে দাদার প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে তা জানি। দাদা কিছুতেই বুঝতে পারেন না সোনার খাঁচাতে পাখির কেন লোভ নেই। নির্বোধ পাখি, অকৃতজ্ঞ পাখি!"

"তা ভালোই তো, বড়োঠাকুর ডেকেই পাঠান-না। সেই কথাই তো ছিল।"

"আমার মনে হয়, ডাকবার আগেই বউরানী যদি যান ভালো হয়, দাদার ওইটুকু অভিমানের না হয় জিত রইল। তা ছাড়া বিপ্রদাসবাবু তো চান বউরানী তাঁর সংসারে ফিরে যান, আমিই নিষেধ করেছিলুম।"

বিপ্রদাসের সঙ্গে এই নিয়ে আজ কী কথা হয়েছে মোতির মা তার কোনো আভাস দিলে না। বললে, "বিপ্রদাসবাবুর কাছে গিয়ে বলোই-না।"

"তাই যাই, তিনি শুনলে খুশি হবেন।"

এমন সময় কুমু দরজার বাইরে থেকে বললে, "ঘরে ঢুকব কি ?"

মোতির মা বললে, "তোমার ঠাকুরপো পথ চেয়ে আছেন।"

"জন্ম জন্ম পথ চেয়ে ছিলুম, এইবার দর্শন পেলুম।"

"আঃ ঠাকুরপো! এত কথা তুমি বানিয়ে বলতে পার কী করে?"

"নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই, বুঝতে পারি নে।"

"আচ্ছা, চলো এখন খেতে যাবে।"

"খাবার আগে একবার তোমার দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা কয়ে আসি গে।"

"না, সে হবে না।"

"কেন?"

"আজ দাদা অনেক কথা বলেছেন, আজ আর নয়।"

"ভালো খবর আছে।"

"তা হোক, কাল এসো বরঞ্চ। আজ কোনো কথা নয়।"

"কাল হয়তো ছুটি পাব না, হয়তো বাধা ঘটবে। দোহাই তোমার, আজ একবার কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে। তোমার দাদা খুশি হবেন, কোনো ক্ষতি হবে না তাঁর।"

"আচ্ছা, আগে তুমি খেয়ে নাও, তার পরে হবে।"

খাওয়া হয়ে গেলে পর কুমু নবীনকে বিপ্রদাসের ঘরে নিয়ে এল। দেখলে দাদা তখনও ঘুমোয় নি। ঘর প্রায় অন্ধকার, আলোর শিখা ম্লান। খোলা জানলা দিয়ে তারা দেখা যায়; থেকে থেকে হু হু করে বইছে দক্ষিণের হাওয়া; ঘরের পর্দা, বিছানার ঝালর, আলনায় ঝোলানো বিপ্রদাসের কাপড় নানারকম ছায়া বিস্তার করে কেঁপে কেঁপে উঠছে; মেজের উপর খবরের কাগজের একটা পাতা যখন-তখন এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে। আধ-শোওয়া অবস্থায় বিপ্রদাস স্থির হয়ে বসে। এগোতে নবীনের পা সরে না। প্রদোষের ছায়া আর রোগের শীর্ণতা বিপ্রদাসকে একটা আবরণ দিয়েছে, মনে হচ্ছে ও যেন সংসার থেকে অনেক দূর, যেন অন্য লোকে। মনে হল ওর মতো এমনতরো একলা মানুষ আর জগতে নেই।

নবীন এসে বিপ্রদাসের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে চাই নে। একটি কথা বলে যাব। সময় হয়েছে, এইবার বউরানী ঘরে ফিরে আসবেন বলে আমরা চেয়ে আছি।"

বিপ্রদাস কোনো উত্তর করলে না, স্থির হয়ে বসে রইল।

খানিক পরে নবীন বললে, "আপনার অনুমতি পেলেই ওঁকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।"

ইতিমধ্যে কুমু ধীরে ধীরে দাদার পায়ের কাছে এসে বসেছে। বিপ্রদাস তার মুখের উপর দৃষ্টি রেখে বললে, "মনে যদি করিস তোর যাবার সময় হয়েছে তা হলে যা কুমু।"

কুমু বললে, "না দাদা, যাব না।" বলে বিপ্রদাসের হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

ঘর স্তব্ধ, কেবল থেকে থেকে দমকা বাতাসে একটা শিথিল জানলা খড়্ খড়্ করছে, আর বাইরে বাগানে গাছের পাতাগুলো মর্মরিয়ে উঠছে।

কুমু একটু পরে বিছানা থেকে উঠেই নবীনকে বললে, "চলো আর দেরি নয়। দাদা, তুমি ঘুমোও।"

মোতির মা বাড়িতে ফিরে এসে বললে, "এতটা কিন্তু ভালো না।"

"অর্থাৎ চোখে খোঁচা দেওয়াটা যেমনি হোক-না, চোখটা রাঙা হয়ে ওঠা একেবারেই ভালো নয়।"

"না গো না, ওটা ওঁদের দেমাক। সংসারে ওঁদের যোগ্য কিছুই মেলে না, ওঁরা সবার উপরে।"

"মেজোবউ, এতবড়ো দেমাক সবাইকে সাজে না, কিন্তু ওঁদের কথা আলাদা।"

"তাই বলে কি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করতে হবে!"

"আত্মীয়স্বজন বললেই আত্মীয়স্বজন হয় না। ওঁরা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আর-এক শ্রেণীর মানুষ। সম্পর্ক ধরে ওঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে আমার সংকোচ হয়।"

"যিনি যতবড়ো লোকই হোন-না কেন, তবু সম্পর্কের জোর আছে এটা মনে রেখো।"

নবীন বুঝতে পারলে এই আলোচনার মধ্যে কুমুর 'পরে মোতির মার একটুখানি ঈর্ষার ঝাঁজও আছে। তা ছাড়া এটাও সত্যি, পারিবারিক বাঁধনটার দাম মেয়েদের কাছে খুবই বেশি। তাই নবীন এ নিয়ে বৃথা তর্ক না করে বললে, "আর কিছুদিন দেখাই যাক-না। দাদার আগ্রহটাও একটু বেড়ে উঠুক, তাতে ক্ষতি হবে না।"

৫৩

মধুসূদনের সংসারে তার স্থানটা পাকা হয়েছে বলেই শ্যামাসুন্দরী প্রত্যাশা করতে পারত, কিন্তু সে কথা অনুভব করতে পারছে না। বাড়ির চাকরবাকরদের 'পরে ওর কর্তৃত্বের দাবি জন্মেছে বলে প্রথমটা ও মনে করেছিল, কিন্তু পদে পদে বুঝতে পারছে যে তারা ওকে মনে মনে প্রভুপদে বসাতে রাজি নয়। ওকে সাহস করে

প্রকাশ্যে অবজ্ঞা দেখাতে পারলে তারা যেন বাঁচে এমনি অবস্থা। সেইজন্যেই শ্যামা তাদেরকে যখন তখন অনাবশ্যক ভর্ৎসনা ও অকারণে ফরমাশ ক'রে কেবলই তাদের দোষত্রুটি ধরে। খিট্‌ খিট্‌ করে। বাপ মা তুলে গাল দেয়। কিছুদিন পূর্বে এই বাড়িতেই শ্যামা নগণ্য ছিল, সেই স্মৃতিটাকে সংসার থেকে মুছে ফেলবার জন্যে খুব কড়াভাবে মাজাঘষার কাজ করতে গিয়ে দেখে যে সেটা সয় না। বাড়ির একজন পুরোনো চাকর শ্যামার তর্জন না সইতে পেরে কাজে ইস্তফা দিলে। তাই নিয়ে শ্যামাকে মাথা হেঁট করতে হল। তার কারণ, নিজের ধনভাগ্য সম্বন্ধে মধুসূদনের কতকগুলো অন্ধ সংস্কার আছে। যে-সব চাকর তার আর্থিক উন্নতির সমকালবর্তী, তাদের মৃত্যু বা পদত্যাগকে ও দুর্লক্ষণ মনে করে। অনুরূপ কারণেই সেই সময়কার একটা মসীচিহ্নিত অত্যন্ত পুরোনো ডেস্ক অসংগতভাবে আপিসঘরে হাল আমলের দামি আসবাবের মাঝখানেই অসংকোচে প্রতিষ্ঠিত আছে, তার উপরে সেই সেদিনকারই দস্তার দোয়াত আর একটা সস্তা বিলিতি কাঠের কলম, যে কলমে সে. তার ব্যবসায়ের নবযুগে প্রথম বড়ো একটা দলিলে নাম সই করেছিল। সেই সময়কার উড়ে চাকর দধি যখন কাজে জবাব দিলে মধুসূদন সেটা গ্রাহ্যই করলে না, উলটে সে লোকটার ভাগ্যে বকশিশ জুটে গেল। শ্যামাসুন্দরী এই নিয়ে ঘোরতর অভিমান করতে গিয়ে দেখে হালে পানি পায় না। দধির হাসিমুখ তাকে দেখতে হল। শ্যামার মুশকিল এই মধুসূদনকে সে সত্যিই ভালোবাসে, তাই মধুসূদনের মেজাজের উপর বেশি চাপ দিতে ওর সাহস হয় না, সোহাগ কোন্‌ সীমায় স্পর্ধায় এসে পৌঁছোবে খুব ভয়ে ভয়ে তারই আন্দাজ করে চলে। মধুসূদনও নিশ্চিত জানে শ্যামার সম্বন্ধে সময় বা ভাবনা নষ্ট করবার দরকার নেই। আদর-আবদার-ঘটিত অপব্যয়ের পরিমাণ সংকোচ করলেও দুর্ঘটনার আশঙ্কা অল্প। অথচ শ্যামাকে নিয়ে ওর একটা স্থূল রকম মোহ আছে, কিন্তু সেই মোহকে ষোলো আনা ভোগে লাগিয়েও তাকে অনায়াসে সামলিয়ে চলতে পারে এই আনন্দে মধুসূদন উৎসাহ পায়— এর ব্যতিক্রম হলে বন্ধন ছিঁড়ে যেত। কর্মের চেয়ে মধুসূদনের কাছে বড়ো কিছু নেই। সেই কর্মের জন্যে ওর সবচেয়ে দরকার অবিচলিত আত্মকর্তৃত্ব। তারই সীমার মধ্যে শ্যামার কর্তৃত্ব প্রবেশ করতে সাহস পায় না. অল্প একটু পা বাড়াতে গিয়ে উঁচোট খেয়ে ফিরে আসে। শ্যামা তাই কেবলই আপনাকে দানই করে, দাবি করতে গিয়ে ঠকে। টাকাকড়ি-সাজসরঞ্জামে শ্যামা চিরদিন বঞ্চিত— তার 'পরে ওর লোভের অন্ত নেই। এতেও তাকে পরিমাণ রক্ষা করে চলতে হয়। এতবড়ো ধনীর কাছে যা অনায়াসে প্রত্যাশা করতে পারত তাও ওর পক্ষে দুরাশা। মধুসূদন

মাঝে মাঝে এক-একদিন খুশি হয়ে ওকে কাপড়চোপড় গহনাপত্র কিছু কিছু এনে দেয়, তাতে ওর সংগ্রহের ক্ষুধা মেটে না। ছোটোখাটো লোভের সামগ্রী আত্মসাৎ করবার জন্যে কেবলই হাত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেখানেও বাধা। এই-রকমেরই একটা সামান্য উপলক্ষে কিছুদিন আগে ওর নির্বাসনের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু শ্যামার সঙ্গ ও সেবা মধুসূদনের অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল— পানতামাকের অভ্যাসেরই মতো সস্তা অথচ প্রবল। সেটাতে ব্যাঘাত ঘটলে মধুসূদনের কাজেরই ব্যাঘাত ঘটবে আশঙ্কায় এবারকার মতো শ্যামার দণ্ড রদ হল। কিন্তু দণ্ডের ভয় মাথার উপর ঝুলতে লাগল।

নিজের এইরকম দুর্বল অধিকারের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর মনে একটা আশঙ্কা লেগেই ছিল কবে আবার কুমু আপন সিংহাসনে ফিরে আসে। এই ঈর্ষার পীড়নে তার মনে একটুও শান্তি নেই। জানে কুমুর সঙ্গে ওর প্রতিযোগিতা চলবেই না, ওরা এক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নেই। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত, সেইখানেই তার অসীম জোর; আর শ্যামা তার এত বেশি আয়ত্তের মধ্যে যে, তার ব্যবহার আছে মূল্য নেই। এই নিয়ে শ্যামা অনেক কান্নাই কেঁদেছে, কতবার মনে করেছে আমার মরণ হলেই বাঁচি। কপাল চাপড়ে বলেছে এত বেশি সস্তা হলুম কেন? তার পরে ভেবেছে সস্তা বলেই জায়গা পেলুম, যার দর বেশি তার আদর বেশি, যে সস্তা সে হয়তো সস্তা বলেই জেতে।

মধুসূদন যখন শ্যামাকে গ্রহণ করে নি তখন শ্যামার এত অসহ্য দুঃখ ছিল না। সে আপন উপবাসী ভাগ্যকে একরকম করে মেনে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে সামান্য খোরাককেই যথেষ্ট মনে হত। আজ অধিকার পাওয়া আর না-পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য কিছুতেই ঘটছে না। হারাই হারাই ভয়ে মন আতঙ্কিত। ভাগ্যের রেল-লাইন এমন কাঁচা করে পাতা যে, ডিরেলের ভয় সর্বত্রই এবং প্রতি মুহূর্তেই। মোতির মার কাছে মন খোলাখুলি করে সান্ত্বনা পাবার জন্যে একবার চেষ্টা করেছিল। সে এমনি একটা ঝাঁঝের সঙ্গে মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে যে, তার একটা কোনো সাংঘাতিক শোধ তুলতে পারলে এখনই তুলত, কিন্তু জানে সংসার-ব্যবস্থায় মধুসূদনের কাছে মোতির মার দাম আছে, সেখানে একটুও নাড়া সইবে না। সেই অবধি দুজনের কথা বন্ধ, পারতপক্ষে মুখ দেখাদেখি নেই। এমনি করে এ বাড়িতে শ্যামার স্থান পূর্বের চেয়ে আরও সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কোথাও তার একটুও স্বচ্ছন্দতা নেই।

এমন সময় একদিন সন্ধেবেলায় শোবার ঘরে এসে দেখে টেবিলের উপর

দেয়ালে হেলানো কুমুর ফোটোগ্রাফ। যে বজ্র মাথায় পড়বে তারই বিদ্যুৎশিখা ওর চোখে এসে পড়ল। যে মাছকে বঁড়শি বিঁধেছে তারই মতো করে ওর বুকের ভিতরটা ধড়্ফড়্‌ ধড়্ফড়্‌ করতে লাগল। ইচ্ছা করে ছবিটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, পারে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকল, মুখ বিবর্ণ, দুই চোখে একটা দাহ, মুঠো দৃঢ় করে বন্ধ। একটা কিছু ভাঙতে, একটা কিছু ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এ ঘরে থাকলে এখনই কিছু একটা লোকসান করে ফেলবে এই ভয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আপনার ঘরে গিয়ে বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে চাদরখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে।

রাত হয়ে এল। বাইরে থেকে বেহারা খবর দিলে মহারাজ শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন। বলবার শক্তি নেই যে যাব না। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে একটা বুটিদার ঢাকাই শাড়ি পরে গায়ে একটু গন্ধ মেখে গেল শোবার ঘরে। ছবিটা যাতে চোখে না পড়ে এই তার চেষ্টা। কিন্তু ঠিক সেই ছবিটার সামনেই বাতি— সমস্ত আলো যেন কারও দীপ্ত দৃষ্টির মতো ওই ছবিকে উদ্‌ভাসিত করে আছে। সমস্ত ঘরের মধ্যে ওই ছবিটিই সবচেয়ে দৃশ্যমান। শ্যামা নিয়মমত পানের বাটা নিয়ে মধুসূদনকে পান দিলে, তার পরে পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যে-কোনো কারণেই হোক আজ মধুসূদন প্রসন্ন ছিল। বিলাতি দোকানের থেকে একটা রুপোর ফোটোগ্রাফের ফ্রেম কিনে এনেছিল। গম্ভীরভাবে শ্যামাকে বললে, "এই নাও।" শ্যামাকে সমাদর করবার উপলক্ষেও মধুসূদন মধুর রসের অবতারণায় যথেষ্ট কার্পণ্য করে। কেননা সে জানে ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিলেই ও আর মর্যাদা রাখতে পারে না। ব্রাউন কাগজে জিনিসটা মোড়া ছিল। আস্তে আস্তে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলে বললে, "কী হবে এটা ?"

মধুসূদন বললে, "জান না, এতে ফোটোগ্রাফ রাখতে হয়।"

শ্যামার বুকের ভিতরটাতে কে যেন চাবুক চালিয়ে দিলে, বললে, "কার ফোটোগ্রাফ রাখবে ?"

"তোমার নিজের। সেদিন সেই যে ছবিটা তোলানো হয়েছে।"

"আমার এত সোহাগে কাজ নেই।" বলে সেই ফ্রেমটা ছুঁড়ে মেজের উপর ফেলে দিলে।

মধুসূদন আশ্চর্য হয়ে বললে, "এর মানে কী হল ?"

"এর মানে কিছুই নেই।" বলে মুখে হাত দিয়ে কেঁদে উঠল, তার পরে বিছানা থেকে মেজের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল। মধুসূদন ভাবল, শ্যামার কম দামের

জিনিস পছন্দ হয় নি, ওর বোধ করি ইচ্ছে ছিল একটা দামি গয়না পায়। সমস্ত দিন আপিসের কাজ সেরে এসে এই উপদ্রবটা একটুও ভালো লাগল না। এ যে প্রায় হিস্‌টিরিয়া। হিস্‌টিরিয়ার 'পরে ওর বিষম অবজ্ঞা। খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, "ওঠো বলছি, এখনই ওঠো !"

শ্যামা উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। মধুসূদন বললে, "এ কিছুতেই চলবে না।"

মধুসূদন শ্যামাকে বিশেষ ভাবেই জানে। নিশ্চয় ঠাওরেছিল একটু পরেই ফিরে এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে মাপ চাইবে— সেই সময়ে খুব শক্ত করে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে হবে।

দশটা বাজল শ্যামা এল না। আর-একবার শ্যামার ঘরের দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এল, "মহারাজ বোলায়া।"

শ্যামা বললে, "মহারাজকে বলো আমার অসুখ করেছে।"

মধুসূদন ভাবলে, আস্পর্ধা তো কম নয়, হুকুম করলে আসে না।

মনে ঠিক করে রেখেছিল আরও খানিক বাদে আসবে। তাও এল না। এগারোটা বাজতে মিনিট পনেরো বাকি। বিছানা ছেড়ে মধুসূদন দ্রুতপদে শ্যামার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখলে ঘরে আলো নেই। অন্ধকারে বেশ দেখা গেল— শ্যামা মেজের উপর পড়ে আছে। মধুসূদন ভাবলে এ-সমস্ত কেবল আদর কাড়বার জন্যে।

গর্জন করে বললে, "উঠে এসো বলছি, শীঘ্র উঠে এসো। ন্যাকামি কোরো না।"

শ্যামা কিছু না বলে উঠে এল।

৫৪

পরদিন আপিসে যাবার আগে খাবার পরে শোবার ঘরে বিশ্রাম করতে এসেই মধুসূদন দেখলে ছবিটি নেই। অন্যদিনের মতো আজ শ্যামা পান নিয়ে মধুসূদনের সেবার জন্যে আগে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। আজ সে অনুপস্থিতও। তাকে ডেকে পাঠানো হল। বেশ বোঝা গেল একটু কুণ্ঠিতভাবেই সে এল। মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "টেবিলের উপর ছবি ছিল, কী হল ?"

শ্যামা অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান করে বললে, "ছবি ! কার ছবি ?"

ভানের পরিমাণটা কিছু বেশি হয়ে পড়ল। সাধারণত পুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তির 'পরে মেয়েদের অশ্রদ্ধা আছে বলেই এতটা সম্ভব হয়েছিল।

মধুসূদন ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "ছবিটা দেখ নি!"

শ্যামা নিতান্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললে, "না, দেখি নি তো।"

মধুসূদন গর্জন করে বলে উঠল, "মিথ্যে কথা বলছ।"

"মিথ্যে কথা কেন বলব, ছবি নিয়ে আমি করব কী?"

"কোথায় রেখেছ বের করে নিয়ে এসো বলছি। নইলে ভালো হবে না।"

"ওমা, কী আপদ! তোমার ছবি আমি কোথায় পাব যে বের করে আনব?"

বেহারাকে ডাক পড়ল। মধু তাকে বললে, "মেজোবাবুকে ডেকে আনো।"

নবীন এল। মধুসূদন বললে, "বড়োবউকে আনিয়ে নাও।"

শ্যামা মুখ বাঁকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে বসে রইল।

নবীন খানিকক্ষণ পরে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "দাদা, ওখানে একবার কি তোমার নিজে যাওয়া উচিত হবে না? তুমি আপনি গিয়ে যদি বল তা হলে বউরানী খুশি হবেন।"

মধুসূদন গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ গুড়গুড়ি টেনে বললে, "আচ্ছা, কাল রবিবার আছে, কাল যাব।"

নবীন মোতির মার কাছে এসে বললে, "একটা কাজ করে ফেলেছি।"

"আমার পরামর্শ না নিয়েই?"

"পরামর্শ নেবার সময় ছিল না।"

"তা হলে তো দেখছি তোমাকে পস্তাতে হবে।"

"অসম্ভব নয়। কুষ্ঠিতে আমার বুদ্ধিস্থানে আর কোনো গ্রহ নেই, আছেন নিজের স্ত্রী। এইজন্যে সর্বদা তোমাকে হাতের কাছে রেখেই চলি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই— দাদা আজ হুকুম করলেন বউরানীকে আনানো চাই। আমি ফস্ করে বলে বসলেম, তুমি নিজে গিয়ে যদি কথাটা তোল ভালো হয়। দাদা কী মেজাজে ছিলেন রাজি হয়ে গেলেন। তার পর থেকেই ভাবছি এর ফলটা কী হবে।"

"ভালো হবে না। বিপ্রদাসবাবুর যেরকম ভাবখানা দেখলুম কী বলতে কী বলবেন, শেষকালে কুরুক্ষেত্রের লড়াই বেধে যাবে। এমন কাজ করলে কেন?"

"প্রথম কারণ বুদ্ধির কোঠা ঠিক সেই সময়টাতেই শূন্য ছিল, তুমি ছিলে অন্যত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, সেদিন বউরানী যখন বললেন, 'আমি যাব না', তার ভিতরকার মানেটা বুঝেছিলুম। তাঁর দাদা রুগ্ন শরীর নিয়ে কলকাতায় এলেন তবু একদিনের জন্যে মহারাজ দেখতে গেলেন না, এই অনাদরটা তাঁর মনে সবচেয়ে বেজেছিল।"

শুনেই মোতির মা একটু চমকে উঠল, কথাটা কেন যে আগে তার মনে

পড়ে নি এইটেই তার আশ্চর্য লাগল। আসলে নিজের অগোচরেও শ্বশুরবাড়ির মাহাত্ম্য নিয়ে ওর একটা অহংকার আছে। অন্য সাধারণ লোকের মতো মহারাজ মধুসূদনেরও কুটুম্বিতার দায়িত্ব আছে এ কথা তার মন বলে না।

সেদিনকার তর্কের অনুবৃত্তিস্বরূপে নবীন একটুখানি টিপ্পনী দিয়ে বললে, "নিজের বুদ্ধিতে কথাটা আমার হয়তো মনে আসত না, তুমিই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে।"

"কী রকম শুনি ?"

"ওই যে সেদিন বললে, কুটুম্বিতার দায়িত্ব আত্মমর্যাদার দায়িত্বের চেয়েও বড়ো। তাই মনে করতে সাহস হল যে মহারাজার মতো অতবড়ো লোকেরও বিপ্রদাসবাবুকে দেখতে যাওয়া উচিত।"

মোতির মা হার মানতে রাজি নয়, কথাটাকে উড়িয়ে দিলে, "কাজের সময় এত বাজে কথাও বলতে পার ! কী করা উচিত এখন সেই কথাটা ভাবো দেখি।"

"গোড়াতেই সকল কথার শেষ পর্যন্ত ভাবতে গেলে ঠকতে হয়। আশু ভাবা উচিত প্রথম কর্তব্যটা কী। সেটা হচ্ছে বিপ্রদাসবাবুকে দাদার দেখতে যাওয়া। দেখতে গিয়ে তার ফলে যা হতে পারে তার উপায় এখনই চিন্তা করতে বসলে তাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হবে, কিন্তু সেটা হবে অতিচিন্তাশীলতা।"

"কী জানি আমার বোধ হচ্ছে মুশকিল বাধবে।"

৫৫

সেদিন সকালে অনেকক্ষণ ধরে কুমু তার দাদার ঘরে বসে গানবাজনা করেছে। সকালবেলাকার সুরে নিজের ব্যক্তিগত বেদনা বিশ্বের জিনিস হয়ে অসীমরূপে দেখা দেয়। তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। সাপগুলো যেন মহাদেবের জটায় প্রকাশ পায় ভূষণ হয়ে। ব্যথার নদীগুলি ব্যথার সমুদ্রে গিয়ে বৃহৎ বিরাম লাভ করে। তার রূপ বদলে যায়, চঞ্চলতা লুপ্ত হয় গভীরতায়। বিপ্রদাস নিশ্বাস ছেড়ে বললে, "সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয় কুমু, চিরকালটা থাকে আড়ালে ; গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।"

এমন সময়ে খবর এল, 'মহারাজ মধুসূদন এসেছেন।'

এক মুহূর্তে কুমুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ; তাই দেখে বিপ্রদাসের মনে বড়ো বাজল, বললে, "কুমু, তুই বাড়ির ভিতরে যা। তোকে হয়তো দরকার হবে না।"

কুমু দ্রুতপদে চলে গেল। মধুসূদন ইচ্ছে করেই খবর না দিয়েই এসেছে। এ পক্ষ আয়োজনের দৈন্য ঢাকা দেবার অবকাশ না পায় এটা তার সংকল্পের মধ্যে। বড়ো ঘরের লোক বলে বিপ্রদাসের মনের মধ্যে একটা বড়াই আছে বলে মধুসূদনের বিশ্বাস। সেই কল্পনাটা সে সইতে পারে না। তাই আজ সে এমনভাবে এল যেন দেখা করতে আসে নি, দেখা দিতে এসেছে।

মধুসূদনের সাজটা ছিল বিচিত্র, বাড়ির চাকরদাসীরা অভিভূত হবে এমনতরো বেশ। ডোরাকাটা বিলিতি শার্টের উপর একটা রঙিন ফুলকাটা ওয়েস্টকোট, কাঁধের উপর পাট-করা চাদর, যত্নে কোঁচানো কালাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি, বার্নিশ-করা কালো দরবারি জুতো, বড়ো বড়ো হীরেপান্নাওআলা আংটিতে আঙুল ঝল্‌মল্‌ করছে। প্রশস্ত উদরের পরিধি বেষ্টন করে মোটা সোনার ঘড়ির শিকল, হাতে একটি শৌখিন লাঠি, তার সোনার হাতলটি হাতির মুণ্ডের আকারে নানা জহরতে খচিত। একটা অসমাপ্ত নমস্কারের দ্রুত আভাস দিয়ে খাটের পাশের একটা কেদারায় বসে বললে, "কেমন আছেন বিপ্রদাসবাবু, শরীরটা তো তেমন ভালো দেখাচ্ছে না।"

বিপ্রদাস তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, "তোমার শরীর ভালোই আছে দেখছি।"

"বিশেষ ভালো যে তা বলতে পারি নে— সন্ধের দিকটা মাথা ধরে, আর খিদেও ভালো হয় না। খাওয়াদাওয়ার অল্প একটু অযত্ন হলেই সইতে পারি নে। আবার অনিদ্রাতেও মাঝে মাঝে ভুগি, ওইটেতে সবচেয়ে দুঃখ দেয়।"

শুশ্রূষার লোকের যে সর্বদা দরকার তারই ভূমিকা পাওয়া গেল।

বিপ্রদাস বললে, "বোধ করি আপিসের কাজ নিয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে।"

"এমনিই কী! আপিসের কাজকর্ম আপনিই চলে যাচ্ছে, আমাকে বড়ো কিছু দেখতে হয় না। ম্যাক্‌নটন্‌ সাহেবের উপরেই বেশির ভাগ কাজের ভার, সার আর্থর পীবডিও আমাকে অনেকটা সাহায্য করেন।"

গুড়গুড়ি এল, পানের বাটায় পান ও মসলা নিয়ে চাকর এসে দাঁড়াল, তার থেকে একটি ছোটো এলাচ নিয়ে মুখে পুরল, আর কিছু নিলে না। গুড়গুড়ির নল নিয়ে দুই-একবার মৃদু মৃদু টান দিলে। তার পরে গুড়গুড়ির নলটা বাঁ হাতে কোলের উপরেই ধরা রইল। আর তার ব্যবহার হল না। অন্তঃপুর থেকে খবর এল জলখাবার প্রস্তুত। ব্যস্ত হয়ে বললে, "ওইটি তো পারব না। আগেই তো বলেছি, খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে খুব ধরকাট করেই চলতে হয়।"

বিপ্রদাস দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলে না। চাকরকে বললে, "পিসিমাকে বলো গে, ওঁর শরীর ভালো নেই, খেতে পারবেন না।"

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। মধুসূদন আশা করেছিল, কুমুর কথা আপনিই উঠবে। এতদিন হয়ে গেল, এখন কুমুকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব বিপ্রদাস আপনিই উদ্বিগ্ন হয়ে করবে— কিন্তু কুমুর নামও করে না যে! ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে রাগ জন্মাতে লাগল। ভাবলে এসে ভুল করেছি। সমস্ত নবীনের কাণ্ড। এখনই গিয়ে তাকে খুব একটা কড়া শাস্তি দেবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

এমন সময় সাদাসিধে সরু কালাপেড়ে একখানি শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা টেনে কুমু ঘরে প্রবেশ করলে। বিপ্রদাস এটা আশা করে নি। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রথমে স্বামীর, পরে দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে কুমু মধুসূদনকে বললে, "দাদার শরীর ক্লান্ত, ওঁকে বেশি কথা কওয়াতে ডাক্তারের মানা। তুমি এই পাশের ঘরে এসো।"

মধুসূদনের মুখ লাল হয়ে উঠল। দ্রুত চৌকি থেকে উঠে পড়ল। কোল থেকে গুড়গুড়ির নলটা মাটিতে পড়ে গেল। বিপ্রদাসের মুখের দিকে না চেয়েই বললে, "আচ্ছা, তবে আসি।"

প্রথম ঝোঁকটা হল হন্ হন্ করে গাড়িতে উঠে বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু মন পড়েছে বাঁধা। অনেক দিন পরে আজ কুমুকে দেখেছে। ওকে অত্যন্ত সাদাসিধে আটপৌরে কাপড়ে এই প্রথম দেখলে। ওকে এত সুন্দর আর কখনও দেখে নি। এমন সংযত এত সহজ। মধুসূদনের বাড়িতে ও ছিল পোশাকি মেয়ে, যেন বাইরের মেয়ে এখানে সে একেবারের ঘরের মেয়ে। আজ যেন ওকে অত্যন্ত কাছের থেকে দেখা গেল। কী স্নিগ্ধ মূর্তি! মধুসূদনের ইচ্ছে করতে লাগল, একটু দেরি না করে এখনই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। ও আমার, ও আমারই, ও আমার ঘরের, আমার ঐশ্বর্যের, আমার সমস্ত দেহমনের, এই কথাটা উলটেপালটে বলতে ইচ্ছে করে।

পাশের ঘরে একটা সোফা দেখিয়ে কুমু যখন বসতে বললে, তখন ওকে বসতেই হল। নিতান্ত যদি বাইরের ঘর না হত তা হলে কুমুকে ধরে সোফায় আপনার পাশে বসাত। কুমু না বসে একটা চৌকির পিছনে তার পিঠের উপর হাত রেখে দাঁড়াল। বললে, "আমাকে কিছু বলতে চাও?"

ঠিক এমন সুরে প্রশ্নটা মধুসূদনের ভালো লাগল না, বললে, "যাবে না বাড়িতে?"

"না।"

মধুসূদন চমকে উঠল— বললে, "সে কী কথা !"

"আমাকে তোমার তো দরকার নেই।"

মধুসূদন বুঝলে শ্যামাসুন্দরীর খবরটা কানে এসেছে, এটা অভিমান। অভিমানটা ভালোই লাগল। বললে, "কী যে বল তার ঠিক নেই। দরকার নেই তো কী ? শূন্য ঘর কি ভালো লাগে ?"

এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে কুমুর প্রবৃত্তি হল না। সংক্ষেপে আর-একবার বললে, "আমি যাব না।"

"মানে কী ? বাড়ির বউ বাড়িতে যাবে না— ?"

কুমু সংক্ষেপে বললে, "না।"

মধুসূদন সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কী ! যাবে না ! যেতেই হবে।"

কুমু কোনো জবাব করলে না। মধুসূদন বললে, "জান পুলিস ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড়ে ধরে ! 'না' বললেই হল !"

কুমু চুপ করে রইল। মধুসূদন গর্জন করে বললে, "দাদার স্কুলে নুরনগরি কায়দা শিক্ষা আবার আরম্ভ হয়েছে ?"

কুমু দাদার ঘরের দিকে একবার কটাক্ষপাত করে বললে, "চুপ করো, অমন চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না।"

"কেন ? তোমার দাদাকে সামলে কথা কইতে হবে নাকি ? জান এই মুহূর্তেই ওকে পথে বার করতে পারি ?"

পরক্ষণেই কুমু দেখে ওর দাদা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ, পাণ্ডুবর্ণ মুখ, বড়ো বড়ো চোখ দুটো জ্বালাময়, একটা মোটা সাদা চাদর গা ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, কুমুকে ডেকে বললে, "আয় কুমু, আয় আমার ঘরে।"

মধুসূদন চেঁচিয়ে উঠল, বললে, "মনে থাকবে তোমার এই আস্পর্ধা। তোমার নুরনগরের নুর মুড়িয়ে দেব তবে আমার নাম মধুসূদন।"

ঘরে গিয়েই বিপ্রদাস বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করলে, কিন্তু ঘুমে নয়, ক্লান্তিতে ও চিন্তায়। কুমু শিয়রের কাছে বসে পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল। এমনি করে অনেকক্ষণ কাটলে পর ক্ষেমাপিসি এসে বললে, "আজ কি খেতে হবে না কুমু ? বেলা যে অনেক হল।"

বিপ্রদাস চোখ খুলে বললে, "কুমু, যা খেতে যা। তোর কালুদাকে পাঠিয়ে দে।"

কুমু বললে, "দাদা, তোমার পায়ে পড়ি এখন কালুদাকে না, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।"

বিপ্রদাস কিছু না বলে সুগভীর বেদনার দৃষ্টিতে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে নিশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজলে। কুমু ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়ে দরজা দিল ভেজিয়ে।

একটু পরেই কালু খবর পাঠাল যে আসতে চায়। বিপ্রদাস উঠে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসল। কালু বললে, "জামাই এসে অল্পক্ষণ পরেই তো চলে গেল। কী হল বলো তো। কুমুকে ওদের ওখানে ফিরে নিয়ে যাবার কথা কিছু বললে কি ?"

"হাঁ বলেছিল। কুমু তার জবাব দিয়েছে, সে যাবে না।"

কালু বিষম ভীত হয়ে বললে, "বল কী দাদা ! এ যে সর্বনেশে কথা !"

"সর্বনাশকে আমরা কোনোকালে ভয় করি নে, ভয় করি অসম্মানকে।"

"তা হলে তৈরি হও, আর দেরি নেই। রক্তে আছে, যাবে কোথায় ? জানি তো, তোমার বাবা ম্যাজিস্ট্রেটকে তুচ্ছ করতে গিয়ে অন্তত দু লাখ টাকা লোকসান করেছিলেন। বুক ফুলিয়ে নিজের বিপদ ঘটানো ও তোমাদের পৈতৃক শখ। ওটা অন্তত আমার বংশে নেই, তাই তোমাদের সাংঘাতিক পাগলামিগুলো চুপ করে সইতে পারি নে। কিন্তু বাঁচব কী করে ?"

বিপ্রদাস উঁচু বাঁ হাঁটুর উপর ডান পা তুলে দিয়ে তাকিয়ায় মাথা রেখে চোখ বুজে খানিক্ষণ ভাবলে। অবশেষে চোখ খুলে বললে, "দলিলের শর্ত অনুসারে মধুসূদন ছ মাস নোটিস না দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা দাবি করতে পারে না। ইতিমধ্যে সুবোধ আষাঢ় মাসের মধ্যেই এসে পড়বে— তখন একটা উপায় হতে পারবে।"

কালু একটু বিরক্ত হয়েই বললে, "উপায় হবে বই-কি। বাতিগুলো এক দমকায় নিবত, সেইগুলো একে একে ভদ্ররকম করে নিববে।"

"বাতি তলার খোপটার মধ্যে এসে জ্বলছে, এখন যে-ফরাশ এসে তাকে যেরকম ফুঁ দিয়েই নেবাক-না— তাতে বেশি হা-হুতাশ করবার কিছু নেই। ওই তলানির আলোটার তদ্‌বির করতে আর ভালো লাগে না, ওর চেয়ে পুরো অন্ধকারে সোয়াস্তি পাওয়া যায়।"

কালুর বুকে ব্যথা বাজল। সে বুঝলে এটা অসুস্থ মানুষের কথা, বিপ্রদাস তো এরকম হালছাড়া প্রকৃতির লোক নয়। পরিণামটাকে ঠেকাবার জন্যে বিপ্রদাস এতদিন নানারকম প্ল্যান করছিল। তার বিশ্বাস ছিল কাটিয়ে উঠবে। আজ ভাবতেও পারে না— বিশ্বাস করবারও জোর নেই।

কালু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে বললে, "তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ভাই, যা করবার আমিই করব। যাই একবার দালাল-মহলে ঘুরে আসি গে।"

পরদিন বিপ্রদাসের কাছে এক ইংরেজি চিঠি এল— মধুসূদনের লেখা। ভাষাটা ওকালতি ছাঁদের— হয়তো বা অ্যাটর্নিকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। নিশ্চিত করে জানতে চায় কুমু ওদের ওখানে ফিরে আসবে কি না, তার পরে যথাকর্তব্য করা হবে।

বিপ্রদাস কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কুমু, ভালো করে সব ভেবে দেখেছিস ?"

কুমু বললে, "ভাবনা সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়েছি, তাই আমার মন আজ খুব নিশ্চিন্ত। ঠিক মনে হচ্ছে যেমন এখানে ছিলুম তেমনি আছি— মাঝে যা-কিছু ঘটেছে সমস্ত স্বপ্ন।"

"যদি তোকে জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়, তুই জোর করে সামলাতে পারবি ?"

"তোমার উপর উৎপাত যদি না হয় তো খুব পারব।"

"এইজন্যে জিজ্ঞাসা করছি যে, যদি শেষকালে ফিরে যেতেই হয় তা হলে যত দেরি করে যাবি ততই সেটা বিশ্রী হয়ে উঠবে। ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্র তোর মনকে কোথাও কিছুমাত্র জড়িয়েছে কি ?"

"কিছুমাত্র না। কেবল আমি নবীনকে, মোতির মাকে, হাবলুকে ভালোবাসি। কিন্তু তারা ঠিক যেন অন্য বাড়ির লোক।"

"দেখ্ কুমু, ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে উৎপাত করবার ক্ষমতা ওদের আছে। সেইজন্যেই সেটাকে অগ্রাহ্য করা চাই। করতে গেলেই লজ্জা সংকোচ ভয় সমস্ত বিসর্জন দিয়ে লোকসমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে, ঘরে-বাইরে চারি দিকে নিন্দের তুফান উঠবে, তার মাঝখানে মাথা তুলে তোর ঠিক থাকা চাই।"

"দাদা, তাতে তোমার অনিষ্ট, তোমার অশান্তি হবে না ?"

"অনিষ্ট অশান্তি কাকে তুই বলিস কুমু ? তুই যদি অসম্মানের মধ্যে ডুবে থাকিস তার চেয়ে অনিষ্ট আমার আর কী হতে পারে ? যদি জানি যে, যে ঘরে তুই আছিস সে তোর ঘর হয়ে উঠল না, তোর উপর যার একান্ত অধিকার সে তোর একান্ত পর, তবে আমার পক্ষে তার চেয়ে অশান্তি ভাবতে পারি নে। বাবা তোকে খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু তখনকার দিনে কর্তারা থাকতেন দূরে দূরে। তোর পক্ষে পড়াশুনোর দরকার আছে তা তিনি মনেই করতেন না। আমিই নিজে গোড়া থেকে তোকে শিখিয়েছি, তোকে মানুষ করে তুলেছি। তোর বাপ-মার চেয়ে আমি কোনো অংশে কম না। সেই মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যে কী আজ তা বুঝতে পারছি। তুই যদি অন্য মেয়ের মতো হতিস তা হলে কোথাও তোর

ঠেকত না। আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক। আমি কোন্ প্রাণে তোকে সেখানে নির্বাসিত করে থাকব? যদি আমার ছোটো ভাই হতিস তা হলে যেমন করে থাকতিস তেমনি করেই চিরদিন থাক্-না আমার কাছে।"

দাদার বুকের কাছে খাটের প্রান্তে মাথা রেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কুমু বললে, "কিন্তু আমি তোমাদের তো ভার হয়ে থাকব না? ঠিক বলছ?"

কুমুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বিপ্রদাস বললে, "ভার কেন হবি বোন? তোকে খুব খাটিয়ে নেব। আমার সব কাজ দেব তোর হাতে। কোনো প্রাইভেট সেক্রেটারি এমন করে কাজ করতে পারবে না। আমাকে তোর বাজনা শোনাতে হবে, আমার ঘোড়া তোর জিম্মেয় থাকবে। তা ছাড়া জানিস আমি শেখাতে ভালোবাসি। তোর মতো ছাত্রী পাব কোথায় বল্? এক কাজ করা যাবে, অনেক দিন থেকে পারসি পড়বার শখ আমার আছে। একলা পড়তে ভালো লাগে না। তোকে নিয়ে পড়ব, তুই নিশ্চয় আমার চেয়ে এগিয়ে যাবি, আমি একটুও হিংসে করব না দেখিস।"

শুনতে শুনতে কুমুর মন পুলকিত হয়ে উঠল, এর চেয়ে জীবনে সুখ আর কিছু হতে পারে না।

খানিক পরে বিপ্রদাস আবার বললে, "আরও একটা কথা তোকে বলে রাখি কুমু, খুব শীঘ্রই আমাদের কাল বদল হবে, আমাদের চালও বদলাবে। আমাদের থাকতে হবে গরিবের মতো। তখন তুই থাকবি আমাদের গরিবের ঐশ্বর্য হয়ে।"

কুমুর চোখে জল এল, বললে, "আমার এমন ভাগ্য যদি হয় তো বেঁচে যাই।"

বিপ্রদাস মধুসূদনের চিঠি হাতে রাখলে, উত্তর দিলে না।

৫৬

দুদিন পরেই নবীন মোতির মা হাবলুকে নিয়ে এসে উপস্থিত। হাবলু জ্যাঠাইমার কোলে চড়ে তার বুকে মাথা রেখে কেঁদে নিলে। কান্নাটা কিসের জন্যে স্পষ্ট করে বলা শক্ত— অতীতের জন্যে অভিমান, না বর্তমানের জন্যে আবদার, না ভবিষ্যতের জন্যে ভাবনা?

কুমু হাবলুকে জড়িয়ে ধরে বললে, "কঠিন সংসার গোপাল, কান্নার অন্ত নেই। কী আছে আমার, কী দিতে পারি যাতে মানুষের ছেলের কান্না কমে! কান্না দিয়ে

কান্না মেটাতে চাই, তার বেশি শক্তি নেই। যে ভালোবাসা আপনাকে দেয় তার অধিক আর কিছু দিতে পারে না, বাছারা, সেই ভালোবাসা তোরা পেয়েছিস; জ্যাঠাইমা চিরদিন থাকবে না, কিন্তু এই কথাটা মনে রাখিস, মনে রাখিস, মনে রাখিস।" বলে তার গালে চুমো খেলে।

নবীন বলল, "বউরানী, এবার রজবপুরে পৈতৃক ঘরে চলেছি; এখানকার পালা সাঙ্গ হল।"

কুমু ব্যাকুল হয়ে বললে, "আমি হতভাগিনী এসে তোমাদের এই বিপদ ঘটালুম।"

নবীন বললে, "ঠিক তার উলটো। অনেক দিন থেকেই মনটা যাই-যাই করছিল। বেঁধে-সেধে তৈরি হয়ে ছিলুম, এমন সময় তুমি এলে আমাদের ঘরে। ঘরের আশ খুব করেই মিটেছিল, কিন্তু বিধাতার সইল না।"

সেদিন মধুসূদন ফিরে গিয়ে তুমুল একটা বিপ্লব বাধিয়েছিল তা বোঝা গেল।

নবীন যাই বলুক, কুমুই যে ওদের সংসারের সমস্ত ওলটপালট করে দিয়েছে মোতির মার তাতে সন্দেহ নেই, আর সেই অপরাধ সে সহজে ক্ষমা করতে চায় না। তার মত এই যে, এখনও কুমুর সেখানে যাওয়া উচিত মাথা হেঁট করে, তার পরে যত লাঞ্ছনাই হোক সেটা মেনে নেওয়া চাই। গলা বেশ একটু কঠিন করেই জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি শ্বশুরবাড়ি একেবারেই যাবে না ঠিক করেছ?"

কুমু তার উত্তরে শক্ত করেই বললে, "না, যাব না।"

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে তোমার গতি কোথায়?"

কুমু বললে, "মস্ত এই পৃথিবী, এর মধ্যে কোনো এক জায়গায় আমারও একটুখানি ঠাঁই হতে পারবে। জীবনে অনেক যায় খসে, তবুও কিছু বাকি থাকে।"

কুমু বুঝতে পারছিল, মোতির মার মন ওর কাছ থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরপো, তা হলে কী করবে এখন?"

"নদীর ধারে কিছু জমি আছে তার থেকে মোটা ভাতও জুটবে, কিছু হাওয়া খাওয়াও চলবে।"

মোতির মা উষ্মার সঙ্গেই বললে, "ওগো মশায়, না, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওই মির্জাপুরের অন্নজলে দাবি রাখি, সে কেউ কাড়তে পারবে না। আমরা তো এত বেশি সম্মানী লোক নই, বড়োঠাকুর তাড়া দিলেই অমনি বিবাগি হয়ে চলে যাব। তিনিই আবার আজ বাদে কাল ফিরিয়ে ডাকবেন, তখন ফিরেও আসব, ইতিমধ্যে সবুর সইবে, এই বলে রাখলুম।"

নবীন একটু ক্ষুণ্ন হয়ে বললে, "সে কথা জানি মেজোবউ, কিন্তু তা নিয়ে বড়াই করি নে। পুনর্জন্ম যদি থাকে তবে সম্মানী হয়েই যেন জন্মাই, তাতে অন্নজলের যদি টানাটানি ঘটে সেও স্বীকার।"

বস্তুত নবীন অনেকবারই দাদার আশ্রয় ছেড়ে গ্রামে চাষবাসের সংকল্প করেছে। মোতির মা মুখে তর্জনগর্জন করেছে, কাজের বেলায় কিছুতেই সহজে নড়তে চায় নি, নবীনকে বারে বারে আটকে রেখেছে। সে জানে ভাশুরের উপর তার সম্পূর্ণ দাবি আছে। ভাশুর তো শ্বশুরের স্থানীয়। তার মতে ভাশুর অন্যায় করতে পারে কিন্তু তাকে অপমান বলা চলে না। কুমুর প্রতি কুমুর স্বামীর ব্যবহার যেমনই হোক তাই বলে কুমু স্বামীর ঘর অস্বীকার করতে পারে, এ কথা মোতির মার কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া।

খবর এল ডাক্তার এসেছে। কুমু বললে, "একটু অপেক্ষা করো, শুনে আসি ডাক্তার কী বলে।"

ডাক্তার কুমুকে বলে গেল, নাড়ি আরও খারাপ, রাত্তিরে ঘুম কমেছে, বোধ হয় রোগী ঠিক বিশ্রাম পাচ্ছে না।

অতিথিদের কাছে কুমু ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় কালু এসে বললে, "একটা কথা না বলে থাকতে পারছি নে, জাল বড়ো জটিল হয়ে এসেছে, তুমি যদি এই সময়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে না যাও, বিপদ আরও ঘনিয়ে ধরবে। আমি তো কোনো উপায় ভেবে পাচ্ছি নে।"

কুমু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কালু বললে, "তোমার স্বামীর ওখান থেকে তাগিদ এসেছে, সেটা অগ্রাহ্য করবার শক্তি কি আমাদের আছে? আমরা যে একেবারে তার মুঠোর মধ্যে।"

কুমু বারান্দায় রেলিং চেপে ধরে বললে, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে, কালুদা। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় মরণ ছাড়া কোনো রাস্তাই আমার খোলা নেই।" এই বলে কুমু দ্রুতপদে চলে গেল।

দাদার ঘরে যখন কুমু ছিল, সেই অবকাশে ক্ষেমা পিসির সঙ্গে মোতির মার কিছু কথাবার্তা হয়ে গেছে। নানারকম লক্ষণ মিলিয়ে দুজনেরই মনে সন্দেহ হয়েছে কুমু গর্ভিণী। মোতির মা খুশি হয়ে উঠল, মনে মনে বললে, মা কালী করুন তাই যেন হয়। এইবার জব্দ! মানিনী শ্বশুরবাড়িকে অবজ্ঞা করতে চান, কিন্তু এ যে নাড়িতে গ্রন্থি লাগল, শুধু তো আঁচলে আঁচলে নয়, পালাবে কেমন করে!

কুমুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে মোতির মা তার সন্দেহের কথাটা বললে। কুমুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে হাত মুঠো করে বললে, "না না, এ কখনোই হতে পারে না, কিছুতেই না।"

মোতির মা বিরক্ত হয়েই বললে, "কেন হতে পারবে না ভাই? তুমি যতবড়ো ঘরেরই মেয়ে হও না কেন, তোমার বেলাতেই তো সংসারের নিয়ম উলটে যাবে না। তুমি ঘোষালদের ঘরের বউ তো, ঘোষাল-বংশের ইষ্টদেবতা কি তোমাকে সহজে ছুটি দেবেন? পালাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।"

স্বামীর সঙ্গে কুমুর অল্পকালের পরিচয় দিনে দিনে ভিতরে ভিতরে কী রকম যে বিকৃত মূর্তি ধরেছে গর্ভের আশঙ্কায় ওর মনে সেটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। মানুষে মানুষে যে ভেদটা সবচেয়ে দুরতিক্রমণীয়, তার উপাদানগুলো অনেক সময়ে খুব সূক্ষ্ম। ভাষায়, ভঙ্গিতে, ব্যবহারের ছোটো ছোটো ইশারায়, যখন কিছুই করছে না তখনকার অনভিব্যক্ত ইঙ্গিতে, গলার সুরে, রুচিতে, রীতিতে, জীবনযাত্রার আদর্শে, ভেদের লক্ষণগুলি আভাসে ছড়িয়ে থাকে। মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহভাবেই গরিব ছিল, সেইজন্যে 'পয়সা'র মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বারবার তুলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যেই। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহমনের, ওর সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীরমনকে সংকুচিত করে তুলেছে। যতই এগুলোকে দৃষ্টি থেকে চিন্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে, ততই এরা বিপুল আবর্জনার মতো চারি দিকে জমে উঠেছে। আপন মনের ঘৃণার ভাবের সঙ্গে কুমু আপনিই প্রাণপণে লড়াই করে এসেছে। স্বামীপূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু কতবড়ো হার হয়েছে তা এর আগে এমন করে বোঝে নি। মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে। কুমু অত্যন্ত উদ্বিগ্নমুখে মোতির মাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কী করে তুমি নিশ্চয় জানলে?"

মোতির মার ভারি রাগ হল, সামলে নিয়ে বললে, "ছেলের মা আমি, আমি

জানব না তো কে জানবে ? তবু একেবারে নিশ্চয় করে বলবার সময় হয় নি। ভালো দাই কাউকে ডেকে পরীক্ষা করিয়ে দেখা ভালো।"

নবীন, মোতির মা, হাবলুর যাবার সময় হল। কিন্তু দৈবের এই চরম অন্যায়ের কথা ছাড়া কুমু আর কোনো কিছুতে আজ মন দিতে পারছিল না। তাই খুব সাধারণভাবেই শ্বশুরবাড়ির বন্ধুদের কাছ থেকে ওর বিদায় নেওয়া হল। নবীন যাবার সময় বললে, "বউরানী, সংসারে সব জিনিসেরই অবসান আছে। কিন্তু তোমাকে সেবা করবার যে অধিকার হঠাৎ একদিনে পেয়েছি সে যে এমন খাপছাড়াভাবে হঠাৎ আর-একদিন শেষ হতে পারে, সে কথা ভাবতেও পারি নে। আবার দেখা হবে।" নবীন প্রণাম করলে, হাবলু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল, মোতির মা মুখ শক্ত করে রইল, একটি কথাও কইলে না।

৫৭

খবরটা বিপ্রদাসের কানে গেল। দাই এল, সন্দেহ রইল না যে কুমুর গর্ভাবস্থা। মধুসূদনের কানেও সংবাদ পৌঁচেছে। মধুসূদন ধন চেয়েছিল, ধন পুরো পরিমাণেই জমেছে, ধনের উপযুক্ত খেতাবও মিলেছে, এখন নিজের মহিমাকে ভাবী বংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই এ সংসারে তার কর্তব্য চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছোবে। মনটা যতই খুশি হল ততই অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব কুমুর উপর থেকে সরিয়ে বোঝাই করলে বিপ্রদাসের উপর। দ্বিতীয় একখানা চিঠি তাকে লিখলে, শুরু করলে Whereas দিয়ে, শেষ করলে Your obedient servant মধুসূদন ঘোষাল সই করে। মাঝখানটাতে ছিল I shall have the painful necessity ইত্যাদি। এরকম ভয়-দেখানো চিঠিতে চাটুজ্যে বংশের উপর উলটো ফল ফলে, বিশেষত ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে। বিপ্রদাস চিঠিটা দেখালে কালুকে। তার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বললে, "এরকম চিঠিতে আমারই মতো সামান্য লোকের দেহে একেবারে বাদশাহি মাত্রায় রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অদৃশ্য কোতোয়াল বেটাকে হাঁক দিয়ে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে, শির লেও উসকো।"

দিনের বেলা নানাপ্রকার লেখাপড়ার কাজ ছিল, সে-সমস্ত শেষ করে সন্ধ্যাবেলা বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু আজ সারাদিন দাদার কাছে আসেই নি। নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিপ্রদাস বিছানা ছেড়ে চৌকিতে উঠে বসল। রোগীর মতো শুয়ে থাকলে মনটা

দুর্বল থাকে। সামনের দিকে কুমুর জন্যে একটা ছোটো চৌকি ঠিক করে রেখেছে। আলোটা ঘরের কোণে একটু আড়াল করে রাখা। মাথার উপর বড়ো একটা টানা পাখা হুস্ হুস্ করে চলছে। বৈশাখ-শেষের আকাশে তখনও গরম জমে আছে, দক্ষিণে হাওয়া এক একবার অল্প একটু নিশ্বাস ছেড়েই থেমে যাচ্ছে, গাছের পাতাগুলো যেন একান্ত কান-পাতা মনোযোগের মতো নিস্তব্ধ। সমুদ্রের মোহানায় গঙ্গা যেখানে নীল জলকে ফিকে করে দিয়েছে, অন্ধকারটা যেন সেইরকম। দীর্ঘবিলম্বিত গোধূলির শেষ-আলোটা তখনও তার কালিমার ভিতরে ভিতরে মিশ্রিত। বাগানের পুকুরটা ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে থাকত, কিন্তু খুব একটা জলজলে তারার স্থির প্রতিবিম্ব আকাশের অঙ্গুলি সংকেতের মতো তাকে নির্দেশ করে দিচ্ছে। গাছতলার নীচে দিয়ে চাকররা ক্ষণে ক্ষণে লণ্ঠন হাতে করে যাতায়াত করছে, আর পেঁচা উঠছে ডেকে।

কুমু বোধ হয় একটু ইতস্তত করে একটু দেরি করেই এল। বিপ্রদাসের কাছে চৌকিতে বসেই বললে, "দাদা, আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমার যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে।"

বিপ্রদাস বললে, "ভুল বলছিস কুমু, তোর ভালোই লাগবে। আর কিছুদিন পরেই তোর মন উঠবে ভরে।"

"কিন্তু তা হলে—" বলে কুমু থেমে গেল।

"তা জানি— এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে ?"

"তবে কি যেতে হবে দাদা ?"

"তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন্ স্পর্ধায় ?"

কুমু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল, বিপ্রদাসও কিছু বললে না।

অবশেষে খুব মৃদুস্বরে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে কবে যেতে হবে ?"

"কালই, আর দেরি সইবে না।"

"দাদা, একটা কথা বোধ হয় বুঝতে পারছ, এবার গেলে ওরা আমাকে আর কখনও তোমার কাছে আসতে দেবে না।"

"তা আমি খুবই জানি।"

"আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন কখনও তোমাকে না দেখতে হয়। সে আমি সইতে পারব না।"

"না কুমু, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

"ওরা কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।"

"ওরা যা করতে পারে তা করা শেষ হলেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনই আমি হব স্বাধীন। তাকে তুই বিপদ বলছিস কেন?"

"দাদা, সেইদিন তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিন ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।"

"আচ্ছা, আগে হোক ছেলে, তার পরে বলিস।"

"তুমি বিশ্বাস করছ না, কিন্তু মার কথা মনে আছে তো? তাঁর তো হয়েছিল ইচ্ছামৃত্যু। সেদিন সংসারে তিনি তাঁর জায়গাটি পাচ্ছিলেন না, তাই তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে অনায়াসে ফেলে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মানুষ যখন মুক্তি চায়, তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারই বোন, দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন যেদিন বাঁধন কাটব, মা সেদিন আমাকে আশীর্বাদ করবেন এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম।"

আবার অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল। হঠাৎ হু হু করে বাতাস উঠল, টিপায়ের উপর বিপ্রদাসের পড়বার বইটার পাতাগুলো ফর্ ফর্ করে উলটে যেতে লাগল। বাগান থেকে বেলফুলের গন্ধে ঘর গেল ভরে।

কুমু বললে, "আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে কোরো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা-না-একটা মুশকিল বাধবে। তা হলে কেন এ বিড়ম্বনা? সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব; চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই? দাদা, তুমি ঠাকুর বিশ্বাস কর না, আমি বিশ্বাস করি। তিন মাস আগে যেরকম করে করতুম, আজ তার চেয়ে বেশি করেই করি। আজ সমস্ত দিন ধরেই এই কথা ভাবছি যে, চারি দিকে এত এলোমেলো, এত উলটো-পালটা, তবু এই জঞ্জালে একেবারে ঢেকে ফেলে নি জগৎটাকে। এ সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও চন্দ্রসূর্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চলছে, সেই যেখানে ছাড়িয়ে গেছে সেইখানে

আছে বৈকুণ্ঠ, সেইখানে আছেন আমার ঠাকুর। তোমার কাছে এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে— কিন্তু আর তো কখনও বলা হবে না, আজ বলে যাই। নইলে আমার জন্যে মিছিমিছি ভাববে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি। সেই আমার অফুরান, সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম তা হলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ বলেই তবে এ কথা বুঝতে পেরেছি।" এই বলেই কুমু চৌকি থেকে নেবে দাদার পায়ের উপর মাথা রেখে পড়ে রইল। রাত বেড়ে চলল, বিপ্রদাস জানালার বাইরে অনিমেষ দৃষ্টি মেলে ভাবতে লাগল।

৫৮

পরদিন ভোরে বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু এসে দেখে বিপ্রদাস বিছানায় বসে, একটি এসরাজ আছে কোলের উপর, আর একটি পাশে শোওয়ানো। কুমুকে বললে, "নে যন্ত্রটা, আমরা দুজনে মিলে বাজাই।" তখনও অল্প অল্প অন্ধকার, সমস্ত রাত্রির পরে বাতাস একটু ঠাণ্ডা হয়ে অশথপাতার মধ্যে ঝির্‌ ঝির্‌ করছে, কাকগুলো ডাকতে শুরু করেছে। দুজনে ভৈরোঁ রাগিণীতে আলাপ শুরু করলে, গম্ভীর শান্ত সকরুণ ; সতীবিরহ যখন অচঞ্চল হয়ে এসেছে, মহাদেবের সেইদিনকার প্রভাতের ধ্যানের মতো। বাজাতে বাজাতে পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ডালের ভিতর দিয়ে অরুণ-আভা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, সূর্য দেখা দিল বাগানের পাচিলের উপরে। চাকররা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল। ঘর সাফ করা হল না। রোদ্দুর ঘরের মধ্যে এল, দরোয়ান আস্তে আস্তে এসে খবরের কাগজ টিপাইয়ের উপর রেখে দিয়ে নিঃশব্দপদে চলে গেল।

অবশেষে বাজনা বন্ধ করে বিপ্রদাস বললে, "কুমু, তুই মনে করিস আমার কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্মকে কথায় বলতে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলি নে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে ; তাকে নাম দিতে পারি নে। তুই আজ চলে যাচ্ছিস কুমু, আর হয়তো দেখা হবে না, আজ সকালে তোকে সেই-সকল বেসুরের সকল অমিলের পরপারে এগিয়ে দিতে এলুম। শকুন্তলা পড়েছিস— দুষ্মন্তের ঘরে যখন শকুন্তলা যাত্রা করে বেরিয়েছিল, কণ্ব কিছুদূর পর্যন্ত তাকে পৌঁছিয়ে দিলেন। যে লোকে তাকে উত্তীর্ণ করতে তিনি বেরিয়েছিলেন, তার মাঝখানে ছিল দুঃখ-অপমান। কিন্তু সেইখানেই থামল না তাও

পেরিয়ে শকুন্তলা পৌঁচেছিল অচঞ্চল শান্তিতে। আজ সকালের ভৈরোঁর মধ্যে সেই শান্তির সুর, আমার সমস্ত অন্তঃকরণের আশীর্বাদ তোকে সেই নির্মল পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিক ; সেই পরিপূর্ণতা তোর অন্তরে তোর বাহিরে, তোর সব দুঃখ তোর সর্ব অপমানকে প্লাবিত করুক।"

কুমু কোনো কথা বললে না। বিপ্রদাসের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলে। খানিকক্ষণ জানলার বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে বললে, "দাদা, তোমার চা-রুটি আমি তৈরি করে নিয়ে আসি গে।"

মধুসূদন আজ দৈবজ্ঞকে ডাকিয়ে শুভযাত্রার লগ্ন ঠিক করে রেখেছিল। সকালে দশটার কিছু পরে। ঠিক সময়ে জরির-কাজ-করা লাল বনাতের ঘেটাটোপওআলা পালকি এল দরজায়, আসাসোটা নিয়ে লোকজন এল, সমারোহ করে কুমুকে নিয়ে গেল মির্জাপুরের প্রাসাদে। আজ সেখানে নহবত বাজছে, আর চলছে ব্রাহ্মণভোজন, ব্রাহ্মণবিদায়ের আয়োজন।

মানিক এল বার্লির পেয়ালা হাতে বিপ্রদাসের ঘরে। আজ বিপ্রদাস বিছানায় নেই, জানলার সামনে চৌকি টেনে নিয়ে স্থির বসে আছে। বার্লি যখন এল কোনো খবরই নিলে না। চাকর ফিরে গেল। তখন ক্ষেমা পিসি এলেন পথ্য নিয়ে, বিপ্রদাসের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "বিপু, বেলা হয়ে গেছে, বাবা।"

বিপ্রদাস চৌকি থেকে ধীরে ধীরে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ক্ষেমা পিসির ইচ্ছা ছিল কেমন ধুমধাম করে আদর করে ওরা কুমুকে নিয়ে গেল তার বিস্তারিত বর্ণনা করে গল্প করেন। কিন্তু বিপ্রদাসের গভীর নিস্তব্ধতা দেখে কোনো কথাই বলতে পারলেন না, মনে হল বিপ্রদাসের চোখের সামনে একটা অতলস্পর্শ শূন্যতা।

বিপ্রদাস যখন বলে উঠল "পিসি, কালুকে পাঠিয়ে দাও" তখন এই সামান্য কথাটাও অদৃষ্টের একটা প্রকাণ্ড নিঃশব্দ ছায়ার ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হল। পিসির গা ছম্ ছম্ করে উঠল।

কালু যখন এল, বিপ্রদাস তার হাতে একখানা চিঠি দিলে। বিলেতের চিঠি সুবোধের লেখা। সুবোধ লিখেছে, বারের ডিনার শেষ না করেই যদি সে দেশে আসে তা হলে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে। তার চেয়ে শেষ-ডিনার সেরে মাঘ-ফাল্গুন নাগাত দেশে ফিরে এলে তার সুবিধে হয়, অনর্থক খরচের আশঙ্কাও বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস বিষয়কর্মের প্রয়োজন ততদিন সবুর করতে পারে।

আজকের দিনে বিষয়কর্মের সংকট নিয়ে বিপ্রদাসকে পীড়া দিতে কালুর একটুও ইচ্ছে ছিল না। কালু বললে, "দাদা, এখনও তো টাকা তুলে নেবার কোনো কথা

ওঠে নি, আর কিছুদিন যদি সাবধানে চলি, কাউকে না ঘাঁটাই, তা হলে শীঘ্র কোনো উৎপাত ঘটবে না। যাই হোক, তুমি কোনো ভাবনা কোরো না।"

বিপ্রদাস বললে, "আমার কোনো ভাবনা নেই কালু। লেশমাত্র না।"

বিপ্রদাসের ভাবনা কালুর ভালো লাগে না— এত অত্যন্ত নির্ভাবনা তাঁর আরও খারাপ লাগে।

বিপ্রদাস খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে লাগল, কালু বুঝলে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে বিপ্রদাসের একটুও ইচ্ছা নেই। অন্যদিন কাজের কথা শেষ হলেই কালু চলে যায়, আজ সে চুপ করে বসে রইল, ইচ্ছা করতে লাগল অন্য কিছু কথা বলে, যা হয় কোনো একটা সেবায় লেগে যায়। জিজ্ঞাসা করলে, "বাইরের দিকে ওই জানলাটা বন্ধ করে দেব কি? রোদ্দুর আসছে।"

বিপ্রদাস হাত নেড়ে জানালে যে, দরকার নেই।

কালু তবু রইল বসে। দাদার ঘরে আজ কুমু নেই, এ শূন্যতা তার বুকে চেপে রইল। হঠাৎ শুনতে পেলে বিছানার নীচে টম কুকুরটা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। কুমুকে সে চলে যেতে দেখেছে, কী একটা বুঝেছে, ভালো করে বোঝাতে পারছে না।

—

প্রবন্ধ

আধুনিক সাহিত্য

আধুনিক সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র

যেকালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখকসম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক -সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন তাহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্যভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্যপ্রভৃতিসম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান কালের নূতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই-সব বালক-ভুলানো কথা— কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত,

এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে-একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম— সেইজন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম-সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্তব্য, মিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্তিত বিরহমিলন— তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীর ভাবে নানা পথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর সে নহবত বাজিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেইদিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ-উৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে— আজ কোনোদিন-বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে কোনোদিন-বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপই হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা— আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে

ঠাকুর-পরিবার ॥ ১৩১১

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদ্যশ্রাদ্ধান্তে গৃহীত ছবি। বাম দিক হইতে

সম্মুখে। হিতেন্দ্র, রবীন্দ্র, শমীন্দ্র, অরুণেন্দ্র, রথীন্দ্র, কৃতীন্দ্র

যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন-কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নব শিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদ-পুরাণ-তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।

রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালির যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজি পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিতেন। সেই-সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত পূর্বতন এণ্ট্রেন্স-পাঠ্য বাংলা গ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিন ভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরাজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালির মতো বালির বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কী হইতে পারে! সম্পূর্ণ ক্ষমতাসত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা-উদ্যম-ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত-কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য-প্রেম মহত্ত্বভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যতকিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্য-গর্বে সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন, পূর্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবনসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকলপ্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া সামান্য পরিশ্রমে স্থলভখ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। চতুর্দিকব্যাপী উৎসাহহীন

জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছুই নাই; তাহার নিয়তপ্রবল ভারাকর্ষণ-শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে-শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্বলোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে কার্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মি-সমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব-অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ড বিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরও কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনও দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এক দিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর-এক দিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র

শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না, তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তখন জানিতেন, বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনো-দিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।

সাহিত্যের মধ্যেও দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা, যেন যথালাভের মতো।

কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা-কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব— যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন। এখন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে 'কৃষ্ণচরিত্রে' বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার-দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন-কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দু-

শাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথক্‌করণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসংকোচে করিয়াছেন যে এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষত দুই শত্রুর মাঝখান দিয়া তাঁহাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছে। এক দিকে যাঁহারা অবতার মানেন না তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অন্য দিকে যাঁহারা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের প্রত্যেক প্রথাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারাও, বিচারের লৌহাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া কাটিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া মহত্তম মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে দেবতা-গঠনকার্যে বড়ো প্রসন্ন হন নাই। এরূপ অবস্থায় অন্য কেহ হইলে কোনো এক পক্ষকে সর্বতোভাবে আপন দলে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সাহিত্যমহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন— তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন— বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ— কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে— কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।

এইরূপ অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। ‘কৃষ্ণচরিত্রে’ উদ্দাম ভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসম্বরণপূর্বক যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লিখেন নাই তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

বিশেষত বিষয়টি এমন যে, ইহা কোনো সাধারণ বাঙালি লেখকের হস্তে পড়িলে তিনি এই সুযোগে বিস্তর হরি হরি, মরি মরি, হায় হায়, অশ্রুপাত ও প্রবল অঙ্গভঙ্গি

করিতেন এবং কল্পনার উচ্ছ্বাস, ভাবের আবেগ এবং হৃদয়াতিশয্য প্রকাশ করিবার এমন অনুকূল অবসর কখনোই ছাড়িতেন না; সুবিচারিত তর্ক দ্বারা, সুকঠিন সত্যনির্ণয়ের স্পৃহা দ্বারা, পদে পদে আপন লেখনীকে বাধা দিতেন না। সর্বজনগম্য সরল পথ ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা স্বকপোলকল্পিত একটা নূতন আবিষ্কারকেই সর্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকেই বাক্‌প্রাচুর্যে এবং কল্পনাকুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন, এবং নিজের বিশ্বাস ও ভাষাকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া আশেপাশে দীর্ঘ করিয়া অধিকপরিমাণে লোককে আপন মতের জালে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

বস্তুত আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন। এক দিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্য দিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদের সংকোচ; এক দিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্য দিকে অতিপরিচয়জনিত অভ্যাস ও সংস্কারের অন্ধতা; যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয়সংকটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে বল্‌গার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে, সেই বল্‌গার আকর্ষণে তাহাকে সর্বদা সংযত করিতে হইবে। এই-সকল ক্ষমতাসামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল। সেইজন্য মৃত্যুর অনতিপূর্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ-পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন তখন বঙ্গসাহিত্যের বড়ো আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে আশা সফল হইতে দিল না, এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পন্ন রহিয়া গেল তাহা যে কবে সমাধা হইবে কেহই বলিতে পারে না।

বঙ্কিম এই-যে সর্বপ্রকার আতিশয্য এবং অসংগতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতিগত। যে-কেহ তাঁহার রচনা পড়িয়াছেন সকলেই জানেন বঙ্কিম হাস্যরসে সুরসিক ছিলেন। যে পরিষ্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসংগতি প্রকাশ হইয়া পড়ে হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি। কতদূর পর্যন্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা হাস্যরসরসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটি বোধশক্তি আছে যদ্দ্বারা তাঁহারা সকল সময়ে নিজের না হইলেও অপরের কথাবার্তা আচারব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যে সুসংগতির সূক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে পারেন।

নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না।

সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার কোনো-একটি সর্ব-উপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ওই রসটাকেই সর্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস-বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্ কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীরভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসংগতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্যের একটি সুন্দর সংমিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীরপুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে তেমনি সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠবুদ্ধির একটি বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্তমান লেখক যেদিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কতদিনের কথা স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে

জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর-কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে, প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক বার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই-যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতি রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সংকুচিত হইয়া দক্ষিণ-করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসংকোচ পলায়নদৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে সময়কার অসংযত বাক্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা কী যে আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় না। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে

আবদ্ধ তাহা যেন কোনো কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত তাহা আজ বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল— যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহসুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন। আজ আমাদের বিলাপ-পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শপ্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তরের মূর্তি স্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইংরাজ এবং ইংরাজের আইন চিরস্থায়ী নহে; রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্তিত হইতে পারে; যে-সকল ঘটনা যে-সকল অনুষ্ঠান আজ সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে, কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে; কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য-দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চির-সৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা-কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা-কিছু অমর করিবে সেই-সকল মহাশক্তিকে ধারণ

করিবার পোষণ করিবার প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে— আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তরপুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

বৈশাখ ১৩০১

বিহারীলাল

বর্তমান নববর্ষের প্রারম্ভেই কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। বঙ্গের সারস্বতকুঞ্জে মৃত্যু ব্যাধের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার নিষ্ঠুর শর-সন্ধানে অল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল।

তন্মধ্যে বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সংগীত নির্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক -সমাজের দ্বারবর্তী হইত না।

কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সংগীতকাকলিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।

বঙ্গদর্শন প্রকাশ হইবার বহুপূর্বে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু-নামক একটি মাসিক পত্র বাহির হইত। তখন বর্তমান লেখক বালকবয়সপ্রযুক্ত নিতান্ত অবোধ ছিল। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তিসহকারে যখন বোধোদয় হইল তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পত্রগুলি কতক বাঁধানো কতক-বা খণ্ড আকারে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আলমারির মধ্যে রক্ষিত ছিল। অনেক মূল্যবান গ্রন্থাদি থাকাতে সে আলমারিতে চপলপ্রকৃতি বালকদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষণে নির্ভয়ে স্বীকার করিতে পারি, অবোধবন্ধুর বন্ধুত্ব-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। এই গোপন দুষ্কর্মের জন্য কোনোরূপ শাস্তি পাওয়া দূরে থাক্, বহুকাল ধরিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছিলাম তাহা এখনও বিস্মৃত হই নাই।

এখনও মনে আছে ইস্কুল ফাঁকি দিয়া একটি দক্ষিণদ্বারী ঘরে সুদীর্ঘ নির্জন মধ্যাহ্নে অবোধবন্ধু হইতে পৌল-বর্জিনীর বাংলা অনুবাদ পাঠ করিতে করিতে প্রবল বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তখন কলিকাতার বহির্বর্তী প্রকৃতি আমার নিকট অপরিচিত ছিল— এবং পৌল-বর্জিনীতে সমুদ্রতটের অরণ্যদৃশ্যবর্ণনা আমার নিকট অনির্বচনীয় সুখস্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত, এবং সেই তরঙ্গঘাতধ্বনিত বনচ্ছায়াস্নিগ্ধ সমুদ্রবেলায় পৌল-বর্জিনীর মিলন এবং বিচ্ছেদবেদনা হৃদয়ের মধ্যে যেন মূর্ছনাসহকারে অপূর্ব সংগীতের মতো বাজিয়া উঠিত।

এই ক্ষুদ্র পত্রে যে-সকল গদ্যপ্রবন্ধ বাহির হইত, তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব

ছিল। তখনকার বাংলা গদ্যে সাধুভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই। তখন যাঁহারা মাসিক পত্রে লিখিতেন তাঁহারা গুরু সাজিয়া লিখিতেন— এইজন্য তাঁহারা পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই এবং এইজন্যই তাঁহাদের লেখার যেন একটা স্বরূপ ছিল না। যখন অবোধবন্ধু পাঠ করিতাম তখন তাহাকে ইস্কুলের পড়ার অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হইত না। বাংলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্যালোচনা করিবেন তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

সে প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না— কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।

রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে তখন যেমন জগতের মূর্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া ওঠে, সেইরূপ অবোধবন্ধুর গদ্যে পদ্যে যেন প্রতিভার প্রত্যুষকিরণে মূর্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল।

> ‘সর্বদাই হু হু করে মন,
> বিশ্ব যেন মরুর মতন।
> চারি দিকে ঝালাফালা,
> উঃ কী জ্বলন্ত জ্বালা,
> অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গপতন।’

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনও কখনও প্রকাশ পাইয়া থাকিবে— কিন্তু তাহা বিরল— এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।

বিহারীলাল তখনকার ইংরেজিভাষায়-নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবি-

দিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না— তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।

পাঠকদিগকে এইরূপে বিশ্রদ্ধভাবে আপনার নিকটে টানিয়া আনিবার ভাব প্রথম অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং অবোধবন্ধুর কবি বিহারীলালের কাব্যে অনুভব করিয়াছিলাম। পৌল-বর্জিনীতে যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির নিকট-পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মনে আছে নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বর্ণনায় এবং সংগীতে মনশ্চক্ষের সমক্ষে সুন্দর চিত্রপট উদ্‌ঘাটিত হইয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিত।

'কভু ভাবি কোনো ঝরনার
উপলে বন্ধুর যার ধার—
  প্রচণ্ড প্রপাতধ্বনি
  বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার—
গিয়ে তার তীরতরুতলে
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে
  ডুবাইয়ে এ শরীর
  শবসম রব স্থির
কান দিয়ে জলকলকলে।
যে-সময় কুরঙ্গিণীগণ
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন
  আমার সে দশা দেখে
  কাছে এসে চেয়ে থেকে
অশ্রুজল করিবে মোচন—
সে-সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
  মৃত্যুকালে মিত্র এলে
  লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে
তেম্নিতর থাকিব চাহিয়ে।'

কবি যে মন 'হু হু' করার কথা লিখিয়াছেন তাহা কী প্রকৃতির বলিতে পারি না। কিন্তু এই বর্ণনা পাঠ করিয়া বহির্জগতের জন্য একটি বালক-পাঠকের মন হু হু করিয়া উঠিত। ঝরনার ধারে জলশীকরসিক্ত স্নিগ্ধশ্যামল দীর্ঘকোমল ঘনঘাসের মধ্যে দেহ নিমগ্ন করিয়া নিস্তব্ধভাবে জলকলধ্বনি শুনিতে পাওয়া একটি পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিয়া মনে হইত ; এবং যদিও জ্ঞানে জানি যে, কুরঙ্গিণীগণ কবির দুঃখে অশ্রুপাত করিতে আসে না এবং সাধ্যমতে কবির আলিঙ্গনে ধরা দিতে চাহে না, তথাপি এই নির্ঝরপার্শ্বে ঘনশষ্পতটে মানবের বাহুপাশবদ্ধ মুগ্ধ কুরঙ্গিণীর দৃশ্য অপরূপ সৌন্দর্যে হৃদয়ে সম্ভববৎ চিত্রিত হইয়া উঠিত।

'কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নামধাম সকল লুকাই।
চাষীদের মাঝে রয়ে
চাষীদের মতো হয়ে
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।
প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর ঝর্,
চারি দিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম ;
সুস্থ স্ফূর্ত হবে কলেবর।
বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরি
সাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি
সরল চাষার সনে
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্বরী।
বরষার যে ঘোরা নিশায়
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায়—
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায়—
সে নিশায় আমি ক্ষেত্রতীরে
নড়বোড়ে পাতার কুটিরে

স্বচ্ছন্দে রাজার মতো
ভূমে আছি নিদ্রাগত,
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।'

কলিকাতার ছেলে পল্লীগ্রামের এই সুখময় চিত্রে যে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় অসন্তোষ মানবপ্রকৃতির সহজাত। অট্টালিকা অপেক্ষা নড়বোড়ে পাতার কুটিরে যে সুখের অংশ অধিক আছে অট্টালিকাবাসী বালকের মনে এ মায়া কে জন্মাইয়া দিল? আদিম মানবপ্রকৃতি। কবি নহে। কবিকে যিনি ভুলাইয়াছেন সেই মহামায়া। কবিতায় অসন্তোষ-গানের বাহুল্য দেখা যায় বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু দোষ কাহাকে দিব? অসন্তোষ মানুষকে কাজ করাইতেছে, আকাঙ্ক্ষা কবিকে গান গাওয়াইতেছে। সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি যতই প্রার্থনীয় হউক তাহাতে কার্য এবং কাব্য উভয়েরই ব্যাঘাত করিয়া থাকে। অ যেমন বর্ণমালার আরম্ভ এবং সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি সেইরূপ সৃজনের আরম্ভে বর্তমান এবং সমস্ত মানবপ্রকৃতির সহিত নিয়ত সংযুক্ত। এইজন্যই তাহা কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবিদিগের মানসিক ক্ষিপ্ততা বা পরিপাকশক্তির বিকারবশত নহে। কৃষক-কবি যখন কবিতা রচনা করে তখন সে মাঠের শোভা কুটিরের সুখ বর্ণনা করে না— নগরের বিস্ময়জনক বৈচিত্র্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করে— তখন সে গাহিয়া ওঠে—

'কী কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানি!
কলেতে ধোঁয়া ওঠে আপনি, সজনি!'

কলের বাঁশি যাহারা শুনিতেছে মাঠের 'বাঁশের বাঁশরি' শুনিয়া তাহারা ব্যাকুল হয় এবং যাহারা বাঁশের বাঁশরি বাজাইয়া থাকে কলের বাঁশি শুনিলে তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। এইজন্য শহরের কবিও সুখের কথা বলে না, মাঠের কবিও আকাঙ্ক্ষার চাঞ্চল্য গানে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।

সুখ চিরকালই দূরবর্তী, এইজন্য কবি যখন গাহিলেন—'সর্বদাই হু হু করে মন' তখন বালকের অন্তরেও তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল। কবি যখন বলিলেন—

'কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ
যাই কোনো এ হেন প্রদেশ
যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,

পড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।
গর্বভরা অট্টালিকা যায়
এবে সব গড়াগড়ি যায়—
বৃক্ষলতা অগণন
ঘোর করে আছে বন,
উপরে বিষাদবায়ু বায়।
প্রবেশিতে যাহার ভিতরে
ক্ষীণপ্রাণী নরে ত্রাসে মরে,
যথায় শ্বাপদদল
করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লি সব ঝিঁ ঝিঁ রব করে।
তথা তার মাঝে বাস করি
ঘুমাইব দিবা বিভাবরী—
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়
মানুষজন্তুকে যত ডরি।'

তখন এই চিত্রে ভয়ের উদয় না হইয়া বাসনার উদ্রেক হইল। যে ছেলে ঘরের বাহিরে একটি দিন যাপন করিতে কাতর হয় ঝিল্লিরবাকুল বিষাদবায়ুবীজিত ঘন-অরণ্যবেষ্টিত ভীষণ ভগ্নাবশেষ কেন যে তাহার নিকট বিশেষরূপে প্রার্থনীয় বোধ হইল বলা কঠিন। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন জগতের সমস্ত নূতন নূতন দেশ, ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর-একজন শতসহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর-একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি, আর একজন খাঁচার পাখি। এই বনের পাখিটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে এবং বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সিন্ধবাদ নাবিকের অপরূপ ভ্রমণ এবং রবিন্সন্ ক্রুসোর নির্জন দ্বীপপ্রবাস মনের মধ্যে যে এক তৃষাতুর ভাবের উদ্রেক করিয়া দিত, অবোধবন্ধুর প্রথম কবিতাটি সেই

ভাবকেই সংক্ষেপে সংগীতে ব্যক্ত করিয়াছিল। যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

'কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে
যথা যেন গর্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘসংঘ,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জিয়া বেলারে—
সম্মুখেতে অসীম অপার
জলরাশি রয়েছে বিস্তার ;
উত্তাল তরঙ্গ সব
ফেনপুঞ্জে ধব্‌ধব্‌,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার—
মহাবেগে বহিছে পবন,
যেন সিন্ধুসঙ্গে করে রণ—
উভে উভ প্রতি ধায়,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমুল তাড়ন—
সেই মহা রণরঙ্গস্থলে
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে
(বাতাসের হুহু রবে
কান বেশ ঠাণ্ডা রবে)
দেখিগে শুনিগে সে সকলে।
যে সময়ে পূর্ণ সুধাকর
ভূষিবেন নির্মল অম্বর,
চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন করে খেলা
তরঙ্গের দোলার উপর—
নিবেদিব তাঁহাদের কাছে
মনে মোর যত খেদ আছে।

শুনি না কি মিত্রবরে
দুখের যে অংশী করে
হাঁপ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে।'

এই বর্ণনাগুলি কতবার পাঠ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, এবং এই-সকল শ্লোকের মধ্য দিয়া সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের আহ্বান বালক পাঠকের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাময়িক অন্য কবির রচনাতেও প্রকৃতিবর্ণনা আছে কিন্তু তাহা প্রথাসংগত বর্ণনামাত্র, তাহা কেবল কবির কর্তব্যপালন। তাহার মধ্যে সেই সোনার কাঠি নাই যাহার স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে।

সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের আর-একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা। ভাষার প্রতি আমাদের অনেক কবির কিয়ৎপরিমাণে অবহেলা আছে। বিশেষত মিত্রাক্ষর ছন্দের মিলটা তাঁহারা নিতান্ত কায়ক্লেশে রক্ষা করেন। অনেকে কেবলমাত্র শেষ অক্ষরের মিলকে যথেষ্ট জ্ঞান করেন এবং অনেকে 'হয়েছে' 'করেছে' 'ভুলেছে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের মিলকে মিল বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। মিলের দুইটি প্রধান গুণ আছে, এক তাহা কর্ণতৃপ্তিকর আর এক অভাবিতপূর্ব। অসম্পূর্ণ মিলে কর্ণের তৃপ্তি হয় না, সেটুকু মিলে স্বরের অনৈক্যটা আরও যেন বেশি করিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাতে কবির ক্ষমতা ও ভাষার দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। ক্রিয়াপদের মিল যত ইচ্ছা করা যাইতে পারে— সেরূপ মিলে কর্ণে প্রত্যেকবার নূতন বিস্ময় উৎপাদন করে না, এইজন্য তাহা বিরক্তিজনক ও 'একঘেয়ে' হইয়া ওঠে। বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা প্রবহমান নির্ঝরের মতো সহজ সংগীতে অবিশ্রাম ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত; অক্ষমতাজনিত নহে। তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কোথাও এ কথা মনে হয় না যে, এইখানে কবিকে দায়ে পড়িয়া মিল নষ্ট বা ছন্দ ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু উপরে যে ছন্দের শ্লোকগুলি উদ্‌ধৃত হইয়াছে 'বঙ্গসুন্দরী'তে সেই ছন্দই প্রধান নহে। প্রথম উপহারটি ব্যতীত 'বঙ্গসুন্দরী'র অন্য সকল কবিতার ছন্দই পর্যায়ক্রমে বারো এবং এগারো অক্ষরে ভাগ করা। যথা—

'সুঠাম শরীর পেলব লতিকা
আনত সুষমা কুসুম ভরে,
চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী-'পরে।'

এ ছন্দ নারীবর্ণনার উপযুক্ত বটে— ইহাতে তালে তালে নূপুর ঝংকৃত হইয়া উঠে। কিন্তু এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত অক্ষরের স্থান নাই। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লেখকের এবং পাঠকের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। অক্ষরের মাত্রাগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে ইচ্ছামত বাড়াইবার কমাইবার অবকাশ আছে। প্রত্যেক অক্ষরকে একমাত্রার স্বরূপ গণ্য করিয়া একেবারে এক নিশ্বাসে পড়িয়া যাইবার আবশ্যক হয় না। দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার কথা স্পষ্ট হইবে।—

'হে সারদে দাও দেখা।
বাঁচিতে পারি নে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়।
কী বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কানে,
বেদনা দিয়ো না প্রাণে ব্যথার সময়।'

ইহার মধ্যে প্রায় যুক্ত অক্ষর নাই। নিম্নলিখিত শ্লোকে অনেকগুলি যুক্তাক্ষর আছে, অথচ উভয় শ্লোকই সুখপাঠ্য এবং শ্রুতিমধুর।

'পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গনিবারে পারে,
সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।'

এই দুটি শ্লোকই কবির রচিত 'সারদামঙ্গল' হইতে উদ্ধৃত। এক্ষণে 'বঙ্গসুন্দরী' হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করা যাক।

'একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।'

ইহার সহিত নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকটি একসঙ্গে পাঠ করিলে প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে।

'অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে
ধরিয়ে ললিত করুণাতান
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।'

'অপ্সরী কিন্নরী' যুক্ত অক্ষর লইয়া এখানে ছন্দ ভঙ্গ করিয়াছে। কবিও এই কারণে 'বঙ্গসুন্দরী'তে যথাসাধ্য যুক্ত অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু বাংলা যে-ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য, যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।

আর্যদর্শনে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'সংগীত যখন প্রথম বাহির হইল, তখন ছন্দের প্রভেদ মুহূর্তেই প্রতীয়মান হইল। 'সারদামঙ্গলে'র ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী, কিন্তু কবি তাহা সংগীতে সৌন্দর্যে সিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 'বঙ্গসুন্দরী'র ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, এবং সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন কিন্তু 'সারদামঙ্গলে'র গীতসৌন্দর্য অনুকরণসাধ্য নহে।

'সারদামঙ্গল' এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষায় ভাবে এবং সংগীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম পাইলাম অমনি তাহা আকার পরিবর্তন করে। সূর্যাস্তকালের সুবর্ণ-মণ্ডিত মেঘমালার মতো 'সারদামঙ্গলে'র সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না— অথচ সুদূর সৌন্দর্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।

এইজন্য 'সারদামঙ্গলে'র শ্রেষ্ঠতা অরসিক লোকের নিকট ভালোরূপে প্রমাণ করা

বড়োই কঠিন হইত। যে বলিত 'আমি বুঝিলাম না আমাকে বুঝাইয়া দাও,' তাহার নিকট হার মানিতে হইত।

কবি যাহা দিতেছেন তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য পাঠককে প্রস্তুত হওয়া উচিত; পাঠক যাহা চান তাহাই কাব্য হইতে আদায় করিবার চেষ্টা করিতে গেলে অধিকাংশ সময়ে নিরাশ হইতে হয়। তাহার ফল হয়, যাহা চাই তাহা পাই না এবং কবি যাহা দিতেছেন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। 'সারদামঙ্গলে' কবি যাহা গাহিতেছেন তাহা কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সংগীতসুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু সমালোচন-শাস্ত্রের আইনের মধ্য হইতে তাহাকে ছাঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহার অনেক রস বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে 'সারদামঙ্গল' একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়ত, সরস্বতী সম্বন্ধে সাধারণত পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

কবি যে-সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন তিনি নানা আকারে নানা ভাবে নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনও জননী, কখনও প্রেয়সী, কখনও কন্যা। তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং দয়া-স্নেহ-প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন। ইংরেজ কবি শেলি যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

> Spirit of Beauty, that dost consecrate
> With thine own hues all thou dost shine upon
> Of human thought or form.

যাহাকে বলিয়াছেন—

> Thou messenger of sympathies,
> That wax and wane in lovers' eyes.

সেই দেবীই বিহারীলালের সরস্বতী।

'সারদামঙ্গলে'র আরম্ভের চারি শ্লোকে কবি সেই সারদা দেবীকে মূর্তিমতী করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে, বাল্মীকির তপোবনে সেই করুণারূপিণী দেবীর কিরূপে আবির্ভাব হইল, কবি তাহা বর্ণনা করিতেছেন। পাঠকের নেত্রসম্মুখে দৃশ্যপট যখন উঠিল তখন তপোবনে অন্ধকার রাত্রি।

> 'নাহি চন্দ্র সূর্য তারা
> অনল-হিল্লোল-ধারা

বিচিত্র-বিদ্যুৎ-দাম-দ্যুতি ঝলমল।
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।'

এমন সময়ে উষার উদয় হইল।—

'হিমাদ্রিশিখর-' পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য-তপোবন।
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে—
তামসী-তরুণ-উষা কুমারীরতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণ।
হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানসসরে কমলকানন।'

তপোবনে এক দিকে যেমন তিমির রাত্রি ভেদ করিয়া তরুণ উষার অভ্যুদয় হইল তেমনি অপর দিকে নিষ্ঠুর হিংসাকে বিদীর্ণ করিয়া কিরূপে করুণাময় কাব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইল কবি তাহার বর্ণনা করিতেছেন।—

'অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রানী কুলুকুলুস্বনে ;
নিরখি লোচনলোভা
পুলিনবিপিনশোভা
ভ্রমেণ বাল্মীকি মুনি ভাব-ভোলা মনে।
শাখিশাখে রসসুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়

হানিল শবরে বাণ—
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ—
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।
ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে—
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণহৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়।
সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।
কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়
ঋষির ললাটে আজি না জানি কী জ্বলে!
কিরণমণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হয়ে স্থির,
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে।
করে ইন্দ্রধনু-বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝল্‌মলে কানন—
কর্ণে কিরণের ফুল,
দোদুল চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।…

করুণ ক্রন্দন রোল
উত উত উতরোল,
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে—
হেরিলেন রক্তমাখা
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্নপাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে।
একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আরবার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী—
কাতরা করুণাভরে
গান সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।
সে শোকসংগীতকথা
শুনে কাঁদে তরুলতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনীচ্ছবি
গদগদ আদিকবি
অন্তরে করুণাসিন্ধু উথলিয়া ধায়।'

সারদা দেবীর এই এক করুণামূর্তি। তাহার পর ২১ শ্লোক হইতে আবার একটি কবিতার আরম্ভ হইয়াছে। সে কবিতায় সারদা দেবী ব্রহ্মার মানস-সরোবরে স্বর্ণপদ্মের উপর দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহার অসংখ্য ছায়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহা সারদা দেবীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যমূর্তি।

'ব্রহ্মার মানসসরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর স্বর্ণনলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমাযামিনী।
কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি,

তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে ;
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে।'

এই সারদা দেবীর, Spirit of Beauty-র নব-অভ্যুদিত করুণা-বালিকামূর্তি এবং সর্বত্রব্যাপ্ত সুন্দরী ষোড়শীমূর্তির বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন—

'তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু'ই ভালো লাগে।—
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে।…
যত মনে অভিলাষ
তত তুমি ভালবাসো,
তত মনপ্রাণ ভরে আমি ভালোবাসি।
ভক্তিভাবে একতানে
মজেছি তোমার ধ্যানে,
কমলার ধনে মানে নহি অভিলাষী।'

এই মানসীরূপিণী সাধনার ধনকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়া কবি প্রথম সর্গ সমাপ্ত করিয়াছেন।

তাহার পর-সর্গ হইতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা। কখনও অভিমান কখনও বিরহ, কখনও আনন্দ কখনও বেদনা, কখনও ভৎর্সনা কখনও স্তব। দেবী কবির প্রণয়িনী রূপে উদিত হইয়া বিচিত্র সুখদুঃখে শতধারে সংগীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছেন। কবি কখনও তাঁহাকে পাইতেছেন কখনও তাঁহাকে হারাইতেছেন— কখনও তাঁহার অভয়রূপ কখনও তাঁহার সংহারমূর্তি দেখিতেছেন। কখনও তিনি অভিমানিনী, কখনও বিষাদিনী, কখনও আনন্দময়ী।

কবি বিষাদিনীকে বলিতেছেন—

'অয়ি, এ কী, কেন কেন,
বিষণ্ণ হইলে হেন—
আনত আনন-শশী, আনত নয়ন,

অধরে মন্থরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
থরথর ওষ্ঠাধর, স্ফোরে না বচন !
তেমন অরুণ-রেখা
কেন কুহেলিকা-ঢাকা,
প্রভাত-প্রতিমা আজি কেন গো মলিন ?
বলো বলো চন্দ্রাননে,
কে ব্যথা দিয়েছে মনে,
কে এমন— কে এমন হৃদয়বিহীন !
বুঝিলাম অনুমানে,
করুণা-কটাক্ষ-দানে
চাবে না আমার পানে, কবেও না কথা।
কেন যে কবে না হায়
হৃদয় জানিতে চায়,
শরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা।
যদি মর্মব্যথা নয়,
কেন অশ্রুধারা বয়।
দেববালা ছলাকলা জানে না কখন—
সরল মধুর প্রাণ,
সতত মুখেতে গান,
আপন বীণার তানে আপনি মগন।
অয়ি, হা, সরলা সতী
সত্যরূপা সরস্বতী,
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পদপদ্মাসন-কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে,
কী করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি।
স্বরগকুসুমমালা,
নরক-জ্বলন-জ্বালা,
ধরিবে প্রফুল্লমুখে মস্তকে সকলি।

তব আজ্ঞা সুমঙ্গল,
যাই যাব রসাতল,
চাই নে এ বরমালা, এ অমরাবতী।'

কবি অভিমানিনী সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

'আজি এ বিষণ্ণ বেশে
কেন দেখা দিলে এসে,
কাঁদিলে কাঁদালে, দেবি, জন্মের মতন!
পূর্ণিমাপ্রমোদ-আলো,
নয়নে লেগেছে ভালো,
মাঝেতে উথলে নদী, দু পারে দুজন—
চক্রবাক্ চক্রবাকী দু পারে দুজন।
নয়নে নয়নে মেলা,
মানসে মানসে খেলা,
অধরে প্রেমের হাসি বিষাদে মলিন।
হৃদয়বীণার মাঝে
ললিত রাগিণী বাজে,
মনের মধুর গান মনেই বিলীন।
সেই আমি সেই তুমি,
সেই এ স্বরগভূমি,
সেই-সব কল্পতরু সেই কুঞ্জবন,
সেই প্রেম সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ সেই দেহ—
কেন মন্দাকিনী-তীরে দু পারে দুজন!'

কখনও মুহূর্তের জন্য সংশয় আসিয়া বলে—

'তবে কি সকলি ভুল?
নাই কি প্রেমের মূল—
বিচিত্র গগনফুল কল্পনালতার?
মন কেন রসে ভাসে,
প্রাণ কেন ভালোবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার?

শত শত নরনারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি—
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি!
হেরে হারানিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায়—
এমন সরল সত্য কী আছে না জানি!'

কখনও-বা প্রেমোপভোগের আদর্শ চিত্র মানসপটে উদিত হয়—

'নন্দননিকুঞ্জবনে
বসি শ্বেতশিলাসনে
খোলা প্রাণে রতি-কাম বিহরে কেমন!
আননে উদার হাসি,
নয়নে অমৃতরাশি,
অপরূপ আলো এক উজলে ভুবন।…
কী এক ভাবেতে ভোর,
কী যেন নেশার ঘোর,
টলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন—
গলে গলে বাহুলতা,
জড়িমা-জড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে গলগল মন।
করে কর থরথর,
টলমল কলেবর,
গুরুগুরু দুরুদুরু বুকের ভিতর—
তরুণ অরুণ ঘটা
আননে আরক্ত ছটা,
অধর-কমলদল কাঁপে থরথর।
প্রণয় পবিত্র কাম
সুখস্বর্গ মোক্ষধাম।
আজি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ!
ফুলধনু ফুলছড়ি
দূরে যায় গড়াগড়ি,

রতির খুলিয়ে খোঁপা আলুথালু কেশ !
বিহ্বল পাগলপ্রাণে
চেয়ে সতী পতিপানে,
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন !
মুগ্ধ মত্ত নেত্র দুটি,
আধ ইন্দিবর ফুটি,
ঢুলুঢুলু ঢুলুঢুলু করিছে কেমন !
আলসে উঠিছে হাই,
ঘুম আছে, ঘুম নাই,
কী যেন স্বপনমত চলিয়াছে মনে !
সুখের সাগরে ভাসি
কিবে প্রাণ-খোলা হাসি
কী এক লহরী খেলে নয়নে নয়নে !
উথুলে উথুলে প্রাণ
উঠিছে ললিত তান,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে গান গায় দুই জন।
সুরে সুরে সম্ রাখি
ডেকে ডেকে ওঠে পাখি,
তালে তালে ঢ'লে ঢ'লে চলে সমীরণ।
কুঞ্জের আড়ালে থেকে
চন্দ্রমা লুকায়ে দেখে,
প্রণয়ীর সুখে সদা সুখী সুধাকর।
সাজিয়ে মুকুলে ফুলে
আহ্লাদেতে হেলে দুলে
চৌদিকে নিকুঞ্জলতা নাচে মনোহর।
সে আনন্দে আনন্দিনী,
উথলিয়ে মন্দাকিনী
করি করি কলধ্বনি বহে কুতূহলে।'

এইরূপ বিষাদ-বিরহ-সংশয়ের পর কবি হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত আনন্দমিলনের চিত্র আঁকিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। আরম্ভ-অংশ ব্যতীত হিমালয়ের

বর্ণনা প্রশংসার যোগ্য নহে, সেই বর্ণনা বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ উদ্‌ধৃত করি –

'উদার উদারতর
দাঁড়ায়ে শিখর-'পর
এই-যে হৃদয়রানী ত্রিদিবসুষমা।
এ নিসর্গ-রঙ্গভূমি,
মনোরমা নটী তুমি,
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা।
আননে বচন নাই,
নয়নে পলক নাই,
কান নাই মন নাই আমার কথায়—
মুখখানি হাস-হাস,
আলুথালু বেশবাস,
আলুথালু কেশপাশ বাতাসে লুটায়।
না জানি কী অভিনব
খুলিয়ে গিয়েছে ভব
আজি ও বিহ্বল মত্ত প্রফুল্ল নয়নে!
আদরিণী, পাগলিনী,
এ নহে শশিযামিনী—
ঘুমাইয়ে একাকিনী কী দেখ স্বপনে!
আহা কী ফুটিল হাসি!
বড়ো আমি ভালোবাসি
ওই হাসিমুখখানি প্রেয়সী তোমার—
বিষাদের আবরণে
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে
দেখিবার আশা আর ছিল না আমার।
দরিদ্র ইন্দ্রত্বলাভে
কতটুকু সুখ পাবে,
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার।...
এসো বোন, এসো ভাই,
হেসে খেলে চলে যাই,

আনন্দে আনন্দ করি আনন্দকাননে।
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে।
হে প্রশান্ত গিরিভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে।
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে।
প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মুরতি তোমার।
হেরে কত দুঃস্বপন
পাগল হয়েছে মন—
কতই কেঁদেছি আমি ক'রে হাহাকার।
আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী-সম
আনন্দসাগর-মাঝে খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দু নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়।
দেখিয়ে মেটে না সাধ,
কী জানি কী আছে স্বাদ,
কী জানি কী মাখা আছে ও শুভ-আননে!
কী এক বিমল ভাতি
প্রভাত করেছে রাতি,
হাসিছে অমরাবতী নয়নকিরণে।
এমন সাধের ধনে
প্রতিবাদী জনে জনে—
দয়া মায়া নাই মনে, কেমন কঠোর!
আদরে গেঁথেছে বালা
হৃদয়কুসুমমালা,
কৃপাণে কাটিবে কে রে সেই ফুলডোর!

পুন কেন অশ্রুজল,
বহ তুমি অবিরল,
চরণকমল আহা ধুয়াও দেবীর!
মানসসরসী-কোলে
সোনার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর।
বিহঙ্গম, খুলে প্রাণ
ধরো রে পঞ্চম তান,
সারদামঙ্গলগান গাও কুতূহলে।'

কবি যে সূত্রে 'সারদামঙ্গলে'র এই কবিতাগুলি গাঁথিয়াছেন তাহা ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কি না জানি না— মধ্যে মধ্যে সূত্র হারাইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়— কিন্তু এ কথা বলিতে পারি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না; বর্তমান সমালোচক এককালে 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গলে'র কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক। এই প্রসঙ্গে আমার সেই কাব্যগুরুর নিকট আর-একটি ঋণ স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া "বিদ্বজ্জনসমাগম"-নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন-কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।

আজ কুড়ি বৎসর হইল 'সারদামঙ্গল' আর্যদর্শন পত্রে এবং ষোলো বৎসর হইল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; ভারতী পত্রিকায় কেবল একটিমাত্র সমালোচক ইহাকে সাদরসম্ভাষণ করেন। তাহার পর হইতে 'সারদামঙ্গল' এই ষোড়শ বৎসর অনাদৃতভাবে প্রথম সংস্করণের মধ্যেই অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছে। কবিও সেই অবধি আর বাহিরে দর্শন দেন নাই। যিনি জীবনরঙ্গভূমির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দর্শকমণ্ডলীর স্তুতিধ্বনির অতীত ছিলেন তিনি আজ মৃত্যুর যবনিকান্তরালে অপসৃত

হইয়া সাধারণের বিদায়সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলেন না ; কিন্তু এ কথা সাহসপূর্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শতসহস্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং বিস্মৃত হইয়া যাইবে 'সারদামঙ্গল' তখন লোকস্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।

আষাঢ় ১৩০১

সঞ্জীবচন্দ্র

পালামৌ

কোনো কোনো ক্ষমতাশালী লেখকের প্রতিভায় কী একটি গ্রহদোষে অসম্পূর্ণতার অভিশাপ থাকিয়া যায় ; তাঁহারা অনেক লিখিলেও মনে হয় তাঁহাদের সব লেখা শেষ হয় নাই। তাঁহাদের প্রতিভাকে আমরা সুসংলগ্ন আকারবদ্ধভাবে পাই না ; বুঝিতে পারি তাহার মধ্যে বৃহত্ত্বের মহত্ত্বের অনেক উপাদান ছিল, কেবল সেই সংযোজনা ছিল না যাহার প্রভাবে সে আপনাকে সর্বসাধারণের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে প্রকাশ ও প্রমাণ করিতে পারে।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা পূর্বোক্ত শ্রেণীর। তাঁহার রচনা হইতে অনুভব করা যায় তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের কাজ দেখিলে মনে হয়, তিনি যতটা কাজে দেখাইয়াছেন তাঁহার সাধ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহার মধ্যে যে পরিমাণে ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণে উদ্যম ছিল না।

তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। ভালো গৃহিণীপনায় স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে ; যতটুকু আছে তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিণীপনার অভাবে সে ঐশ্বর্য ব্যর্থ হইয়া যায় ; সে-স্থলে অনেক জিনিস ফেলাছড়া যায় অথচ অল্প জিনিসই কাজে আসে। তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই ; তাহার কারণ সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী, কিন্তু গৃহিণী নহে।

একটা উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ আমার কথাটা বুঝিতে পারিবেন। 'জাল প্রতাপচাঁদ' -নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনাসংস্থান, প্রমাণবিচার এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে-একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্বিক

গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকে না— কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয় ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র। এই ক্ষমতা যদি তিনি কোনো প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেন তবে তাহা আমাদের ক্ষণিক কৌতূহল চরিতার্থ না করিয়া স্থায়ী আনন্দের বিষয় হইত। যে কারুকার্য প্রস্তরের উপর খোদিত করা উচিত তাহা বালুকার উপরে অঙ্কিত করিলে কেবল আক্ষেপের উদয় হয়।

'পালামৌ' সঞ্জীবের রচিত একটি রমণীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইহাতে সৌন্দর্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু পড়িতে পড়িতে প্রতিপদে মনে হয় লেখক যথোচিত যত্নসহকারে লেখেন নাই। ইহার রচনার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে আলস্য ও অবহেলা জড়িত আছে, এবং তাহা রচয়িতারও অগোচর ছিল না। বঙ্কিমবাবুর রচনায় যেখানেই দুর্বলতার লক্ষণ আছে সেইখানেই তিনি পাঠকগণকে চোখ রাঙাইয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন— সঞ্জীববাবু অনুরূপ স্থলে অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেটা কেবল পাঠকদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য— তাহার মধ্যে অনুতাপ নাই এবং ভবিষ্যতে যে সতর্ক হইবেন কথার ভাবে তাহাও মনে হয় না। তিনি যেন পাঠকদিগকে বলিয়া রাখিয়াছেন, 'দেখো বাপু, আমি আপন ইচ্ছায় যাহা দিতেছি তাহাই গ্রহণ করো, বেশি মাত্রায় কিছু প্রত্যাশা করিয়ো না।'

'পালামৌ'-ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি যে ছাঁদে লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে আশপাশের নানা কথা আসিতে পারে— কিন্তু তবু তাহার মধ্যেও নির্বাচন এবং পরিমাণসামঞ্জস্যের আবশ্যকতা আছে। যে-সকল কথা আসিবে তাহারা আপনি আসিয়া পড়িবে, অথচ কথার স্রোতকে বাধা দিবে না। ঝর্না যখন চলে তখন যে পাথরগুলাকে স্রোতের মুখে ঠেলিয়া লইতে পারে তাহাকেই বহন করিয়া লয়, যাহাকে অবাধে লঙ্ঘন করিতে পারে তাহাকে নিমগ্ন করিয়া চলে, আর যে পাথরটা বহন বা লঙ্ঘন -যোগ্য নহে তাহাকে অনায়াসে পাশ কাটাইয়া যায়। সঞ্জীববাবুর এই ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে এমন অনেক বক্তৃতা আসিয়া পড়িয়াছে যাহা পাশ কাটাইবার যোগ্য, যাহাতে রসের ব্যাঘাত করিয়াছে এবং লেখকও অবশেষে বলিয়াছেন, 'এখন এ-সকল কচ্‌কচি যাক।' কিন্তু এই-সকল কচ্‌কচিগুলিকে সযত্নে বর্জন করিবার উপযোগী সতর্ক উদ্যম তাঁহার স্বভাবতই ছিল না। যে কথা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে অনাবশ্যক হইলেও সে কথা সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে।

যেজন্য সঞ্জীবের প্রতিভা সাধারণের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই আমরা উপরে তাহার কারণ ও উদাহরণ দেখাইতেছিলাম, আবার যেজন্য সঞ্জীবের

প্রতিভা ভাবুকের নিকট সমাদরের যোগ্য তাহার কারণও যথেষ্ট আছে।

'পালামৌ'-ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে-একটি অকৃত্রিম সজাগ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণত আমাদের জাতির মধ্যে একটি বিজ্ঞবার্ধক্যের লক্ষণ আছে— আমাদের চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্যের মায়া-আবরণ যেন বিস্রস্ত হইয়াছে, এবং বিশ্বসংসারের অনাদি প্রাচীনতা পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমাদের নিকটই ধরা পড়িয়াছে। সেইজন্য অশনবসন ছন্দভাষা আচারব্যবহার বাসস্থান সর্বত্রই সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের এমন সুগভীর অবহেলা। কিন্তু সঞ্জীবের অন্তরে সেই জরার রাজত্ব ছিল না। তিনি যেন একটি নূতনসৃষ্ট জগতের মধ্যে একজোড়া নূতন চক্ষু লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। 'পালামৌ'তে সঞ্জীবচন্দ্র যে বিশেষ কোনো কৌতূহলজনক নূতন কিছু দেখিয়াছেন, অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু সর্বত্রই ভালোবাসিবার ও ভালো লাগিবার একটা ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। পালামৌ দেশটা সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান চিত্রের মতো প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যে সহৃদয়তা ও রসবোধ থাকিলে জগতের সর্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্যের সুধাভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিসটি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার হৃদয়ের সেই অনুরাগপূর্ণ মমত্ববৃত্তির কল্যাণকিরণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে— কৃষ্ণবর্ণ কোলরমণীই হউক, বনসমাকীর্ণ পর্বতভূমিই হউক, জড় হউক চেতন হউক, ছোটো হউক বড়ো হউক, সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দর্য এবং গৌরব অর্পণ করিয়াছে।

লেখক যখন যাত্রা-আরম্ভকালে গাড়ি করিয়া বরাকর নদী পার হইতেছেন এমন সময় কুলিদের বালকবালিকারা তাঁহার গাড়ি ঘিরিয়া 'সাহেব একটি পয়সা' 'সাহেব একটি পয়সা' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ; লেখক বলিতেছেন—

'এই সময় একটি দুই-বৎসর-বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল ; অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তুমুল কলহ বাধিল।'

সামান্য শিশুর এই শিশুত্বটুকু, তাহার উদ্দেশ্যবোধহীন অনুকরণবৃত্তির এই ক্ষুদ্র উদাহরণটুকুর উপর সঞ্জীবের যে-একটি সকৌতুক স্নেহহাস্য নিপতিত রহিয়াছে সেইটি পাঠকের নিকট রমণীয় ; সেই একটি উল্‌টা-হাতপাতা ঊর্ধ্বমুখ অজ্ঞান লোভহীন

শিশু-ভিক্ষুকের চিত্রটি সমস্ত শিশুজাতির প্রতি আমাদের মনের একটি মধুর রস আকর্ষণ করিয়া আনে।

দৃশ্যটি নূতন এবং অসামান্য বলিয়া নহে, পরন্তু পুরাতন এবং সামান্য বলিয়াই আমাদের হৃদয়কে এরূপ বিচলিত করে। শিশুদের মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে ইহারই অনুরূপ অনেক ঘটনা দেখিয়া আসিয়াছি, সেইগুলি বিস্মৃতভাবে আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। সঞ্জীবের রচিত চিত্রটি আমাদের সম্মুখে খাড়া হইবামাত্র সেই-সকল অপরিস্ফুট স্মৃতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং তৎসহকারে শিশুদের প্রতি আমাদের স্নেহরাশি ঘনীভূত হইয়া আনন্দরসে পরিণত হইল।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন, সচরাচর লোকে যাহা দেখে না সঞ্জীববাবু তাহাই দেখিতেন— ইহা তাঁহার একটি বিশেষত্ব। আমরা বলি, সঞ্জীববাবুর সেই বিশেষত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে সে বিশেষত্বের কোনো আবশ্যকতা নাই। আমরা পূর্বে যে ঘটনাটি উদ্‌ধৃত করিয়াছি তাহা নূতন লক্ষগোচর বিষয় নহে, তাহার মধ্যে কোনো নূতন চিন্তা বা পর্যবেক্ষণ করিবার কোনো নূতন প্রণালী নাই, কিন্তু তথাপি উহা প্রকৃত সাহিত্যের অঙ্গ। গ্রন্থ হইতে আর-এক অংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি। লেখক বলিতেছেন, এক-দিন পাহাড়ের মূলদেশে দাঁড়াইয়া চীৎকার-শব্দে একটা পোষা কুকুরকে ডাকিবামাত্র 'পশ্চাতে সেই চীৎকার আশ্চর্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্বমত হ্রস্বদীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চনীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোনো-একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে।··· ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ-কন্‌ডক্‌টার।'

ইহা বিজ্ঞান, সম্ভবত ভ্রান্ত বিজ্ঞান। ইহা নূতন হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে কোনো রসের অবতারণা করে না— আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে-একটি সাহিত্য-কন্‌ডক্‌টর আছে সে স্তরে ইহা প্রতিধ্বনিত হয় না। ইহার পূর্বোদ্‌ধৃত ঘটনাটি অবিসংবাদিত ও পুরাতন, কিন্তু তাহার বর্ণনা আমাদের হৃদয়ের সাহিত্যস্তরে কম্পিত হইতে থাকে।

চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার মতের সপক্ষে একটি উদাহরণ প্রয়োগ করিয়াছেন। সেটি আমরা মূল গ্রন্থ হইতে আদ্যোপান্ত উদ্‌ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

'নিত্য অপরাহ্ণে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন তাহা কখনও ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহারও

সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোনো গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমায় সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একার নহে। যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে জল আনিতে যাইবে। জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে। জলে যে যাইতে পাইল না সে অভাগিনী, সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রঙ ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয় আমিও পৃথিবীর রঙ-ফেরা দেখিতে যাইতাম।'

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—

'জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়, আমাদের মেয়েদের জল আনা এমন করিয়া কয় জন লক্ষ্য করে?'

আমাদের বিবেচনায় সমালোচকের এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। হয়তো, অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, হয়তো নাও দেখিতে পারে। কুলবধূরা জল ফেলিয়াও জল আনিতে যায়, সাধারণের স্থূলদৃষ্টির অগোচর এই নবাবিষ্কৃত তথ্যটির জন্য আমরা উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনাটির প্রশংসা করি না। বাংলাদেশে অপরাহ্নে মেয়েদের জল আনিতে যাওয়া -নামক সর্বসাধারণের সুগোচর একটি অত্যন্ত পুরাতন ব্যাপারকে সঞ্জীব নিজের কল্পনার সৌন্দর্যকিরণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া উক্ত বর্ণনা আমাদের নিকট আদরের সামগ্রী। যাহা সুগোচর তাহা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে ইহা আমাদের পরম লাভ। সম্ভবত, সত্যের হিসাব হইতে দেখিতে গেলে অনেক মেয়ে ঘাটে সখীমণ্ডলীর নিকট গল্প শুনিতে বা কুৎসা রটনা করিতে যায়, হয়তো সমস্ত দিন গৃহকার্যের পর ঘরের বাহিরে জল আনিতে যাওয়াতে তাহারা একটা পরিবর্তন অনুভব করিয়া সুখ পায়, অনেকেই হয়তো নিতান্তই কেবল একটা অভ্যাসপালন করিবার জন্য ব্যগ্র হয় মাত্র, কিন্তু সেই-সকল মনস্তত্ত্বের মীমাংসাকে আমরা এ স্থলে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। অপরাহ্নে জল আনিতে যাইবার যতগুলি কারণ সম্ভব হইতে পারে তন্মধ্যে সব-চেয়ে যেটি সুন্দর সঞ্জীব সেইটি আরোপ করিবামাত্র অপরাহ্নের ছায়ালোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া কুলবধূর জল আনার দৃশ্যটি বড়োই মনোহর হইয়া উঠে; এবং যে মেয়েটি জল আনিতে যাইতে পারিল না বলিয়া একা বসিয়া শূন্যমনে দেখিতে থাকে উঠানের ছায়া দীর্ঘতর এবং আকাশের ছায়া নিবিড়তর হইয়া আসিতেছে, তাহার বিষণ্ণ মুখের উপর সায়াহ্নের ম্লান স্বর্ণচ্ছায়া পতিত হইয়া গৃহপ্রাঙ্গণতলে একটি অপরূপ সুন্দর মূর্তির সৃষ্টি করিয়া তোলে। এই মেয়েটিকে যে সঞ্জীব লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আমরা লক্ষ্য করি নাই তাহা নহে, তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে সম্ভবপররূপে

স্থায়ী করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিতেও চাহি না, এইরূপ মেয়ের অস্তিত্ব বাংলাদেশে সাধারণত সত্য কি না এবং সেই সত্যটি সঞ্জীবের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না। আমরা কেবল অনুভব করি, ছবিটি সুন্দর বটে এবং অসম্ভবও নহে।

সঞ্জীববাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন—

'বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূত প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহ-আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়; কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী, কিন্তু বৃক্ষপল্লব নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্রভেদ।'

সঞ্জীববাবুর এই মতটি অবলম্বন করিয়া চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছেন—

'সঞ্জীববাবুর সৌন্দর্যতত্ত্ব ভালো করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভালো করিয়া বুঝা যায় না, ভালো করিয়া সম্ভোগ করা যায় না।'

সমালোচকের এ কথায় আমরা কিছুতেই সায় দিতে পারি না। কোনো-একটি বিশেষ সৌন্দর্যতত্ত্ব অবলম্বন না করিলে সঞ্জীবের রচনার সৌন্দর্য বুঝা যায় না এ কথা যদি সত্য হইত তবে তাঁহার রচনা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য হইত না। নদ-নদীতেও সৌন্দর্য আছে, পুষ্পে নক্ষত্রেও সৌন্দর্য আছে, মনুষ্যে পশুপক্ষীতেও সৌন্দর্য আছে, এ কথা প্লেটো না পড়িয়াও আমরা জানিতাম— সেই সৌন্দর্য ভূতের মতো বাহির হইতে আসিয়া বস্তুবিশেষে আবির্ভূত হয় অথবা তাহা বস্তুর এবং আমাদের প্রকৃতির বিশেষ ধর্মবশত আমাদের মনের মধ্যে উদিত হয় সে-সমস্ত তত্ত্বের সহিত সৌন্দর্যসম্ভোগের কিছুমাত্র যোগ নাই। একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও যখন তাহার প্রিয়মুখকে চাঁদমুখ বলে তখন সে কোনো বিশেষ তত্ত্ব না পড়িয়াও স্বীকার করে যে, যদিচ চাঁদ এবং তাহার প্রিয়জন বস্তুত সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ তথাপি চাঁদের দর্শন হইতে সে যে-জাতীয় সুখ অনুভব করে তাহার প্রিয়মুখ হইতেও ঠিক সেইজাতীয় সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমাদের মতভেদ কিছু বিস্তারিত করিয়া বলিলাম; তাহার কারণ এই যে, এই উপায়ে পাঠকগণ অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন আমরা সাহিত্যকে কী নজরে দেখিয়া থাকি। এবং ইহাও বুঝিবেন, যাহা প্রকৃতপক্ষে সহজ এবং সর্বজনগম্য আজকালকার সমালোচন-প্রণালীতে তাহাকে জটিল করিয়া তুলিয়া পুরাতনকে একটা নূতন ঘরগড়া আকার দিয়া পাঠকের নিকট ধরিবার চেষ্টা করা হয়। ভালো কাব্যের সমালোচনায় পাঠকের হৃদয়ে সৌন্দর্য সঞ্চার করিবার দিকে লক্ষ না রাখিয়া নূতন এবং কঠিন কথায় পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিবার প্রয়াস

আজকাল দেখা যায়; তাহাতে সমালোচনা সত্য হয় না, সহজ হয় না, সুন্দর হয় না, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হইয়া উঠে।

গ্রন্থকার কোল-যুবতীদের নৃত্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্‌ধৃত করি।—

'এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড়ো হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ-বারোটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে। হাস্য-উপহাস্য শেষ হইলে নৃত্যের উদ্‌যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত-ধরাধরি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড়ো চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম-উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কালো; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলেরই সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে এক-একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

'সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃন্ময়মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল।'

এই বর্ণনাটি সুন্দর, ইহা ছাড়া আর কী বলিবার আছে? এবং ইহা অপেক্ষা প্রশংসার বিষয়ই বা কী হইতে পারে? নৃত্যের পূর্বে আহ্লাদে চঞ্চল যুবতীগণ তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় দেহবেগ সংযত করিয়া আছে, এ কথায় যে চিত্র আমাদের মনে উদয় হয় সে আমাদের কল্পনাশক্তিপ্রভাবে হয়, কোনো বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা হয় না। 'যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল' এ কথা বলিলে ত্বরিত আমাদের মনে একটা ভাবের উদয় হয়; যে কথাটা সহজে বর্ণনা করা দুরূহ তাহা ওই উপমা-দ্বারা এক পলকে আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। নৃত্যের বাদ্য বাজিবামাত্র চিরাভ্যাসক্রমে কোল-রমণীদের সর্বাঙ্গে একটা উদ্দাম উৎসাহচাঞ্চল্য তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন একটা জানাজানি কানাকানি, একটা সচকিত উদ্যম, একটা উৎসবের আয়োজন পড়িয়া গেল— যদি আমাদের দিব্যকর্ণ থাকিত তবে যেন আমরা তাহাদের নৃত্যবেগে উল্লসিত দেহের কলকোলাহল শুনিতে পাইতাম। নৃত্যবাদ্যের প্রথম আঘাতমাত্রেই যৌবনসন্নদ্ধ

কোলাঙ্গনাগণের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বিভঙ্গিত এই-যে একটা হিল্লোল ইহা এমন সূক্ষ্ম, ইহার এতটা কেবল আমাদের অনুমানবোধ্য এবং ভাবগম্য যে, তাহা বর্ণনায় পরিস্ফুট করিতে হইলে 'কোলাহলে'র উপমা অবলম্বন করিতে হয়, এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে আর-কোনো গূঢ়তত্ত্ব নাই। যদি এই উপমা-দ্বারা লেখকের মনোগত ভাব পরিস্ফুট না হইয়া থাকে, তবে ইহার অন্য কোনো সার্থকতা নাই, তবে ইহা প্রলাপোক্তি মাত্র।

বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরী যখন পদ্মবীজমালা হস্তে মহাদেবের তপোবনে প্রবেশ করিতেছেন তখন কালিদাস তাঁহাকে 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' বলিয়াছেন; সঙ্গিনী-পরিবৃতা সুন্দরী রাধিকা যখন দৃষ্টিপথে প্রবেশ করিলেন তখন গোবিন্দদাস তাঁহাকে মোহিনী পঞ্চম রাগিণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন; তাঁহাদের কোনো বিশেষ সৌন্দর্যতত্ত্ব ছিল কি না জানি না, কিন্তু এরূপ বিসদৃশ উপমাপ্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, দক্ষিণ-বায়ুতে বসন্তকালের পল্লবে-ভরা লতার আন্দোলন আমরা অনেকবার দেখিয়াছি; তাহার সেই সৌন্দর্যভঙ্গি আমাদের নিকট সুপরিচিত; সেই উপমাটি প্রয়োগ করিবামাত্র আমাদের বহুকালের সঞ্চিত পরিচিত একটি সৌন্দর্যভাবে ভূষিত হইয়া এক কথায় গৌরী আমাদের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠেন; আমরা জানি রাগিণী আমাদের মনে কী-একটি বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা সঞ্চার করে, এইজন্য পঞ্চম রাগিণীর সহিত রাধিকার তুলনা করিবামাত্র আমাদের মনে যে-একটি অনির্দেশ্য অথচ চিরপরিচিত মধুর ভাবের উদ্রেক হয় তাহা কোনো বর্ণনাবাহুল্যের দ্বারা হইত না; অতএব দেখা যাইতেছে, অন্য সৌন্দর্যরাজ্যে সঞ্জীববাবু তাঁহার নিজের রচিত একটা নূতন গলি কাটেন নাই, সমুদয় ভাবুক ও কবিবর্গের পুরাতন রাজপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন এবং সেই তাঁহার গৌরব।

সঞ্জীব একটি যুবতীর বর্ণনার মধ্যে বলিয়াছেন—

'তাহার যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি ঊর্ধ্বে নীল আকাশে কোনো বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে।'

এই উপমাটি পড়িবামাত্র মনে বড়ো একটি আনন্দের উদয় হয়; কেবলমাত্র উপমাসাদৃশ্য তাহার কারণ নহে, কিন্তু সেই সাদৃশ্যটুকুকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া একটা সৌন্দর্যের সহিত আর-কতকগুলি সৌন্দর্য জড়িত হইয়া যায়— সে একটা ইন্দ্রজালের মতো; ঠিক করিয়া বলা শক্ত যে, অপরাহ্নের অতিদূর নির্মল নীলাকাশে ভাসমান স্থিরপক্ষ স্থগিতগতি পাখিটিকে দেখিতেছি, না, যুবতীর শুভ্রসুন্দর ললাটতলে অঙ্কিত একটি জোড়া ভুরু আমাদের চক্ষে পড়িতেছে। জানি না, কেমন করিয়া কী মন্ত্রবলে একটি ক্ষুদ্র ললাটের উপর সহসা আলোকধৌত নীলাম্বরের অনন্ত বিস্তার আসিয়া

পড়ে এবং মনে হয় যেন রমণীমুখের সেই ভ্রূযুগল দেখিতে স্থিরদৃষ্টিকে বহু উচ্চে বহু দূরে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। এই উপমায় হঠাৎ এইরূপ একটা বিভ্রম উৎপন্ন করে— কিন্তু সেই ভ্রমের কুহকেই সৌন্দর্য ঘনীভূত হইয়া উঠে।

অবশেষে গ্রন্থ হইতে একটি সরল বর্ণনার উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। গ্রন্থকার একটি নিদ্রিত বাঘের বর্ণনা করিতেছেন—

'প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভালোমানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে; মুখের নিকট সুন্দর নখরসংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল।'

আহারপরিতৃপ্ত সুপ্তশান্ত ব্যাঘ্রটি ওই-যে মুখের সামনে একটি থাবা উল্‌টাইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এই এক কথায় ঘুমন্ত বাঘের ছবিটি যেমন সুস্পষ্ট সত্য হইয়া উঠিয়াছে এমন আর-কিছুতে হইতে পারিত না। সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিস সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।

পৌষ ১৩০১

বিদ্যাপতির রাধিকা

গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গি, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের দাহ, প্রেমের আলোক। এইজন্য ছন্দ সংগীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্যসুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা। ইহা কেবল যৌবনের প্রথম-আরম্ভের আনন্দোচ্ছ্বাস। কেবল অবিমিশ্র সুখ এবং অব্যাহত সংগীতধ্বনি। দুঃখ নাই যে তাহা নহে কিন্তু সুখদুঃখের মাঝখানে একটা অন্তরাল-ব্যবধান আছে। হয় সুখ নয় দুঃখ, হয় মিলন নয় বিরহ, এইরূপ পরিষ্কার শ্রেণী-বিভাগ। চণ্ডীদাসের মতো সুখে দুঃখে বিরহে মিলনে জড়িত হইয়া যায় নাই। সেইজন্য বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।

অল্প বয়সের ধর্মই এই, সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া দেখে। যেন জগতে এক দিকে বিশুদ্ধ ভালো আর-এক দিকে বিশুদ্ধ মন্দ, এক দিকে

একান্ত সুখ আর-এক দিকে একান্ত দুঃখ প্রতিপক্ষতা অবলম্বন করিয়া পরস্পর বিমুখ হইয়া বসিয়া আছে। সে বয়সে সকল বিষয়ের একটা পরিপূর্ণ আদর্শ হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকে। গুণ দেখিলেই সর্বগুণ কল্পনা করি, দোষ দেখিলেই সর্বদোষ একত্র হইয়া পিশাচমূর্তি ধারণ করে। সুখ দেখা দিলেই ত্রিভুবনে দুঃখের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যায়, এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে কোথাও সুখের লেশমাত্র দেখা যায় না। সংগীত সেইজন্য সর্বদাই উচ্ছ্বসিত পঞ্চম স্বরে বাঁধা। বিদ্যাপতিতে সেইজন্য কেবল বসন্ত।

রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢলঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারি দিকে একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি। একটু ব্যাকুলতা, একটু আশানৈরাশ্যের আন্দোলনও আছে। কিন্তু তাহা নিতান্ত মর্মঘাতী নহে। চণ্ডীদাসের যেমন—

নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি হয়—

বিদ্যাপতিতে সেরূপ উতরোল ভাব নয়— কতকটা উতলা বটে। কেবল আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন; কেবল হঠাৎ উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী; নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক-অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতিসাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। যেমন একটি ভীরু বালিকা স্বাভাবিক পশুস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞাত-স্বভাব মৃগকে একবার সচকিতে স্পর্শ করে, একবার পালায়, ক্রমে ক্রমে ভয় ভাঙে, সেইরূপ।

যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলই রহস্যপরিপূর্ণ। সদ্য-বিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে; আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না—

কবহুঁ বাঁধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।

হৃদয়ের নবীন বাসনাসকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়, কিন্তু এখনও পথ জানে নাই। কৌতূহল এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয় আবার জড়সড়

অঞ্চলটির অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

এখন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশি। ইহাতে গভীরতার অটল স্থৈর্য নাই কেবল নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলাচাঞ্চল্য। বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে; ফেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে; সূর্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে; তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য, করতালি; কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেমহিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কত ছন্দে কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে, বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতি-তরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।

কদাচ কখনও দেখা হয়, যমুনার জলে অথবা স্নান করিয়া ফিরিবার সময়। কিন্তু ভালো করিয়া দেখা হয় না। একে অল্পক্ষণের দেখা, তাহাতে অধৈর্যচঞ্চল দোদুল্যমান হৃদয়ে সৌন্দর্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়— মনকে শান্ত করিয়া ধৈর্য ধরিয়া দেখিবার অবসর পাওয়া যায় না— যেটুকু দেখা গেল সে কেবল—

'আধ আঁচর খসি আধবদনে হসি,
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।'

কিন্তু

'ভালো করি পেখন না ভেল।'

তাহার পর কত আসা-যাওয়া, কত বলা-কওয়া, কত ছলে কত ভাব প্রকাশ, কত ভয়, কত ভাবনা— অবশেষে একদিন মধুর বসন্তে নবীন মিলন; কিন্তু তাহাও নিবিড় নিগূঢ় নিরতিশয় মিলন নহে। তাহার মধ্যে কত আশঙ্কা, কত আশ্বাস, কত কৌতুক, কত ছদ্মলীলা, কত মান-অভিমান সাধ্যসাধনা! আবার সখীর সহিত পরামর্শ; সখীকে ডাকিয়া গৃহকোণে নিভৃতে বসিয়া নানা ছলে এবং কথার কৌশলে আপনার সুখস্মৃতি লইয়া আলোচনা। নবীনার নবপ্রেম যেমন মুগ্ধ যেমন মিশ্রিত বিচিত্র কৌতুককৌতূহলপরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই কম নাই।

চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।

'নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ,
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল।
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী-পুলিন-কুঞ্জ নব শোভন,
নব নব প্রেম বিভোর।
নবীন রসাল-মুকুল মধুমাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই
নব রসে কাননে ধায়।
নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥'

ইহার সহিত আর-একটি গীত যোগ না করিলে ইহা সম্পূর্ণ হয় না।

'মধু ঋতু, মধুকর পাঁতি;
মধুর-কুসুম-মধু-মাতি।
মধুর বৃন্দাবন মাঝ,
মধুর মধুর রসরাজ।
মধুর-যুবতীগণ-সঙ্গ
মধুর মধুর রস রঙ্গ।
মধুর যন্ত্র সুরসাল,
মধুর মধুর করতাল।
মধুর নটন-গতিভঙ্গ,
মধুর নটনী-নট-রঙ্গ।
মধুর মধুর রস গান,
মধুর বিদ্যাপতি ভান।'

এইখানেই শেষ করা যাইত। কিন্তু এখানে শেষ করিলে বড়ো অসমাপ্ত থাকে। ঠিক সমে আসিয়া থামে না। এইজন্য বিদ্যাপতি একটি শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা যাইতে পারে অশেষ কথাও বলা যাইতে পারে; এত লীলা-খেলা নব নব রসোল্লাসের পরিণাম-কথা এই যে—

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।'

নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গেল। ইহার পরে ছন্দ এবং রাগিণী পরিবর্তন করা আবশ্যক। চিরনবীন প্রেমের ভূমিকা সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস আসিয়া চিরপুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।

চৈত্র ১২৯৮

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম ইংরাজি শিক্ষা পাইয়া আমরা যখন রাজনীতির সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলাম, সমাজনীতি এবং ধর্মনীতিও সেই নিষ্ঠুর পরীক্ষার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। তখন ছাত্রমাত্রেরই মনে আমাদের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে একটা অসন্তোষ ও সংশয়ের উদ্রেক হইয়াছিল।

বিচারের পর কাজের পালা। মতের দ্বারা ভালোমন্দ স্থির করা কঠিন নহে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তদনুসারে আপন কর্তব্য নিয়মিত করা অত্যন্ত দুরূহ। রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের নিজের কর্তব্য অতি যৎসামান্য; কারণ, রাজত্বের অধিকার আমাদের হস্তে কিছুই নাই। এইজন্য পোলিটিকাল সমালোচনা এখনও অত্যন্ত তীব্র ও প্রবল-ভাবেই চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে কোনোপ্রকার দ্বিধা অথবা বাধা অনুভব করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। কিন্তু সমাজ ও ধর্ম -সম্বন্ধীয় কর্তব্য আমাদের নিজের হাতে; অতএব ধর্ম ও সমাজনীতি সম্বন্ধে বিচারে যাহা স্থির হয় কাজে তাহার প্রয়োগ না হইলে সেজন্য আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও দোষী করা যায় না। মানুষ বেশিক্ষণ আপনাকে দোষী করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; এবং নিজের প্রতি দোষারোপ করিয়া অম্লানবদনে বসিয়া থাকাও তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। এইজন্য সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে এক-একটি কৈফিয়ত বাহির করিয়া আমরা মনকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলাম; অবশেষে এমন হইল যে, আমাদের যাহা-কিছু আছে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইহা আমরা কিছু অধিক উচ্চস্বরে এবং প্রাণপণ বল-সহকারে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এরূপ ব্যবহার যে কপট ও কৃত্রিম আমি তাহা বলি না। বস্তুত, সমাজ ও ধর্মের মূল জাতীয় প্রকৃতির এমন গভীরতম দেশে অনুপ্রবিষ্ট যে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে নানা দিক হইতে নানা গুরুতর বাধা আসিয়া পড়ে এবং পুরাতন অমঙ্গলের স্থলে নূতন অমঙ্গল মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এমন স্থলে শঙ্কিতচিত্তে পুনরায় নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং সেই নিশ্চেষ্টতার পথে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত স্পর্ধার সহিত আস্ফালন করাও অস্বাভাবিক নহে— বুক ফুলাইয়া সর্বসাধারণকে বলিতে ইচ্ছা করে, ইহা আমাদের হার নহে, জিত।

আমাদের বঙ্গসমাজের এইরূপ উল্টারথের দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচিত হয়। যখন বড়ো-ছোটো অনেকে মিলিয়া জনতার স্বরে স্বর মিলাইয়া গোলে হরিবোল দিতেছিলেন তখন প্রতিভার কণ্ঠে একটা নূতন স্বর বাজিয়া উঠিল— বঙ্কিমচন্দ্রের

'কৃষ্ণচরিত্র' গোলে হরিবোল নহে। ইহাতে সর্বসাধারণের সমর্থন নাই, সর্বসাধারণের প্রতি অনুশাসন আছে।

যে সময়ে 'কৃষ্ণচরিত্র' রচিত হইয়াছে সেই সময়ের গতি এবং বঙ্কিমের চতুর্দিক্‌বর্তী অনুবর্তিগণের ভাবভঙ্গী বিচার করিয়া দেখিলে এই 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে প্রতিভার একটি প্রবল স্বাধীন বল অনুভব করা যায়।

সেই বলটি আমাদের একটি স্থায়ী লাভ। সেই বলটি বাঙালির পরম আবশ্যক। সেই বল স্থানে স্থানে ন্যায় এবং শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে তথাপি তাহা আমাদের ন্যায় হীনবীর্য ভীরুদের পক্ষে একটি অভয় আশ্রয়দণ্ড।

যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয়ঘোষণা করিতেছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীরদর্পসহকারে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তিদ্বারা তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়নপূর্বক অপমানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের মতে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক, স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমত বঙ্কিম বুঝাইয়াছেন, জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না, সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের শ্রেষ্ঠতা এবং ঐতিহাসিকতা প্রমাণের বিষয়। গ্রন্থের প্রথমাংশে লেখক ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণচরিত্রের রীতিমত ইতিহাস-সমালোচনা এই প্রথম। ইতিপূর্বে কেহ ইহার সূত্রপাত করিয়া যায় নাই, এইজন্য ভাঙিবার এবং গড়িবার ভার উভয়ই বঙ্কিমকে লইতে হইয়াছে। কোন্‌টা ইতিহাস তাহা স্থির করিবার পূর্বে কোন্‌টা ইতিহাস নহে তাহা নির্ণয় করা বিপুল পরিশ্রমের ও বিচক্ষণতার কাজ। আমাদের বিবেচনায় বর্তমান গ্রন্থে বঙ্কিম সেই ভাঙিবার কাজ অনেকটা পরিমাণে শেষ করিয়াছেন— গড়িবার কাজে ভালো করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই।

মহাভারতকেই বঙ্কিম প্রধানত আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মহাভারতের মধ্যে বিস্তর প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। অথচ ঠিক কোন্‌টুকু

যে মূল মহাভারত তাহা তিনি স্থাপনা করিয়া যান নাই। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

'প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসিকী সংহিতা নহে। ইহা বৈশম্পায়ন-সংহিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন-সংহিতা পাইয়াছি কি না তাহা সন্দেহ। তার পরে প্রমাণ করিয়াছি যে, ইহার প্রায় তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত।'

বঙ্কিম মহাভারতের তিনটি স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম স্তরের রচনা উদার ও উচ্চকবিত্বপূর্ণ; দ্বিতীয় স্তরের রচনা অনুদার এবং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত এবং তৃতীয় স্তর বহুকালের বহুবিধ লোকের যদৃচ্ছামত রচনা।

এ কথা পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, কাব্যাংশের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিয়া স্তরনির্ণয় করা নিতান্তই আনুমানিক। রুচিভেদে কবিত্ব ভিন্নলোকের নিকট ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। আবার, একই কবির রচনার ভিন্ন ভিন্ন অংশের কবিত্ব হিসাবে আকাশ-পাতাল তফাত হয় এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। অতএব ভাষার প্রভেদ ঐতিহাসিকের প্রধান সমালোচ্য বিষয়, কবিত্বের প্রভেদ নহে। মহাভারতের মধ্যে এই ভাষার অনুসরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা নির্ণয় করা এবং মূল মহাভারত নির্বাচন করা প্রভৃত শ্রমসাধ্য।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ভালো কবির রচনায় ভালো কাব্য থাকিতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিকতা কবিত্বের উপর নির্ভর করে না। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবিবরণ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে নানা স্থানের নানা লোকের মুখে নানা গল্প প্রচলিত ছিল। কোনো উৎকৃষ্ট কবি সেই-সকল গল্পের মধ্য হইতে তাঁহার কবিত্বের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ ও সংগঠন করিয়া লইয়া একটি সুসংগত সুন্দর কাব্য রচনা করিয়া থাকিতে পারেন এবং অনেক অকবি ও কুকবিবর্গ তাঁহার সেই কাব্যের মধ্যে তাঁহাদের নিজের জানা ইতিহাস জুড়িয়া দিতে পারেন। সে-স্থলে সুকাব্যের অপেক্ষা অকাব্য ঐতিহাসিক হিসাবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হইতে পারে। এ কথা কাহারও অবিদিত নাই যে, কাব্যহিসাবে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে হইলে সমগ্র ইতিহাসকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা যায় না। শেক্‌স্‌পীয়ারের কোনো ঐতিহাসিক নাটকে যদি পরবর্তী সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ ঐতিহাসিক অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া দিবার জন্য নিজ নিজ রচনা নির্বিচারে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিতে থাকেন তবে তাহাতে কাব্যের কত ত্রুটি, মূলের সহিত কত অসামঞ্জস্য এবং শেক্‌স্‌পীয়ার-বর্ণিত চরিত্রের সহিত কত বিরোধ ঘটিতে থাকে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; সে স্থলে কাব্যসমালোচক কবিত্ব বিচার করিয়া শেক্‌স্‌পীয়ারের মূলনাটক উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস-সমালোচক ইতিহাস-উদ্ধারের জন্য একমাত্র শেক্‌স্‌পীয়ারের মূল গ্রন্থের উপরেই নির্ভর করিবেন এমন কথা বলিতে পারি না।

যাহা হউক, মহাভারতে যে নানা কালের নানা লোকের রচনা আছে তাহা স্বীকার্য; কিন্তু তাহাদিগকে পৃথক করিয়া তাহাদের রচনাকাল ও তাহাদের আপেক্ষিক সত্যাসত্য নির্ণয় যে কেমন করিয়া সাধিত হইতে পারে তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

কেবল, বঙ্কিমবাবু অনৈতিহাসিকতার একটি-যে লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না; তাহা অনৈসর্গিকতা। প্রথমত, যাহা অনৈসর্গিক তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের যে অংশে অনৈসর্গিকতা দেখা যায়, সে অংশ যে ঘটনাকালের বহু পরে রচিত তাহা মোটামুটি বলা যাইতে পারে।

বঙ্কিমবাবু অনৈতিহাসিকতার আর-একটি যে লক্ষণ স্থির করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। যে অংশে কোনো ঐতিহাসিক মহৎ ব্যক্তি দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন সে অংশও যে পরবর্তী কালের যোজনা তাহা সুনিশ্চিত।

অতএব বঙ্কিম যে-সকল স্থলে কৃষ্ণচরিত্র হইতে অতিপ্রাকৃত অমানুষিক অংশ বর্জন করিয়াছেন সে স্থলে কোনো ঐতিহাসিকের মনে বিরুদ্ধ তর্ক উদয় হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে তিনি মহাভারতের একাংশের সহিত অসংগত বলিয়া কিছু পরিত্যাগ করিয়াছেন সেখানে পাঠকের মন নিঃসংশয় হইতে পারে না। কারণ একটা বড়ো লোক এবং বড়ো ঘটনা সম্বন্ধে দেশে বিচিত্র জনশ্রুতি প্রচলিত থাকে। সেই-সকল জনশ্রুতি বর্জন এবং মার্জন -পূর্বক ভিন্ন কবি আপন আদর্শ অনুযায়ী ভিন্নরূপ কাব্য রচনা করিতে পারেন। কেহ-বা শ্রীকৃষ্ণকে পরম ধর্মশীল দেবপ্রকৃতির মানুষ বলিয়া গড়িতে পারেন, কেহ-বা তাঁহাকে কূটবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ চক্রীরূপে চিত্রিত করিতে পারেন। সম্ভবত উভয়েরই চিত্র অসম্পূর্ণ। এবং পরস্পরবিরোধী হইলেও সম্ভবত উভয়ের রচনাতেই আংশিক সত্য আছে। বস্তুত নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন, ইতিহাস হিসাবে কে বেশি নির্ভরযোগ্য।

এই হেতু বঙ্কিম মহাভারতবর্ণিত কৃষ্ণের প্রত্যেক উক্তি এবং মত যতটা বিস্তারিত ব্যাখ্যার সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহা হইতে যে ঐতিহাসিক চরিত্র গঠন করিয়াছেন তাহা আমাদের মতে যথেষ্ট তথ্যমূলক নহে। বঙ্কিমবাবুও মধ্যে মধ্যে বলিয়াছেন যে, মহাভারতে কৃষ্ণের মুখে যত কথা বসানো হইয়াছে সবই যে কৃষ্ণ বাস্তবিক বলিয়াছিলেন তাহা নহে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণসম্বন্ধে কবির কিরূপ ধারণা ছিল তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু কবির আদর্শকে সর্বতোভাবে ঐতিহাসিক আদর্শের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে কবির কাব্য ব্যতীত অন্যান্য অনুকূল প্রমাণের আবশ্যক। আমরা একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করি। বঙ্কিমবাবু

বলিতেছেন—

'কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা তাঁহাকে বলিলেন তাহা অমূল্য। যে-ব্যক্তি মনুষ্যচরিত্রের সর্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূল্যত্ব বুঝিবে না। মূর্খের তো কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "পাণ্ডবগণ নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ হর্ষ ক্ষুধা পিপাসা হিম রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না। বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না-হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।"

বঙ্কিমবাবু মহাভারত হইতে কৃষ্ণের যে উক্তি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা সুগভীর ভাবগর্ভ উপদেশে পূর্ণ। কিন্তু ইহা হইতে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের চরিত্রনির্ণয়ের বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় এমন আমরা বিশ্বাস করি না। ইহাতে মহাভারতকার কবির মানবচরিত্রজ্ঞতা এবং হৃদয়ের উচ্চতা প্রকাশ করে। উদ্যোগপর্বের নবতিতম অধ্যায়ে কৃষ্ণের এই উক্তি বর্ণিত আছে; ইহার প্রায় চল্লিশ অধ্যায় পরেই কুন্তীর মুখে বিদুলা-সঞ্জয়সংবাদ-নামক একটি পুরাতন কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাহাতে তেজস্বিনী বিদুলা তাঁহার যুদ্ধচেষ্টাবিমুখ পুত্র সঞ্জয়কে ক্ষত্রধর্মে উৎসাহিত করিবার জন্য যে কথাগুলি বলিয়াছেন কৃষ্ণের পূর্বোদ্‌ধৃত উক্তির সহিত তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বিদুলা বলিতেছেন—

'এখনও পুরুষোচিত চিন্তাভার বহন করো। অল্পদ্বারা পরিতৃপ্ত রাখিয়া অপরিমেয় আত্মাকে অনর্থক অবমানিত করিয়ো না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নগাসকল যেমন অল্প জলেই পরিপূর্ণা হয় এবং মূষিকের অঞ্জলি যেমন অল্প দ্রব্যেই পূর্ণ হইয়া উঠে সেইরূপ কাপুরুষেরাও অত্যল্পমাত্রে পরিতৃপ্ত হওয়ায় সহজেই সন্তুষ্ট হইতে থাকে। · চিরকাল ধূমিত হওয়া অপেক্ষা মুহূর্তকাল জ্বলিত হওয়াও শতগুণে শ্রেষ্ঠ।··· ইহসংসারে প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অত্যল্প বস্তুকে অপ্রিয় বোধ করেন; অত্যল্প বস্তু যাহার প্রিয় হয়, তাহার সেই অল্প বস্তুই নিশ্চয় অনিষ্টকর হইয়া থাকে।··· যাহারা ফলের অনিত্যত্ব স্থির করিয়াও কর্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ না হয় তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেও পারে, না হইতেও পারে; কিন্তু অনিশ্চিত বোধে যাহারা একেবারেই অনুষ্ঠানে বিরত হয় তাহারা আর কস্মিন্ কালেও কৃতকার্য হইতে পারে না।'

ইহা হইতে এই দেখা যাইতেছে যে, কর্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে মহাভারতের কবির আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ছিল, এবং সেই আদর্শ তিনি নানা উদাহরণের দ্বারা নানা স্থানে প্রচার করিয়াছেন। মহাভারত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এমন কল্পনা করাও অসংগত হয় না যে, একসময়ে ভারতে কর্মধর্মের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণার উদ্দেশে কবি লোকবিখ্যাত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবৃত্তান্ত মহাকাব্যে গ্রথিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীষ্ম, ভীম, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি মহাভারতের প্রধান নায়কগুলিমাত্রেই কর্মবীরের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল ; এমন কি, গান্ধারী এবং দ্রৌপদীও কর্তব্যনিষ্ঠার মহিমায় দীপ্তিমতী। সেইজন্য গান্ধারী দুর্যোধনকে ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন, 'অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।'

অতএব বঙ্কিম যাহা বলিতেছেন তাহাতে যদি প্রমাণের কোনো ত্রুটি না থাকে তবে তদ্দ্বারা ইহাই স্থির হইয়াছে যে, কোনো একটি অজ্ঞাতনামা কবির মনে মহত্ত্বের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল ; এবং তাঁহার সেই উচ্চতম আদর্শ-সৃষ্টিই মহাভারতের কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ঐতিহাসিক হইতে পারেন কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণ যে সর্বাংশে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের প্রতিরূপ তাহার কোনো প্রমাণ নাই। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এই মহাভারতেই ভিন্ন লোক ভিন্ন আদর্শের কৃষ্ণ সংগঠন করিয়াছেন।

যেখানে এক সাক্ষী বিরোধী কথা কহিতেছে সেখানে অন্যান্য সাক্ষী ডাকিয়া সত্য সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু দেখাইয়াছেন, মহাভারতে কৃষ্ণের জীবনের যে অংশ বর্ণিত হইয়াছে অন্য কোনো পুরাণেই তাহা হয় নাই ; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য তুলনা করিয়া সত্য উদ্ধারের যে উপায় আছে, এ স্থলে তাহাও নাই।

অতএব বঙ্কিমবাবুর প্রমাণমত দেখিতে পাইতেছি, ব্যাসরচিত মূল মহাভারত বর্তমান নাই। এখন যে মহাভারত পাওয়া যায় তাহা ব্যাসের মুখ হইতে বৈশম্পায়ন, বৈশম্পায়নের মুখ হইতে উগ্রশ্রবার পিতা, পিতার মুখ হইতে উগ্রশ্রবা, এবং উগ্রশ্রবার মুখ হইতে অন্য কোনো একজন কবি সংগ্রহ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, এ মহাভারতের মধ্যেও কালক্রমে নানা লোকের রচনা মিশ্রিত হইয়াছে ; তাহা নিঃসংশয়ে বিশ্লিষ্ট করিবার কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় আপাতত স্থির হয় নাই। তৃতীয়ত, অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তুলনা দ্বারা মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিবারও পথ নাই।

বঙ্কিম প্রধানত কৃষ্ণচরিত্রকেই উপলক্ষ্য করিয়া কেবল প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিচার করিয়াছেন ; কিন্তু প্রথমে প্রমাণ ও বিচার প্রয়োগপূর্বক প্রধানত সমস্ত মহাভারতের ইতিহাস-অংশ বাহির করিলে পর, তবে কৃষ্ণচরিত্রের

ঐতিহাসিকতা সন্তোষজনকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপে বলিতে পারি, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিগ্রহণ প্রামাণিক সত্য কি না, সে বিষয়ে বঙ্কিম সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ; অতএব দেখা আবশ্যক, বঙ্কিম যাহাকে মূল মহাভারত বলিতেছেন তাহার সর্বত্র হইতেই দ্রৌপদীর পঞ্চপতিগ্রহণ বর্জন করা যায় কি না, এবং বঙ্কিম মহাভারতের যে যে অংশ হইতে কৃষ্ণচরিত্রের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন, সেই সেই অংশে দ্রৌপদীর পঞ্চপতিচর্যা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নাই কি না। বঙ্কিম মহাভারতবর্ণিত যে-সকল ঘটনাকে অনৈতিহাসিক মনে করেন সে-সমস্ত যদি তিনি তাঁহার কল্পিত মূল মহাভারত হইতে প্রমাণসহকারে দূর করিয়া দিতে পারেন তবে আমরা তাঁহার নির্বাচিত অংশকে বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। কিন্তু মহাভারতের ঠিক কতটুকু মূল ঐতিহাসিক অংশ তাহা বঙ্কিম সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করেন নাই, তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণচরিত্রের ধারাটি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন—

'আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্নি হইতে দ্রুপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ঔরসকন্যা থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাঁহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে অর্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। তার পর, তাঁহার পাঁচ স্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই।'

প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। কারণ, বঙ্কিম মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সেইজন্যই মহাভারতবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রকে তিনি ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীবিবাহ ব্যাপারটি তুচ্ছ নহে ; কিন্তু এতবড়ো ঘটনাটি যদি মিথ্যা হয়, এবং সেই মিথ্যা যদি বঙ্কিমের নির্বাচিত মহাভারতেও স্থান পাইয়া থাকে তবে তদ্দ্বারা সেই মহাভারতের প্রামাণিকতা হ্রাস ও সেই মহাভারতবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা খর্ব হইয়া আসে। সাক্ষী যখন একমাত্র, তখন তাহার সাক্ষ্যের কোনো-এক বিশেষ অংশ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে গেলে সাক্ষ্যের অপরাংশে মিথ্যাসংস্রব না থাকা আবশ্যক।

কিন্তু এত আয়োজন করিয়া অগ্রসর হইতে গেলে সম্ভবত 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থখানি বাঙালি পাঠকের অদৃষ্টে জুটিত না। সমুচিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সমস্ত মহাভারতের সমূলক অংশ উদ্ধার করা এক জন লোকের জীবিতকালে সম্ভব কি না সন্দেহ। অতএব মহাভারতের বিস্তীর্ণ গহন অরণ্যের মধ্যে বঙ্কিম যে এক সংকীর্ণ পথের সূচনা করিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা, এবং

অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমাদের কেবল বক্তব্য এই যে, তাঁহার কার্য পরিসমাপ্ত হয় নাই। বঙ্কিমের প্রতিভা আমাদিগকে যেখানে উপনীত করিয়াছেন সেইখানেই যে আমাদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে। তিনি আমাদিগকে অসন্তোষের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে; সচেষ্টভাবে সত্যের রাজ্য বিস্তার করিতে হইবে। তিনি আমাদের হাতে মুক্তাটি দিয়া যান নাই, দৃষ্টান্তসহকারে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যদি মুক্তা চাও তো সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। খুব সম্ভবত আমরা নমস্কার করিয়া বলিব, আমাদের মুক্তায় কাজ নাই, আমরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারিব না।

বঙ্কিম, মেকলে কার্লাইল লামার্টিন থুকিদিদীস প্রভৃতি উদাহরণ দেখাইয়া মহাভারতকে কবিত্বময় ইতিহাস বলিতে চাহেন; আমরা মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া গণ্য করি। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদর্শ আমরা ইতিহাস হইতে পাই, অথবা কাব্য হইতে পাই, অথবা কাব্য-ইতিহাসের মিশ্রণ হইতে পাই তাহা লইয়া অধিক তর্ক করিতে চাহি না। ফলত ইতিহাস যে বেদবাক্য তাহা নহে; সকলেই জানেন একটা উপস্থিত ঘটনাস্থলেও প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকৃতরূপে গ্রহণ করিতে এবং প্রকৃত-রূপে বর্ণনা করিতে অতি অল্প লোকই পারে। খণ্ড খণ্ড বৃত্তান্ত হইতে একটি সমগ্র মানবচরিত্র ও ইতিহাস রচনা করা আরও অল্প লোকের সাধ্যায়ত্ত। সকলেই জানেন আত্মীয় সম্বন্ধেও আত্মীয়ের ভ্রম হয় এবং বন্ধুকেও বন্ধু অনেক বিষয়ে বিপরীতভাবে বুঝিয়া থাকেন। অসাধারণ লোককে প্রকৃতভাবে জানা আরও কঠিন; দূর হইতে এবং অতীত বৃত্তান্ত হইতে তাহার যথার্থ প্রতিকৃতি-নির্মাণ বহুলপরিমাণে কাল্পনিক, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রমাণে এবং অনুমানে মিশ্রিত করিয়া একই লোকের এত বিভিন্নপ্রকার মূর্তি গড়িয়া তোলা যায় যে তাহার মধ্যে কোন্‌টা মূলের অনুরূপ তাহা প্রকৃতিভেদে ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভাবে বিশ্বাস করেন। ইতিহাসমাত্রই যে বহুল-পরিমাণে লেখকের অনুমান ও পাঠকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে কবির অনুমান ঐতিহাসিকের অনুমানের অপেক্ষা প্রকৃত ইতিহাসের অনেক কাছাকাছি যাওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। ফস্টার সাহেব স্ট্র্যাফোর্ডের যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, জনশ্রুতি এই যে, তাহা কবি ব্রাউনিঙের স্বরচিত বলিলেই হয়, কিন্তু উক্ত কবি অনতিকাল পরে স্ট্র্যাফোর্ড নামক যে নাটক লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার ইতিহাসের অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়া পরে প্রমাণিত হইয়াছে। সেইরূপ, পুরাকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্তসম্বন্ধে যে-সকল কিম্বদন্তী বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল, মহাভারতের কবি কল্পনাবলে তাহাদের অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া তাহাদিগকে

যে-একটি সমগ্র চিত্রে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা যে ঐতিহাসিকের ইতিহাস অপেক্ষা অল্প সত্য হইবেই এমন কোনো কথা নাই।

তথ্য, যাহাকে ইংরাজিতে ফ্যাক্ট কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি এবং কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অতএব এত দীর্ঘকাল পরে মহাভারতের কবিবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণ লইতে বসা আমরা দুঃসাধ্য এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বাহুল্য বোধ করি। সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ ফ্রুড সাহেব বলিয়াছেন 'যথার্থ মহৎ ব্যক্তির অকৃত্রিম এবং স্বাভাবিক মহত্ত্ব গদ্যের আয়ত্তের বাহিরে; তাহা কেবলমাত্র কবির লেখনী দ্বারাই বর্ণনসাধ্য। ইহার কারণ যাহাই হউক, ফলত ইহা সত্য। কবিতার এই সঞ্জীবনীশক্তি আছে এবং গদ্যের তাহা নাই; এবং সেই কারণেই কবিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।'

আমরা ফ্রুডের উপরি-উক্ত কথার এই অর্থ বুঝি যে, মহৎ ব্যক্তির কার্যবিবরণ কেবল তথ্যমাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবিপ্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।

সে হিসাবে দেখিতে গেলে মহাভারতের কবিবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রত্যেক তথ্যটি প্রকৃত না হইতে পারে; কৃষ্ণের মুখে যত কথা বসানো হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি যত কার্যকলাপের আরোপ হইয়াছে তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃত্তান্তটি প্রামাণিক না হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য তিনি পাঠকদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহাই সর্বাপেক্ষা মহামূল্য সত্য। কৃষ্ণের যদি ইতিহাস থাকিত তবে সম্ভবত তাহাতে এমন সহস্র ঘটনার উল্লেখ থাকিত যাহা কৃষ্ণকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার কোনো স্থায়ী মূল্য নাই অর্থাৎ যে-সকল কাজ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব প্রকাশ করে না— এমন-কি, শেষ পর্যন্ত সকল কথা জানা সম্ভব নহে বলিয়া তাহার অনেকগুলি কৃষ্ণের যথার্থ স্বভাবের বিরোধী বলিয়াও মনে হইতে পারিত। প্রত্যেক মানুষে অনেক কাজে নিজের যথার্থ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও থাকে। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রে নিশ্চয়ই সেই-সকল অনাবশ্যক এবং আকস্মিক তথ্যগুলি বর্জিত হইয়া কেবল প্রকৃত স্বরূপগত সত্যগুলি নির্বাচিত হইয়াছে— এমন-কি, কৃষ্ণ যে কথা বলেন নাই কিন্তু যে কথা কেবল কৃষ্ণই বলিতে পারিতেন, সেই কথা কৃষ্ণকে বলাইয়া, কৃষ্ণ যে কাজ করেন নাই কিন্তু যে কাজ কেবল কৃষ্ণই করিতে পারিতেন সেই কাজ কৃষ্ণকে করাইয়া কবি বাস্তবিক-কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহার কৃষ্ণকে অধিকতর সত্য করিয়া তুলিয়াছেন।

অর্থাৎ, বাস্তব-কৃষ্ণে স্বভাবতই অকৃষ্ণ যাহা ছিল তাহা দূরে রাখিয়া এবং বাস্তব-কৃষ্ণ নিজের চরিত্রগুণে কবির মনে যে আদর্শের উদয় করিয়া দিয়াছেন পরন্তু নানা বাহ্য কারণে যাহা কার্যে সর্বত্র ধারাবাহিক পরিস্ফুটভাবে ও নির্বিরোধে প্রকাশ হইতে পারে নাই, সেই আদর্শকে সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুট করিয়া কবি বাস্তবিক ইতিহাস হইতে সত্যতম নিত্যতম কৃষ্ণকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন।

অতএব, বঙ্কিম যখন কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বাঙালি পাঠকদিগের মনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন তখন কবির কাব্য হইতে তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া লওয়াই তাঁহার উপযুক্ত কার্য হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাভারত নানা কালের নানা লোকের রচনার মধ্যে চাপা পড়িয়াছে ; কবির মূল আদর্শটি বাহির করা সহজ ব্যাপার নহে। সমস্ত জঞ্জাল দূর করিতে পারিলে, কেবল কৃষ্ণ নহে, ভীষ্ম কর্ণ অর্জুন দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেই উজ্জ্বলতার সম্পূর্ণতর আকারে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন। মহাভারতের আদিকবির মূল রচনাটি উদ্ধার করা হইলে মানবজাতির একটি পরমতম লাভ হইবে।

কিন্তু, মহাভারতের আদিকবির আদর্শ কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ ছিল বঙ্কিম নিজের আদর্শ অনুসারে তাহা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন কি না তাহা নিঃসংশয়ে বলিবার পূর্বে অষ্টাদশপর্ব পারাবার হইতে মূল মহাভারতটিকে মন্থন করিয়া লওয়া আবশ্যক। আপাতত কেবল একটি বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

বঙ্কিম যাঁহাকে মহাভারতের প্রথম স্তরের কবি বলেন তিনি কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন না, এ কথা বঙ্কিম স্বীকার করিয়াছেন। এমন-কি, এই তথ্যটি তাঁহার মতে প্রথম স্তর নির্ণয় করিবার একটি প্রধান উপায়।

কিন্তু বঙ্কিম কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন। এই মহৎ প্রভেদবশত মহাভারত-গত প্রথম স্তরের কবির আদর্শ কৃষ্ণচরিত্র তাঁহার পক্ষে নির্বাচন করিয়া লওয়া সহজ ছিল না। তিনি যে-কৃষ্ণের অন্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন সে-কৃষ্ণ তাঁহার নিজের মনের আকাঙ্ক্ষাজাত। সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলনে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত একটি আদর্শ তিনি ব্যাকুলচিত্তে সন্ধান করিতেছিলেন, তাঁহার ধর্মতত্ত্বে যাহাকে তত্ত্বভাবে পাইয়াছিলেন ইতিহাসে তাহাকেই সজীব সশরীর -ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিঃসন্দেহ তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল। মনের সে অবস্থায় অন্য কোনো কবির আদর্শকে অবিকলভাবে উদ্ধার করা মনুষ্যের পক্ষে সহজ নহে।

উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, বঙ্কিম যদিও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তথাপি তিনি বারম্বার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর যখন অবতাররূপে নরলোকে

অবতীর্ণ হন তখন তিনি সম্পূর্ণ মানুষ-ভাবেই প্রকাশ পাইতে থাকেন, কোনোপ্রকার অলৌকিক কাণ্ডদ্বারা আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রচার করেন না। অতএব বঙ্কিম দেবতা-কৃষ্ণকে নহে, মানুষ-কৃষ্ণকেই মহাভারত হইতে আবিষ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

কিন্তু যে-মানুষকে বঙ্কিম খুঁজিতেছিলেন তাহার কোথাও কোনো অসম্পূর্ণতা নাই, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত। অর্থাৎ সে একটি মূর্তিমান থিয়োরি। কিন্তু সম্ভবত মহাভারতকারের কৃষ্ণ দেবতা নহেন, অনুশীলনপ্রাপ্ত চিত্তবৃত্তি নহেন, তিনি কৃষ্ণ।

মহাভারতকার এমন-একটি মানুষের সৃষ্টি করেন নাই, যিনি মনুষ্য-আকারধারী তত্ত্বকথা বা নীতিসূত্র মাত্র। সেই তাঁহার অত্যুচ্চ কবিপ্রতিভার পরিচায়ক। তিনি তাঁহার বড়ো বড়ো বীরদিগকেও অনেক সময় এমন সকল অযোগ্য কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন যাহা ছোটো কবিদের সাহসে কুলাইত না। ছোটা কবিদের সৃজনশক্তি নাই, নির্মাণশক্তি আছে; তাহারা যাহা গড়ে তাহার আদ্যোপান্ত নিয়ম অনুসারে গড়ে— কোথাও তাহার মধ্যে ব্যতিক্রম বা আত্মবিরোধ রাখিতে পারে না। প্রকৃত বড়ো জিনিসের অসম্পূর্ণতাও তাহার বড়োত্ব সূচনা করে; প্রকৃতি একটা পর্বতকে নিখুঁত মণ্ডলাকার করিবার আবশ্যক বোধ করে না— তাহার সমস্ত ভাঙাচোরা— তাহার সমস্ত অযত্ন-অবহেলা লইয়াও সে অভ্রভেদী রাজগৌরবগর্বিত। সে আপন অপূর্ণতাগুলি এমন অনায়াসে বহন করিতে পারে যে, তাহার অপূর্ণতার দ্বারা তাহার প্রকাণ্ড সম্পূর্ণতার পরিমাপ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বস্তুতে সামান্য অপূর্ণতা মারাত্মক— তাহার প্রতি দৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইলে তাহাকে নিখুঁত করাই আবশ্যক হইয়া পড়ে।

মহাভারতকার কবি যে-একটি বীরসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একটি সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে কিন্তু ক্ষুদ্র সুসংগতি নাই। খুব সম্ভব, আধুনিক খ্যাত-অখ্যাত অনেক আর্য বাঙালি লেখকই সরলা বিমলা দামিনী যামিনী -নামধেয়া এমন-সকল সতীচরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন যাঁহারা আদ্যোপান্তসুসংগত অপূর্ব নৈতিকগুণে দ্রৌপদীকে পদে পদে পরাভূত করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি, মহাভারতের দ্রৌপদী তাঁহার সমস্ত অপূর্ণতা অসংকোচে বক্ষে বহন করিয়া এই-সমস্ত নব্য বল্মীকরচিত ক্ষুদ্র নীতিস্তূপগুলির বহু ঊর্ধ্বে উদার আদিম অপর্যাপ্ত প্রবল মাহাত্ম্যে নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকিবেন। মহাভারতের কর্ণ সভাপর্বে পাণ্ডবদের প্রতি যে-সকল হীনতাচরণ করিয়াছেন আমাদের নাটক-নভেলের দীনেশ রমেশ গণেশ ধনেশ -বর্গ

কখনোই তাহা করেন না, তাঁহারা সময়ে-অসময়ে স্থানে-অস্থানে অনায়াসেই আত্ম-বিসর্জন করিয়া থাকেন, তথাপি মহাভারতের কবি বিনা চেষ্টায় কর্ণকে যে অমর-লোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন এই দীনেশ রমেশ গণেশ ধনেশ -বর্গ সমালোচক-প্রদত্ত সমস্ত ফার্স্ট ক্লাস টিকিট এবং নৈতিক পাথেয় লইয়াও তাহার নিম্নতম সোপান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে কি না সন্দেহ।

সেই কারণেই বলিতেছিলাম, প্রথম স্তরের মহাভারতকার কবি যদি কৃষ্ণকে দেবতা বলিয়া মানিতেন না ইহা সত্য হয়, তবে তিনি যে তাঁহাকে নীতিশিক্ষার অখণ্ড উদাহরণ-স্বরূপ গড়িয়াছিলেন ইহা আমাদের নিকট সম্ভবপর বোধ হয় না। বঙ্কিম মহাভারতের প্রথমস্তর-রচয়িতাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অনেক স্থলে সেই শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়া তিনি কৃষ্ণচরিত্র হইতে সমস্ত অসংগতি-অসম্পূর্ণতা বাদ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিতেছি, সেই শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ যে সংগতি তাহা নহে। এ পর্যন্ত হ্যাম্‌লেট-চরিত্রের সংগতি কেহ সন্তোষজনকরূপে আবিষ্কার করিতে পারে নাই, কিন্তু কাব্যজগতের মধ্যে হ্যাম্‌লেট যে একটি পরম স্বাভাবিক সৃষ্টি সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই।

অতএব, বঙ্কিম মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র হইতে সমস্ত মন্দ অংশ বাদ দিয়া যে আদিম মহাভারতকারের আদর্শ কৃষ্ণকেই আবিষ্কার করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

এক্ষণে কথা এই যে, মহাভারতকারের আদর্শ না-ই হইল, বঙ্কিমের আদর্শ যদি যথার্থ মহৎ হয় তবে সেও বঙ্গীয় পাঠকদের পক্ষে পরম লাভ বলিতে হইবে।

বঙ্কিমের আদর্শ যে মহৎ এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' যে বঙ্গসাহিত্যের পরম লাভ সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।

কিন্তু সেইজন্যই 'কৃষ্ণচরিত্র' পাঠ করিতে সর্বদাই মনে এই খেদ উপস্থিত হয় যে, সাহিত্যে যে প্রণালীতে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় বঙ্কিম সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই।

ফ্রুড যে বলিয়াছেন, মহৎ লোকের মাহাত্ম্য ইতিহাস যথার্থরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, কাব্য পারে, সে কথা সত্য। কারণ, মাহাত্ম্য পদার্থটি পাঠকের মনে অখণ্ডভাবে সজীবভাবে সঞ্চার করিয়া দিবার জিনিস। তাহা তর্কদ্বারা যুক্তিদ্বারা ক্রমশ খণ্ড খণ্ড আকারে মনের মধ্যে কিয়দংশে প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু তর্কযুক্তি তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে সর্বাংশে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে না।

বঙ্কিম গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতেই তরবারি হস্তে সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর

হইয়াছেন ; কোথাও শান্তভাবে তাঁহার কৃষ্ণের সমগ্র মূর্তি আমাদের সম্মুখে একত্র ধরিবার অবসর পান নাই।

সেজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়াও যায় না। কারণ, ভক্তসম্প্রদায়ের বাহিরে এমন-কি ভিতরেও, কৃষ্ণচরিত্র যেরূপ কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত ছিল তাহাতে প্রথমত সেই পূর্বসংস্কার ঘুচাইবার জন্য তাঁহাকে বিপুল প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। যেখানে তাঁহার দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে সেখানকার জঙ্গল সাফ করিবার জন্য তাঁহাকে কুঠার ধারণ করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রকৃত কৃষ্ণ যে অনেক বিভিন্ন বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' হইতে তাহা আমরা শিক্ষা করিয়াছি।

কিন্তু বঙ্কিম এই গ্রন্থে অনাবশ্যক যে-সকল কলহের অবতারণা করিয়াছেন আমাদের নিকট তাহা অত্যন্ত পীড়াজনক বোধ হইয়াছে। কারণ, যে আদর্শ হৃদয়ে স্থির রাখিয়া বঙ্কিম এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, সেই আদর্শের দ্বারাই সমস্ত ভাষা এবং ভাব অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলে তবেই সে আদর্শের মর্যাদা রক্ষা হয়। বঙ্কিম যদি তুচ্ছ বিরোধ এবং অনুদার সমালোচনার অবতারণাপূর্বক চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন তবে সেই চাঞ্চল্য তাঁহার আদর্শের নিত্য নির্বিকারতা দূর করিয়া ফেলে। অনেক ঝগড়া আছে যাহা সাপ্তাহিক পত্রের বাদপ্রতিবাদেই শোভা পায়, যাহা কোনো চিরস্মরণীয় চিরস্থায়ী গ্রন্থে স্থান পাইবার একেবারে অযোগ্য।

'পাশ্চাত্য মূর্খ' অর্থাৎ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি লেখক অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমত সে-কাজটাই গর্হিত ; দ্বিতীয়ত এমন গ্রন্থে সেটা অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে। মান্যজনের সমক্ষে অন্য কাহারও প্রতি অযথা দুর্ব্যবহার কেবল দুর্ব্যবহার মাত্র নহে, তাহা মান্য ব্যক্তির প্রতিও অশিষ্টতা। বঙ্কিম যাঁহাকে মানবশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন, যিনি একাধারে ক্ষমা ও শৌর্যের আধার, যিনি সক্ষম হইয়াও অকারণে, এমন-কি, সকারণে অস্ত্র ধারণ করিতে অনেক সময়েই বিরত হইয়াছেন, তাঁহারই চরিত্র-প্রতিষ্ঠা-স্থলে তাঁহারই আদর্শের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া মতভেদ-উপলক্ষে চপলতা প্রকাশ করা আদর্শের অবমাননা। কেবল য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি নহে সাধারণত য়ুরোপীয় জাতির প্রতিই লেখক স্থানে অস্থানে তীব্র বৈরিতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুই-একটা দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করি।

শিশুপালের গালি 'শুনিয়া ক্ষমাগুণের পরমাধার পরম যোগী আদর্শপুরুষ কোনো উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম— পরবর্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখনও যে এরূপ

পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। য়ুরোপীয়দের মতো ডাকিয়া বলিলেন না, "শিশুপাল, ক্ষমা বড়ো ধর্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।'

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমাগুণের বর্ণনাস্থলে অকারণে য়ুরোপীয়দের প্রতি একটা অন্যায় খোঁচা দেওয়া যে কেবল অনাবশ্যক হইয়াছে তাহা নহে; ইহাতে মূল উদ্দেশ্যটি পর্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। পাঠকদের চিত্তকে যেরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিলে তাহারা কৃষ্ণের ক্ষমাশক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিত তাহা ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ন্যায় গ্রন্থ কেবল আধুনিক হিন্দুদের জন্য লিখিত হওয়া উচিত নহে, তাহা সর্বকালের সর্বজাতির জন্যই রচিত হওয়া কর্তব্য। পাঠকেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন এই অংশ পাঠকালে একজন য়ুরোপীয় পাঠকের মনে কিরূপ বিদ্রোহী ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব। বিশেষত, ক্ষমা করিবার সময় ক্ষমাধর্মের মহিমাকীর্তন যে য়ুরোপীয়দের জাতীয় প্রকৃতি এরূপ সাধারণ কথা লেখক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলা কঠিন। আমাদের শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ ভূরি ভূরি আছে— যখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের গাভী বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন এবং নন্দিনী অতিশয় তাড়িত হইয়া আর্তরবে বশিষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন বশিষ্ঠ কহিলেন, 'হে ভদ্রে নন্দিনী, তুমি পুনঃপুনঃ রব করিতেছ, তাহা আমি শুনিতেছি; কিন্তু হে ভদ্রে, যখন রাজা বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্বক হরণ করিতেছেন তখন আমি কী করিব! যেহেতু আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ।' পুনশ্চ নন্দিনী তাঁহার নিকট কাতরতা প্রকাশ করিলে তিনি কহিলেন, 'ক্ষত্রিয়ের বল তেজ এবং ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা; অতএব আমি ক্ষমাগুণে আকৃষ্ট হইতেছি।'

'ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।'

শ্রীকৃষ্ণের এই মহদুক্তি উদ্‌ধৃত করিয়া বঙ্কিম বলিতেছেন—

'হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কিনা, মেমসাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না-হয় সভা করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়া পাখির মতো কিচিরমিচির করি।'

ক্ষণে ক্ষণে লেখকের এরূপ ধৈর্যচ্যুতি 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ন্যায় গ্রন্থে অতিশয় অযোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষায় ভাবে ও ভঙ্গীতে সর্বত্রই একটি গাম্ভীর্য, সৌন্দর্য ও ঔদার্য রক্ষা না করাতে বর্ণনীয় আদর্শচরিত্রের উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিম সামান্য উপলক্ষমাত্রেই য়ুরোপীয়দের সহিত, পাঠকদের সহিত এবং

ভাগ্যহীন ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত কলহ করিয়াছেন। সেই কলহের ভাবটাই এ গ্রন্থে অসংগত হইয়াছে; তাহা ছাড়া প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিস্তর অবান্তর তর্কের উত্থাপন করিয়া পাঠকের মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রথমত, যখন তিনি কৃষ্ণকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তখন ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব কি না এ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া কেবল পাঠকের মনে একটা তর্ক উঠাইয়াছেন, অথচ তাহার ভালোরূপ মীমাংসা করেন নাই। নিরাকার ঈশ্বর আকার ধারণ করিবেন কী করিয়া, এরূপ আপত্তি যাঁহারা করেন বঙ্কিম তাঁহাদিগকে এই উত্তর দিয়াছেন যে, যিনি সর্বশক্তিমান তিনি আকার গ্রহণ করিতে পারেন না ইহা অসম্ভব। যাঁহারা আপত্তি করেন যে, যিনি সর্বশক্তিমান তাঁহার দেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন কী, তিনি তো ইচ্ছামাত্রেই রাবণ কুম্ভকর্ণ অথবা কংস শিশুপাল -বধ করিতে পারেন, তাঁহাদের কথার উত্তরে বঙ্কিম বলেন যে, রাবণ অথবা শিশুপাল -বধ করিবার জন্যই যে ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন তাহা নহে, মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই তাঁহার অবতার হইবার উদ্দেশ্য। তিনি দেবতার ভাবে যদি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন তবে তাহাতে মানুষের কোনো শিক্ষা হয় না; পরন্তু তিনি যদি মনুষ্য হইয়া দেখাইয়া দেন মনুষ্যের দ্বারা কতদূর সম্ভব তবেই তাহা আমাদের স্থায়ী কল্যাণের কারণ হয়। এক্ষণে তৃতীয় আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন এবং মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তবে তিনি কি আদর্শরূপী মনুষ্যকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন না— তাঁহার কি নিজেই মনুষ্য হইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই? এইখানেই কি তাঁহার শক্তির সীমা? বঙ্কিম এই আপত্তি উত্থাপনও করেন নাই, এই আপত্তির উত্তরও দেন নাই।

পরন্তু, সমস্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্যের সহিত এই তর্কের কিঞ্চিৎ যোগ আছে। বঙ্কিম নানা স্থলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষের আদর্শ যেমন কার্যকারী এমন দেবতার আদর্শ নহে। কারণ, সর্বশক্তিমানের অনুকরণে আমাদের সহজেই উৎসাহ না হইতে পারে। যাহা মানুষে সাধন করিয়াছে তাহা আমরাও সাধন করিতে পারি এই বিশ্বাস এবং আশা অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং স্বাভাবিক। অতএব কৃষ্ণকে দেবতা প্রমাণ করিতে গিয়া বঙ্কিম তাঁহার মানব-আদর্শের মূল্য হ্রাস করিয়া দিতেছেন। কারণ, ঈশ্বরের পক্ষে সকলই যখন অনায়াসে সম্ভব তখন কৃষ্ণচরিত্রে বিশেষরূপে বিস্ময় অনুভব করিবার কোনো কারণ দেখা যায় না।

বঙ্কিম এই গ্রন্থের অনেক স্থলেই যে-সকল সামাজিক তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থের বিষয়টি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র, আর কোনো ফল হয় নাই।

'কৃষ্ণের বহুবিবাহ' শীর্ষক অধ্যায়ে রুক্মিণী ব্যতীত কৃষ্ণের অন্য স্ত্রী ছিল না ইহাই প্রমাণ করিয়া লেখক সর্বশেষে তর্ক তুলিয়াছেন যে, পুরুষের বহুবিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম এ কথা ঠিক নহে। তিনি বলিয়াছেন—

'সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্নী কুষ্ঠগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্‌ণ যে সে কোনোমতেই সংসারধর্মের সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দারান্তর পরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধর্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। যদি য়ুরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে, বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বর্জনরূপ অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেনরিকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না। য়ুরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এই কারণে অনেক পত্নীহত্যা, পতিহত্যা হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যাহাই বিলাতি, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য, ঊর্ধ্বাধঃ চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ত্ব একটা কথা।'

কৃষ্ণ যখন একাধিক বিবাহ করেন নাই তখন বিবাহসম্বন্ধীয় এই তর্ক নিতান্তই অনাবশ্যক; তাহা ছাড়া তর্কটারই বা কী মীমাংসা হইল। প্রথম স্থির হইল, যাহার স্ত্রী রুগ্‌ণ অথবা ভ্রষ্টা অথবা বন্ধ্যা সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু য়ুরোপে রুগ্‌ণা, ভ্রষ্টা এবং বন্ধ্যার স্বামী সহজে দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে না বলিয়াই যে, সেখানকার সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এত পত্নীহত্যা হইতেছে তাহা নহে; অনেক সময় পত্নীর প্রতি বিরাগ ও অন্যের প্রতি অনুরাগ বশত হত্যা-ঘটনা অধিকতর সম্ভবপর। যদি সে হত্যা নিবারণ করিতে হয় তবে অন্য স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চারকেও দ্বিতীয় স্ত্রী-গ্রহণের ধর্মসংগত বিধান বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে 'সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম' এ কথাটার এই তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, যখন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে যাইবে তখন যেন একটা কোনো কারণ থাকে, কাজটা যেন অকারণে না হয়। অর্থাৎ যদি তোমার স্ত্রী রুগ্‌ণ অক্ষম হয় তবে তুমি বিবাহ করিতে পার, অথবা যদি অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা বোধ হয় তাহা হইলেও তুমি বিবাহ করিতে পার; কারণ, সেইরূপ ইচ্ছার বাধা পাইয়া

ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরি পত্নীহত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো কারণ না থাকিলে বিবাহ করিয়ো না। জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বামীকে যে যুক্তি অনুসারে যে-সকল স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী করা হইল, ঠিক সেই যুক্তি অনুসারে অনুরূপ স্থলে স্ত্রীর প্রতি অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যায় কি না, এবং আমাদের সমাজে স্ত্রীর সেই-সকল স্বাধীন ক্ষমতা না থাকাতে স্ত্রী 'অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত' হয় কি না।

ইহার অনতিপরেই সুভদ্রাহরণ কার্যটা যে বিশেষ দোষের হয় নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিতে গিয়া লেখক, 'মালাবারী' নামক এক পারসি— সম্ভবত যাঁহার খ্যাতিপুষ্প বর্তমান কালের গুটিকয়েক সংবাদপত্রপুটের মধ্যেই কীটের দ্বারা জীর্ণ হইতে থাকিবে— তাঁহার প্রতি একটা খোঁচা দিয়া আর-একটা সামাজিক তর্ক তুলিয়াছেন। সে তর্কটারও মীমাংসা কিছুমাত্র সন্তোষজনক হয় নাই. অথচ লেখক অধীরভাবে অসহিষ্ণু ভাষায় অনেকের সঙ্গে অনর্থক একটা কলহ করিয়াছেন।

বঙ্কিম যদি কৃষ্ণকে দেবতা না মনে করিতেন এবং কৃষ্ণের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার কোনোরূপ থিয়োরি না থাকিত তাহা হইলে এ-সমস্ত তর্ক-বিতর্কের কোনো প্রয়োজন থাকিত না, এবং তিনি সর্বত্র সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন। তাহা হইলে তিনি নিরপেক্ষ নির্বিকারচিত্তে মহাভারতকার কবির আদর্শ কৃষ্ণকে অবিকলভাবে উদ্ধার করিয়া পাঠকদের সম্মুখে উপনীত করিতেন— এবং পাছে কোনো অবিশ্বাসী সংশয়ী পাঠক তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের কোনো অংশে তিলমাত্র অসম্পূর্ণতা দেখিতে পায় এজন্য আগেভাগে তাহাদের প্রতি রোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে উচ্চসাহিত্যের লক্ষণগত অচঞ্চল শান্তি দূর করিয়া দিতেন না।

যেমন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে নেপথ্যবিধান করিতে আরম্ভ করিলে অভিনয়ের রসভঙ্গ হয়, কাব্যসৌন্দর্য সমগ্রভাবে শ্রোতৃবর্গের মনের মধ্যে মুদ্রিত হয় না, সেইরূপ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের পদে পদে তর্কযুক্তিবিচার উপস্থিত হইয়া আসল কৃষ্ণচরিত্রটিকে পাঠকের হৃদয়ে অখণ্ডভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা দিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম বলিতে পারেন, 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটি স্টেজ নহে; উহা নেপথ্য; স্টেজ-ম্যানেজার আমি নানা বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া, নানা স্থান হইতে নানা সাজসজ্জা আনয়নপূর্বক কৃষ্ণকে নরোত্তমবেশে সাজাইয়া দিলাম— এখন কোনো কবি আসিয়া যবনিকা উত্তোলন করিয়া দিন, অভিনয় আরম্ভ করুন, সর্বসাধারণের মনোহরণ করিতে থাকুন। তাঁহাকে শ্রমসাধ্য চিন্তাসাধ্য বিচারসাধ্য কাজ কিছুই করিতে হইবে না।

মাঘ, ফাল্গুন ১৩০১

রাজসিংহ

নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ

'রাজসিংহ' প্রথম হইতে উল্‌টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে, এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিতেছে।

এই অনিবার্য অগ্রসরগতি সঞ্চার করিবার জন্য বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জন করিয়াছেন, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র।

কোনো ভীরু লেখকের হাতে পড়িলে ইহার মধ্যে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বড়ো বড়ো কৈফিয়ত বসিত। জবাবদিহির ভয়ে তাহাকে অনেক কথা বাড়াইয়া লিখিতে হইত। সম্রাটের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাদশাহজাদীর সহিত মোবারকের প্রণয়ব্যাপার, তাহা লইয়া দুঃসাহসিকা আতরওআলী দরিয়ার প্রগল্‌ভতা, চঞ্চল-কুমারীর নিকট আপন পরামর্শ ও পাঞ্জা-সমেত যোধপুরী বেগমের দূতীপ্রেরণ, সেনা-পতির নিকট নৃত্যকৌশল দেখাইয়া দরিয়ার পুরুষবেশী অশ্বারোহী সৈনিক সাজিবার সম্মতি গ্রহণ— এ-সমস্ত যে একেবারেই সম্ভবাতীত তাহা না হইতে পারে— কিন্তু ইহাদের সত্যতার বিশিষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু এক-একটি ছোটো ছোটো পরিচ্ছেদে ইহাদিগকে এমন অবলীলাক্রমে অসংকোচে ব্যক্ত করিয়া গেছেন যে, কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করিতে সাহস করে না। ভীতু লেখকের কলম এই-সকল জায়গায় ইতস্তত করিত, অনেক কথা বলিত এবং অনেক কথা বলিতে গিয়াই পাঠকের সন্দেহ আরও বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত।

বঙ্কিমবাবু একে তো কোথাও কোনোরূপ জবাবদিহি করেন নাই, তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে নির্দোষ পাঠকদিগকেও ধমক দিতে ছাড়েন নাই। মানিকলাল যখন পথের মধ্যে হঠাৎ অপরিচিতা নির্মলকুমারীকে তাহার সহিত এক ঘোড়ায় উঠিয়া বসিতে বলিল এবং নির্মল যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে মানিকলালের অনুরোধ রক্ষা করিল, তখন লেখক কোথায় তাঁহার স্বরচিত পাত্রগুলির এইরূপ অপূর্ব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইবেন, তাহা না হইয়া উল্‌টিয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন—

'বোধ হয় কোর্টশিপটা পাঠকের বড়ো ভালো লাগিল না। আমি কী করিব। ভালোবাসাবাসির কথা একটাও নাই-- বহুকালসঞ্চিতপ্রণয়ের কথা কিছু নাই— 'হে প্রাণ!' 'হে প্রাণাধিকা!' সে-সব কিছুই নাই— ধিক্!'

এই গ্রন্থবর্ণিত পাত্রগণের চরিত্রের, বিশেষত স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বড়ো-একটা দ্রুততা আছে। তাহারা বড়ো বড়ো সাহসের এবং নৈপুণ্যের কাজ করে অথচ তৎপূর্বে যথেষ্ট ইতস্তত অথবা চিন্তা করে না। সুন্দরী বিদ্যুৎরেখার মতো এক নিমেষে মেঘাবরোধ ছিন্ন করিয়া লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে, কোনো প্রস্তরভিত্তি সেই প্রলয়-গতিকে বাধা দিতে পারে না। স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ করে; তাহার সমগ্র মনপ্রাণ লইয়া বিবেচনা চিন্তা বিসর্জন দিয়া একেবারে অব্যবহিত-ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার প্রাত্যহিক গৃহকর্মসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্যবেগে আকর্ষণ করিয়া আনে, পাঠককে পূর্ব হইতে তাহার একটা পরিচয় একটু সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু তাহা পুরাপুরি দেন নাই।

সেইজন্য 'রাজসিংহ' প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঙ্কা সংশয় -ভারে ভারাক্রান্ত, কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়— কিন্তু 'রাজসিংহ'-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।

যাহারা আজকালকার ইংরাজি নভেল বেশি পড়ে তাহাদের কাছে এই লঘুতা বড়ো বিস্ময়জনক। আধুনিক ইংরাজি নভেলে পদে পদে বিশ্লেষণ— একটা সামান্যতম কার্যের সহিত তাহার দূরতম কারণপরম্পরা গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়— ব্যাপারটা হয়তো ছোটো কিন্তু তাহার নথিটা বড়ো বিপর্যয়। আজ-কালকার নভেলিস্টরা কিছুই বাদ দিতে চান না, তাঁহাদের কাছে সকলই গুরুতর। এইজন্য উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ংকর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে।

এইজন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভয় হয়। মনে হয়, কর্মক্লান্ত মানবহৃদয়ের পক্ষে বাস্তবজগতের চিন্তাভার অনেক সময় যথেষ্টের বেশি হইয়া পড়ে, আবার যদি সাহিত্যও নির্দয় হয় তবে আর পলায়নের পথ থাকে না। সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না।

কিন্তু সত্যকে সম্যক প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালোরূপ অনুভবগম্য হইয়া হৃদয়ের আনন্দ উৎপাদন করে; কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।

বঙ্কিমবাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিগ্ধরূপে সম্ভবপর ও প্রশ্নসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলাভঙ্গীতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হয় নাই। যেন রেলপথের মাঝে মাঝে এমন এক-আধটা ব্রিজ আছে যাহা পুরা মজবুত বলিয়া বোধ হয় না— কিন্তু চালক তাহার উপর দিয়া এমন দ্রুত গাড়ি লইয়া চলে যে, ব্রিজ ভাঙিয়া পড়িবার অবসর পায় না।

এমন হইবার কারণও স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যখন বৃহৎ সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে চলে তখন তাহারা সমস্ত ঘরকর্না কাঁধে করিয়া লইয়া চলিতে পারে না। বিস্তর আবশ্যক দ্রব্যের মায়াও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়। চলৎশক্তির বাধা তাহাদের পক্ষে মারাত্মক। গৃহস্থ-মানুষের পক্ষে উপকরণের প্রাচুর্য এবং ভারবাহুল্য শোভা পায়।

রাজসিংহের গল্পটা সৈন্যদলের চলার মতো— ঘটনাগুলা বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রাজসিংহের সহিত চঞ্চলকুমারীর প্রণয়ব্যাপারটা তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই বলিয়া কোনো কোনো পাঠক এবং সম্ভবত বহুসংখ্যক পাঠিকা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিমবাবু বড়ো-একটি দুর্লভ অবসর পাইয়াছিলেন— এই সুযোগে কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং করুণরসের বরুণবাণে দিগ্‌বিদিক সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সংকীর্ণ সন্ধিপথে বজ্রস্তনিতরবে ফেনাইয়া চলিতেছে— তাহারই উপর দিয়া সামাল্ সামাল্ তরী। তখন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্রেমাভিনয় করিবার সময় নহে।

তখনকার যে প্রেম, সে অত্যন্ত বাহুল্যবর্জিত সংক্ষিপ্ত সংহত। সে তো বাসর-রাত্রের সুখশয্যার বাসন্তী প্রেম নহে— ঘনবর্ষার কালরাত্রে মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে— মান-অভিমান লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়া ত্রস্ত

নায়িকা চকিত বাহুপাশে নায়ককে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুদীর্ঘ সুমধুর ভূমিকার সময় নাই।

এই অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং আপনার অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর আলিঙ্গন অনুভব করিতেছে। কোথায় ছিল ক্ষুদ্র রূপনগরের অন্তঃপুরপ্রান্তে একটি বালিকা, কালক্রমে সে কোন্ ক্ষুদ্র রাজপুত নৃপতির শত রাজ্ঞীর মধ্যে অন্যতম হইয়া অসম্ভব চিত্রিত লতার উপরে অসম্ভব-চিত্রিত পক্ষী-খচিত শ্বেতপ্রস্তররচিত কক্ষপ্রাচীরমধ্যে পুরু গালিচায় বসিয়া রঙ্গসঙ্গিনীগণের হাসিটিটকারি-পরিবৃত হইয়া আলবোলায় তামাকু টানিত, সেই পুষ্পপ্রতিমা সুকুমার সুন্দর বালিকাটুকুর মধ্যে কী এক দুর্বার দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল— সে আজ বাঁধমুক্ত বন্যার একটি গর্বোদ্ধত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল-রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত রঙমহলে সুন্দরী জেবউন্নিসা— সে সুখের উপর সুখ, বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাকে আরামের পুষ্পরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল— সেদিনের সেই মৃত্যুদোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন্ মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহুবেষ্টনে পীড়ন করিয়া ধরিল, সম্রাট্‌দুহিতাকে কে সেই সর্বত্রগামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিল যে দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটিরবাসিনী কৃষককন্যার সহিত এক বেদনাশয্যায় শয়ন করাইয়া দেয়! দস্যু মানিকলাল হইল বীর, রূপমুগ্ধ মোবারক মৃত্যুসাগরে আত্মবিসর্জন করিল, গৃহপিঞ্জরের নির্মলকুমারী বিপ্লবের বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল এবং নৃত্যকুশলা পতঙ্গচপলা দরিয়া সহসা অট্টহাস্যে মুক্তকেশে কালনৃত্যে আসিয়া যোগ দিল।

অর্ধরাত্রির এই বিশ্বব্যাপী ভয়ংকর জাগরণের মধ্যে কি মধ্যাহ্নকুলায়বাসী প্রণয়ের করুণ কপোতকূজন প্রত্যাশা করা যায়?

'রাজসিংহ' দ্বিতীয় 'বিষবৃক্ষ' হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। 'বিষবৃক্ষে'র সুতীব্র সুখদুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল; অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। 'রাজসিংহে'র প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি মনের উপর সেরূপ রক্তবর্ণ সুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না। তাহার কারণ 'রাজসিংহ' স্বতন্ত্রজাতীয় উপন্যাস।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, 'রাজসিংহ' পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে

প্রথম-প্রথম খট্‌কা লাগিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়োই বেশি তাড়াতাড়ি দেখিতেছি— কাহারও যেন মিষ্টমুখে দুটো ভদ্রতার কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া না গিয়া আর-একটু গভীরতররূপে কর্ষণ করিয়া গেলে ভালো হইত। যখন এই-সকল কথা ভাবিতেছিলাম তখন 'রাজসিংহে'র ভিতরে গিয়া প্রবেশ করি নাই।

পর্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মতো ছুটিতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে মনে হয় না তাহারা কোনো কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছুদূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে— ক্রমেই গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্বত ভাঙিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে— সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

'রাজসিংহে'ও তাই। তাহার এক-একটি খণ্ড এক-একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম-প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি— তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক-বা নদীর স্রোত, কতক-বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক-বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক-বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক-বা কালপুরুষলিখিত ইতিহাসের অব্যাকুল বিরাট বিস্তার, কতক-বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ— উপন্যাস-অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা।

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী, মানিকলাল প্রভৃতি ছোটোবড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদুর্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত-ইতিহাসের রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত। তাহাদের জীবন-ইতিহাসের, তাহাদের সুখদুঃখের স্বতন্ত্র মূল্য নাই— অর্থাৎ

এ গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই।

জেবউন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অংশীভূত করিয়া লয় নাই, সে আপনার জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখো, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্মান্তিক আর্তধ্বনিও, রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয়তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

তিনি এই বৃহৎ জাতীয়-ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।

মোগল-সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে সম্রাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া, প্রজার সুখদুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার জাগরণের দিন উপস্থিত হইল।

বিলাসিনী জেবউন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাট্‌দুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্মের মস্তকে আপন জরিজহরতজড়িত পাদুকাখচিত সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার মর্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখমন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল — তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল— দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না, কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেবউন্নিসা সম্রাট্‌প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধুলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত জগৎবাসিনী রমণী।

ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড়ো-একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্যোগের রাত্রে এক দিকে মোগলের অভ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর-এক দিকে সর্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে ; সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবে— কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাসপর্যায়কে নীরবে নিয়মিত করিতেছেন তিনি এই ধূলিলুণ্ঠ্যমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে— কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয় ঐ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি-একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশি করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোনো কোনো অতিকৌতূহলী পাঠক ওই নৌকার অভ্যন্তর-ভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, এবং সেইজন্য মনঃক্ষোভে লেখককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্তব্য লেখক গ্রন্থবিশেষে কী করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন। পূর্ব হইতে একটা অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসংগত নহে। গ্রন্থপাঠারম্ভে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ কথাটা বলিতে হইল।

চৈত্র ১৩০০

ফুলজানি

ফুলজানি। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার -প্রণীত

শহরে বিচিত্র জটিল ঘটনা, লোকজনের গতিবিধি, গাড়িঘোড়া-কলকারখানায় সমস্ত মানুষ ছোটো হইয়া যায়; শহরে কে বাঁচিল কে মরিল, কে খাইল কে না খাইল তাহার খবর কেহ রাখে না। সেখানে বড়োলাট-ছোটোলাটের কীর্তি, চীনে জাপানে লড়াই, অথবা একটা অসামান্য ঘটনা নহিলে সর্বসাধারণের কানেই উঠিতে পারে না।

কিন্তু পল্লীগ্রামে ছোটোবড়ো সকল মানুষ এবং মনুষ্যজীবনের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে; এমন-কি, নদীনালা পুষ্করিণী মাঠঘাট পশুপক্ষী রৌদ্রবৃষ্টি সকালবিকাল সমস্তই বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানকার লোকালয়ে সুখ-দুঃখের সামান্যতম লহরীলীলা পর্যন্ত গণনার বিষয় হয়, এবং প্রকৃতির মুখশ্রীর সমস্ত ছায়ালোকসম্পাত একটি ক্ষুদ্র দিগন্তসীমার মধ্যে মহৎ প্রাধান্য লাভ করে।

উপন্যাসের মধ্যেও সেইরূপ শহর-পল্লীগ্রামের প্রভেদ আছে। কোনো উপন্যাসে অসাধারণ মানবপ্রকৃতি, জটিল ঘটনাবলী এবং প্রচণ্ড হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষ বর্ণিত হইয়া থাকে— সেখানে সাধারণ মনুষ্যের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ অণু আকারে দৃষ্টির অতীত হইয়া যায়; আবার কোনো উপন্যাস উন্মত্ত ঘটনাবর্তের কোলাহল হইতে, উত্তুঙ্গ কীর্তিস্তম্ভমালার দিগন্তপ্রসারিত ছায়া হইতে, ঘনজনতাবন্যার সর্বগ্রাসী প্রলয়বেগ হইতে বহুদূরে ধূলিশূন্য নির্মল নীলাকাশতলে, শস্যপূর্ণ শ্যামল প্রান্তরপ্রান্তে ছায়াময় বিহঙ্গকূজিত নিভৃত গ্রামের মধ্যে আপন রঙ্গভূমি স্থাপন করে, যেখানে মানবসাধারণের সকল কথাই কানে আসিয়া প্রবেশ করে এবং সকল সুখদুঃখই মমতা আকর্ষণ করিয়া আনে।

শ্রীশবাবুর 'ফুলজানি' এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাস। ইহার স্বচ্ছতা, সরলতা, ইহার ঘটনার বিরলতাই ইহার প্রধান সৌন্দর্য। এবং পল্লীর বাগানের উপর প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ যেমন করিয়া পড়ে; কোথাও-বা চিকন পাতার উপরে ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠে, কোথাও-বা পাতার ছিদ্র বাহিয়া অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে চুম্‌কি বসাইয়া দেয়, কোথাও-বা জীর্ণ গোয়ালঘরের প্রাঙ্গণের মধ্যে পড়িয়া মলিনতাকে ভূষিত করিতে চেষ্টা করে, কোথাও-বা ঘনছায়াবেষ্টিত দীর্ঘিকাজলের একটিমাত্র প্রান্তে নিকষের উপর সোনার রেখা কষিয়া দেয়— তেমনি এই উপন্যাসের ইতস্তত যেখানে একটু অবকাশ পাইয়াছে সেইখানেই লেখকের একটি নির্মল স্নিগ্ধহাস্য সকৌতুকে

প্রবেশ করিয়া সমস্ত লোকালয়দৃশ্যটিকে উজ্জ্বলতায় অঙ্কিত করিয়াছে।

শ্রীশবাবু আমাদিগকে বাংলাদেশের যে-একটি পল্লীতে লইয়া গিয়াছেন সেখানে আমরা সকলের সকল খবর রাখিতে চাই, সকল লোকের সহিত আলাপ করিতে চাই, বিশ্রব্ধভাবে সকল স্থানে প্রবেশ করিতে চাই, তদপেক্ষা গুরুতর কিছুই প্রত্যাশা করি না। আমরা অভ্রভেদী এমন একটা-কিছু ব্যাপার চাহি না যাহাতে আর-সকলকেই তুচ্ছ করিয়া দেয়, যাহাতে একটি বিস্তীর্ণ শান্তিময় শ্যামল সমগ্রতাকে বিদীর্ণ ও খর্ব করিয়া ফেলে। এখানে স্বগুনির মা এবং নিস্তারিণী, ফমুশেখ এবং নায়েব মহাশয় সকলেই আমাদের প্রতিবেশী— পরস্পরের মধ্যে ছোটোবড়ো ভেদ যতই থাক্, তথাপি সকলেরই ঘরের কথা আমাদের জিজ্ঞাস্য, প্রতিদিনের সংবাদ আমাদের আলোচ্য বিষয়। এরূপ উপন্যাস সুপরিচিত স্থানের ন্যায় আমাদের মনের পক্ষে অত্যন্ত বিরামদায়ক; এখানে অপ্রত্যাশিত কিছু নাই, মনকে কিছুতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় না, প্রত্যেক পদক্ষেপে এক-একটা দুরূহ সমস্যা জাগ্রত হইয়া উঠে না, সৌন্দর্যরস এত সহজে সম্ভোগ করা যায় যে, তাহার জন্য কোনোরূপ কৃত্রিম মালমশলার আবশ্যক করে না।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার নিজের প্রতিভায় নিজে সন্তুষ্ট নহেন; তিনি আপনাকে আপনি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন। অরসিকদের চক্ষে যাহা সহজ তাহা তুচ্ছ; গ্রন্থকার ক্ষমতাশীল লেখক হইয়াও সেই অরসিকমণ্ডলীর নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভনটুকু কাটাইতে পারেন নাই। তিনি হঠাৎ এক সময় আপন প্রতিভার স্বাভাবিক গতিকে বলপূর্বক প্রতিহত করিয়া তাহাকে অসাধারণ চরিত্র ও রোমহর্ষণ ঘটনাবলীর মধ্যে অসহায়ভাবে নিক্ষেপ করিয়াছেন। পরিচিত সহজ সৌন্দর্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ; বাংলার লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই অসামান্য ক্ষমতাটি আছে, কিন্তু তিনি তদপেক্ষা আরও অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিতে চাহেন এবং সেই কাজ করিতে গিয়া নিজের প্রতিভার মধ্যে অনর্থক একটা আত্ম-বিরোধ বাধাইয়া বসেন। প্রতিভাবহির্গামী এই দুরাশায় তাঁহার প্রথম-রচিত উপন্যাস 'শক্তিকাননে'র মাঝখানে দাবানল জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ফুলজানি'রও একটি প্রান্তভাগে তাহার একটি শিখা আপন প্রলয়রসনা বিস্তার করিয়াছে— সৌভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই।

সার্বভৌম-মহাশয়ের মেয়েটির নাম কালী, তাহার স্বভাবটি যেমন মিষ্ট তেমনি দুষ্ট, তেমনি স্বাভাবিক; গ্রন্থের নায়িকা ফুলকুমারীর প্রতি তাহার যে সুদৃঢ়

ভালোবাসা সে-ও বড়ো স্বাভাবিক ; কারণ, ফুল নিতান্ত নিরুপায় ভীরুস্বভাব— এত অধিক নির্জীব যে, পাঠকের হৃদয়াকর্ষণে সে সম্পূর্ণ সক্ষম নহে ; কিন্তু এইরূপ নির্ভর-পরায়ণ সামর্থ্যহীনের জন্যই বলিষ্ঠ তেজস্বী স্বভাব আপনাকে একান্ত বিসর্জন করিয়া থাকে। ফুলকুমারী যদিও গ্রন্থের নায়িকা, কিন্তু তাহাকে একটি শূন্যপটের মতো অবলম্বন করিয়া তাহার উপরে গ্রন্থকার কালীকেই অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সামান্য পল্লীর কালো মেয়েটি অসাধারণ হয় নাই, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে কখন যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে তাহা জানিতেও পারা যায় না। বোসেদের ফুলবাগানের মধ্যে, তালপুকুরের ধারে এই দুটি ক্ষুদ্র বালিকার সখিত্ব আমরা সস্নেহে আনন্দে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম ; তাহার মধ্যে পাঠশালার ছেলেদের দৌরাত্ম্য-কোলাহল, বালকবিদ্বেষী উত্ত্যক্ত বাগ্‌দিবুড়ির অভিশাপমন্ত্র, মধ্যাহ্নে পক্ষীনীড়লুণ্ঠক ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক আন্দোলিত ঘন আম্রবনের ছায়া এবং নিভৃত দীর্ঘিকার সন্তরণাকুল অগাধশীতল জলের তরঙ্গভঙ্গ মিশ্রিত হইয়া একটি মনোহর সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা পাঠকবর্গ ইহাতেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলাম, ইহার অধিক আর কিছুই প্রার্থনা করি নাই, এমন সময় হরিশপুর পল্লীর সেই স্নিগ্ধ আম্রবনচ্ছায়ার মধ্যে একটুখানি অলৌকিকের ছায়া আসিয়া পড়িল। ফুল স্বপ্নে দেখিল যে, তাহার আসন্ন বিবাহ শুভ হইবে না, এবং বাগ্‌দিবুড়ির মুখেও যেন সেই অভিশাপ শুনিতে পাইল, এবং বটবৃক্ষের শাখা হইতেও সেই অভিশাপ ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখনই বুঝিলাম, ফুলকুমারীর বিবাহও সুখের হইবে না, এবং পাঠকের কাব্যরস-সম্ভোগের আনন্দেও অভিশাপ লাগিয়াছে। কিছুকাল পরে ফুলকুমারীও তাহার দুঃস্বপ্ন ভুলিয়া গেল, পাঠকও পুনশ্চ ক্ষুদ্র পল্লীর লোকসমাজে প্রবেশ করিয়া ভুলিয়া গেলেন যে তাঁহার একটা ফাঁড়া আছে।

সেখানে প্রবেশ করিয়া নায়েব মহেশ্বর ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শান্তি-সৌন্দর্যময় পল্লীটির মধ্যে ইনিই রুদ্ররসের অবতারণা করিয়াছেন। রৌদ্রীশক্তিতে গৃহিণী জগদ্ধাত্রী আবার স্বামীকেও অভিভূত করিয়াছেন। দেখিয়া মনে হয় যে, প্রজাবর্গ অসহায় হস্তীর ন্যায় পড়িয়া আছে ; নায়েব সিংহের ন্যায় তাহাদের স্কন্ধের উপর চড়িয়া রুধির শোষণ করিতেছেন এবং গৃহিণী জগদ্ধাত্রী, দেবী জগদ্ধাত্রীর ন্যায় এই প্রচণ্ড সিংহের স্কন্ধে পা রাখিয়া বসিয়া আছেন।

ছেলেটির নাম পুরন্দর। যদিচ তিনিই এই গ্রন্থের নায়ক, তথাপি সাধারণ ছেলের মতো পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া থাকেন, বটগাছে চড়িয়া কাকের ছানা পাড়িয়া আমোদ অনুভব করেন, গাছের ডাল হইতে ঝুপ্ করিয়া দিঘির জলের মধ্যে পড়িয়া

ফুৎকারে আকাশে জলক্ষেপ করিতে করিতে চিতসাঁতার কাটেন— দেখিয়া আমাদের বড়ো আশা হইয়াছিল পাঠকের কপালগুণে ছেলেটি আর যাহাই হউক অসাধারণ হইবে না। কিন্তু 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে'। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

শান্ত মধুর অথচ সুদৃঢ়স্বভাব নিস্তারিণীর চরিত্র সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। এই নিস্তারিণীর কন্যা ফুলকুমারীর সহিত যথাকালে নায়েব মহাশয়ের পুত্র পুরন্দরের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু নায়েব মহাশয় এবং তাঁহার স্ত্রী জগদ্ধাত্রী তাঁহাদের বেহাইনের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। বিবাহের পর উভয় বৈবাহিক পক্ষে ছোটোখাটো পল্লীযুদ্ধ চলিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় পুত্র পুরন্দরকে তাঁহার বেহাইনের প্রভাব হইতে দূরে রাখিবার জন্য সঙ্গে করিয়া আপন কর্মস্থানে লইয়া গেলেন।

এইখানে আসিয়া মৌলভির নিকট হাফেজ পড়িয়া এবং পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পুরন্দর একটা নূতনতর মানুষ হইয়া উঠিল। মানুষের পরিবর্তন কিছুই অসম্ভব নহে এবং পুরন্দরের স্বভাবে পরিবর্তনের প্রচুর কারণও ছিল। কিন্তু আমরা যে গ্রামদৃশ্য, যে সরল লোকসমাজ, যে অনতিতরঙ্গিত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এতক্ষণ কালযাপন করিতেছিলাম নূতনীকৃত পুরন্দর তাহাকে যেন অত্যন্ত অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল। পুরন্দর ভালো ছেলে হউক, সে ভালো ; তাহার দানধ্যানে মতি হউক, হরিনামে প্রীতি হউক, শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি এবং হাফেজে অনুরাগ বাড়িতে থাক্, আমাদের দেশে সচরাচর যেরূপ ভাবে অনেক লোকের মনে সংসার-বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, পুরন্দরের হৃদয়েও সেইরূপ বৈরাগ্যের সঞ্চার হউক তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তাহার বেশি কিছু হইতে গেলে তাহাকে আর সহ্য করা যায় না। কারণ, 'ফুলজানি' উপন্যাসকে সম্পূর্ণতা দেওয়াই পুরন্দরচরিত্রের একমাত্র সার্থকতা। অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া যদি তিনি উপন্যাস নষ্ট করেন তবে আমরা তাঁহাকে মার্জনা করিতে পারিব না। প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইতে 'ফুলজানি'তে যে-এক স্বচ্ছ সুন্দর সারল্য-স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল পুরন্দর হঠাৎ অসাধারণ উচ্চ হইয়া উঠিয়া তাহাকেই প্রতিহত করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থকর্তা পুরন্দর সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

'বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে যে পরিবর্তন ঘটিতেছিল তাহার গতি এবং প্রকৃতি বিষাদের দিকে। মানুষ সংসারে, যে কারণেই হউক, দুঃখকষ্ট সহিতে আসিয়াছে, এই রকম তাহার মনের ভাব। আত্মজীবনের একটা লক্ষ্য তাহার তখনও স্থির হয় নাই কিন্তু আপনার বিষয়ে ভাবিতে বসিলেই তাহার মনে হইত, অতিঘোর

আঁধারে তাহার ভবিষ্যৎ সমাচ্ছন্ন। মনের এই অবস্থায় আনন্দের ভিতরেও সে মনশ্চক্ষে দেখিত, যে কেহ তাহার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট সকলেরই জীবন অল্পবিস্তর দুঃখ-যন্ত্রণাময়।'

পুরন্দরের এই অনাসৃষ্টি দুঃখভাবের গূঢ় কারণ অনতিপরেই একটি ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। একদা তিনি এবং তাঁহার বন্ধু ব্রজ বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন, গঙ্গাতীরে এক শালিকের কোটরের নিকট এক বিষধর সাপের সহিত শুকদম্পতির যুদ্ধ চলিতেছে। সেই পক্ষীদের নিরীহ শাবকগুলি এখনই সর্পের কবলস্থ হইবে মনে করিয়া পুরন্দরের চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল। তাহার সঙ্গী ব্রজ অসাধারণ বালক নহে, এইজন্য সে এক ফোঁটা জল না ফেলিয়া একখণ্ড লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল। তাহাতে অধিক কাজ হইল, আহত সর্পটা জলে পড়িয়া গেল। ব্রজ পুনশ্চ তাহার প্রতি লোষ্ট্রবর্ষণ করাতে পুরন্দর তাহা সহিতে পারিল না, বারণ করিল।—

'সে ভাবিতেছিল খাদ্য-খাদকের অহি নকুলের যে বিষম বিদ্বেষ ভাব, ইহার জন্য কে দায়ী? ভগবানের সংসার প্রেমময় না হইয়া কেন এমন হিংসাদ্বেষসংকুল হইল?'

ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল বক্তৃতা শুনিয়া—

'ব্রজ সহসা কোনো উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার প্রিয় সুহৃদের হৃদয়ে ব্যথা কোন্‌খানে, বুঝিতে পারিল। বুঝিল, পুরনের দুঃখ ব্যক্তিগত নহে।'

টার্পিন তেল মালিশ করিলে যে-সকল ব্যথা সারে, অভাব মোচন হইলে যে-সকল দুঃখ দূর হয়, উপস্থিতক্ষেত্রে সেই-সকল ব্যথা এবং সেই-সকল দুঃখই ভালো। প্রচলিত প্রবাদে গরিবের ছেলের ঘোড়ারোগকে যেরূপ অনর্থের হেতু বলিয়াছে, বাংলাদেশীয় পল্লীর ছেলের এ-সকল বড়ো বড়ো ব্যথা এবং উঁচুদরের দুঃখও সেইরূপ সর্বনাশের কারণ।

পুরন্দরের পিতা পুরন্দরকে লইয়া বাড়ি ফিরিবার সময় পথিমধ্যে অসন্তুষ্ট প্রজাগণ কর্তৃক নিহত হইলেন, তাঁহার স্ত্রী জগদ্ধাত্রী সহমৃতা হইলেন। পুরন্দর এই আঘাতে পীড়িত হইয়া বাড়ি গেলেন, সেখানে তাহার স্ত্রীর শুশ্রূষায় জীবন লাভ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বিধবা নিস্তারিণী শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন।

এইখানে গ্রন্থ শেষ হইল, কিন্তু গ্রন্থকার ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি আবার শেষকে নিঃশেষ করিতে বসিলেন। অকস্মাৎ একদল যবন এবং যবনী মিলিয়া কালী ও ফুলকে চুরি করিয়া লইয়া গেল— কালী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মরিল— ফুল সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, পুরন্দর তাহাকে উদ্ধার করিতে গেল এবং উভয়ে ঘাতক-হস্তে বিনষ্ট হইল।

এ-সমস্ত কেন ? আগাগোড়া গল্পের সহিত ইহার কী যোগ ? প্রথম হইতে এমন কী সকল অনিবার্য কারণ একত্র হইয়াছিল যাহাতে গ্রন্থের এই বিচিত্র পরিণাম অবশ্যম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল ? গ্রন্থকার যদি বলিতেন 'গ্রামে হঠাৎ একটা মড়ক হইল এবং সকলেই মরিয়া গেল' তবে কাব্য-হিসাবে তাহার সহিত ইহার প্রভেদ কী ? ১৬৬ পাতায় বইখানি সমাপ্ত। ১২২ পাতায় নিস্তারিণী তীর্থে গেলেন। তাহার পর ৪৪টি পত্রে গ্রন্থকার হঠাৎ একটা সম্পূর্ণ নূতন কাণ্ড ঘটাইয়া পাঠকগণকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। পূর্বে ইহার কোনো সূত্রপাত ছিল না, ফুলকুমারীর চরিত্রের সঙ্গেও ইহার কোনো যোগ ছিল না। এতক্ষণ গ্রন্থকার ১২২ পৃষ্ঠায় যে একটি সুন্দর সরল সমগ্র কাব্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসবশত শেষের ৪৪ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে একটি আকস্মিক বজ্র নির্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন।

অগ্রহায়ণ ১৩০১

যুগান্তর

যুগান্তর। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী -বিরচিত

শিবনাথবাবুর 'যুগান্তর' উপন্যাসখানি পাঠ করিতে করিতে কর্তব্যক্লান্ত সমালোচকের চিত্ত বহুকাল পরে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্রসৃজন, এমন সরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। লেখক বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে আমাদের নিকট পরমাত্মীয়ের ন্যায় পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। এমন সত্য চরিত্র বাংলা উপন্যাসে ইতিপূর্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লেখক তাঁহাকে সমস্ত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান দেখিয়াছেন— তাঁহার চরিত্রটিকে প্রতিদিনের হাস্যে এবং অশ্রুজলে, দোষে এবং গুণে অতি সহজেই সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। বিরলবসতি বঙ্গসাহিত্যরাজ্যে তর্কভূষণ মহাশয় যে একটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন এবং আমরা যে একটি স্থায়ী বন্ধু লাভ করিলাম সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহমাত্র নাই।

কেবল তর্কভূষণকে কেন, লেখক বঙ্গসাহিত্যে নশিপুর নামক আস্ত-একটি গ্রাম বসাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রামের ক্রিয়াকর্ম, আমোদপ্রমোদ, কৌতুক-উপদ্রব, সুজন-দুর্জন সমস্তই পাঠকদের চিরসম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। তর্কভূষণের টোল, 'হাঁসের দল', চিমু ঘোষ, জহরলালের ইতিহাস নূতনগঠিত সদ্য-পঠিত হইলেও তাহা আমাদের নিকট যেন অনেক কালের পুরাতন পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। এ দিকে উলোর রামরতন মুখুজ্যের ঘরে তর্কভূষণের কন্যা ভুবনেশ্বরীর ঘরকন্নাও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য এবং অত্যন্ত বেদনাজনক হইয়াছে। সংক্ষেপে তর্কভূষণ, তাঁহার গ্রাম, তাঁহার পরিবার, তাঁহার ছাত্রবর্গ, তাঁহার শত্রুমিত্র সকলকে লইয়া একটি গ্রাম্যগ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্রবর্তী সূর্যের ন্যায় আমাদের নিকট প্রবল উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।

এমন সময়ে আমাদের পরম দুর্ভাগ্যবশত উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথায় গেল তর্কভূষণ, নশিপুর, হাঁসের দল— কোথা হইতে উপস্থিত নবীনচন্দ্র, হাতিবাগান, নবরত্নসভা। গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক; ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতিপ্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। গ্রন্থকার পূর্বে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত গড়িতে লাগিলেন, পূর্বে যেখানে আনন্দনিকেতন ছিল এখন সেখানে পাঠশালা বসিয়া গেল।

এরূপ অঘটন সংঘটন হইল কেন তাহা বলিতে পারি না। তর্কভূষণের বিধবা ভগিনী বিজয়া এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্রের কলিকাতায় আগমনকালটি তাঁহাদের নিজের পক্ষে সুক্ষণ, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে কুক্ষণ— কারণ সেই উপলক্ষটুকু অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের শেষার্ধটি প্রথমার্ধের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে কোনো অবশ্যযোগ নাই।

দুইটা মানুষকে এক দড়ি দিয়া বাঁধিলে ঐক্য হিসাবেও তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় না এবং দ্বৈত হিসাবেও তাহা সুবিধা হয় না। তেমনি দুই স্বতন্ত্র গল্পকে জবরদস্তি করিয়া একত্র বাঁধিয়া দিলে একটা গল্পের হিসাবেও তাহাদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন পরিণতিতে বাধা দেওয়া হয়, দুইটা গল্পের হিসাবেও তাহাদিগকে আড়ষ্ট করিয়া বধ করা হয়। বর্তমান গ্রন্থেও তাহাই হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি দুটি গল্পকে বিচ্ছিন্ন আকারে রচনা করিতেন তাহা হইলে সম্ভবত দুটিকেই উৎকৃষ্ট গল্পে পরিণত করিতে পারিতেন।

দ্বিতীয় গল্পটির কথা বলিতে পারি না— কিন্তু প্রথম গল্পটি যে সাহিত্যের অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিত সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।

আসল কথা, লেখক নিজেই নূতন যুগের মধ্যে বাস করিতেছেন; এমন-কি, নবযুগরথে চালকবর্গ-মধ্যে তিনিও একজন গণ্য ব্যক্তি। তিনি ইহার ঘর্ঘর শব্দ এবং জনতা-কোলাহল হইতে কল্পনাযোগে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এতদূরে লইয়া যাইতে পারেন নাই যেখানে শান্তিতে বসিয়া নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ইহাকে চিত্রিত করিতে পারেন। বিচিত্র মতামত এবং তর্কবিতর্কগুলা একেবারে গোটা আসিয়া পড়ে, তাহা রক্তমাংসের মানবাকারে পরিণত হইয়া উঠে না। তাঁহার পঞ্চু, ব্রজরাজ, সুরেন্দ্র গুপ্ত, মথুরেশ, এমন-কি নবীনও খুব ভালো ছেলে বটে কিন্তু সজীব নহে— তাহারা বীজগণিতের ক খ গ অক্ষরের ন্যায় কেবল কতকগুলি চিহ্নমাত্র।

সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত। যাহা পুরাতন, যাহা স্থির, যাহা নানা দিকে নানা ভাবে সমাজের হৃদয় হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শ্যামল সতেজ এবং পরিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে— তাহাকে সত্য এবং সরসভাবে পাঠকের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যাহা নূতন উঠিতেছে, যাহা চেষ্টা করিতেছে, যুদ্ধ করিতেছে, পরিবর্তনের মুখে আবর্তিত হইতেছে, যাহা এখনও সর্বাঙ্গীণ পরিণতিলাভ করে নাই তাহাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করিতে হইলে বিস্তর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অথবা ঘাতপ্রতিঘাত-ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিচিত্র নাট্যকলা প্রয়োগ আবশ্যক হয়। কিন্তু সেরূপ করিতে হইলে রচনার বিষয় হইতে রচয়িতার নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে হয়— অত্যন্ত কাছে থাকিলে, মণ্ডলীর

কেন্দ্রের মধ্যে বাস করিলে সমগ্রের তুলনায় তাহার অংশগুলি, ব্যক্তির তুলনায় তাহার মতগুলি, কার্যপ্রবাহের তুলনায় তাহার উদ্দেশ্যগুলি যেরূপ বেশি করিয়া চোখে পড়ে, তাহাতে রচনা সত্যবৎ হয় না, তাহার পরিমাণ-সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং বাহিরের নির্লিপ্ত পাঠকদের নিকটে কিরূপে বিষয়টিকে সমগ্র এবং সপ্রমাণ করিতে হইবে তাহার ঠাহর থাকে না।

কিন্তু এই দ্বিতীয় নম্বর গল্পটিতেও লেখক যেখানেই নবযুগের আবর্ত ছাড়িয়া খাঁটি মানুষগুলির কথা বলিয়াছেন সেইখানেই দুই-চারিটি সরল বর্ণনায় স্বল্প রেখাপাতে অতি সহজেই চিত্র আঁকিয়াছেন এবং পাঠকের হৃদয়কে রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এক স্থলে গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে শ্রীধর ঘোষের সহিত কেবল চকিতের মতো আমাদের পরিচয় করাইয়া তাহাকে অপসৃত করিয়া দিয়াছেন— কিন্তু সেই স্বল্পকালের পরিচয়েই আমাদের মনে একটা আক্ষেপ রাখিয়া গিয়াছেন ; আমাদের বিশ্বাস, লেখক মনোযোগ করিলে এই শ্রীধর ঘোষটিকে একটি গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া আর-একটি উপন্যাসকে প্রাণদান করিতে পারিতেন। আমরা শ্রীধরের সংক্ষেপ পরিচয়টি এ স্থলে উদ্‌ধৃত করি।

'এই ঘোষ-পরিবার বৈষ্ণব পরিবার— গোঁসায়ের শিষ্য। শ্রীধর ঘোষ মহাশয় অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। উদরান্নের জন্য ম্লেচ্ছের অধীনে কাজ করিতেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। আপিসে যখন কর্ম করিতেন, তখন তাঁহার নাসাতে তিলক ও সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দৃষ্ট হইত।··· মানুষটি শ্যামবর্ণ সুস্থ ও সবলদেহ ছিলেন, মুখটি সদ্‌ভাবে ও ভক্তিতে যেন গদ্‌গদ, সে মুখ দেখিলেই কেমন হৃদয় স্বভাবত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। ঘোষজা মহাশয় আপিসে প্রবেশের দ্বারের পার্শ্বের ঘরেই বসিতেন ; এবং যত গাড়ি মাল আমদানি ও রপ্তানি হইত তাহার হিসাব রাখিতেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আপিসে প্রবেশের সময়ে অনেকবার এই প্রশ্ন শুনিতে হইত··· কী ঘোষজা মশাই, খবর কী ? সব কুশল তো ? অমনি ঘোষজার উত্তর "আজ্ঞে গোবিন্দের কৃপাতে সবই কুশল।" ঘোষজা দোলের সময় কিছু ব্যয় করিতেন ; লোকজনকে শ্রদ্ধাসহকারে আহ্বান করিয়া উত্তমরূপ খাওয়াইতেন। এইজন্য আপিসের লোক মাঘ মাস পড়িলেই জিজ্ঞাসা করিত— "কী ঘোষজা মশাই, এবার দোল করবেন তো ?" অমনি উত্তর— "আজ্ঞে কী জানি, যা গোবিন্দের ইচ্ছা।" গোবিন্দের প্রতি নির্ভরের ভাব তাঁহার এমন স্বাভাবিক ছিল যে, আট বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটির কাল হইলে, তাহারই তিন-চারি দিন পরে আপিসের একজন লোক জিজ্ঞাসা করিলেন— "কী, ঘোষ মশাই

ছেলে দুটো মানুষ হচ্ছে তো ?" ঘোষজা উত্তর করিলেন— "আজ্ঞে দুটো আর কই ? এখন তো একটি, কেবল বড়োটিই আছে।" প্রশ্নকর্তা বিস্মিত হইয়া কহিলেন— "সে ছেলেটির কী হল ?" ঘোষজা উত্তর করিলেন— "আজ্ঞে গোবিন্দ সেটিকে নিয়েছেন।"··· তিনি সাধ করিয়া নাতি নাতনীদের নাম রাখিয়াছিলেন। পুত্রের সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা হইলে তাহার নাম রাধারানী রাখিলেন··· সর্বজ্যেষ্ঠা রাধারানী তাঁহার প্রথম আদরের ধন ছিল। "রাধে। রাজনন্দিনী। গরবিনী। শ্যামসোহাগিনী।" বলিয়া যখন ডাকিতেন, তখন এক বৎসরের বালিকা রাধারানী অচিরোদ্গত-দন্তাবলী-শোভিত মুখচন্দ্রে একটু হাসিয়া, ঝাঁপাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া পড়িত। তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন— "রাখালের সনে প্রেম করিস নে রাই!" অমনি চক্ষে জলধারা বহিত।'

এ দিকে শিশুকন্যা টিমিমণি, নবীনের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধ, নবীনের রাঙা মা— এগুলিও লেখক বড়ো সরল এবং সরস সুমিষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

লেখক ধারাবাহিক গল্পের প্রতি বড়ো-একটা দৃষ্টিপাত করেন নাই— আমরাও গল্পের জন্য বিশেষ লালায়িত নহি। আমরা একজন রীতিমত মনুষ্যের আনন্দজনক বিশ্বাসজনক জীবনবৃত্তান্ত চাহি— নশিপুর গ্রামে তর্কভূষণ-পরিবারের আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিয়া যাইতে আমাদের কিছুমাত্র শ্রান্তিবোধ হইত না; কারণ, তর্কভূষণ আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং লেখকও তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিনী হাস্যবর্ষিণী কল্পনাশক্তি দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু লেখক দুইখানি বহির পাতা পরস্পর উল্‌টাপাল্‌টা করিয়া দিয়া একসঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরির অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন, এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।

চৈত্র ১৩০১

আর্যগাথা

আর্যগাথা। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় -প্রণীত

গ্রন্থখানি সংগীতপুস্তক এইজন্য ইহার সম্পূর্ণ সমালোচনা সম্ভবে না। কারণ, গানে কথার অপেক্ষা সুরেরই প্রাধান্য। সুর খুলিয়া লইলে অনেক সময়ে গানের কথা অত্যন্ত শ্রীহীন এবং অর্থশূন্য হইয়া পড়ে এবং সেইরূপই হওয়া উচিত। কারণ, সংগীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষমাত্র করাই আবশ্যক ; কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায় তবে সংগীত সেখানে খর্ব হইয়া পড়ে। কথার দ্বারা আমরা যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকি তাহা বহুলপরিমাণে সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট— কিন্তু আমাদের মনে অনেক সময় এমন-সকল ভাবের উদয় হয় যাহা নামরূপে নির্দেশ বা বর্ণনায় প্রকাশ করিতে পারি না, যাহা কথার অতীত, যাহা অহৈতুক— সেই-সকল ভাব, অন্তরাত্মার সেই-সমস্ত আবেগ-উদ্বেগগুলি সংগীতেই বিশুদ্ধ-রূপে ব্যক্ত হইতে পারে। হিন্দুস্থানি গানে কথা এতই যৎসামান্য যে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না— ননদিয়া, গগরিয়া, চুনরিয়া আমরা কানে শুনিয়া যাই মাত্র কিন্তু সংগীতের সহস্রবাহিনী নির্ঝরিণী সেই-সমস্ত কথাকে তুচ্ছ উপলখণ্ডের মতো প্লাবিত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্যবেগ, এক অনির্বচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার করিয়া দেয়। সামান্যত পাথরের নুড়ি বালকের খেলেনা মাত্র, হিন্দি গানের কথাও সেইরূপ ছেলেখেলা— কিন্তু নির্ঝরের তলে সেই নুড়িগুলি ঘাতে-প্রতিঘাতে জলস্রোতকে মুখরিত করিয়া তোলে, বেগবান প্রবাহকে বিবিধ বাধা দ্বারা উচ্ছ্বসিত করিয়া অপরূপ বৈচিত্র্য দান করে। হিন্দি গানের কথাও সেইরূপ সুরপ্রবাহকে বিচিত্র শব্দসংঘর্ষ এবং বাধার দ্বারা উচ্ছ্বসিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে, অর্থগৌরব বা কাব্যসৌন্দর্যের দ্বারা তাহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে না। ছন্দ-সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। নদী যেমন আপনার পথ আপনি কাটিয়া যায় গানও তেমনি আপনার ছন্দ আপনি গড়িয়া গেলেই ভালো হয়। অধিকাংশ স্থলেই হিন্দি গানের কথায় কোনো ছন্দ থাকে না— সেইজন্যই ভালো হিন্দি গানের তালের গতিবৈচিত্র্য এমন অভাবিতপূর্ব ও সুন্দর— সে ইচ্ছামত হ্রস্বদীর্ঘের সামঞ্জস্য বিধান করিতে করিতে চলে, স্বাধীনতার সহিত সংযমের সমন্বয় সাধন করিতে করিতে বিজয়ী সম্রাটের ন্যায় গুরুগম্ভীর ভেরীধ্বনি-সহকারে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহাকে পূর্বকৃত বাঁধা ছন্দের মধ্য দিয়া চালনা করিয়া লইয়া গেলে তাহার বৈচিত্র্য এবং

গৌরবের হানি হইয়া থাকে। কাব্য স্বরাজ্যে একাধিপত্য করিতে পারে কিন্তু সংগীতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহার পক্ষে অনধিকারচর্চা হয়।

বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ সংগীত স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যাদেবীগণের মহল পৃথক হইলেও তাঁহারা কখনও কখনও একত্র মিলিয়া থাকেন। সংগীতে ও কাব্যে মধ্যে মধ্যে সেরূপ মিলন দেখা যায়। তখন উভয়েই পরস্পরের জন্য আপনাকে কথঞ্চিৎ সংকুচিত করিয়া লন, কাব্য আপন বিচিত্র অলংকার পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় স্বচ্ছতা ও সরলতা অবলম্বন করেন, সংগীতও আপন তালসুরের উদ্দাম লীলাভঙ্গকে সম্বরণ করিয়া সখ্যভাবে কাব্যের সাহচর্য করিতে থাকেন।

হিন্দুস্থানে বিশুদ্ধ সংগীত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে কিন্তু বঙ্গদেশে কাব্য ও সংগীতের সম্মিলন ঘটিয়াছে। গানের যে-একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি স্বাধীন পরিণতি তাহা এ দেশে স্থান পায় নাই। কাব্যকে অন্তরের মধ্যে ভালো করিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্যই এ দেশে সংগীতের অবতারণা হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বড়ো বড়ো কাব্যও সুরসহকারে সর্বসাধারণের নিকট পঠিত হইত। বৈষ্ণব কবিদিগের গানগুলিও কাব্য— কেবল চারি দিকে উড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবার জন্য সুরগুলি তাহাদের ডানাস্বরূপ হইয়াছিল। কবিরা যে কাব্য রচনা করিয়াছেন সুর তাহাই ঘোষণা করিতেছে মাত্র।

বঙ্গদেশের কীর্তনে কাব্য ও সংগীতের সম্মিলন এক আশ্চর্য আকার ধারণ করিয়াছে ; তাহাতে কাব্যও পরিপূর্ণ এবং সংগীতও প্রবল। মনে হয় যেন ভাবের বোঝাই পূর্ণ সোনার কবিতা ভরাসুরের সংগীত-নদীর মাঝখান দিয়া বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। সংগীত কেবল-যে কবিতাটিকে বহন করিতেছে তাহা নহে তাহার নিজেরও একটা ঐশ্বর্য এবং ঔদার্য এবং মর্যাদা প্রবলভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে উভয় শ্রেণীরই গান দেখা যায়। ইহার মধ্যে কতকগুলি গান আছে যাহা সুখপাঠ্য নহে, যাহার ছন্দ ও ভাববিন্যাস সুরতালের অপেক্ষা রাখে, সেগুলি সাহিত্যসমালোচকের অধিকারবহির্ভূত। আর-কতকগুলি গান আছে যাহা কাব্য হিসাবে অনেকটা সম্পূর্ণ— যাহা পাঠমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করে। যদিচ সে-গানগুলির মাধুর্যও সম্ভবত সুরসংযোগে অধিকতর পরিস্ফুটতা, গভীরতা এবং নূতনত্ব লাভ করিতে পারে তথাপি ভালো এনগ্রেভিং হইতে তাহার আদর্শ অয়েলপেন্টিঙের সৌন্দর্য যেমন অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায় তেমনি কেবলমাত্র সেই-সকল কবিতা হইতে গানের সমগ্র মাধুর্য

আমরা মনে মনে পূরণ করিয়া লইতে পারি। উদাহরণস্বরূপে "একবার দেখে যাও দেখে যাও কত দুখে যাপি দিবানিশি" কীর্তনটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা বেদনায় পরিপূর্ণ, অনুরাগে অনুনয়ে পরিপ্লুত। পাঠ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে ইহার আকৃতিপূর্ণ সংগীতটি আমাদের কল্পনায় ধ্বনিত হইতে থাকে। সম্ভবত যে সুরে এই গান বাঁধা হইতেছে তাহা আমাদের কল্পনার আদর্শের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। না হইবারই কথা। কারণ, এই কবিতাটি কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং বিচিত্র; এবং আমাদের সংগীত সাধারণত একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত স্থায়ী ভাব অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে ; ভাব হইতে ভাবান্তরে বিচিত্র আকারে ও নব নব ভঙ্গিতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে না। এইজন্য আমাদের বক্ষ্যমাণ কবিতাটির উপযুক্ত রাগিণী আমরা সহজে প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু কোনো সুর না থাকিলেও ইহাকে আমরা গান বলিব— কারণ, ইহাতে আমাদের মনের মধ্যে গানের একটা আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া দেয়— যেমন ছবিতে একটা নির্ঝরিণী আঁকা দেখিলে তাহার গতিটি আমরা মনের ভিতর হইতে পূরণ করিয়া লই। গান এবং কবিতার প্রভেদ আমরা এই গ্রন্থ হইতেই তুলনার দ্বারা দেখাইয়া দিতে পারি।

সে কে ?— এ জগতে কেহ আছে, অতি উচ্চ মোর কাছে
যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ ;
সে কে ?— অধীন হইয়ে, তবু রহে যে আমার প্রভু ;
প্রভু হয়ে আমি যার দাস ;
সে কে ?— দূর হতে দূরাত্মীয়, প্রিয়তম হতে প্রিয়,
আপন হইতে যে আপন ;
সে কে ?— লতা হতে ক্ষীণ তারে বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,
ছাড়াতে পারি না আজীবন ;
সে কে ?— দুর্বলতা যার বল ; মর্মভেদী অশ্রুজল ;
প্রেম-উচ্চারিত রোষ যার ;
সে কে ?— যার পরিতোষ মম সফল জনমসম ;
সুখ— সিদ্ধি সব সাধনার ;
সে কে ?— হলেও কঠিন চিত শিশুসম স্নেহভীত
যার কাছে পড়ি গিয়া নুয়ে ;
সে কে ?— বিনা দোষে ক্ষমা চাই যার ; অপমান নাই
শতবার পা দুখানি ছুঁয়ে ;

সে কে ?— মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার ;
শৃঙ্খল নূপুর হয়ে বাজে ;
সে কে ?— হৃদয় খুঁজিতে গিয়া নিজে যাই হারাইয়া
যার হৃদি-প্রহেলিকা মাঝে।

ইহা কবিতা, কিন্তু গান নহে। স্বরসংযোগে গাহিলেও ইহাকে গান বলিতে পারি না। ইহাতে ভাব আছে এবং ভাবপ্রকাশের নৈপুণ্যও আছে কিন্তু ভাবের সেই স্বত-উচ্ছ্বসিত সদ্য-উৎসারিত আবেগ নাই যাহা পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে প্রহত তন্ত্রীর ন্যায় একটা সংগীতময় কম্পন উৎপাদন করিয়া তোলে।

ছিল বসি সে কুসুমকাননে।
আর অমল অরুণ উজল আভা
ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে) ;
ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি
অতুল গরিমারাশি।
সেথা ছিল না বিষাদভাষা (অশ্রুভরা গো) ;
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি
হাসি, হরষ, আশা ;
সেথা ঘুমায়ে ছিল রে পুণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালোবাসা।
তার সরল সুঠাম দেহ (প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো) ;
যেন যা-কিছু কোমল ললিত তা দিয়ে
রচিয়াছে তাহে কেহ ;
পরে সৃজিল সেথায় স্বপন, সংগীত,
সোহাগ শরম স্নেহ।
যেন পাইল রে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে) ;
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি
সুমিলিত, সমতান।
যেন সজীব সুরভি মধুর মলয়
কোকিলকূজিত গান।
শুধু চাহিল সে মোর পানে (একেবার গো) ;

যেন বাজিল বীণা মুরজ মুরলী
অমনি অধীর প্রাণে ;
সে গেল কী দিয়া, কী নিয়া, বাঁধি মোর হিয়া
কী মন্ত্রগুণে কে জানে।

এই কবিতাটির মধ্যে যে রস আছে তাহাকে আমরা গীতরস নাম দিতে পারি। অর্থাৎ লেখক একটি সুখস্মৃতি এবং সৌন্দর্যস্বপ্নে আমাদের মনকে যেরূপ ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিতে চাহেন তাহা সংগীত দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে এবং যখন কোনো কবিতা বিশেষ মন্ত্রগুণে অনুরূপ ফল প্রদান করে তখন মনের মধ্যে যেন একটি অব্যক্ত গীতধ্বনি গুঞ্জরিত হইতে থাকে। যাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করিয়াছেন, অন্যান্য কবিতা হইতে গানের কবিতার স্বাতন্ত্র্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

আমরা সামান্য কথাবার্তার মধ্যেও যখন সৌন্দর্যের অথবা অনুভবের আবেগ প্রকাশ করিতে চাহি তখন স্বতই আমাদের কথার সঙ্গে সুরের ভঙ্গি মিলিয়া যায়। সেইজন্য কবিতায় যখন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমোহ অথবা ভাবের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয় তখন কথা তাহার চিরসঙ্গী সংগীতের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে থাকে।—

এসো এসো বঁধু এসো, আধো আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি!

এই পদটিতে যে গভীর প্রীতি এবং একান্ত আত্মসমর্পণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি কথার দ্বারা হইয়াছে? না, আমরা মনের ভিতর হইতে একটা কল্পিত করুণ সুর সংযোগ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি? ওই দুটি ছত্রের মধ্যে যে-কটি কথা আছে তাহার মতো এমন সামান্য এমন সরল এমন পুরাতন কথা আর কী হইতে পারে? কিন্তু উহার ওই অত্যন্ত সরলতাই শ্রোতাদের কল্পনার নিকট হইতে সুর ভিক্ষা করিয়া লইতেছে। এইজন্য ওই কবিতার সুর না থাকিলেও উহা গান। এইজন্যই—

হরষে বরষ পরে যখন ফিরি রে ঘরে,
সে কে রে আমারি তরে আশা ক'রে রহে বলো ;
স্বজন সুহৃদ সবে উজল নয়ন যবে,
কার প্রিয় আঁখি দুটি সব চেয়ে সমুজ্জল!

ইহা কানাড়ায় গীত হইলেও গান নহে, এবং—

চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখপানে
ফিরিতে চাহে না আঁখি ;

আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
অবাক হইয়ে থাকি !

ইহাতে কোনো রাগিণীর নির্দেশ না থাকিলেও ইহা গান।

সর্বশেষে আমরা আর্যগাথা হইতে একটি বাৎসল্য রসের গান উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহাতে পাঠকগণ স্নেহের সহিত কৌতুকের সংমিশ্রণ দেখিতে পাইবেন।

একি রে তার ছেলেখেলা বকি তায় কি সাধে,—
যা দেখবে বলবে, 'ওমা, এনে দে, ওমা, দে।'
'নেব নেব' সদাই কি এ ?
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলে, হাসতে গিয়ে কাঁদে।
এত খেলার জিনিস ছেড়ে,
বলে কি না দিতে পেড়ে—
অসম্ভব যা— তারায় মেঘে বিজলিরে চাঁদে !
শুনল কারো হবে বিয়ে,
ধরল ধুয়ো অমনি গিয়ে
'ও মা, আমি বিয়ে করব'— কান্নার ওস্তাদ এ !
শোনে কারো হবে ফাঁসি
অমনি আঁচল ধরল আসি—
'ও মা, আমি ফাঁসি যাব'— বিনি অপরাধে !

অগ্রহায়ণ ১৩০১

‘আষাঢ়ে’

লেখক তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং আমরাও তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, বাংলা-পাঠকসমাজে তাঁহার নাম গোপন থাকিবে না।

‘আষাঢ়ে’ কতকগুলি হাস্যরসপ্রধান কবিতা। তাহার অনেকগুলিই গল্প-আকারে রচিত। গল্পগুলিকে ‘আষাঢ়ে’ আখ্যা দিয়া গ্রন্থকার পাঠকদিগকে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, আমরা বাঙালি পাঠকেরা অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বেরসিক বর যেমন বাসরঘরের অপ্রত্যাশিত রসিকতায় খাপা হইয়া উঠে আমরাও তেমনি ছাপার বই খুলিয়া হঠাৎ আদ্যোপান্ত কৌতুক দেখিতে পাইলে ছিব্‌লামি সহ্য করিতে পারি না।

বইখানির মধ্যে গায়ে বাজে এমনতরো কৌতুকও আছে। ইহার শেষ কবিতার নাম ‘কর্ণবিমর্দন’। কিন্তু এই মর্দন-ব্যাপারটি সকল কবিতাতেই কিছু-না কিছু আছে। গল্পপ্রসঙ্গে সামাজিক কপটতার যে-অংশটাই কবির হাতের কাছে আসিয়াছে সেই-খানেই তিনি একটুখানি সহাস্য টিপ্পনী প্রয়োগ করিয়াছেন।

এরূপ প্রকৃতির রহস্য-কবিতা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং ‘আষাঢ়ে’র কবি অপূর্ব প্রতিভাবলে ইহার ভাষা, ভঙ্গি, বিষয় সমস্তই নিজে উদ্‌ভাবন করিয়া লইয়াছেন।

ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

‘এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সংগত। কিন্তু যেরূপ বিষয় সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি-যাত্রা বর্ণনা করিতে মেঘনাদবধের দুন্দুভি-নিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?’

ভাষা সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন সে ঠিক কথা। কিন্তু ছন্দ সম্বন্ধে তিনি কোনো কৈফিয়ত দেন নাই এবং দিলেও আমরা গ্রহণ করিতে পারিতাম না। পদ্যকে সমিল গদ্যরূপে চালাইবার কোনো হেতু নাই। ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়ে না, বরঞ্চ কমিয়া যায়। কারণ কবিতা পড়িবার সময় পদ্যের নিয়ম রক্ষা করিয়া পড়িতে স্বতই চেষ্টা জন্মে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি স্খলন হইতে থাকে তবে তাহা বাধা-জনক ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।

বায়রনের ডন জুয়ানে কবি অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ কৌতুকের অবতারণা করিয়া-

ছেন। কিন্তু নির্দোষ ছন্দের সুকঠিন নিয়মের মধ্যেই সেই অনায়াস অবলীলাভঙ্গি পাঠককে এরূপ পদে পদে বিস্মিত করিয়া তোলে।

ইন্‌গোল্‌ড্‌স্‌বি কাহিনী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কৌতুক-কাব্যেও ছন্দের অস্খলিত পারিপাট্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

বস্তুত, ছন্দের শৈথিল্যে হাস্যরসের নিবিড়তা নষ্ট করে। কারণ হাস্যরসের প্রধান দুইটি উপাদান, অবাধ দ্রুতবেগ এবং অভাবনীয়তা। যদি পড়িতে গিয়া ছন্দে বাধা পাইয়া যতিস্থাপন সম্বন্ধে দুই-তিনবার দুই-তিন রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় তবে সেই চেষ্টার মধ্যে হাস্যের তীক্ষ্ণতা আপন ধার নষ্ট করিয়া ফেলে।

অবশ্য কোনো নূতন ছন্দ প্রথম পড়িতে কষ্ট হয়, এবং যাঁহাদের ছন্দের স্বাভাবিক কান নাই তাঁহারা পরের উপদেশ ব্যতীত তাহা কোনো কালেই পড়িতে পারেন না। কিন্তু আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা তাহার নূতনত্ব নহে। তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই এইজন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্যকমত কোথাও টানিয়া কোথাও ঠাসিয়া কমিবেশি করিয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া বরঞ্চ মনে মনে পড়া চলে, কিন্তু কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতে হইলে পদে পদে অপ্রতিভ হইতে হয়।

অথচ শোনাইবার যোগ্য এমন কৌতুকাবহ পদার্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। আজকাল বাংলা কবিতা আবৃত্তির দিকে একটা ঝোঁক পড়িয়াছে। আবৃত্তির পক্ষে কৌতুক-কবিতা অত্যন্ত উপাদেয়। অথচ 'আষাঢ়ে'র অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতাবশত আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে।

অথচ ছন্দ এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য দখল আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি হইতে থাকে তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিল বর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারে না তাহারও অনেক উদাহরণ আছে। কবি নিজেই তাঁহার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রচনাগুলিকে নিয়মিত ছন্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্থায়িত্ব এবং উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার 'বাঙালি মহিমা', 'ইংরেজ-স্তোত্র', 'ডিপুটি কাহিনী' ও 'কর্ণবিমর্দন' সর্বত্র উদ্‌ধৃত, পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছে। এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

প্রতিভার প্রথম উদ্দাম চেষ্টা, আরম্ভেই একটা নূতন পথের দিকে ধাবিত হয়,

তাহার পর পরিণতিসহকারে পুরাতন বন্ধনের মধ্যে ধরা দিয়া আপন মর্মগত নূতনত্বকে বহিঃস্থিত পুরাতনের উপর দ্বিগুণতর উজ্জ্বল আকারে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। 'আষাঢ়ে'র গ্রন্থকর্তা যতগুলি কবিতা লিখিয়াছেন, সকলেরই মধ্যে তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু যে কবিতাগুলি তিনি ছন্দের পুরাতন ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নূতনত্বের উজ্জ্বলতা ও পুরাতনের স্থায়িত্ব উভয়ই একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, কবিও তাহা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার হাস্যসৃষ্টির নীহারিকা ক্রমে ছন্দোবন্ধে ঘনীভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে হাস্যা-লোকের ধ্রুব নক্ষত্রপুঞ্জ রচনা করিবে।

শুদ্ধমাত্র অমিশ্র হাস্য ফেনরাশির মতো লঘু এবং অগভীর। তাহা বিষয়-পুঞ্জের উপরিতলের অস্থায়ী উজ্জ্বল বর্ণপাত মাত্র। কেবল সেই হাস্যরসের দ্বারা কেহ যথার্থ অমরতা লাভ করে না। রূপালির পাতের মধ্যে শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু তাহার লঘুত্ব ও অগভীরতা-বশত তাহার মূল্যও অল্প এবং তাহার স্থায়িত্বও সামান্য। সেই উজ্জ্বলতার সঙ্গে রৌপ্যপিণ্ডের কাঠিন্য ও ভার থাকিলে তবেই তাহার মূল্য বৃদ্ধি করে। হাস্যরসের সঙ্গে চিন্তা এবং ভাবের ভার থাকিলে তবে তাহার স্থায়ী আদর হয়। সমালোচ্য গ্রন্থে 'বাঙালি মহিমা', 'কর্ণবিমর্দনকাহিনী' প্রভৃতি কবিতায় যে হাস্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা লঘু হাস্য মাত্র নহে, তাহার মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্‌কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।

তাহা ছাড়া, সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে 'আষাঢ়ে'-রচয়িতার এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে যাহাতে হাস্য এবং অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে কেবল বাঙালিকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়াছেন।

অগ্রহায়ণ ১৩০৫

মন্দ্র

'মন্দ্র' শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নূতন প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থখানিকে আমরা সাহিত্যের আসরে সাদর অভিবাদনের সঙ্গে আহ্বান করিয়া আনিব— ইহাকে আমরা মুহূর্তমাত্র দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারিব না।

গ্রন্থ-সমালোচনা সম্পাদকের কর্তব্য বলিয়াই গণ্য। অনেকেই অতিমাত্র আগ্রহের সঙ্গেই এ কর্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে ব্যগ্রতার যথেষ্ট অভাব আছে, সে কথা স্বীকার করি।

'মন্দ্র' কাব্যখানিকে অবলম্বন করিয়া আমরা অকস্মাৎ কর্তব্য পালন করিতে আসি নাই। গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের এই উদ্যম।

'মন্দ্র' কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।

সে সাহস কি শব্দনির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে— আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্বান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন— দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্র তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য, বিস্ময়, কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।

এইরূপে 'মন্দ্র' কাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন নৃত্য করিতেছে, কেহ স্থির হইয়া নাই; ভাবের অভাবনীয় আবর্তনে তাহার ছন্দ ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অলংকারগুলি হইতে আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু নর্তনশীলা নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে 'মন্দ্র' কাব্যের কবিতাগুলির ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য, বিষাদ, বিদ্রূপ, বিস্ময় সমস্তই পুরুষের— তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে। তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার প্রতি কোনো নজর নাই।

বরং উপমা দিতে হইলে শ্রাবণের পূর্ণিমারাত্রির কথা পাড়া যাইতে পারে।

আলোক এবং অন্ধকার, গতি এবং স্তব্ধতা, মাধুর্য ও বিরাটভাব আকাশ জুড়িয়া অনায়াসে মিলিত হইয়াছে। আবার মাঝে মাঝে এক-এক পসলা বৃষ্টিও বাতাসকে আর্দ্র করিয়া ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে ঝরিয়া পড়ে। মেঘেরও বিচিত্র ভঙ্গি— তাহা কখনও চাঁদকে অর্ধেক ঢাকিতেছে, কখনও পুরা ঢাকিতেছে, কখনও-বা হঠাৎ একেবারে মুক্ত করিয়া দিতেছে— কখনও-বা ঘোরঘটায় বিদ্যুতে স্ফুরিত ও গর্জনে স্তনিত হইয়া উঠিতেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলাভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভা-সম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে, তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন— পূর্বে যাহার অস্তিত্ব কেহ সন্দেহ করে নাই, তাহাই তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্যভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেশভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।

ছন্দ সম্বন্ধেও যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'আশীর্বাদ' ও 'উদ্বোধন' কবিতায় ছন্দকে একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া ছন্দোরচনা করা হইয়াছে। তিনি যেন সাংঘাতিক সংকটের পাশ দিয়া গেছেন— কোথাও যে কিছু বিপদ ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই দুঃসাহস কোনো ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ শোভা পাইত না।

এইবার নমুনা উদ্‌ধৃত করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু আমরা ফুল ছিঁড়িয়া বাগানের শোভা দেখাইবার আশা করি না। পাঠকগণ কাব্য পড়িবেন— কেবল সমালোচনা চাখিয়া ভোজের পূর্ণসুখ নষ্ট করিবেন না।

কার্তিক ১৩০৯

শুভবিবাহ

রাস্কিন এক জায়গায় বলিয়াছেন, মহৎ আর্ট মাত্রই স্তব। সেই সঙ্গেই তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে, কোনো বড়ো জিনিসকে সংজ্ঞার দ্বারা বাঁধা সহজ নহে— অতএব, আর্ট ব্যাপারটা যে স্তব, সেটা খোলসা করিয়া বোঝানো আবশ্যক।

মানুষ বিশ্বসংসারে যাহা ভালোবাসে, আর্টের দ্বারা তাহার স্তব করে। সুন্দর গড়ন দিয়া মানুষ যখন একটা সামান্য ঘট প্রস্তুত করে, তখন সে কী করে? না, রেখার যে মনোহর রহস্য আমরা ফুলের পাপড়ির মধ্যে, ফলের পূর্ণতার মধ্যে, পাতার ভঙ্গিমায়, জীবশরীরের লাবণ্যে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, মানুষ ঘটের গঠনে বিশ্বের সেই রেখাবিন্যাস-চাতুরীর প্রশংসা করে। বলে যে, জগতে চোখ মেলিয়া এই-সকল বিচিত্র সুষমা আমার ভালো লাগিয়াছে।

এইখানে একটা কথা ভাবিবার আছে। বিশ্বপ্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু মহৎ বা সুন্দর, তাহাই আমাদের স্তবের যোগ্য, সুতরাং তাহাই আর্টের বিষয়, এ কথা বলিলে সমস্ত কথা বলা হয় না।

প্রাণের প্রতি প্রাণের, মনের প্রতি মনের, হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক টান আছে ইহাকে বিশেষভাবে সৌন্দর্য বা ঔদার্যের আকর্ষণ বলিতে পারি না। ইহাকে ঐক্যের আকর্ষণ বলা যাইতে পারে। আমি মানুষ, কেবল এইজন্যই মানুষের সকল বিষয়েই আমার মনের একটা ঔৎসুক্য আছে। আমি বাঙালি, এইজন্য বাঙালির তুচ্ছ বিষয়টিতেও আমার মনের মধ্যে একটা সাড়া পাওয়া যায়। গ্রামের দিঘির ভাঙা ঘাটটি আমার ভালো লাগে— সুন্দর বলিয়া নয়, গ্রামকে ভালোবাসি বলিয়া। গ্রামকে কেন ভালোবাসি? না, গ্রামের লোকজনদের প্রতি আমার মনের একটা টান আছে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা যে রামচন্দ্র-যুধিষ্ঠির, সীতা-সাবিত্রীর দল, তাহা নহে— তাহারা নিতান্তই সাধারণ লোক— তাহাদের মধ্যে স্তব করিবার যোগ্য কোনো বিশেষত্বই দেখা যায় না।

যদি কোনো কবি এই ঘাটটির প্রতি তাঁহার অনুরাগ ঠিকমতো ব্যক্ত করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন, তবে সে কবিতা কেবল যে এই গ্রামের লোকেরই মনে লাগিবে, তাহা নহে— সকল দেশেরই সহৃদয় পাঠক এই কবিতার রস উপভোগ করিতে পারিবে। কারণ, যে-ভাবটি লইয়া এই কবিতা রচিত, তাহা সকল দেশের মানুষের পক্ষেই সমান।

এ কথা সত্য যে, অনেক আর্টই, যাহা উদার, যাহা সুন্দর, তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি বা প্রীতির প্রকাশ। কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, যাহা সাধারণ, তাহার প্রতি আমাদের মনের সহজ আনন্দ, ইহাও আর্টের বিষয়। যদি তাহা না হইত, তবে আর্ট আমাদের ক্ষতিই করিত।

কারণ, কেবলমাত্র বাছাই করিয়া জগতের যাহা-কিছু বিশেষভাবে সুন্দর, বিশেষভাবে মহৎ, তাহারই প্রতি আমাদের রুচিকে বারংবার প্রবর্তিত করিতে থাকিলে আমাদের একটা রসের বিলাসিতা জন্মায়। যাহা প্রতিদিনের, যাহা চারি দিকের, যাহা হাতের কাছে আছে, তাহা আমাদের কাছে বিস্বাদ হইয়া আসে; ইহাতে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমাদের অনুভবশক্তির আতিশয্য ঘটাইয়া আর-সর্বত্র তাহার জড়ত্ব উৎপাদন করা হয়। এইরূপ আর্ট-সম্বন্ধীয় বাবুয়ানার দুর্গতির কথা টেনিসন তাঁহার কোনো কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন, সকলেই তাহা জানেন।

আমরা যে-গ্রন্থখানির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, পাঠকের সহিত তাহার পরিচয়সাধন করাইবার আরম্ভে ভূমিকাস্বরূপ উপরের কয়েকটি কথা বলা গেল।

রাস্কিনের সংজ্ঞা অনুসারে 'শুভবিবাহ' বইখানি কিসের স্তব? ইহার মধ্যে সৌন্দর্যের ছবি, মহত্ত্বের আদর্শ, কী প্রকাশ পাইয়াছে? ইহার উত্তরে বলিব, এমন করিয়া হিসাব খতাইয়া দেখা চলে না। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে ঘরের লোক জিজ্ঞাসা করিতে পারে, আজ তুমি কী রোজগার করিয়া আনিলে? লাভের পরিমাণ তখনই তাহাকে গুনিয়া দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের বাড়ি ঘুরিয়া আসিলে যদি প্রশ্ন ওঠে, আজ তুমি কী লাভ করিলে, তবে থলি ঝাড়িয়া তাহা হাতে-হাতে দেখানো সম্ভবপর হইতে পারে না।

সাহিত্যেও কোনো কোনো বিশেষ গ্রন্থে কী পাওয়া গেল, তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু এমন গ্রন্থও আছে, যাহার লাভ অমন করিয়া হিসাবের মধ্যে আনা যায় না— যাহা নূতন শিক্ষা নহে, যাহা মহান উপদেশ নহে, যাহা অপরূপ সৃষ্টি নহে। যাহা কেবল পরিচিতের সঙ্গে পরিচয়, আলাপীর সঙ্গে আলাপ, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্বমাত্র।

কিন্তু জীবনের আনন্দের অধিকাংশই এইরূপ অত্যন্ত সহজ এবং সামান্য জিনিস লইয়াই তৈরি। আকস্মিক, অদ্ভুত, অপূর্ব আমাদের জীবনের পথে দৈবাৎ আসিয়া জোটে; তাহার জন্য যে বসিয়া থাকে বা খুঁজিয়া বেড়ায় তাহাকে প্রায়ই বঞ্চিত হইতে হয়।

'শুভবিবাহ' একটি গল্পের বই, স্ত্রীলোকের লেখা, ইহার গল্পের ক্ষেত্রটি কলিকাতা

কায়স্থসমাজের অন্তঃপুর। এটুকু বলিতে পারি, মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে, এমন কোনো পুরুষ-গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না।

পরিচয় থাকিলেই তাহার বিষয়ে যে সহজে লেখা যায়, এ কথা ঠিক নহে। নিত্য-পরিচয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়তা আনে— মনকে যাহা নূতন করিয়া, বিশেষ করিয়া আঘাত না করে, মন তাহাকে জানিয়াও জানে না। যাহা সুপরিচিত, তাহার প্রতিও মনের নবীন ঔৎসুক্য থাকা একটি দুর্লভ ক্ষমতা।

'শুভবিবাহে' লেখিকা সেই ক্ষমতা প্রচুরপরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোনো গল্পের বইয়ে আমরা দেখি নাই। গ্রন্থে বর্ণিত অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণ যে লেখিকার বানানো, এ-কথা আমরা কোনো জায়গাতেই মনে করিতে পারি নাই। তাহারাই দেদীপ্যমান সত্য এবং লেখিকা উপলক্ষমাত্র।

এই বইখানির মধ্যে সামান্য একটুখানিমাত্র গল্প আছে এবং নায়কনায়িকার উপসর্গ একেবারেই নাই। তবু প্রথম খানত্রিশেক পাতা পড়া হইয়া গেলেই মনের ঔৎসুক্য শেষ ছত্র পর্যন্ত সমান সজাগ হইয়া থাকে। অথচ সমস্ত গ্রন্থে কলাকৌশল বা ভাষার ছটা একেবারেই নাই কেবল জীবন এবং সত্য আছে। যাহা-কিছু আছে, সমস্তই সহজেই প্রত্যক্ষ এবং অনায়াসেই প্রত্যয়যোগ্য।

গ্রন্থে বর্ণিত নারীগুলিকে অসামান্যভাবে চিত্র করিবার চেষ্টামাত্র করা হয় নাই— অথচ তাহাদের চরিত্রে আমাদের মনকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাদের সুখদুঃখে আমরা কিছুমাত্র উদাসীন নই। যিনি ঘরের গৃহিণী, এই গ্রন্থের যিনি 'দিদি', তিনি মোটাসোটা, সাদাসিধা প্রৌঢ় স্ত্রীলোক, ছেলের উপার্জিত নূতনলব্ধ ঐশ্বর্যে অহংকৃত; অথচ তাঁহার অন্তঃকরণে যে স্বাভাবিক স্নেহরস সঞ্চিত আছে, তাহা বিকৃত হইতে পায় নাই; তিনি উপরে ধনী-ঘরের কর্ত্রী, কিন্তু ভিতরে সরলহৃদয় সহজ স্ত্রীলোক। তাঁহার বিধবা কন্যা 'রানী' কল্যাণের প্রতিমা। অথচ ইঁহার চিত্রে সচেষ্টভাবে বেশি করিয়া রঙ ফলাইবার প্রয়াস কোনো জায়গাতেই দেখা যায় না। অতি সহজেই ইনি ইঁহার স্থান লইয়া আছেন। নিতান্ত সামান্য ব্যাপারের মধ্যেই ইনি আপনার অসামান্যতাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। লেখিকা ইঁহাকে আমাদের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়া বাহবা লইবার জন্য কোথাও আমাদের মুখের দিকে তাকান নাই। আর সেই 'পিসিমা'— অনাথা সন্তানহীনা— জনশূন্য বৃহৎ ঘরে অনাবশ্যক ঐশ্বর্যের মধ্যে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহটিকে লইয়া যিনি নারীহৃদয়ের সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রশান্ত ধৈর্যের সহিত মিটাইতেছেন, তাঁহার চরিত্রে শুভ পবিত্রতার সহিত স্নিগ্ধ করুণার,

বঞ্চিত স্নেহবৃত্তির সহিত সংযত নিষ্ঠার সুন্দর সমবায় যেন অনায়াসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে কাছে পাইয়া যখন এই তপস্বিনীর স্ত্রীপ্রকৃতি সুধারসে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার দেবসেবার নিত্যকর্মকেও যেন ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেল, তখন আন্তরিক অশ্রুজলে পাঠকের হৃদয় যেন সুস্নিগ্ধ হইয়া যায়।

রোমান্টিক উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তবচিত্রের অত্যন্ত অভাব। এজন্যও এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম। য়ুরোপীয় সাহিত্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাই, মানবচরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাকেই বাস্তবিকতা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বাংলা গ্রন্থটিতে পঙ্কিলতার নামগন্ধমাত্র নাই, অথচ বইটির আগাগোড়ায় এমন কিছু নাই, যাহা সাধারণ নহে, স্বাভাবিক নহে, বাস্তব নহে।

আষাঢ় ১৩১৩

মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত। প্রথম খণ্ড। শ্রীআবদুল করিম বি. এ. -প্রণীত

ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রবেশের অনতিপূর্বে খৃস্টশতাব্দীর আরম্ভকালে ভারত-ইতিহাসে একটা রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা দেখা যায়। দীর্ঘ দিবসের অবসানের পর একটা যেন চেতনাহীন সুষুপ্তির অন্ধকার সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল— সেটুকু সময়ের কোনো জাগ্রত সাক্ষী কোনো প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। গ্রীক এবং শকগণের সহিত সংঘাত তাহার পূর্বেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যে দ্বন্দ্বসংঘাতে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য শালিবাহন সমস্ত ভারতবর্ষের চূড়ার উপরে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন তাহা কেমন করিয়া একেবারে শান্ত নিরস্ত নিস্তরঙ্গ হইয়াছিল। নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে কোনো মহৎ ব্যক্তি বা বৃহৎ উদ্বোধনের আবির্ভাব হয় নাই। মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস-যবনিকা সবলে ছিন্ন করিয়া উদ্‌ঘাটন করিল তখন রাজপুত নামক এক আধুনিক সম্প্রদায় দেশের সমুদয় উচ্চ স্থানগুলি অধিকার করিয়া মান-অভিমানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধে দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতেছিল। সে জাতি কখন গঠিত হইল, কখন প্রবল হইল, কখন পশ্চিম হইতে পূর্বদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইল, তাহারা কাহাকে দূরীকৃত করিয়া কাহার স্থান অধিকার করিল, তা সমস্তই

ভারতবর্ষের সেই ঐতিহাসিক অন্ধরজনীর কাহিনী ; তাহার আনুপূর্বিকতা প্রচ্ছন্ন। মনে হয়, ভারতবর্ষ তদানীং সহসা কোথা হইতে একটা নিষ্ঠুর আঘাত একটা প্রচণ্ড বেদনা পাইয়া নিঃশব্দ মূর্ছিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে আর সে নিজের পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পায় নাই ; আর তাহার বীণায় সংগীত বাজে নাই, কোদণ্ডে টংকার জাগে নাই, হোমাগ্নিদীপ্ত তপোবনে ঋষিললাট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা উদ্‌ভাসিত হয় নাই।

এ দিকে অনতিপূর্বে ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ডবিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণবলে একীভূত হইয়া মুসলমান নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। তাহারা যেন ভিন্ন ভিন্ন দুর্গম মরুময় গিরিশিখরের উপরে খণ্ড তুষারের ন্যায় নিজের নিকটে অপ্রবুদ্ধ এবং বাহিরের নিকটে অজ্ঞাত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। কখন প্রচণ্ড সূর্যের উদয় হইল এবং দেখিতে দেখিতে নানা শিখর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তুষারস্রুত বন্যা একবার একত্র স্ফীত হইয়া তাহার পরে উন্মত্ত সহস্র ধারায় জগৎকে চতুর্দিকে আক্রমণ করিতে বাহির হইল।

তখন শ্রান্ত পুরাতন ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম বৌদ্ধদের দ্বারা পরাস্ত ; এবং বৌদ্ধধর্ম বিচিত্র বিকৃত রূপান্তরে ক্রমশ পুরাণ-উপপুরাণের শতধাবিভক্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বক্র প্রণালীর মধ্যে স্রোতোহীন মন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়া একটি সহস্রলাঙ্গুল শীতরক্ত সরীসৃপের ন্যায় ভারতবর্ষকে শতপাকে জড়িত করিতেছিল। তখন ধর্মে সমাজে শাস্ত্রে কোনো বিষয়ে নবীনতা ছিল না, গতি ছিল না, বৃদ্ধি ছিল না, সকল বিষয়েই যেন পরীক্ষা শেষ হইয়া গেছে, নূতন আশা করিবার বিষয় নাই। সে সময়ে নূতন-সৃষ্ট মুসলমানজাতির বিশ্ববিজয়োদ্দীপ্ত নবীন বল সম্বরণ করিবার উপযোগী কোনো একটা উদ্দীপনা ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না।

নবভাবোৎসাহে এবং ঐক্যপ্রবণ ধর্মবলে একটা জাতি যে কিরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি লাভ করে পরবর্তীকালে শিখগণ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল।

কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় নিরুৎসুক হিন্দুগণ মরিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানেরা যুদ্ধ করিয়াছে, আর হিন্দুরা দলে দলে আত্মহত্যা করিয়াছে। মুসলমানদের যুদ্ধের মধ্যে এক দিকে ধর্মোৎসাহ, অপর দিকে রাজ্য অথবা অর্থ -লোভ ছিল ; কিন্তু হিন্দুরা চিতা জ্বালাইয়া স্ত্রীকন্যা ধ্বংস করিয়া আবালবৃদ্ধ মরিয়াছে— মরা উচিত বিবেচনা করিয়া ; বাঁচা তাহাদের শিক্ষাবিরুদ্ধ সংস্কারবিরুদ্ধ বলিয়া। তাহাকে বীরত্ব বলিতে পার কিন্তু তাহাকে যুদ্ধ বলে না। তাহার মধ্যে উদ্দেশ্য অথবা রাষ্ট্রনীতি কিছুই ছিল না।

শাস্ত্রের উপদেশই হউক বা অন্য কোনো ঐতিহাসিক কারণ অথবা জলবায়ুঘটিত নিরুদ্যমবশতই হউক পৃথিবীর উপর হিন্দুদের লুব্ধমুষ্টি অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। জগতের কিছুর উপরে তেমন প্রাণপণ দাবি ছিল না। প্রবৃত্তির সেই উগ্রতা না থাকিলে মাংসপেশীতেও যথোচিত শক্তি জোগায় না। গাছ যেমন সহস্র শিকড় দিয়া মাটি কামড়াইয়া থাকে এবং চারি দিক হইতে রস শুষিয়া টানে, যাহারা তেমনি আগ্রহে জগৎকে খুব শক্ত করিয়া না ধরিতে পারে জগৎও তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে না। তাহাদের গোড়া আলগা হয়, তাহারা ঝড়ে উল্‌টাইয়া পড়ে। আমরা হিন্দুরা, বিশেষ করিয়া কিছু চাহি না, অন্য প্রাচীরের সন্ধি বিদীর্ণ করিয়া দূরের দিকে শিকড় প্রসারণ করি না— সেইজন্য, যাহারা চায় তাহাদের সহিত পারিয়া উঠা আমাদের কর্ম নহে।

যাহারা চায় তাহারা যে কেমন করিয়া চায় এই সমালোচ্য গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। পৃথিবীর জন্য এমন ভয়ংকর কাড়াকাড়ি, রক্তপাত, এত মহাপাতক একত্র আর কোথাও দেখা যায় না। অথচ এই রক্তস্রোতের ভীষণ আবর্তের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে দয়াদাক্ষিণ্য ধর্মপরতা রত্নরাজির ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

য়ুরোপীয় খৃস্টানজাতির মধ্যেও এই বিশ্বগ্রাসী প্রবৃত্তিক্ষুধা কিরূপ সাংঘাতিক তাহা সমুদ্রতীরের বিলুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণ ও রক্তকায় জাতিরা জানে। রূপকথার রাক্ষস যেমন নাসিকা উদ্যত করিয়া আছে, আমিষের ঘ্রাণ পাইলেই গর্জন করিয়া উঠে, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ—" ইহারা তেমনি কোথাও একটুকরা নূতন জমির সন্ধান পাইলেই দলে দলে চীৎকার করিয়া উঠে, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ মাটির গন্ধ পাঁউ।" উত্তর-আমেরিকার দুর্গম তুষারমরুর মধ্যে স্বর্ণখনির সংবাদ পাইয়া লোভোন্মত্ত নরনারীগণ দীপশিখালুব্ধ পতঙ্গের মতো কেমন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে, পথের বাধা, প্রাণের ভয়, অন্নকষ্ট কিছুতেই তাহাদিগকে রোধ করিতে পারে নাই, সে বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে সকলেই পাঠ করিয়াছেন। এই যে অচিন্তনীয় কষ্টসাধন— ইহাতে দেশের উন্নতি করিতে পারে কিন্তু ইহার লক্ষ্য দেশের উন্নতি, জ্ঞানের অর্জন অথবা আর-কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নহে— ইহার উদ্দীপক দুর্দান্ত লোভ। দুর্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণ যেমন লোভের প্ররোচনায় উত্তরের গোগৃহে ছুটিয়াছিল ইহারাও তেমনি ধরণীর স্বর্ণ-রস দোহন করিয়া লইবার জন্য মৃত্যুসংকুল উত্তরমেরুর দিকে ধাবিত হইয়াছে।

অধিকদিনের কথা নহে, ১৮৭১ খৃস্টাব্দে একটি ইংরাজ দাসদস্যুব্যবসায়ী জাহাজে কিরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা The Wide World Magazine-নামক

একটি নূতন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ফিজিদ্বীপে য়ুরোপীয় শস্যক্ষেত্রে মনুষ্য-পিছু তিন পাউণ্ড করিয়া মূল্য দেওয়া হইত। সেই লোভে একদল দাস-চোর যে কিরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত দক্ষিণসামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জে মনুষ্য শিকার করিত এবং একদা ষাট-সত্তর জন বন্দীকে কিরূপ পিশাচের মতো হত্যা করিয়া সমুদ্রের হাঙর দিয়া খাওয়াইয়াছিল তাহার নিদারুণ বিবরণ পাঠ করিলে খৃস্টানমতের অনন্ত নরকদণ্ডে বিশ্বাস জন্মে।

যে-সকল জাতি বিশ্ববিজয়ী, যাহাদের অসন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, তাহাদের সভ্যতার নিম্নকক্ষে শৃঙ্খলবদ্ধ হিংস্রতা ও উচ্ছৃঙ্খল লোভের যে-একটা পশুশালা গুপ্ত রহিয়াছে, মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাইলে কণ্টকিত হইতে হয়।

তখন আমাদের মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের উদয় হয় যে, যে-বৈরাগ্য ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিকে পরের অন্নে হস্তপ্রসারণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে, দুর্ভিক্ষের উপবাসের দিনেও যাহা তাহাকে শান্তভাবে মরিতে দেয়, তাহা স্বার্থরক্ষার পক্ষে উপযোগী নহে বটে, তথাপি যখন মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সম্মুখে, ক্ষমতালাভ স্বার্থসাধন সিংহাসনপ্রাপ্তির নিকটে স্বাভাবিক স্নেহ দয়া ধর্ম সমস্তই তুচ্ছ হইয়া যায়; ভাই-ভাই, পিতাপুত্র, স্বামীস্ত্রী, প্রভুভৃত্যের মধ্যে বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, রক্তপাত এবং অকথ্য অনৈসর্গিক নির্মমতার প্রাদুর্ভাব হয়, যখন খৃস্টান ইতিহাসে দেখা যায় আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় মাটির লোভে অসহায় দেশবাসীদিগকে পশুদলের মতো উৎসাদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, লোভান্ধ দাসব্যবসায়িগণ মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে নাই, যখন দেখিতে পাই পৃথিবীটাকে ভাঙিয়া চুরিয়া নিজের কবলে পুরিবার জন্য সর্বপ্রকার বাধা অমান্য করিতে মানুষ প্রস্তুত— ক্লাইভ, হেস্টিংস তাহাদের নিকট মহাপুরুষ এবং সফলতা-লাভ রাজনীতির শেষ নীতি— তখন ভাবি শ্রেয়ের পথ কোন্ দিকে! যদিও জানি যে-বল পশুত্বকে উত্তেজিত করে, সেই বল সময়ক্রমে দেবত্বকে উদ্বোধিত করে, জানি যেখানে আসক্তি প্রবল সেইখানেই আসক্তিত্যাগ সুমহৎ, জানি বৈরাগ্যধর্মের ঔদাসীন্য যেমন প্রকৃতিকে দমন করে তেমনি মনুষ্যত্বে অসাড়তা আনে এবং ইহাও জানি অনুরাগধর্মের নিম্নস্তরে যেমন মোহান্ধকার তেমনি তাহার উচ্চশিখরে ধর্মের নির্মলতম জ্যোতি— জানি যে, যেখানে মনুষ্যপ্রকৃতির বলশালিতাবশত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংঘর্ষ প্রচণ্ড সেইখানেই দেবগণের ভোগে বিশুদ্ধতম আধ্যাত্মিক অমৃত উন্মথিত হইয়া উঠে, তথাপি লোভ-হিংসার ভীষণ আন্দোলন এবং বিলাসলালসার নিয়ত চাঞ্চল্যের

দৃষ্টান্ত দেখিলে ক্ষণকালের জন্য দ্বিধা উপস্থিত হয়, মনে সন্দেহ জাগে যে, পাপ-পুণ্যের ভালো-মন্দের এইরূপ উত্তুঙ্গ তরঙ্গিত অসাম্য শ্রেয়, না অপাপের অমন্দের একটি নির্জীব সুবৃহৎ সমতল নিশ্চলতা শ্রেয়! শেষের দিকেই আমাদের অন্তরের আকর্ষণ— কারণ, বিরাট সংগ্রামের উপযোগী বল আমরা অন্তঃকরণের মধ্যে অনুভব করি না, ধর্ম এবং অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই সব-কটাকে একত্র চালনা করিবার মতো উদ্যম আমাদের নাই— আমরা সর্বপ্রকার দুরন্ত চেষ্টাকে নিবৃত্ত করিয়া সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করিবার প্রয়াসী। কিন্তু শাস্ত্রে যখন ভারতবর্ষকে দুর্গপ্রাচীরের মতো রক্ষা করিতে পারে না, পরজাতির সংঘাত যখন অনিবার্য, যখন লোভের নিকট হইতে স্বার্থরক্ষা এবং হিংসার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমরা বাধ্য, তখন মানবের মধ্যে যে-দানবটা আছে, সেটাকে সকালে সন্ধ্যায় আমিষ খাওয়াইয়া কিছু না হউক দ্বারের বাহিরেও প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখা সংগত। তাহাতে কিছু না হউক, বলশালী লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

কিন্তু হায়, ভারতবর্ষে দেব-দানবের যুদ্ধে দানবগুলো একেবারেই গেছে— দেবতারাও যে খুব সজীব আছেন, তাহা বোধ হয় না। অন্তত সর্বপ্রকার শঙ্কা ও দ্বন্দ্ব -শূন্য হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রাবণ ১৩০৫

সিরাজদ্দৌলা

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় -প্রণীত

স্কুলে যাঁহাদিগকে ইতিহাস মুখস্থ করিতে হইয়াছে তাঁহাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, ভারত-ইতিবৃত্তে ইংরাজ-শাসনকালের বিবরণ সর্বাপেক্ষা নীরস। তাহার একটা কারণ, এই বিবরণে মানবস্বভাবের লীলা পরিস্ফুট দেখা যায় না। গবর্নর আসিলেন, যুদ্ধ হইল, জয়পরাজয় হইল, পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল, গবর্নর চলিয়া গেলেন।

অবশ্য ব্যাপারটা সত্যই এমন সম্পূর্ণ হৃদয়সম্পর্কশূন্য কলের কাণ্ড নহে। ভারত-শতরঞ্চমঞ্চে সাদা ও কালো ঘরে নানা পক্ষে যে-সকল বিচিত্র চাল চালিতেছিলেন, তাহার মধ্যে ভুলভ্রান্তি-রাগদ্বেষ-লোভমোহের হাত ছিল না এমন নহে। কিন্তু রাজভক্তি ও পাঠ্যসমিতির প্রতি লক্ষ রাখিয়া লেখকদিগকে সংকীর্ণ সীমায় সভয়ে পদক্ষেপ করিতে হয়। সেইজন্য অন্তত বাংলায় রচিত ইতিহাসে ইংরাজশাসনের অধ্যায় অত্যন্ত শুষ্ক এবং শীর্ণ।

আরও একটা কথা আছে। মোগল-পাঠানের সময় প্রত্যেক সম্রাট স্বতন্ত্র প্রভুরূপে স্বেচ্ছামতে রাজ্যশাসন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছার আন্দোলনে ভারত-ইতিবৃত্তে পদে পদে রসবৈচিত্র্য তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজের ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের শাসন। তাহার মধ্যে হৃদয়ের লীলা অত্যন্ত গৌণ ব্যাপার। মানুষ নাই, রাজা নাই, কেবল একটা পলিসি অতি দীর্ঘ পথ দিয়া ডাক বসাইয়া চলিয়াছে, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর তাহার বাহক বদল হয় মাত্র।

সেই পলিসি কিরূপ সূক্ষ্ম জটিল সুদূরব্যাপী, এই মাকড়সাজালের সূত্রগুলি জিব্রল্টার ইজিপ্ট এডেন প্রভৃতি দেশদেশান্তর হইতে লম্বমান হইয়া কেমন করিয়া ভারতবর্ষকে আপাদমস্তক ছাঁকিয়া ধরিয়াছে তাহার বিবরণ আমাদের পক্ষে কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই— এবং সেই বিবরণ লায়াল সাহেবের ভারতসাম্রাজ্য গ্রন্থে যেমন সংক্ষেপে ও মনোরম আকারে বিবৃত হইয়াছে এমন আর-কোথাও দেখি নাই।

কিন্তু এই বিবরণ মানববুদ্ধির নৈপুণ্যব্যঞ্জক ঐতিহাসিক যন্ত্রতত্ত্ব— তাহা পাঠকের চিরকৌতুকাবহ ঐতিহাসিক হৃদয়তত্ত্ব নহে। পশ্চিমদেশের কল পূর্বদেশে কিরূপ পুতুলবাজি করাইতেছে তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ হাস্যরস কিঞ্চিৎ করুণরস এবং প্রভূত পরিমাণে বিস্ময়রস আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের সংঘর্ষে যে নাট্যরসভূয়িষ্ঠ সাহিত্যের উপাদান জন্মে ইহাতে তাহা স্বল্প।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে সেই ঐতিহাসিক উপন্যাস -রস, ইংরাজিতে যাহাকে রোম্যান্স বলে তাহা যথেষ্টপরিমাণে ছিল। তখন ইংরাজের স্বাভাবিক দূরদর্শী রাজ্যবিস্তারনীতির মধ্যেও ব্যক্তিগত স্বার্থলোভ রাগদ্বেষের লীলায় ইতিহাসকে চঞ্চল ও উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থে ঐতিহাসিক রহস্যের যেখানে যবনিকা উত্তোলন করিয়াছেন সেখানে মোগল-সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ প্রাসাদদ্বারে ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় অত্যন্ত দীনভাবে দণ্ডায়মান। তখন ভারতক্ষেত্রে সংহারশক্তি যতপ্রকার বিচিত্র দেশে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাধু শান্ত ও দরিদ্র বেশ ছিল ইংরাজের। মারাঠি অশ্বপৃষ্ঠে দিগ্‌দিগন্তরে কালানল জ্বালাইয়া ফিরিতেছিল, শিখ ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে আপন দুর্জয় শক্তিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিতেছিল, মোগল-সম্রাটের রাজপ্রতিনিধিগণ সেই-যুগান্তরের সন্ধ্যাকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রোহের রক্তধ্বজা আন্দোলন করিতেছিল, কেবল কয়েকজন ইংরাজ সওদাগর বাণিজ্যের বস্তা মাথায় করিয়া সম্রাটের প্রাসাদসোপানে প্রসাদচ্ছায়ায় অত্যন্ত বিনম্রভাবে আশ্রয় লইয়াছিল।

মাতামহ আলিবর্দির ক্রোড়ে নবাব-রাজহর্ম্যে সিরাজদ্দৌলা যখন শিশু, তখন ভাবী ইংরাজ-রাজমহিমাও কলিকাতায় সওদাগরের কুঠিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অসহায় শিশুলীলা যাপন করিতেছিল। উভয়ের মধ্যে একটি অদৃষ্ট বন্ধন বাঁধিয়া দিয়া ভবিতব্য আপন নিদারুণ কৌতুক গোপন করিয়া রাখিয়াছিল।

প্রমোদের মোহমত্ততায় এই প্রলয়নাট্যের আরম্ভ হইল। ভাগীরথীতটে হীরাঝিলের নিকুঞ্জবনে বিলাসিনীর কলকণ্ঠ এবং নর্তকীর নূপুরধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিল। লালসার লুব্ধহস্ত গৃহস্থের রুদ্ধগৃহের মধ্যেও প্রসারিত হইল।

এ দিকে নেপথ্যে মাঝে মাঝে বর্গিদলের অশ্বখুরধ্বনি শুনা যায়, অস্ত্রঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠে। তাহাদের আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য বৃদ্ধ আলিবর্দি দশ দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এই উৎপাতের সুযোগে ইংরাজ বণিক কাশিমবাজারে একটি দুর্গ ফাঁদিল এবং স্থানে স্থানে আত্মরক্ষার উপযোগী সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিল।

বণিকদের স্পর্ধাও বাড়িতে লাগিল। তাহারা দেশী-বিদেশী মহাজনদিগের নৌকা জাহাজ লুঠতরাজ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোম্পানির কর্মচারিগণ আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবসহ বিনাশুল্কে নিজ হিসাবে বাণিজ্য চালাইতে প্রবৃত্ত হইল।

এমন সময়ে সিরাজদ্দৌলা যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং ইংরাজের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিবার জন্য কঠিন শাসন বিস্তার করিলেন।

রাজমর্যাদাভিমানী নবাবের সহিত ধনলোলুপ বিদেশী বণিকের দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিল। এই দ্বন্দ্বে বণিক-পক্ষে গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। সিরাজদ্দৌলা যদিচ উন্নতচরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি এই দ্বন্দ্বের হীনতা-মিথ্যাচার-প্রতারণার উপরে তাঁহার সাহস ও সরলতা, বীর্য ও ক্ষমা রাজোচিত মহত্ত্বে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। তাই ম্যালিসন তাঁহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "সেই পরিণামদারুণ মহানাটকের প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে সিরাজদ্দৌলাই একমাত্র লোক যিনি প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন নাই।"

দ্বন্দ্বের আরম্ভটি পত্রযুগলসমন্বিত তরুর অঙ্কুরের ন্যায় ক্ষুদ্র ও সরল, কিন্তু ক্রমশ নানা লোক ও নানা মতলবের সমাবেশ হইয়া তাহা বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় বিস্তৃত ও জটিল হইয়া পড়িল।

নিপুণ সারথি যেমন এককালে বহু অশ্ব যোজনা করিয়া রথ চালনা করিতে পারে, অক্ষয়বাবু তেমনি প্রতিভাবলে এই বহুনায়কসংকুল জটিল দ্বন্দ্ববিবরণকে আরম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত সবলে অনিবার্যবেগে ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ভাষা যেরূপ উজ্জ্বল ও সরস, ঘটনাবিন্যাসও সেইরূপ সুসংগত, প্রমাণ-বিশ্লেষণও সেইরূপ সুনিপুণ। যেখানে ঘটনাসকল বিচিত্র এবং নানাভিমুখী, প্রমাণ-সকল বিক্ষিপ্ত এবং পদে পদে তর্কবিচারের অবতারণা আবশ্যক হইয়া পড়ে, সেখানে বিষয়টির সমগ্রতা সর্বত্র রক্ষা করিয়া তাহাকে ক্ষিপ্রগতিতে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া ক্ষমতাশালী লেখকের কাজ। বিশেষত প্রমাণের বিচারে গল্পের সূত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, কিন্তু সেই-সকল অনিবার্য বাধাসত্ত্বেও লেখক তাঁহার ইতিবৃত্তকে কাহিনীর ন্যায় মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন, এবং ইতিহাসের চিরাপরাধী অপবাদগ্রস্ত দুর্ভাগা সিরাজদ্দৌলার জন্য পাঠকের করুণা উদ্দীপন করিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

কেবল একটা বিষয়ে তিনি ইতিহাস-নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। গ্রন্থকার যদিচ সিরাজচরিত্রের কোনো দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ উদ্যম-সহকারে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। শান্তভাবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদৃঢ় প্রতিকূল সংস্কারের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া এবং প্রচলিত বিশ্বাসের অন্ধ অন্যায়পরতার দ্বারা পদে পদে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি স্বভাবতই এইরূপ বিচলিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সত্যের শান্তি নষ্ট হইয়াছে এবং পক্ষপাতের অমূলক আশঙ্কায় পাঠকের মনে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

২

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' পাঠ করিয়া কোনো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বজাতি সম্বন্ধে পরের নিকট হইতে নিন্দোক্তি শুনিলে ক্রোধ হইতেই পারে। সমূলক হইলেও।

কিন্তু আমাদের সহিত উক্ত পত্রসম্পাদকের কত প্রভেদ! আমাদিগকে বিদেশী-লিখিত নিন্দোক্তি বাধ্য হইয়া অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু অক্ষয়বাবুর সিরাজদ্দৌলা কোনো কালে সম্পাদক মহাশয়ের সন্তানবর্গের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত হইবার সম্ভাবনা দেখি না। বিশেষত অক্ষয়বাবু এই গ্রন্থ যখন বাংলায় রচনা করিয়াছেন তখন ইংরাজ পাঠককে ব্যথিত করিবার সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত হইয়াছে।

কিন্তু এই বাংলা রচনাতেই সমালোচক আক্রোশের কারণ আরও অধিক দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি আশঙ্কা করেন, ভাষানভিজ্ঞতাবশত যে-সকল বাঙালি পাঠকের নিকট মূল দলিল এবং ঐতিহাসিক প্রমাণসকল আয়ত্তাতীত, 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থ পাঠে ইংরাজদিগের আচরণের প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে।

কিন্তু ইহা ইতিহাস; যুক্তির দ্বারা প্রমাণের দ্বারা ইহাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া দেওয়া কঠিন নহে। এমন-কি, আইনের কোনো অভাবনীয় ব্যাখ্যায় ইতিহাস-সমেত ঐতিহাসিককেও লোপ করিয়া দেওয়া অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, তুলনায় কোন্‌টা গুরুতর— ইংরাজ লেখকগণ গল্পে প্রবন্ধে ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাচ্যজাতীয়দের প্রতি নানা আকারে যে নিন্দা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন, যাহা অধিকাংশ স্থলেই যুক্তিগত তথ্যগত নহে, জাতীয় সংস্কারগত— অধিকাংশ স্থলেই যাহার সুগভীর মূল কারণ স্পেক্‌টেটর যাহাকে বলিয়াছেন "The dislike for aliens"— ইহাই, অথবা বাংলা ইতিহাস যাহা শিক্ষিত বাঙালিদেরও বারো আনা লোক বাংলায় লিখিত বলিয়াই পড়িতে অনাদর করিবে, তাহা?

আমাদের প্রতি ইংরাজের যে ধারণা জন্মিয়া থাকে তাহার ফল প্রত্যক্ষ— কারণ, আমরা নিরুপায়ভাবে ইংরাজের হস্তগত। একে দুর্বল অধীন আজ্ঞাবহের প্রতি স্বভাবতই উপেক্ষা জন্মে এবং সেই উপেক্ষা সদ্‌বিচারের ব্যাঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না, তাহার পরে শিশুকাল হইতে ইংরাজসন্তান যে-সকল গ্রন্থ পাঠ করে তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বীভৎসা এবং বিভীষিকার উদ্রেক করিয়া দেয়। ভারতবর্ষের

ধর্ম, সমাজ এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে ভূয়োভূয় কাল্পনিক মিথ্যাবাদ ও অত্যুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ ইংরাজি গ্রন্থের পত্রসংখ্যার সহিত তুলিত হইলে বঙ্গসাহিত্যের ভালোমন্দ পাঠ্য-অপাঠ্য সমস্ত গ্রন্থ আপন ক্ষীণতাক্ষোভে লজ্জিত হইয়া উঠে।

ইংরাজ আমাদের ক্ষমতাশালী প্রভু। সেই ক্ষমতা ও প্রভাবের প্রত্যক্ষ আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক। এত অধিক যে, অন্যায় ও অত্যাচারও যদি ঘটে তথাপি তাহা দুর্বল ব্যক্তিদিগকে ভয়ে বিস্ময়ে এবং একপ্রকার অন্ধ আসক্তিতে অভিভূত করিয়া রাখে। অতএব দেড়শত বৎসর পূর্বে ইংরাজ বণিক তৎকালীন রাজস্থানীয়দের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া ইংরাজের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে থাকিবে এমন ভারতবাসী নাই। মুখে যাহাই বলি, কোনোদিন বিশেষ আঘাতের ক্ষোভে বিশেষ কারণে যেমনই তর্ক করি, ইংরাজের প্রবল প্রতাপের আকর্ষণ ছেদন করা আমাদের পক্ষে সহজ নহে।

অতএব যতদিন আমরা দুর্বল এবং ইংরাজ সবল ততদিন আমাদের মুখের নিন্দায় তাঁহাদের ক্ষতি নাই বলিলেই হয়, তাঁহাদের মুখের নিন্দা আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক। ততদিন আমাদের সংবাদপত্র কেবল তাঁহাদের ও তাঁহাদের মেমসাহেবদের কর্ণপীড়া উৎপাদন করে মাত্র এবং তাঁহাদের সংবাদপত্র আমাদের মর্মস্থানের উপর বন্দুকের গুলি বর্ষণ করে।

কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যে একটা অন্যায় আচরিত হয় বলিয়া আমরা তাহার অন্যায় প্রতিশোধ লইব ইহা সুযুক্তির কথা নহে— বিশেষত দুর্বলের পক্ষে সবলের অনুকরণ ভয়াবহ।

ইংরাজের অন্যায় নিন্দা 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তবে, এমন-একটা প্রসঙ্গের উত্থাপন করায় কী প্রয়োজন ছিল! সেই প্রয়োজনীয়তা সমালোচক ঠিকভাবে বুঝিবেন এবং যথার্থভাবে গ্রহণ করিবেন কি না সন্দেহ।

ঘাতপ্রতিঘাতের একটা স্বাভাবিক নিয়ম আছে। প্রাচ্য চরিত্র, প্রাচ্য শাসননীতি সম্বন্ধে ইংরাজি গ্রন্থে ছোটো-বড়ো স্পষ্ট-অস্পষ্ট, সংগত-অসংগত অজস্র কটূক্তি পাঠ করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের মনে যে-একটা অবমাননাজনিত ক্ষোভ জন্মিতে পারে এ কথা অল্প ইংরাজই কল্পনা করেন।

অথচ, প্রথম শিক্ষাকালে ইংরাজের গ্রন্থ আমরা বেদবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করিতাম। তাহা আমাদিগকে যতই ব্যথিত করুক তাহার যে প্রতিবাদ সম্ভবপর, তাহার যে প্রমাণ-আলোচনা আমাদের আয়ত্তগত এ কথা আমাদের বিশ্বাস হইত না। নীরবে নতশিরে আপনাদের প্রতি ধিক্‌কার-সহকারে সমস্ত লাঞ্ছনাকে সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞানে বহন

করিতে হইত।

এমন অবস্থায় আমাদের দেশের যে-কোনো কৃতী গুণী ক্ষমতাশালী লেখক সেই মানসিক বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন তিনি আমাদের দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাপাত্র।

তাহা ছাড়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে আমাদের ভাগে যে কেবলই কলঙ্ক সেটা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা এবং বিরুদ্ধ প্রমাণ আনয়ন করা আমাদের নতশির ক্ষত-হৃদয়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

অক্ষয়বাবু যে অন্ধকূপহত্যার সহিত গ্লেনকোর হত্যাকাণ্ড ও সিপাহিবিদ্রোহকালে অমৃতসরের নিদারুণ নিধন-ব্যাপারের তুলনা করিয়াছেন ইতিহাসবিবৃতিস্থলে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে এবং ইংরাজ সমালোচকের তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাতও সংগত হইতে পারে, কিন্তু আমরা ইহাকে নিরর্থক বলিতে পারি না। এইজন্য পারি না যে, যে-সকল সমূলক, অমূলক ও অতিরঞ্জিত বিবরণ পাঠ করিয়া প্রাচ্য-চরিত্রের নির্দয় বর্বরতায় ইংরাজ-সন্তানগণ বংশানুক্রমে কণ্টকিত হইয়া আসিতেছেন এবং উচ্চ ধর্মমঞ্চ হইতে আমাদের প্রতি ভর্ৎসনা উদ্যত করিয়া রাখিয়াছেন, অন্ধকূপহত্যা তাহার মধ্যে একটা প্রধান। সেই আঘাতের একটা প্রতিঘাত করিতে না পারিলে আত্মাবমাননার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। সুযোগ বুঝিয়া এ কথা বলিবার প্রলোভন আমরা সম্বরণ করিতে পারি না যে, শত্রুর প্রতি অন্ধ হিংস্রতা বিকৃত মানব-চরিত্রের পশুপ্রবৃত্তি, তাহা বিশেষরূপে প্রাচ্য-চরিত্রের নহে। সমালোচকের ধর্মমঞ্চ কেবল একা কোনো জাতির নহে। অবসর পাইলে আমরাও তাহার উপর চড়িয়া বিচারক মহাশয়ের কলঙ্ককালিমায় তর্জনী নির্দেশ করিতে পারি। খৃস্টানশাস্ত্রে বলে পরকে বিচার করিলে নিজেকেও বিচারাধীনে আসিতে হয়। স্বীকার করি ইহা ইতিহাসনীতি নহে, কিন্তু ইহা স্বভাবের নিয়ম।

অবশ্য ইহাও স্বভাবের নিয়ম যে, সবল দুর্বলকে যেমন স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তচিত্তে বিচার করিয়া থাকে, দুর্বল সবলকে তেমন করিয়া বিচার করিতে গেলে সবলের ভ্রূযুগল কুটিল এবং মুষ্টিযুগল উদ্যত হইয়া উঠিতে পারে। অক্ষয়বাবু হয়তো আদিম প্রকৃতির সেই রূঢ় নিয়মের অধীনে আসিয়াছেন কিন্তু বাংলা ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন সেজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন।

সমালোচক মহাশয় এ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, মুসলমান রাজ্যকালে এরূপ গ্রন্থ অক্ষয়বাবু লিখিতে পারিতেন না। হয়তো পারিতেন না। মুসলমান-রাজ্যকালে বিজিত হিন্দুগণ প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, রাজস্বসচিব প্রভৃতি

উচ্চতর রাজকার্যে অধিকারবান ছিলেন কিন্তু কোনো নবাবি আমলে উক্ত নবাবের দেড়শতাব্দ-পূর্ববর্তী ইতিহাস, বাহিরের প্রমাণ ও অন্তরের বিশ্বাস অনুসারে তাঁহারা হয়তো লিখিতে পারিতেন না। ইংরাজ-রাজত্বকালে অক্ষয়বাবু যদি সেই অধিকার লাভ করিয়া থাকেন তবে তাহা ইংরাজশাসনের গৌরব, কিন্তু তবে কেন সেই অধিকার ব্যবহারের জন্য সমালোচক মহাশয় চক্ষু রক্তবর্ণ করিতেছেন? এবং যদি সে অধিকার অক্ষয়বাবুর না থাকে, যদি তিনি আইনের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া থাকেন, তবে কেন সমালোচক মহাশয় অধিকারদানের ঔদার্য লইয়া গৌরব প্রকাশ করিতেছেন?

ফলত এই অধিকারের রেখা এতই ক্ষীণ সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে যে, যাঁহারা আইনের অণুবীক্ষণ নিপুণভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন তাঁহারাও সীমানির্ণয়ে মতভেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন— এমন অবস্থায় অন্তত আরও কিছুদিন এ-সম্বন্ধে কোনো কথা না বলাই ভালো।

শ্রাবণ ১৩০৫

ঐতিহাসিক চিত্র

আমরা 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক একখানি ঐতিহাসিক পত্রের মুদ্রিত প্রস্তাবনা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সম্পাদকতায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

এই প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে— 'আমাদের ইতিহাসের অনেক উপকরণ বিদেশীয় পরিব্রাজকগণের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ; তাহা বহুভাষায় লিখিত বলিয়া আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত ও অনাদৃত। মুসলমান বা ইউরোপীয় সমসাময়িক ইতিহাস লেখকগণ যে-সকল বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারও অদ্যাপি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। পুরাতন রাজবংশের কাগজপত্রের মধ্যে যে-সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে তাহার অনুসন্ধান লইবারও ব্যবস্থা দেখা যায় না।

'নানা ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণকাহিনী ও ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙালি রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই (এই প্রস্তাবিত পত্রের) মুখ্য উদ্দেশ্য।'

প্রাচীন গ্রীস রোম এবং আধুনিক প্রায় সকল সভ্যদেশেই ইতিহাসের প্রতি পক্ষপাত যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে ভারতবর্ষে কখনও তেমন ছিল না, ইহাতে বোধ করি দুই মত হইবে না। মান্ধাতার সমকালে আমাদের দেশে হয়তো সবই ছিল— তখন টেলিগ্রাফ, রেলগাড়ি, বেলুন, ম্যাক্‌সিম বন্দুক, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, এবং গ্যানো-রচিত প্রকৃতিবিজ্ঞান ছিল এমন অনেকে আভাস দিয়া থাকেন— কিন্তু, তখন ইতিহাস ছিল না। থাকিলে এমন-সকল কথা অল্প শুনা যাইত।

কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষে, যে সময়ে রাজপুতদের জনবন্ধন দৃঢ় ছিল তখন তাহাদের মধ্যে, উপযুক্ত মাটিতে উপযুক্ত চাষের মতো, ইতিহাস আপনি উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠিত।

আধুনিক ভারতে যখন হইতে মারাঠারা শিবাজীর প্রতিভাবলে এক জনসম্প্রদায়-রূপে বজ্রের মতো বাঁধিয়া গিয়াছিল এবং সেই বজ্র যখন জীর্ণ মোগল-সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ-বেগে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তখন হইতে তাহাদের ইতিহাস রচনার স্বাভাবিক কারণ ঘটে। তাহাদের 'বখর' নামধারী ইতিহাসগুলি প্রাচীন মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ।

শিখদের ধর্মগ্রন্থ এবং তাহাদের জনসম্প্রদায়গঠনের ইতিহাস একত্র সম্মিলিত। তাহাদের ধর্মমতে একেশ্বরবাদের মহান ঐক্য স্বভাবতই জাতীয় ঐক্যের কারণ হইয়াছিল। তাহারা যেমন ধর্মে এক, তেমনি কর্মে এক, তেমনি বলে এক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের ধর্মগ্রন্থ একই কালে পুরাণ এবং ইতিহাস।

আসল্ কথা এই যে, জীবের ধর্ম যেমন বর্তমানে জীবনরক্ষা এবং ভবিষ্যতে বংশানুক্রমে আপনাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা, তেমনি যখন বহুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন লোককে কোনো-একটি বিশেষ মত বা ভাব বা ধারাবাহিক স্মৃতিপরম্পরা এক জীবন দিয়া এক জীব করিয়া তোলে তখন সে বহিঃশত্রুর আক্রমণে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং ভবিষ্যৎ-অভিমুখে আপন ব্যক্তিত্ব, আপন সম্প্রদায়গত ঐক্যকে প্রেরণ করিবার জন্য যত্নবান হইয়া উঠে। ইতিহাস তাহার অন্যতম উপায়। এইজন্য কীটসমাজের পক্ষে বংশানুক্রমে প্রবালশৈলরচনার ন্যায় বিশেষ ঐক্যবদ্ধ জনসম্প্রদায়ের পক্ষে ইতিহাসরচনা প্রকৃতিগত ধর্ম।

শাস্ত্র পুরাণ জনসমাজের সম্পূর্ণ ইতিহাস না হইলেও তাহা ধর্মসমাজের ইতিহাস। ধর্মমণ্ডলী আপন ধর্মের মহত্ত্ব সৌন্দর্য প্রাচীনতা সাধুদৃষ্টান্তমালা পুরাণে শাস্ত্রে গ্রথিত করিয়া ধর্মমতপ্রবাহকে অখণ্ড আকারে কাল হইতে কালান্তরে সঞ্চারিত করিয়া রাখে এবং সেই পুরাতন ঐক্যসূত্রে আপন সম্প্রদায়কে দূরকালবদ্ধ বৃহৎ এবং সুদৃঢ় করিয়া তোলে।

এইজন্য ঘটনার তথ্যতা রক্ষা করা পুরাণের উদ্দেশ্য নহে। তাহা কেবল ধর্মমত-ধর্মবিশ্বাসের ইতিবৃত্ত। তাহার কাল্পনিক অমূলক উক্তিসকলও বর্ণিত ধর্মনীতির আদর্শকেই ব্যক্ত করে। সাময়িক ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ তাহার লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে না।

কিন্তু লোকেরা যখন কেবল ধর্মসম্প্রদায় বলিয়া নহে, জনসম্প্রদায় বলিয়া আপনার ঐক্য অনুভব করে, কেবল ধর্মরক্ষা নহে জনগত আত্মরক্ষা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া উঠে, তখন তাহারা কেবল বিশেষ মত বা বিশ্বাস নহে পরন্তু আপনাদের ক্রিয়াকলাপকীর্তি সুখদুঃখ ও সাময়িক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতে থাকে।

যখন আর্যগণ প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, যখন উদাসীন স্বাতন্ত্র্য তাঁহাদের আদর্শ ছিল না, যখন প্রাকৃতিক বাধা ও আদিম অনার্যের সহিত সংগ্রামে তাঁহাদিগকে সচেষ্ট দলবদ্ধ হইতে হইয়াছিল, যখন বীরপুরুষগণের স্মৃতি তাঁহাদিগকে বীর্যে উৎসাহিত করিত, তখন তাঁহাদের লিপিহীন সাহিত্যে ইতিহাসগাথার প্রাদুর্ভাব ছিল সন্দেহ নাই। সেই-সকল অতিপুরাতন খণ্ড-ইতিহাস বহুযুগ পরে মহাভারতে

ও রামায়ণে নানা বিকারসহকারে একত্র সংযোজিত হইয়াছিল।

কিন্তু প্রতিপদক্ষেপে যখন আর বন ছিল না এবং বনে যখন আর রাক্ষস ছিল না যক্ষরক্ষকিন্নরগণ যখন দুর্গম পর্বতে নির্বাসিত হইয়া জনপ্রবাদে ক্রমশ অলৌকিক আকার ধারণ করিল, অর্জুনবিজয়ী কিরাতেশ্বর ধূর্জটি যখন দেবপদে উত্তীর্ণ হইলেন, প্রতিকূল প্রকৃতি এবং মানবের সংঘাত যখন দূর হইয়া গেল, যখন সুদীর্ঘ শান্তিকালে সূর্যকরোত্তপ্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ সকলের প্রধান হইয়া আপন ঔদাস্যধর্মের বিপুলজাল হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত নিক্ষেপ করিল, তখন হইতে আর ইতিহাস রহিল না। ব্রাহ্মণের ধর্ম শত শত নব নব পুরাণে গ্রথিত হইতে লাগিল কিন্তু জনসংঘ ক্রমে শিথিলীভূত হইয়া কোথায় ছড়াইয়া পড়িল, তাহাদের আর কোনো কথাই নাই। অতীত হইতেও তাহারা বিচ্যুত হইল, ভবিষ্যতের সহিতও তাহাদের যোগ রহিল না।

আসল কথা, ঐক্যের ধর্ম প্রাণধর্মের ন্যায়। সে জড়ধর্মের ন্যায় কেবল একাংশে বদ্ধ থাকে না। সে যদি এক দিকে প্রবেশ লাভ করে তবে ক্রমে আর-এক দিকেও আপনার অধিকার বিস্তার করিতে থাকে। সে যদি দেশে ব্যাপ্ত হইতে পায় তবে কালেও ব্যাপ্ত হইতে চায়। সে যদি নিকট এবং দূরের মধ্যে বিচ্ছেদ পূরণ করিতে পারে তবে অতীত এবং ভবিষ্যতের সঙ্গেও আপন বিচ্ছিন্নতা দূর করিতে চেষ্টা করে।

এই অখণ্ডতার চেষ্টা এত প্রবল যে, অনেক সময়ে তাহা কল্পনার দ্বারা ইতিহাসের অভাব পূরণ করিয়া ইতিহাসকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। এইজন্যই সুদীর্ঘ কল্পনাজাল বিস্তার করিয়া রাজপুতগণ চন্দ্রসূর্যবংশের সহিত আপন সংযোগ সাধন করিয়াছিল।

আমরাও বর্ণ এবং কুল -মর্যাদা একটি সূক্ষ্ম সূত্রের মতো অনেকদিন হইতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছি। তাহার শ্রেণী-গোত্র-গাঁই-মেল সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত সাহিত্য ভাটেদের মুখে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা আমরা ভুলিতে দিতে পারি না। কারণ আমাদের সমাজে যে ঐক্য আছে তাহা প্রধানত বর্ণগত। সেই সূত্র আমরা স্মরণাতীত কাল হইতে টানিয়া আনিতে এবং অনন্ত ভবিষ্যতের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে চাই।

কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি জনগত ঐক্য থাকিত, যদি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া জয়ের গৌরব, পরাজয়ের লজ্জা, উন্নতির চেষ্টা আমরা এক বৃহৎ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিতাম, তবে সেই জনমণ্ডলী স্বভাবতই ঊর্ণনাভের মতো আপনার ইতিহাসতন্তু প্রসারিত করিয়া দূর-দূরান্তরে আপনাকে সংযুক্ত করিত। তাহা হইলে আমাদের দেশের ভাটেরা কেবল গাঁই-গোত্র-প্রবরের শ্লোক আওড়াইত না, কথকেরা কেবল পুরাণ ব্যাখ্যা করিত না, ইতিহাসগাথকেরা পূর্বকালের সহিত সুখদুঃখগৌরবের যোগ বংশানুক্রমে স্মরণ করাইয়া রাখিত।

এক্ষণে আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ এই যে, সম্প্রতি বঙ্গসাহিত্যে যে একটি ইতিহাস-উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সার্বজনীন সুলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তাহাকে আমরা আকস্মিক এবং ক্ষণস্থায়ী একটা বিশেষ ধরনের সংক্রামক রচনা-কণ্ডু বলিয়া স্থির করিতে পারি না। আজকাল সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষা এবং আন্দোলনের যে জীবনশক্তি নানা আকারে কার্য করিতেছে এই ইতিহাসক্ষুধা তাহারই একটি স্বাভাবিক ফল।

ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, কন্‌গ্রেস প্রভৃতির বিক্ষোভ যে আমাদের দেশে বাহ্যিক তাহা নহে। এক-এক সময়ে মনে আশঙ্কা জন্মে যে, রাজদরবারে প্রতিবৎসর একঘেয়ে দরখাস্ত পেশ করিবার এই যে-সকল বিপুল আয়োজন ইহা ব্যর্থ। কারণ, সরকারের নিকট ইহা প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারে নাই, এবং দেশের অন্তরের মধ্যেও ইহার স্থায়ী প্রভাব প্রবেশ করিতেছে না।

কিন্তু আমাদের অন্তরের মধ্যে শক্তিপুঞ্জ কেমন করিয়া অলক্ষ্যে কাজ করিতেছে তাহাই আমরা সর্বাপেক্ষা অল্প জানি। যখন অঙ্কুর বাহির হইয়া পড়ে তখনই বুঝিতে পারি, বাতাসে কখন বীজ উড়িয়া আসিয়া মনের উর্বর প্রদেশে স্থানলাভ করিয়াছিল। এই ইতিহাসবুভুক্ষা, ইহা একটি অঙ্কুর। বুঝিতেছি যে, কন্‌গ্রেস বৎসর বৎসর কেবল রাজপ্রাসাদে কতকগুলি বিফল দরখাস্ত বর্ষণ করে নাই, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে ক্রমশই ঘনিষ্ঠতর করিয়া আনিয়া আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে ভাবের বীজ বপন করিতেছে।

দেশব্যাপী বৃহৎ হৃৎস্পন্দন কিছুদিন হইতে আমরা যেন অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ব্যক্তিগত পল্লীগত বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের সুখদুঃখ, আমাদের মান-অপমান, আমাদের চিন্তা, আমাদের চেষ্টা ক্রমেই বৃহৎ পরিধি আশ্রয় করিতেছে। জড়ীভূতা অহল্যা রামচন্দ্রের স্পর্শে যেমন ভূমিতল হইতে মূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেইরূপ একেশ্বর ইংরাজশাসনের সংস্পর্শে আমাদের ভারতবর্ষ বিমিশ্র অস্পৃষ্ট বিচ্ছিন্ন জড়পুঞ্জমধ্য হইতে ক্রমশ এক মূর্তি গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে। জনহৃদয়ে সঞ্চরমাণ সেই-যে ঐক্যের বেগ, প্রাণের উচ্ছ্বাস, প্রীতির বন্ধনমুক্তি ও কর্তব্যের উদারতাজনিত আনন্দ, তাহাই আমাদের উদ্যমকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এখন আমরা বোম্বাই-মাদ্রাজ-পঞ্জাবকে যেমন নিকটে পাইতে চাই, তেমনি অতীত ভারতবর্ষকেও প্রত্যক্ষ করিতে চাহি। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া এক্ষণে আমরা দেশে এবং কালে এক রূপে এবং বিরাট রূপে আপনাকে উপলব্ধি করিতে উৎসুক। এখন আমরা মোগল-রাজত্বের মধ্য দিয়া পাঠান-রাজত্ব ভেদ করিয়া সেন-

বংশ পাল-বংশ গুপ্ত-বংশের জটিল অরণ্যমধ্যে পথ করিয়া পৌরাণিক কাল হইতে বৌদ্ধ কাল এবং বৌদ্ধ কাল হইতে বৈদিক কাল পর্যন্ত অখণ্ড আপনার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি। সেই মহৎ আবিষ্কারব্যাপারের নৌযাত্রায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' একটি অন্যতম তরণী। যে-সকল নির্ভীক নাবিক ইহাতে সমবেত হইয়াছেন ঈশ্বর তাঁহাদের আশীর্বাদ করুন, দেশের লোক তাঁহাদের সহায় হউন এবং বাধাবিঘ্ন ও নিরুৎসাহের মধ্যেও অনুরাগপ্রবৃত্ত মহৎ কর্তব্যসাধনের নিষ্কাম আনন্দ তাঁহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ না করুক।

এ কথা কেহ না মনে করেন, গৌরব অনুসন্ধানের জন্য পুরাবৃত্তের দুর্গম পথে প্রবেশ করিতে হইবে। সে দিকে গৌরব না থাকিতেও পারে— অনেক পরাভব, অনেক অবমাননা, অনেক পতন ও বিকারের মধ্য দিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস বহিয়া আসিয়াছে। অনেক স্থলে সেই একহাঁটু পঙ্কের ভিতর দিয়া আমাদিগকে হাঁটিতে হইবে। তবু আমাদিগকে এই পঙ্কিল জটিল বক্র পথের দিকে আকর্ষণ করিতেছে কে? জাতীয় আত্মশ্লাঘা নহে, স্বদেশের প্রতি নবজাগ্রত প্রেম। আমরা দেশকে প্রকৃতরূপে প্রত্যক্ষরূপে সম্পূর্ণরূপে জানিতে চাই— তাহার সমস্ত দুঃখদুর্দশাদুর্গতির মধ্যেও তাহাকে লক্ষ্য করিতে চাই— আপনাকে ভুলাইতে চাই না।

তথাপি আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ইতিহাসের পথ বাহিয়া ভারতবর্ষকে যদি আমরা সমগ্রভাবে দেখিতে পাই, আমাদের লজ্জা পাইবার কারণ ঘটিবে না। তাহা হইলে আমরা এমন একটি নিত্য আদর্শ লাভ করিব যাহা ভারতবর্ষের আদর্শ, যাহা সকল পরাভব ও অবমাননার ঊর্ধ্বে আপন উচ্চশির অম্লান রাখিতে পারিয়াছে।

গ্রীক ও রোমকেরা বীর জাতি ছিল, বিজয়ী জাতি ছিল, তাহারা বহুকাল নির্ভয়ে প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া দেশজয় ও দেশরক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা তাহাদের জাতীয় লক্ষ্য ও গৌরব ছিল। কিন্তু সেই দৃঢ় আদর্শ, সেই বহুকালের সফলতা ও মহদ্‌দৃষ্টান্ত তাহাদিগকে পতনের ও পরাভবের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।

ভারতবর্ষ নিজেকে যে পথে লইয়া গিয়াছিল তাহা কোনো কালেই দেশরক্ষা ও দেশজয়ের পথ নহে। অতএব বহিঃশত্রুর বাহুবলের নিকট ভারতবর্ষের যে পরাভব সে তাহার আত্ম-আদর্শের পরাভব নহে। অবশ্য বাহিরের উপপ্লবে, শক গ্রীক আরব মোগল ও ভারতবর্ষীয় অনার্যদের সংঘাতে ভারতবর্ষের তপোভঙ্গ হইয়াছিল; যে আদর্শের ঐক্য ক্রমশ অভিব্যক্ত হইয়া, বিক্ষিপ্ততা হইতে ক্রমশ সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ়

হইয়া হিন্দুজাতিকে একটি বিশেষ ভাবে ও গঠনে, শোভায় ও সামঞ্জস্যে সৃজন করিয়া তুলিতে পারিত, তাহা বারম্বার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি নানা বিচ্ছেদের মধ্য দিয়াও সেই মূলসূত্রটি অনুসরণ করিতে পারিলে হয়তো বুঝিতে পারিব বর্তমান য়ুরোপের আদর্শ-দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পরিমেয় নহে।

য়ুরোপের আদর্শ য়ুরোপকে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা আমরা কিছুই জানি না; তাহা যে স্থায়ী নহে, তাহার মধ্যে যে অনেক বিনাশের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ভারতবর্ষ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া শত্রুহস্তে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে— য়ুরোপ প্রবৃত্তিকে লালন করিয়া আত্মহত্যার উদ্‌যোগ করিতেছে। নিজদেশ এবং পরদেশের প্রতি আমাদের আসক্তি ছিল না বলিয়া বিদেশীর নিকট আমরা দেশকে বিসর্জন দিয়াছি— নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আসক্তি সযত্নে পোষণ করিয়া য়ুরোপ আজ কোন্ রক্তসমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! অস্ত্রে শস্ত্রে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া তুলিয়া তাহার এ কী বিকটমূর্তি! কী সন্দেহ ও কী আতঙ্কের সহিত য়ুরোপের প্রত্যেক রাজশক্তি পরস্পরের প্রতি ক্রূর কটাক্ষপাত করিতেছে! রাজমন্ত্রিগণ টিপিয়া টিপিয়া পরস্পরের মৃত্যুচাল চালিতেছে; রণতরীসকল মৃত্যুবাণে পরিপূর্ণ হইয়া পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে যমদৌত্যে বাহির হইয়াছে। আফ্রিকায় এসিয়ায় য়ুরোপের ক্ষুধিত লুব্ধগণ আসিয়া ধীরে ধীরে এক-এক পা বাড়াইয়া একটা থাবায় মাটি আক্রমণ করিতেছে এবং আর-একটা থাবা সম্মুখের লোলুপ অভ্যাগতের প্রতি উদ্যত করিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার হিংসা ও লোভে অদ্য পৃথিবীর চারি মহাদেশ ও দুই মহাসমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার মহাজনদের সহিত মজুরদের, বিলাসের সহিত দুর্ভিক্ষের, দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির সহিত সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ও নাইহিলিজ্‌মের দ্বন্দ্ব য়ুরোপের সর্বত্রই আসন্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তির প্রবলতা, প্রভুত্বের মত্ততা, স্বার্থের উত্তেজনা কোনো কালেই শান্তি ও পরিপূর্ণতায় লইয়া যাইতে পারে না, তাহার একটা প্রচণ্ড সংঘাত, একটা ভীষণ রক্তাক্ত পরিণাম আছেই। অতএব য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে চরম আদর্শ বিবেচনাপূর্বক তদ্দ্বারা ভারতবর্ষকে মাপিয়া খাটো করিয়া ক্ষোভ পাইবার হয়তো প্রয়োজন নাই। একটা কথা আছে, জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ।

যেমন করিয়াই হউক এখন ভারতবর্ষকে আর পরের চোখে দেখিয়া আমাদের সান্ত্বনা নাই। কারণ, ভারতবর্ষের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইয়া উঠে নাই তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা বাহির হইতে দেখিতাম; তখন আমরা পাঠান-রাজত্বের ইতিহাস মোগল-রাজত্বে পাঠ করিতাম। এখন সেই মোগল-

রাজত্ব পাঠান-রাজত্বের মধ্যে ভারতেরই ইতিহাস অনুসরণ করিতে চাহি। ঔদাসীন্য অথবা বিরাগের দ্বারা তাহা কখনও সাধ্য নহে। সেই সমগ্র ধারণা কেবল বিচার ও গবেষণার দ্বারাও হইতে পারে না; কল্পনা এবং সহানুভূতি আবশ্যক।

বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীকে এক করিতে ও মৃততথ্যগুলিতে জীবনসঞ্চার করিতে যখন কল্পনা ও সহানুভূতি নিতান্তই চাই তখন সে বিষয়ে আমরা পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। সংগ্রহকার্যে পরের সহায়তা লইতে আপত্তি নাই কিন্তু সৃজনকার্যে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হইলে পক্ষপাতের আশঙ্কা আছে, কিন্তু পক্ষপাত অপেক্ষা বিদ্বেষে ও সহানুভূতির অভাবে ইতিহাসকে ঢের বেশি বিকৃত করে। তাহা ছাড়া এক দেশের আদর্শ লইয়া আর-এক দেশে খাটাইবার প্রবৃত্তি বিদেশীর লেখনীমুখে আপনি আসিয়া পড়ে, তাহাতেও শুভ হয় না।

হউক বা না হউক, আমাদের ইতিহাসকে আমরা পরের হাত হইতে উদ্ধার করিব, আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীনদৃষ্টিতে দেখিব, সেই আনন্দের দিন আসিয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গকে লেথব্রিজ সাহেবের চটির মধ্য হইতে বাহির করিয়া ইতিহাসের উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিব; এখানে তাঁহারা নিজের চেষ্টায় সত্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভ্রমও সংগ্রহ করেন সেও আমাদের পক্ষে পরিলিখিত পরীক্ষাপুস্তকের মুখস্থ বিদ্যা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেয়, কারণ সেই স্বাধীন চেষ্টার উদ্যম আর-একদিন সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবে। কিন্তু পরদত্ত চোখের ঠুলি চিরদিন বাঁধারাস্তায় ঘুরিবার যতই উপযোগী হউক, পরীক্ষার ঘানি-বৃক্ষের তৈলনিষ্কাশনকল্পে যতই প্রয়োজনীয় হউক, নূতন সত্য অর্জন ও পুরাতন ভ্রম বিবর্জনের উদ্দেশে অব্যবহার্য।

"ঐতিহাসিক চিত্র" ভারত-ইতিহাসের বন্ধনমোচন-জন্য ধর্মযুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত। আশা করি ধর্ম তাহার সহায় হইয়া তাহাকে রক্ষা ও তাহার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিবেন। অথবা ধর্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।

ভাদ্র ১৩০৫

সাকার ও নিরাকার

সাকার ও নিরাকার -তত্ত্ব। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি. এ. -প্রণীত

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এরূপ তর্ক মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশে শুনা যায়। কিন্তু বর্তমান সমালোচ্য গ্রন্থে তর্কটা ততদূর স্থূল নহে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, ঈশ্বরকে সাকার ভাবে উপাসনা করিতে হইবে কি নিরাকার ভাবে।

কেহ কেহ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন যে, যে লোক নিরাকারে মন দিতে পারে না তাহার পক্ষে সাকার উপাসনা শ্রেয়।

কিন্তু গ্রন্থকার সেরূপ মাঝামাঝি কিছু বলিতে চাহেন না; তিনি বলেন, নিরাকার উপাসনা হইতেই পারে না। হয় সোঽহং ব্রহ্ম হইয়া যাও, নয় মূর্তিপূজা করো। তিনি কালাপাহাড়ের ঠিক বিপরীতমুখে সংহারকার্য শুরু করিয়াছেন। মূর্তিপূজাকে কেবল যে তিনি রক্ষা করিতে চান তাহা নহে, অমূর্ত পূজাকে তর্কের দ্বারা ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন।

কী হইতে পারে এবং কী হইতে পারে না, তর্ক অপেক্ষা ইতিহাসে তাহার প্রমাণ সহজে পাওয়া যায়। জল যে শীতে জমিয়া বরফ হইতে পারে উষ্ণপ্রধান দেশের রাজাকে তাহা তর্কে বুঝানো অসাধ্য; কিন্তু যদি একবার নড়িয়া হিমালয়প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া আসেন তবে এ সম্বন্ধে আর কথা থাকে না। লেখকমহাশয় সে রাস্তায় যান নাই। তিনি তর্কদ্বারা বলিয়াছেন, নিরাকার উপাসনা হইতেই পারে না।

মুসলমানেরা মূর্তিপূজা করে না। অথচ মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্ত কেহ নাই বা কখনও জন্মেন নাই এ কথা বিশ্বাস্য নহে। কী করিয়া যে তাঁহাদের ভক্তি-বৃত্তির পরিতৃপ্তি হয় তাহা যতীন্দ্রমোহনবাবু না বুঝিতে পারেন কিন্তু মূর্তিপূজা করিয়া নহে এ কথা নিশ্চয়।

নানক যে জগতের ভক্তশ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন নহেন তাহা কেহ সাহস করিয়া বলিবেন না। তিনি যে সোঽহংব্রহ্মবাদী ছিলেন না ইহাও নিঃসন্দেহ। তিনি যে প্রচলিত মূর্তি-উপাসনা বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া অমূর্ত উপাসনা প্রচার করিয়া-ছিলেন ইহার একটি বই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিশ্চয় তিনি নিরাকার উপাসনায় চরিতার্থতা লাভ করিতেন এবং মূর্তি-উপাসনায় তাহার ব্যাঘাত করিয়াছিল।

ব্রাহ্মদের মধ্যেও নিঃসন্দেহ কেহ না কেহ আছেন যিনি প্রবল ভক্তির আবেগ-

বশতই মূর্তিপূজা পরিহারপূর্বক সমস্ত জীবন নিরাকার উপাসনায় যাপন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে তিনি ভ্রান্ত হইতে পারেন কিন্তু তিনি যে ভক্ত তাহা কেবল তর্কে নহে আচরণে এবং বহু পীড়ন ও ত্যাগ স্বীকারে প্রমাণ করিয়াছেন।

এককালে ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা ছিল না, কিন্তু সেই দূরকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ উত্থাপন করা নিষ্ফল। আধুনিক কালের যে কয়টি উদাহরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে অন্তত এটুকু প্রমাণ হয় যে, কোনো কোনো ভক্ত মূর্তিপূজায় বিরক্ত হইয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছেন এবং অনেক ভক্ত পৃথিবীর অনেক দেশে অমূর্ত উপাসনায় ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার বলেন, মানিলাম তাঁহারা মূর্তিপূজা করেন না কিন্তু তাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন ইহা হইতেই পারে না। কারণ, 'জাতিবাচক ও গুণবাচক পদার্থের জ্ঞান সাকার' এবং 'জাতিবাচক ও গুণবাচক পদার্থ অবলম্বনে ঈশ্বরের জ্ঞান সাকার।'

এ কেমন তর্ক, যেমন— যদি আমি বলি ক বাঁকা পথে চলে এবং খ সোজা পথে চলে তুমি বলিতে পার খও সোজা পথে চলে না— কারণ সরল রেখা কাল্পনিক; পৃথিবীতে কোথাও সরল রেখা নাই।

কথাটা সত্য বটে কিন্তু তথাপি ইহা তর্কমাত্র। আমাদের ভাষা আমাদের মনকে একদম ছাড়াইয়া যাইতে পারে না; এবং আমাদের মন সীমাবদ্ধ। সুতরাং আমাদের ভাষা আপেক্ষিক। আমরা যাহাকে তীক্ষ্ণ বলি অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে তাহা ভোঁতা হইয়া পড়ে, আমরা যাহাকে নিটোল গোল বলি তাহাকে সহস্রগুণ বাড়াইয়া দেখিলে তাহার অসমানতা ধরা পড়িয়া যায়। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে নিরাকার উপাসনার মধ্যে যে আকারের আভাস পাওয়া যায় না তাহা বলিতে সাহস করি না।

তাই যদি হইল, তবে আমরা যাহাকে সাকার উপাসনা বলি তাহাতেই বা দোষ কী? নিরাকার যখন পূর্ণভাবে মনের অগম্য তখন তাঁহাকে সুগম আকারে পূজা করাই ভালো।

আকার আমাদের মনের পক্ষে সুগম হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া নিরাকার যে আকারের দ্বারা সুগম হইতে পারেন তাহা নহে— ঠিক তাহার উল্‌টা।

মনে করো, আমি সমুদ্রের ধারণা করিতে ইচ্ছা করি। সমুদ্র ক্রোশ-দুই তফাতে আছে। আমি তাহা দেখিতে যাত্রা করিবার সময় পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, সমুদ্র এতই বড়ো যে স্বচক্ষে দেখিয়াও তাহার ধারণা হইতে পারে না; কারণ আমাদের

দৃষ্টি সীমাবদ্ধ; আমরা সমুদ্রের মধ্যে যতই দূরে যাই, যতই প্রয়াস পাই, সমুদ্রকে ছোটো করিয়া দেখা ছাড়া উপায়ই নাই। অতএব তোমার অন্দরের মধ্যে একটি ছোটো ডোবা খুঁড়িয়া তাহাকে সমুদ্র বলিয়া কল্পনা করো।

কিন্তু দর্শনশক্তির সাধ্য সীমা দ্বারা সমুদ্র দেখিয়াও যদি সমুদ্রের ধারণা সম্পূর্ণ না হয় তবে ডোবা হইতে সমুদ্রের ধারণা অসম্ভব বলিলেও হয়।

অনন্ত আকাশ আমাদের কাছে মণ্ডলবদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া আকাশ দেখার সাধ মিটাইতে পারি না। আমি যতদূর পর্যন্ত দেখিতে পাই তাহা না দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।

এই যে প্রয়াস, বস্তুত ইহাই উপাসনা। আমার শেষ পর্যন্ত গিয়াও যখন তাঁহার শেষ পাই না, আমার মন যখন একাকী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হয়, যখন অগণ্য গ্রহচন্দ্রতারকার অনন্ত জটিল জ্যোতিররণ্যমধ্যে সে হারাইয়া যায়, এবং প্রভাতকরপ্লাবিত নীলাকাশের মহোচ্চদেশে বিলীনপ্রায় বিহঙ্গমের মতো উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে গাহিয়া উঠে, তুমি ভূমা, আমি তোমার শেষ পাইলাম না— তখন তাহাতেই সে কৃতার্থ হয়। সেই অন্ত না পাইয়াই তাহার সুখ, "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।"

টলেমির জগৎতন্ত্র আমাদের ধারণাযোগ্য। পৃথিবীকে মধ্যে রাখিয়া বদ্ধ কঠিন আকাশে জ্যোতিষ্কগণ সংকীর্ণ নিয়মে ঘুরিতেছে ইহা ঠিক মনুষ্যমনের আয়ত্তগম্য; কিন্তু অধুনা জ্যোতির্বিদ্যার বন্ধনমুক্তি হইয়াছে, সে সীমাবদ্ধ ধারণার বাহিরে অনন্ত রহস্যের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহার গৌরব বাড়িয়াছে। জগৎটা যে পৃথিবীর প্রাঙ্গণমাত্র নহে, পৃথিবী যে বিশ্বজগতে ধূলিকণার অধম এই সংবাদেই আমাদের কল্পনা প্রসারিত হইয়া যায়।

আমাদের উপাস্য দেবতাকেও যখন কেবলমাত্র মনুষ্যের গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে বদ্ধ করিয়া না দেখি, তাঁহাকে আমাদের ধারণার অতীত বলিয়া জানি, যখন ঋষিদের মুখে শুনি—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন

অর্থাৎ মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে সেই আনন্দকে সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি কাহা হইতেও ভয় পান না— তখনই আমাদের বদ্ধ হৃদয় মুক্তির আশ্বাস লাভ করিতে থাকে। বাক্য-মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে তিনি যে আমাদের পক্ষে শূন্যস্বরূপ তাহা নহে, তিনিই আনন্দ।

যাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া জানি তাঁহাকেই উপাসনা করি।

আমাদের সর্বোচ্চ উপাসনা তিনিই আকর্ষণ করেন যিনি এতবড়ো যে কোথাও তাঁহার শেষ নাই।

তর্কের মুখে বলা যাইতে পারে, তাঁহাকে জানিব বড়ো করিয়া, কিন্তু দেখিব ছোটো করিয়া। আপনাকে আপনি খণ্ডন করিয়া চলা কি সহজ কাজ? বিশেষত ইন্দ্রিয় প্রশ্রয় পাইলে সে মনের অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠে। সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্য যতটুকু না লইলে নয় তদপেক্ষা বেশি কর্তৃত্ব তাহার হাতে স্বেচ্ছাপূর্বক সমর্পণ করিলে মনের জড়ত্ব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

তাঁহাকে ছোটো করিয়াই বা দেখিব কেন?

নতুবা তাঁহাকে কিছু-একটা বলিয়া মনে হয় না, তিনি মন হইতে ক্রমশ স্খলিত হইয়া পড়েন।

কিন্তু মহৎ লক্ষ্যের জন্য ফাঁকি দিয়া সারিবার সংক্ষিপ্ত রাস্তা নাই। দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। সেই দুর্গম পথ এড়াইবার উপায় থাকিলে ভাবনা ছিল না। কষ্ট করিতে হয়, চেষ্টা করিতে হয় বলিয়া বিনা-প্রয়াসের পথ অবলম্বন করিলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যে লোক ধনী হইতে চায় সে সমস্তদিন খাটিয়া রাত্রি একটা পর্যন্ত হিসাব মিলাইয়া তবে শুইতে যায়; পায়ের উপর পা দিয়া তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। আর যে ঈশ্বরকে চায়, পথ দুর্গম বলিয়া সে কি খেলা করিয়া তাঁহাকে পাইবে?

আসল কথা, ঈশ্বরকে সকলে চায় না, পারমার্থিক দিকে স্বভাবতই অনেকের মন নাই। ধন ঐশ্বর্য সুখ সৌভাগ্য পাপক্ষয় এবং পুণ্য-অর্জনের দিকে লক্ষ রাখিয়া দেবসেবা ও ধর্মকর্ম করাকে জর্জ এলিয়ট other-worldliness নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ সেটা পারলৌকিক বৈষয়িকতা। তাহা আধ্যাত্মিকতা নহে। যাহাদের সেই দিকে লক্ষ সাকার-নিরাকার তাহাদের পক্ষে উপলক্ষমাত্র। সুতরাং হাতের কাছে যেটা থাকে, যাহাতে সুবিধা পায়, দশ জনে যেটা পরামর্শ দেয় তাহাই অবলম্বন করিয়া ধর্মচতুর লোক পুণ্যের খাতায় লাভের অঙ্ক জমা করিতে থাকেন। নিরাকার-বাদী এবং সাকারবাদী উভয় দলেই তেমন লোক ঢের আছে।

কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যাঁহাদের প্রকৃতির সহজ ধর্ম, সংসার যাঁহাদিগকে তৃপ্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না, যে দিকেই স্থাপন কর কম্পাসের কাঁটার মতো যাঁহাদের মন এক অনির্বচনীয় চুম্বক-আকর্ষণে অনন্তের দিকে আপনি ফিরিয়া দাঁড়ায়, জগদীশ্বরকে বাদ দিলে যাঁহাদের নিকট আমাদের স্থিতিগতি চিন্তাচেষ্টা ক্রিয়াকর্ম একেবারেই নিরর্থক এবং সমস্ত জগদ্‌ব্যাপার নিরবচ্ছিন্ন বিভীষিকা, যাঁহারা অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ আনন্দ উপভোগ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন যে,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, সাধনা তাঁহাদের নিকট দুঃসাধ্য নহে এবং তাঁহারা আপনাকে ভুলাইয়া এবং আপনার ঈশ্বরকে ভুলাইয়া সংক্ষেপে কার্যোদ্ধার করিতে চাহেন না—কারণ, নিত্যসাধনাতেই তাঁহাদের সুখ, নিয়তপ্রয়াসেই তাঁহাদের প্রকৃতির পরিতৃপ্তি।

সেইরূপ কোনো স্বভাবভক্ত যখন মূর্তিপূজার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি আপন অসামান্য প্রতিভাবলে মূর্তিকে অমূর্ত করিয়া দেখিতে পারেন; তাঁহার প্রত্যক্ষবর্তী কোনো সীমা তাঁহাকে অসীমের নিকট হইতে কাড়িয়া রাখিতে পারে না; তাঁহার চক্ষু যাহা দেখে তাঁহার মন তাহাকে বিদ্যুদ্‌বেগে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়; বাহিরের উপলক্ষ তাঁহার নিকট কেবল অভ্যাসক্রমে থাকে মাত্র, তাহাকে দূর করিবার কোনো প্রয়োজন হয় না; বিশ্বসংসারই তাঁহার নিকট রূপক, প্রতিমার তো কথাই নাই; যে লোকের অক্ষরজ্ঞান আছে সে যেমন অক্ষরকে অক্ষররূপে দেখে না, সে যেমন কাগজের উপর যখন 'গা' এবং 'ছ' দেখে তখন ক্ষুদ্র গয়ে আকার ছ দেখে না কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনশ্চক্ষে শাখাপল্লবিত বৃক্ষ দেখিতে পায়, তেমনি তিনি সম্মুখে স্থাপিত বস্তুকে দেখিয়াও দেখিতে পান না, মুহূর্তমধ্যে অন্তঃকরণে সেই অমূর্ত আনন্দ উপলব্ধি করেন, যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। কিন্তু এই ইন্দ্রজাল অসামান্য প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য। সে প্রতিভা চৈতন্যের ছিল, রামপ্রসাদ সেনের ছিল।

আবার প্রকৃতিভেদে কোনো কোনো স্বভাবভক্ত লোক প্রচলিত মূর্তি দ্বারা ঈশ্বরের পূজাকে আত্মাবমাননা এবং পরমাত্মাবমাননা বলিয়া অভ্যাসবন্ধন ছেদন করিয়া আত্মার মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করেন। মহম্মদ এবং নানক তাহার দৃষ্টান্ত।

কিন্তু আমাদের মধ্যে ভক্তির প্রতিভা খুব অল্প লোকেরই আছে। প্রত্যক্ষ সংসার-অরণ্য আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; মাঝে মাঝে তাহারই ডালপালার অবকাশ-পথে অধ্যাত্মরশ্মি দেবদূতের তর্জনীর মতো আমাদের অন্ধকারের একাংশ স্পর্শ করিয়া যায়। এখন, আমরা যদি মাঝে মাঝে সংসারের বনচ্ছায়াতলে কীটানুসন্ধান ছাড়িয়া দিয়া অনন্ত আকাশের মধ্যে মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে চাই তো কী করিব?

'যদি চাই' এ কথা বলিতে হইল। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি আমরা সকলে চাই না, ঈশ্বরকে উপলক্ষ করিয়া আর-কিছু চাই। কিন্তু যদি চাই তো কী করিব?

তবে, যাহাতে বাধা যাহাতে অন্ধকার তাহা সাবধানে এড়াইয়া যে দিকে আলোক আপনাকে প্রকাশ করে সেই পথ দিয়া পাখা মেলিয়া আকাশের দিকে উড়িতে

হইবে। সে পথ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের পথ ধূলির পথ পৃথিবীর পথ নহে, তাহা পদচিহ্ন-হীন বায়ুর পথ আলোকের পথ আকাশের পথ। আমাদের পক্ষে সেই এক পথ।

যাঁহারা মুক্তক্ষেত্রে বাস করেন তাঁহারা মাটিতে বসিয়াও আকাশের আলো পান, কিন্তু যাহারা জটিল প্রবৃত্তিজালে পরিবৃত হইয়া আছে তাহাদিগকে একেবারে পৃথিবীর দিক হইতে উড়িয়া বাহির হইয়া যাইতে হয়।

তাহা না করিয়া আমরা যদি আমাদেরই প্রবৃত্তি আমাদেরই আকৃতি দিয়া দেবতা গড়ি তবে তাহার মধ্যে মুক্তি কোন্‌খানে? যদি তাহাকে স্নান করাই, খাওয়াই, মশারিতে শোয়াই, এমন-কি তাহার জন্য নটী নিযুক্ত করিয়া রাখি তবে তাহার ফল কী হয়? তবে নিজের প্রবৃত্তিকেই দেবতা করিয়া পূজা করা হয়। আমাদের লোভ আমাদের হিংসা আমাদের ক্ষুদ্রতাকে দেবতারূপে অমর করিয়া রাখি। এই কারণেই কালীকে দস্যু আপন দস্যুবৃত্তির সহায় বলিয়া জ্ঞান করে, মিথ্যাশপথকারী আদালতে জয়লাভের জন্য পশু মানত করে, এমন-কি, যে-সকল অন্যায়-অবিচার-দুষ্কর্ম মনুষ্যলোকে, গর্হিত বলিয়া খ্যাত, দেবচরিত্রে তাহাও অনিন্দনীয় বলিয়া স্থান পায়।

আমাদের দেশের দেবতা কি কেবল মূর্তিতেই বদ্ধ যে রূপক ভাঙিয়া তাহার মধ্যে আমরা ভাবের স্বাধীনতা লাভ করিব? চার হাতকে যেন আমরা চারিদিক্‌বর্তী কর্মশীলতা বলিয়া মনে করিলাম কিন্তু পুরাণে উপপুরাণে যাত্রায় কথকতায় তাঁহার জন্মমৃত্যুবিবাহ-রাগদ্বেষ-সুখদুঃখ-দৈন্যদুর্বলতার বিচিত্র পাঠ ও পাঠান্তর হইতে মনকে মুক্ত করিব কেমন করিয়া? যতপ্রকার কৌশলে মানুষের মনকে ভুলাইয়া একেবারে আটেঘাটে বাঁধা যায় তাহার কোনোটারই ত্রুটি নাই। এবং এতপ্রকার সুদৃঢ় স্থূল শৃঙ্খলে চতুর্দিক হইতে সযত্ন বন্ধনকে গ্রন্থকার যদি তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মলাভের সোপান বলিয়া গণ্য করেন তবে মাছির পক্ষে মাকড়সার জালে পড়াই আকাশে উড়িবার উপায় মনে করা অসংগত হইবে না।

দেবচরিত্র সম্বন্ধে যে-সকল ভ্রষ্ট আদর্শের কল্পনা আমাদের দেশে শাখাপল্লবিত হইয়া চারি দিকে শিকড় বিস্তার করিয়াছে, তাহা কল্পনার বিকার; গ্রন্থকার বোধ করি তাহা হিন্দুসমাজের অধোগতির ফল বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সম্ভবত তাহা সংশোধন করিয়া লইতে উপদেশ দেন। সংশোধনের উপায় কী? তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন—

'সকল শাস্ত্রের মূলে এক বেদ, এক শ্রুতি— এক শ্রুতির দ্বারা সকল শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জন করিবার বিধি রহিয়াছে।'

বিধি রহিয়াছে কিন্তু কেহ কখনও চেষ্টা করিয়াছেন? পৌরাণিক ধর্মের সহিত

বৈদিক ধর্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া কোনো পণ্ডিত আজ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের একটা অখণ্ড আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কি ? ইহা কি সকলের দ্বারা সাধ্য ?

পৌরাণিক ধর্ম ঐতিহাসিক হিন্দুধর্ম। কালক্রমে হিন্দুর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বৈদিক আর্যগণ যে সমাজ, যে রীতি, যে বিশ্বাস, যে মানসিক প্রকৃতি লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন অনার্যদের সংঘর্ষে মিশ্রণে বিচিত্র অবস্থান্তরে স্বভাবের নিয়মে ক্রমশই তাহা রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই-সকল নব নব অভিব্যক্তি নব নব পুরাণে আপনাকে আকারবদ্ধ করিয়াছে। বেদ যে অবস্থার শাস্ত্র, পুরাণ সে অবস্থার শাস্ত্র নহে। সুতরাং বেদকেই যদি প্রমাণ বলিয়া মানা যায় তবে পুরাণকে ছাড়িতে হয় এবং পুরাণকে প্রবল বলিয়া মানিলে বেদকে পরিহার করিতে হয়। এমন-কি গ্রন্থকার নিজে বলিয়াছেন এবং ফলেও দেখা যায়, এক পুরাণকে মানিলে অন্য পুরাণের সহিত বিরোধ বাধিয়া উঠে। বর্তমানে হিন্দুসমাজ বেদকে মুখে মান্য করিয়া কাজের বেলা পুরাণকে অবলম্বন করে। উভয়ের মধ্যে যে কোনোপ্রকার অসামঞ্জস্য আছে সে তর্ক উত্থাপিত হয় না।

হিন্দুধর্মের এই ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কারণ পুরাণ কেবল সংস্কৃত ভাষায় বদ্ধ নহে, প্রচলিত ভাষাতেও রচিত হয়। মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। মেয়েদের ব্রতকথাও তাহার উদাহরণ। অন্নদামঙ্গলে যদিও পৌরাণিক শিবদুর্গার লীলা বর্ণিত, এবং যদিও তাহার রচয়িতা ভারতচন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তথাপি তাহার মধ্যে জনসাধারণ-প্রচলিত আধুনিক কল্পনাবিকার সহজেই স্থানলাভ করিয়াছে। কবিকঙ্কণচণ্ডীতেও তাহাই। হর-পার্বতীর কোন্দল, কোঁচ-নারীদের প্রতি শিবের আসক্তি, নিজের গাত্রমল দিয়া দুর্গা কর্তৃক খেলার পুত্তলি নির্মাণ ও তাহা হইতে গণেশের জন্ম এ-সমস্ত কাহিনী আধুনিক, প্রাদেশিক ; শ্রুতি ইহার মূল নহে, লোকের কল্পনাই ইহার মূল, দেবতাকে নিজ পরিমাপে নির্মাণচেষ্টাই ইহার প্রধান কারণ। ইহার মধ্যে উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক রূপক বাহির করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসাধ্য এবং অসাধারণ লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য।

সংক্ষেপে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, যে-সকল ভক্ত মহাপুরুষ চিরপ্রথাগত সাকার উপাসনা ত্যাগ করেন নাই তাঁহারা অসামান্য প্রতিভাবলে উদ্দীপ্ত ভাবাবেগে দৃষ্টিগোচরকেও দৃষ্টিপথাতীত করিয়া তুলিয়াছেন, বাধা তাঁহাদের নিকট বাধা নহে, র‍্যণ্ট্‌গেন-আবিষ্কৃত রশ্মির ন্যায় তাঁহাদের মন শতপ্রাচীরবেষ্টিত জড় আবরণ অনায়াসে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে বাধা যে বাধা

তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের মনের স্বাভাবিক জড়ত্ব জড়কে আশ্রয় করিতে চায়, তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা তাহাদিগকে অগ্রসর করে না, বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা সে ভক্তিসুখ লাভ করিতে পারে কিন্তু তাহা মুক্তিসুখ নহে।

সকল সম্প্রদায়েরই অধিকাংশ লোক সমাজের অনুসরণে অভ্যস্ত আচার পালন করেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকে নিয়মিত কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করেন এবং শব্দ শুনিয়া যান, এবং মূর্তি-উপাসকদের অনেকে বাহ্যিক পূজা ও মৌখিক জপ করিয়া কর্তব্য সারিয়া দেন। কিন্তু যাঁহারা কেবল সামাজিক ব্রাহ্ম নহেন আধ্যাত্মিক ব্রাহ্ম তাঁহাদের উপাসনাকে গ্রন্থকার যেরূপ উদ্‌ভ্রান্ত মনে করেন তাহা সেরূপ নহে।

আশ্বিন ১৩০৫

জুবেয়ার

রসজ্ঞ ম্যাথ্যু আর্নল্‌ড্‌ ফরাসি ভাবুক জুবেয়ারের সহিত ইংরাজি-পাঠকদের পরিচয় করাইয়া দেন।

যখন যাহা মনে আসিত জুবেয়ার তাহা লিখিতেন কিন্তু প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার রচনা প্রবন্ধরচনা নহে, এক-একটি ভাবকে স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। পদ্যে যেমন সনেট, যেমন শ্লোক, গদ্যে এই লেখাগুলি তেমনি।

জুবেয়ারের বাক্সে দেরাজে এই লেখা কাগজসকল স্তূপাকার হইয়া ছিল; তাঁহার মৃত্যুর চোদ্দ বৎসর পরে এগুলি ছাপা হয়; তাহাও পাঠকসাধারণের জন্য নহে, কেবল বাছা বাছা অল্প গুটিকয়েক সমজদারের জন্য।

জুবেয়ার নিজের রচনার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —

'আমি কেবল বপন করি, নির্মাণ বা পত্তন করি না।'

অর্থাৎ তিনি ভাবগুলিকে পরস্পর গাঁথিয়া কিছু-একটা বানাইয়া তোলেন না, সজীব ভাবের বীজকে এক-একটি করিয়া বপন করেন।

কোনো কোনো মনস্বী আপনার মনটিকে ফলের বাগান করিয়া রাখেন, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ চিন্তা ও চর্চার দ্বারা চিত্তকে আবৃত করেন, চতুর্দিকের নিত্যবীজবর্ষণ তাঁহাদের মনের মধ্যে অনাহূত ও অবারিত ভাবে স্থান পায় না।

জুবেয়ারের মন সে শ্রেণীর ছিল না, তাঁহার চিত্ত ফলের বাগান নহে, ফসলের ক্ষেত্র।

সে ফসল নানাবিধ। ধর্ম কর্ম কলারস সাহিত্য কত কী তাহার ঠিক নাই।

অগ্ত আমরা সাহিত্য ও রচনাকলা সম্বন্ধে এক অঞ্জলি সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।—

জুবেয়ার নিজের সম্বন্ধে বলেন—

'যাহা জানিবার ইচ্ছা ছিল তাহা শিক্ষা করিতে বৃদ্ধবয়সের প্রয়োজন হইল, কিন্তু যাহা জানিয়াছি তাহা ভালোরূপে প্রকাশ করিতে যৌবনের প্রয়োজন অনুভব করি।'

অর্থাৎ জ্ঞানের জন্য চেষ্টাজাত অভিজ্ঞতা চাই কিন্তু প্রকাশের জন্য নবীনতা আবশ্যক। লেখার বিষয়টির মধ্যে চিন্তার পরিচয় যত থাকে ততই তাহার গৌরব বাড়ে কিন্তু রচনার মধ্যে চেষ্টার লক্ষণ যত অল্প থাকিবে তাহার প্রকাশশক্তি ততই অধিক হইবে।

জুবেয়ার নিজে যে রচনাকলা অবলম্বন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বলিতেছেন,

'তোমরা কথার ধ্বনির দ্বারা যে ফল পাইতে চাও আমি কথার অর্থ-দ্বারা সেই ফল ইচ্ছা করি; তোমরা কথার প্রাচুর্যের দ্বারা যাহা চাও আমি কথার নির্বাচনের দ্বারা তাহা চাই, তোমরা কথার সংগতির দ্বারা যাহা চাও আমি কথার পৃথক্‌করণের দ্বারা তাহা লাভ করিতে প্রয়াসী। অথচ সংগতিও (harmony) ইচ্ছা করি কিন্তু তাহা স্বভাবসিদ্ধ যথাযোগ্য সংগতি; জোড়া-গাঁথার নৈপুণ্যমাত্রের দ্বারা যে সংগতি রচিত তাহা চাই না।'

বস্তুত প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ও লিপিকুশল লেখকের প্রভেদ এই যে, একজনের রচনায় সংগতি এমন স্বাভাবিক এবং অখণ্ড যে, তাহা বিশ্লেষণ করাই শক্ত, অপরের রচনায় সংগতি ইটের উপর ইটের ন্যায় গাঁথা ও সাজানো। প্রথমটি অজ্ঞাতসারে মুগ্ধ করে, দ্বিতীয়টি বিন্যাসনৈপুণ্যে বাহবা বলায়।

তর্কযুদ্ধ সম্বন্ধে জুবেয়ার বলেন—

'তর্কবিতর্কের প্রয়োজনীয়তা যতটুকু তাহার ঝঞ্ঝাট তদপেক্ষা অনেক বেশি। বিরোধমাত্রেই চিত্তকে বধির করিয়া ফেলে। যেখানে অন্য-সকলে বধির আমি সেখানে মূক।'

জুবেয়ার বলেন—

'কোনো কোনো চিত্ত নিজের জমিতে ফসল জন্মাইতে পারে না কিন্তু জমির উপরিভাগে যে সার ঢালা থাকে সেইখান হইতেই তাহার শস্য উঠে।'

আমাদের কথা মনে পড়ে। আজকাল আমাদের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইতেছে সে কি যথার্থ আমাদের মনের ভিতর হইতে— না, ইংরাজি য়ুনিবার্সিটি গাড়ি বোঝাই করিয়া আমাদের প্রকৃতির উপরিভাগে যে সার বিছাইয়া দিয়াছে সেইখান হইতে? এ সম্বন্ধে তর্ক তুলিলে বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে, অতএব মূক থাকাই ভালো।

সমালোচনা সম্বন্ধে জুবেয়ারের কতকগুলি মত নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

'পূর্বে যাহা সুখ দেয় নাই তাহাকে সুখকর করিয়া তোলা একপ্রকার নূতন সৃজন।'

এই সৃজনশক্তি সমালোচকের।

'লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য। লেখায় বিশুদ্ধ নিয়ম রক্ষা হইয়াছে কি না তাহারই খবরদারি করা তাহার ব্যাবসাগত কাজ বটে কিন্তু সেইটেই সবচেয়ে কম দরকারি।'

'অকরুণ সমালোচনায় রুচিকে পীড়িত করে এবং সকল দ্রব্যের স্বাদে বিষ মিশাইয়া দেয়।'

'যেখানে সৌজন্য এবং শান্তি নাই সেখানে প্রকৃত সাহিত্যই নাই। সমালোচনার মধ্যেও দাক্ষিণ্য থাকা উচিত— না থাকিলে তাহা যথার্থ সাহিত্যশ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না।'

'ব্যাবসাদার সমালোচকরা আকাটা হীরা বা খনি হইতে তোলা সোনার ঠিক দর যাচাই করিতে পারে না। ট্যাঁকশালের চলতি টাকাপয়সা লইয়াই তাহাদের কারবার। তাহাদের সমালোচনায় দাঁড়িপাল্লা আছে কিন্তু নিকষপাথর অথবা সোনা গলাইয়া দেখিবার মুচি নাই।'

'সাহিত্যের বিচারশক্তি অতি দীর্ঘকালে জন্মে এবং তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ অত্যন্ত বিলম্বে ঘটে।'

'রুচি লইয়া সমালোচকদের উন্মত্ত উৎসাহ, তাহাদের আক্রোশ-উত্তেজনা-উত্তাপ হাস্যকর। কাব্যসম্বন্ধে তাহারা এমনভাবে লেখে, কেবল ধর্মনীতি সম্বন্ধেই যাহা শোভা পায়। সাহিত্য মনোরাজ্যের জিনিস, তাহার সহিত মনোরাজ্যের আচার অনুসারেই চলা উচিত; রোষের উদ্দীপনা, পিত্তের দাহ সেখানে অসংগত।'

রচনাবিদ্যার সম্বন্ধে জুবেয়ারের উপদেশগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

'অধিক ঝোঁক দিয়া বলিবার চেষ্টাতেই নবীন লেখকদের লেখা নষ্ট হয়, যেমন অধিক চড়া করিয়া গাহিতে গেলে গলা খারাপ হইয়া যায়। বেগ কণ্ঠ ক্ষমতা এবং বুদ্ধির মিতপ্রয়োগ করিতে শেখাই রচনাবিদ্যা, এবং উৎকর্ষলাভের সেই একমাত্র রাস্তা।'

'সাহিত্যে মিতাচরণেই বড়ো লেখককে চেনা যায়। শৃঙ্খলা এবং অপ্রমত্ততা ব্যতীত প্রাজ্ঞতা হইতে পারে না এবং প্রাজ্ঞতা ব্যতীত মহত্ত্ব সম্ভবপর নহে।'

'ভালো করিয়া লিখিতে গেলে স্বাভাবিক অনায়াসতা এবং অভ্যস্ত আয়াসের প্রয়োজন।'

পূর্বোক্ত কথাটার তাৎপর্য এই যে, ভালো লেখকের লিখনশক্তিটা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই শক্তিটাকে বিচারের দ্বারা পদে পদে নিয়মিত করাটা অভ্যাসসাধ্য। সেই স্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে যখন এই অভ্যস্ত শক্তির সম্মিলন হয় তখনই যথার্থ ভালো লেখা বাহির হয়। ভালো লেখক অনায়াসেই লিখিতে পারে, কিন্তু লিখিবার জন্য পদে পদে আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে।

'প্রাচুর্যের ক্ষমতাটা লেখকের থাকা চাই, অথচ তাহা ব্যবহার করিয়া যেন সে অপরাধী না হয়। কারণ, কাগজ ধৈর্যশীল, পাঠক ধৈর্যশীল নহে; পাঠকদের ক্ষুধা অপেক্ষা পাঠকের মুখ মরিয়া যাওয়াকেই বেশি ভয় করা উচিত।'

'প্রতিভা মহৎকার্যের সূত্রপাত করে কিন্তু পরিশ্রম তাহা সমাধা করিয়া দেয়।'

'একটা ভালো বই রচনা করিতে তিনটি জিনিসের দরকার— ক্ষমতা, বিদ্যা এবং নৈপুণ্য। অর্থাৎ স্বভাব, পরিশ্রম এবং অভ্যাস।'

'লিখিবার সময় কল্পনা করিতে হইবে যেন বাছা বাছা কয়েকজন সুশিক্ষিত লোকের সম্মুখে উপস্থিত আছি অথচ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছি না।'

অর্থাৎ লেখা কেবল বাছা বাছা লোকের পড়িবার যোগ্য হইলে হইবে না; তাহা জনসাধারণের উপযুক্ত হইবে অথচ বিশিষ্ট মণ্ডলীর পছন্দসই হওয়া চাই।

'ভাবকে তখনই সম্পূর্ণ বলা যায় যখন তাহা হাতের কাছে প্রস্তুত হইয়া আসে— অর্থাৎ যখন তাহাকে যেমন ইচ্ছা পৃথক করিয়া লওয়া এবং যেখানে ইচ্ছা স্থাপন করা যায়।'

অধিকাংশ লোকেরই মনে অধিকাংশ ভাব জড়িত-মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তাহাদিগকে আকারবদ্ধ ও পৃথক করিয়া লইতে না পারিলে বিশেষ কাজে লাগানো যায় না। জুবেয়ার নিজে সর্বদাই তাঁহার ভাবগুলিকে আকার ও স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটিকে যেন ব্যবহারযোগ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার মনের প্রত্যেক ভাবের সহিত স্পষ্ট পরিচয় স্থাপন করাই তাঁহার কাজ ছিল।

'রচনাকালে, আমরা যে কী বলিতে চাই তাহা ঠিকটি জানি না, যতক্ষণ না বলিয়া ফেলি। বস্তুত কথাই ভাবকে সম্পূর্ণতা এবং অস্তিত্ব দান করে।'

'ভালো সাহিত্যগ্রন্থে উন্মত্ত করে না, মুগ্ধ করে।'

'যাহা বিস্ময়কর তাহা একবার মাত্র বিস্মিত করে, যাহা মনোহর তাহার মনোহারিতা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে।'

লেখার স্টাইল সম্বন্ধে জুবেয়ারের অনেকগুলি বচন আছে। কিন্তু স্টাইলকে বাংলায় কী বলিব ?

চলিত শব্দ হইলেই ভালো হয়, আলংকারিক পরিভাষা সর্বদা ব্যবহারযোগ্য হয় না। বাংলা 'ছাঁদ' কথা স্টাইলের মোটামুটি প্রতিশব্দ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার দোষ এই যে, শুধু ছাঁদ কথাটা ব্যবহার বাংলায় রীতি নহে। বলিবার ছাঁদ, লিখিবার ছাঁদ ইত্যাদি না বলিলে কথাটা সম্পূর্ণ হয় না।

সংস্কৃত ভাষায় স্থলবিশেষে রীতি শব্দে স্টাইল বুঝায়। যথা মাগধী রীতি বৈদর্ভী রীতি ইত্যাদি। মগধে যে বিশেষ স্টাইল প্রচলিত তাহাই মাগধী রীতি, বিদর্ভের প্রচলিত স্টাইল বৈদর্ভী রীতি। এইরূপ, ব্যক্তিবিশেষের লেখায় তাঁহার একটি স্বকীয় রীতিও থাকিতে পারে— য়ুরোপীয় অলংকারে সেই স্টাইলের বহুল আলোচনা দেখা যায়।

তথাপি অনুবাদ করিতে বসিলে দেখা যাইবে, রীতি অথবা ছাঁদ সর্বত্রই স্টাইলের প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ করিলে ভাষার প্রথা-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। একটি উদাহরণ দিই : জুবেয়ার বলিয়াছেন, স্টাইলের চালাকিতে ভুলিয়ো না (Beware of tricks of style)। এ স্থলে 'রীতি' অথবা 'ছাঁদ' ঠিক এ ভাবে চলে না। কিন্তু একটু ঘুরাইয়া বলিলে কাজ চালানো যায়— লেখার ছাঁদের মধ্যে যদি চালাকি থাকে তাহা দেখিয়া ভুলিয়ো না— অথবা, লিখনরীতির চাতুরীতে ভুলিয়ো না। কিন্তু যেখানে স্টাইল কথাটা ব্যবহার করিলে সুবিধা পাওয়া যাইবে সেখানে আমরা প্রতিশব্দ বসাইবার চেষ্টা করিব না।

'ডুসোল্ট্ বলেন, মনের অভ্যাস হইতে স্টাইলের উৎপত্তি। কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির অভ্যাস হইতে যাহাদের স্টাইল গঠিত তাহারাই ধন্য।'

অনুবাদে আমরা সাহস করিয়া 'প্রকৃতি' শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি। মূলে যে কথা আছে তাহার ইংরাজি প্রতিশব্দ 'soul'। এ স্থলে 'আত্মা' কথা বলা যায় না, তাহার দার্শনিক অর্থ অন্যপ্রকার। এখানে 'সোল' শব্দের অর্থ এই যে, তাহা মনের ন্যায় আংশিক নহে। মন তাহার অধীন। মন হৃদয় ও চরিত্র তাহার অঙ্গ— এই 'সোল' শব্দ দ্বারা মানসিক সমগ্রতা প্রকাশ হইতেছে। 'অন্তঃপ্রকৃতি' শব্দ দ্বারা যদি এই অখণ্ড মানসতন্ত্রের ঐক্যটি না বুঝায় তবে পাঠকেরা উপযুক্ত শব্দ ভাবিয়া লইবেন। জুবেয়ারের কথাটার তাৎপর্য এই যে, মন তো চিন্তার যন্ত্র, তাহার চালনা দ্বারা

কৌশল শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ মানুষটির দ্বারা যে স্টাইল গঠিত হয় তাহাই স্টাইল বটে। সেই লিখনরীতির মধ্যে কেবল চিন্তার প্রভাব নহে, সমস্ত মানুষের একটি সম্পূর্ণ প্রভাব পাওয়া যায়।

'মনের অভ্যাস হইতে নৈপুণ্য, প্রকৃতির অভ্যাস হইতে উৎকর্ষ এবং সম্পূর্ণতা।'

ভালো লেখকমাত্রেরই একটি স্বকীয় লিখনরীতি থাকে— কিন্তু বড়ো লেখকের সেই রীতিটি পরিষ্কার ধরা শক্ত। তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ অনির্দিষ্টতা থাকে। এ সম্বন্ধে জুবেয়ার লিখিতেছেন—

'যাহাদের ভাবনা ভাষাকে ছাড়াইয়া যায় না, যাহাদের দৃষ্টি ভাবনাকে অতিক্রম করে না, তাহাদেরই লিখনরীতি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট হইয়া থাকে।'

মহৎ লেখকদের ভাষা অপেক্ষা ভাবনা বড়ো হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের মানসদৃষ্টি ভাবনাকে অতিক্রম করিয়া যায়। তাঁহারা যুক্তিতর্কচিন্তাকে লঙ্ঘন করিয়া অনেক জিনিস সহজে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদের রীতি বাঁধাছাঁদা কাটাছাঁটা নহে, তাহার মধ্যে একটি অনির্দেশ্যতা অনির্বচনীয়তা থাকিয়া যায়।

'সুকথিত রচনার লক্ষণ এই যে, ঠিক যেটুকু আবশ্যক তার চেয়ে সে অধিক বলে অথচ যেটি বলিবার নিতান্ত সেইটিই বলে; ভালো লেখায় একই কালে প্রচুর এবং পরিমিত, ছোটো এবং বড়ো মিশ্রিত থাকে। এক কথায়, ইহার শব্দ সংক্ষিপ্ত, অর্থ অসীম।'

'অতিমাত্রায় ঠিকঠাকের ভাবটা ভালো নয়, কি সাহিত্যে কি আচরণে শ্রীরক্ষা করিয়া চলিতে গেলে এই নিয়ম স্মরণ রাখা আবশ্যক।'

'কোনো কোনো রচনারীতির একপ্রকার পরিষ্কার খোলাখুলি ভাব আছে, লেখকের মেজাজ হইতে তাহার জন্ম। সেটা আমাদের ভালো লাগিতে পারে কিন্তু সেটা চাইই চাই এমন কথা বলা যায় না।'

'ভল্টেয়ারের লেখার এই গুণ, কিন্তু পুরাতন লেখকদের রচনায় ইহা দেখা যায় না। অতুলনীয় গ্রীক সাহিত্যের স্টাইলে সত্য সুষমা এবং সৌহার্দ্য ছিল কিন্তু এই খোলাখুলি ভাবটা ছিল না। সৌন্দর্যের কতকগুলি মুখ্য উপাদানের সঙ্গে এই গুণটি ঠিক মিশে না। প্রবলতার সঙ্গে ইহা খাপ খাইতে পারে কিন্তু মর্যাদার সঙ্গে নহে। এই গুণটির মধ্যে একপ্রকার সাহসিকতা ও স্পর্ধা আছে বটে কিন্তু তেমনি ইহার মধ্যে একটা খাপছাড়া খিট্‌খিটে ভাবও আছে।'

'যাহারা অর্ধেক বুঝিয়াই সন্তুষ্ট হয় তাহারা অর্ধেক প্রকাশ করিয়াই খুশি থাকে; এমনি করিয়াই দ্রুত রচনার উৎপত্তি।'

'নবীন লেখকেরা মনটাকে টহলায় বেশি কিন্তু খোরাক অতি অল্পই দেয়।'

'কাচ যেমন, হয় দৃষ্টিকে সাহায্য করে নয় ঝাপসা করিয়া দেয়, কথা জিনিসটিও তেমনি।'

'একপ্রকারের কেতাবি স্টাইল আছে যাহার মধ্যে কাগজেরই গন্ধ পাওয়া যায়, বিশ্বসংসারের গন্ধ নাই; পদার্থের তত্ত্ব যাহার মধ্যে দুর্লভ, আছে কেবল লেখকিয়ানা।'

বই জিনিসটা ভাব- প্রকাশ ও রক্ষার একটা আধারমাত্র। কিন্তু অনেক সময় সে'ই নিজে সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। তখন সে বই পড়িয়া মনে হয় এ কেবল বই পড়িতেছি মাত্র, এগুলা কেবল লেখা। ভালো বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি; ভাব এবং তত্ত্বের সহিত মুখামুখি পরিচয় হয়, মধ্যস্থ পদার্থটা চোখেই পড়ে না।

'অনেক লেখক আপনার স্টাইলটাকে ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজাইতে থাকে, লোককে জানাইতে চায় তাহার কাছে সোনা আছে বটে।'

'দুর্লভ আশাতীত স্টাইল ভালো, যদি জোটে, কিন্তু আমি পছন্দ করি যে স্টাইলটিকে ঠিক প্রত্যাশা করা যায়।'

এ কথাটির মধ্যে গভীরতা আছে। অভাবনীয় আশাতিরিক্ত সৌন্দর্যকে ভালো বলিতেই হইবে, তথাপি তাহা মনের ভারস্বরূপ, তাহাতে শ্রান্তি আনে। কিন্তু যেখানে যেটি আশা করা যায় ঠিক সেইটি পাইলেই মন শান্তি ও স্বাস্থ্য অনুভব করে, তাহাকে বিস্ময় বা সুখের ধাক্কায় বারম্বার আহত করিয়া ক্ষুব্ধ করে না। বাংলায় যে বচন আছে, 'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো' তাহারও এই অর্থ। স্বস্তির মধ্যে যে শান্তি ও গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ধ্রুবত্ব আছে, সুখের মধ্যে তাহা নাই। এইজন্য বলা যাইতে পারে সুখ ভালো বটে কিন্তু স্বস্তি তাহার চেয়েও প্রার্থনীয়।

বৈশাখ ১৩০৮

পরিশিষ্ট

শোকসভা

বঙ্কিমের মৃত্যু উপলক্ষে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য যাঁহারা সাধারণ সভা আহ্বানের চেষ্টা করিয়াছেন, শুনা যায়, তাঁহারা একটি গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সে বাধা সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক এবং তাহা পূর্বে প্রত্যাশা করা যায় নাই।

যাঁহারা বঙ্কিমের বন্ধুত্বসম্পর্কে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন এমন অনেক খ্যাতনামা লোক সভাস্থলে শোকপ্রকাশ করা কৃত্রিম আড়ম্বর বলিয়া তাহাতে যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছেন এবং সভার উদ্‌যোগিগণকে ভর্ৎসনা করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। এরূপ বিয়োগ উপলক্ষে আপন অন্তরের আবেগ প্রকাশ্যে ব্যক্ত করাকে বোধ করি তাঁহারা পবিত্র শোকের অবমাননা বলিয়া জ্ঞান করেন।

বিশেষত আমাদের দেশে কখনও এমন প্রথা প্রচলিত ছিল না, সুতরাং শোকের দিনে একটা অনাবশ্যক বিদেশী আড়ম্বরে মাতিয়া ওঠা কিছু অশোভন এবং অসময়োচিত বলিয়া মনে হইতে পারে।

যখন আমাদের দেশের অনেক শ্রদ্ধেয় লোকের এইরূপ মত দেখা যাইতেছে তখন এ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক হইয়াছে।

সাধারণের হিতৈষী কোনো মহৎব্যক্তির মৃত্যু হইলে সাধারণ সভায় তাঁহার গুণের আলোচনা করিয়া তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্বক শোকপ্রকাশ করার মধ্যে ভালোমন্দ আর যাহাই থাক্, তাহা যে য়ুরোপীয়তা-নামক মহদ্দোষে দুষ্ট সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, য়ুরোপীয়দের সংসর্গবশতই হউক বা অন্যান্য নানা কারণে ইচ্ছাক্রমে ও অনিচ্ছাক্রমে আমাদের বাহ্য অবস্থা এবং মনের ভাবের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিতেছে; কেবল রাগ করিয়া অস্বীকার করিয়া বিরক্ত হইয়া তাহাকে লোপ করা যায় না। নূতন আবশ্যকের জন্য নূতন উপায়গুলি অনভ্যাসবশত প্রথম-প্রথম যদি-বা কাহারও চক্ষে অপরিচিত অপ্রিয় বলিয়া বোধ হয় তথাপি বিবেচক ব্যক্তি ভালোরূপ বিচার না করিয়া তাহার নিন্দা করেন না।

সহৃদয় লোকের নিকট কৃত্রিমতা অতিশয় অসহ্য হইয়া থাকে এ কথা সর্বজন বিদিত। কিন্তু কৃত্রিমতার অনেক প্রকারভেদ আছে। একপ্রকার কৃত্রিমতা ভিত্তি-স্বরূপে সমাজকে ধারণ করিয়া রাখে, আর-একপ্রকার কৃত্রিমতা কীটের স্বরূপে সমাজকে জীর্ণ করিয়া ফেলে।

সমাজের প্রতি আমাদের যে-সকল কর্তব্য আছে তাহা পালন করিতে গেলেই কথঞ্চিৎ কৃত্রিমতা অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ প্রত্যেকেই যদি নিজের রুচি ও হৃদয়াবেগের পরিমাণ অনুসারে স্বরচিত নিয়মে সামাজিক কর্তব্য পালন করে তবে আর উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা থাকে না। সে স্থলে সর্বজনসম্মত একটা বাঁধা নিয়ম আশ্রয় করিতে হয়। যেমন সৃষ্টিকর্তা এই পৃথিবীকে কেবল বিশুদ্ধ ভাবরূপে রাখিয়া দেন নাই কিন্তু ভাবকে ভূরিপরিমাণ ধূলিরাশি দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, তেমনি, যাহা-কিছু কেবলমাত্র একাকীর নহে, যাহাকেই সর্বসাধারণের সেব্য এবং যোগ্য করিতে হইবে, তাহাকেই অনেকটা জড় কৃত্রিমতার দ্বারা দৃঢ় আকারবদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। অরণ্যের অকৃত্রিম সৌন্দর্য সহৃদয় কবিগণ যতই ভালো বলুন, কৃত্রিম ইষ্টককাষ্ঠ রচিত মহানগর লোকসমাজের বাসের পক্ষে যে তদপেক্ষা অনেকাংশে উপযোগী তাহা অস্বীকার করিবার কারণ দেখি না। তরুর প্রত্যেক অংশ সজীব এবং স্বতোবর্ধিত, তাহার শোভা হৃদয়তৃপ্তিকর, তথাপি মনুষ্য আপন সনাতন পূর্বপুরুষ শাখামৃগের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ না করিয়া স্বহস্তরচিত অট্টালিকায় আশ্রয়গ্রহণপূর্বক যথার্থ মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিয়াছে।

যে-সকল ভাব প্রধানত নিজের, যেখানে বহিঃসমাজের কোনো প্রবেশাধিকার নাই, যেখানে মনুষ্যের হৃদয়ের স্বাধীনতা আছে, সেখানে কৃত্রিমতা দোষাবহ। কিন্তু মনুষ্যসমাজ এতই জটিল যে, কতটুকু আমার একাকীর এবং কতখানি বাহিরের সমাজের তাহার সীমানির্ণয় অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়ে এবং অনেক সময় বাধ্য হইয়া আমার নিজস্ব অধিকারের মধ্য দিয়াও সমাজ-মুনিসিপ্যালিটির জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দিতে হয়।

একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। সহজেই মনে হইতে পারে, পিতৃশোক সন্তানের নিজের। সমাজের সে সম্বন্ধে আইন বাঁধিবার কোনো অধিকার নাই। সকল সন্তান সমান নহে, সকল সন্তানের শোক সমান নহে, এবং মনের প্রকৃতি অনুসারে শোক-প্রকাশের ভিন্ন উপায়ই স্বাভাবিক, তথাপি সমাজ আসিয়া বলে, তোমার শোক তোমারই থাক্, অথবা না থাকে যদি সে সম্বন্ধেও কোনো প্রশ্নোত্তরের আবশ্যক নাই, কিন্তু শোকপ্রকাশের আমি যে বিধি করিয়া দিয়াছি, সৎ এবং অসৎ, গুরুশোকাতুর এবং স্বল্পশোকাতুর, সকলকেই তাহা পালন করিতে হইবে। পিতৃবিয়োগে শোক পাওয়া বা না পাওয়া লইয়া কথা নহে, সমাজ বলে, আমার নিকট শোকপ্রকাশ করিতে তুমি বাধ্য এবং তাহাও আমার নিয়মে করিতে হইবে।

কেন করিতে হইবে? কারণ, পিতার প্রতি ভক্তি সমাজের মঙ্গলের পক্ষে একান্ত

আবশ্যক। যদি মৃত্যুর ন্যায় এমন গুরুতর ঘটনাতেও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারে পিতৃভক্তির অভাব প্রকাশ পায় অথবা সাধারণের নিকট সে ভক্তি গোপন থাকে তবে সেই দৃষ্টান্ত সমাজের মূলে গিয়া আঘাত করে। সে স্থলে আত্মরক্ষার্থে ব্যক্তিগত শোক এবং ভক্তি-প্রকাশকেও সমাজ নিয়মের দ্বারা বাঁধিয়া দিতে বাধ্য হয়। এবং সর্বসাধারণের জন্য যে নিয়ম বাঁধিতে হয় তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের পরিমাপ কখনোই রক্ষিত হইতে পারে না। এইজন্য অকৃত্রিম প্রবল শোকের পক্ষে সাধারণ নিয়ম অনেক সময় কঠিন পীড়াদায়ক হইতে পারে তথাপি সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে গুরুতর শোকের সময়ও অনুষ্ঠানবিধির প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সযত্নে রক্ষা করিয়া চলিতে হয়।

সকলেই স্বীকার করিবেন, ঈশ্বরের সহিত ভক্তের সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা নিগূঢ় সম্বন্ধ। তাহা দেশকালে বিচ্ছিন্ন নহে। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র স্বামী কেহই আমাদের চিরদিনের নহে এরূপ বৈরাগ্যসংগীত ভারতবর্ষের পথে পথে ধ্বনিত হইয়া থাকে— অতএব যাহাদের সহিত কেবল আমাদের ইহজীবনের সামাজিক সম্পর্ক, সমাজ তাহাদের সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বপ্রকার নিয়মের দ্বারা বাধ্য করিতে পারে, কিন্তু যাঁহার সহিত আমাদের অনন্তকালের ঘনিষ্ঠ যোগ, তাঁহাতে-আমাতে স্বতন্ত্র স্বাধীন সম্বন্ধ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের সমাজ তাহাতেও আমাদের স্বাধীনতা দেয় নাই। ঈশ্বরকে কী মূর্তিতে কী ভাবে কী উপায়ে পূজা করিতে হইবে তাহা কেবল উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অনুশাসনের দ্বারা বদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কোন্ ফুল উপহার দিতে হইবে এবং কোন্ ফুল দিতে হইবে না তাহাও তাহার আদেশ অনুসারে পালন করিতে হইবে। যে মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিতে হইবে তাহা না বুঝিলেও ক্ষতি নাই কিন্তু নিজের হৃদয়ের অনুবর্তী হইয়া সে মন্ত্রের পরিবর্তন করিলে চলিবে না। অতএব, আমাদের জীবনের যে অংশ একেবারে অন্তরতম, যাহা সমস্ত সমাজ এবং সংসারের অতীত সেই অন্তর্যামী পুরুষের উদ্দেশে একান্তভাবে উৎসর্গীকৃত, সাধারণ-মঙ্গলের উপলক্ষ করিয়া সমাজ সেখানেও আপনার সংকীর্ণ শাসন স্থাপন করিয়াছে।

সর্বত্রই সমাজের অপ্রতিহত ক্ষমতা ভালো কি মন্দ সে তর্ক এখানে উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক। আমি দেখাইতে চাই যে, ভ্রমক্রমেই হউক বা সুবিচারপূর্বকই হউক, সমাজ যেখানেই আবশ্যক বোধ করিয়াছে সেখানে ব্যক্তিগত হৃদয়ের ভাবকে নিজের বিধি অনুসারে প্রকাশ করিতে সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে বাধ্য করিয়াছে। তাহাতে সমাজের অনেক কার্য সরল হইয়া আসে এবং তাহার অনেক সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়।

আমাদের সমাজ গার্হস্থ্যপ্রধান সমাজ। পিতামাতা এবং গৃহের কর্তৃস্থানীয়

ব্যক্তিদিগের প্রতি অক্ষুণ্ণ ভক্তি ও নির্ভর এই সমাজের প্রধান বন্ধন— এই কারণে গুরুজনের বিয়োগে শোকপ্রকাশ কেবল ব্যক্তিগত নহে, তাহা সমাজগত নিয়মের অধীন। এ সমাজ অনাবশ্যকবোধে পুত্রশোকের প্রতি কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই।

সম্প্রতি এই গার্হস্থ্যপ্রধান সমাজের কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা নূতন বন্যার জল প্রবেশ করিয়াছে। তাহার নাম পাব্লিক।

পদার্থটিও নূতন, তাহার নামও নূতন। বাংলা ভাষায় উহার অনুবাদ অসম্ভব। সুতরাং পাব্লিক শব্দ এবং তাহার বিপরীতার্থক প্রাইভেট শব্দ বাংলায় প্রচলিত হইয়াছে, কেবল এখনও জাতে উঠিয়া সাহিত্য-সভায় স্থান পায় নাই; তাহাতে তাহাদের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সাহিত্যেরই সমূহ অসুবিধা। যখন কথাটা বলিবার দরকার হয় তখন শব্দটা কোনোমতে উচ্চারণ না করিয়া ভাবে ভঙ্গিতে ইশারায় ইঙ্গিতে সাধু সাহিত্যকে বহু কষ্টে কাজ চালাইতে হয়। কিন্তু এই বিদেশী শব্দটা যখন সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে তখন আর এ-প্রকার দুরূহ ব্যায়ামের আবশ্যক দেখি না।

এক্ষণে আমাদের সমাজে যখন, কেবল গৃহ নহে, পাব্লিকের অস্তিত্বও ক্রমশ দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে, তখন এখানে ক্রমে ক্রমে এক-একটি করিয়া পাব্লিক-কর্তব্যের আবির্ভাবও অবশ্যম্ভাবী।

যেমন আমাদের দেশে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক পিতৃহীন ব্যক্তির পিতৃশোক ব্যক্ত করা প্রকাশ্য কর্তব্যস্বরূপে গণ্য হয় তেমনি পাব্লিকের হিতৈষী কোনো মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রকাশ্য সভায় শোকজ্ঞাপন একটা সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। গার্হস্থ্যপ্রধান সমাজে প্রায় প্রত্যেক পিতাই বীর। তাঁহাদিগকে বিচিত্র কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে হয় এবং সমস্ত পরিবারের জন্য পদে পদে ত্যাগস্বীকার করিয়া আত্মসুখ বিসর্জনপূর্বক চলিতে হয়। যাহাদের হিতের জন্য তাঁহারা ধৈর্যের সহিত বীর্যসহকারে আমৃত্যুকাল সংসারের কঠিন কর্তব্য-সকল সাবধানে পালন করিয়া চলেন তাহারা সর্বসমক্ষে সেই আত্মসুখে উদাসীন হিতব্রত গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিবে ইহা সমাজের শাসন। তেমনি, যাঁহারা কেবল আপনার ঘরের জন্য নহে, পরন্তু পাব্লিকের হিতের জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, মৃত্যুর পরে তাঁহাদের প্রতি প্রকাশ্য ভক্তি স্বীকার করা কি পাব্লিকের কর্তব্য নহে? এবং প্রকাশ্যে ভক্তি স্বীকার করিতে গেলেই কি ব্যক্তিগত শোককে সংযমে আনা আবশ্যক হয় না? এবং একজন বিশেষ বন্ধু রুদ্ধদ্বার গৃহের

মধ্যে যেরূপ ভাবে শোকোচ্ছ্বাসকে মুক্ত করিয়া থাকেন সাধারণের নিকট কি কখনও সেরূপ শোকপ্রকাশ প্রত্যাশা করা যায়? এবং সাধারণের পক্ষে সেরূপ শোক সম্ভব নহে বলিয়াই কি সাধারণ শোকের কোনো মূল্য নাই এবং তাহা নিন্দনীয়?

এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, আমাদের দেশের পাব্লিক আমাদের দেশীয় মহাত্মা লোকের বিয়োগে যথোচিত শোক অনুভব করে না। আমাদের এই অল্পবয়স্ক পাব্লিক অনেকটা বালক-স্বভাব। সে আপনার হিতৈষীদিগকে ভালো করিয়া চেনে না, যে উপকারগুলি পায় তাহার সম্পূর্ণ মূল্য বুঝে না, বন্ধুদিগকে অতিশীঘ্রই বিস্মৃত হয় এবং মনে করে আমি কেবল গ্রহণ করিব মাত্র কিন্তু তাহার পরিবর্তে আমার কোনো কর্তব্য নাই।

আমি বলি, এইরূপ পাব্লিকেরই শিক্ষা আবশ্যক এবং সভা আহ্বান ও সেই সভায় আলোচনাই শিক্ষার প্রধান উপায়। যাঁহারা চিন্তাশীল সহৃদয় ভাবুক ব্যক্তি তাঁহারা যদি লোকহিতৈষী মহোদয় ব্যক্তিদিগের বিয়োগশোককে নিজের হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া দেন, তাহাকে যদি সাধারণ শোকের উদার বৃহত্ত্ব দান না করেন, তাঁহারা যদি সাধারণকে ক্ষুদ্র ও চপল বলিয়া ঘৃণা করিয়া দেশের বড়ো বড়ো ঘটনার সময় শিক্ষাদানের অবসরকে অবহেলা করেন, এমন-কি, যখন দেশের লোক সুসময়ে দুঃসময়ে তাঁহাদের দ্বারে গিয়া সমাগত হয় তখন বিমুখ হইয়া তাহাদিগকে নিরাশ ও নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন এবং সেই তিরস্কৃত সম্প্রদায় নিজের স্বল্প বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে তাঁহাদের বিনা সাহায্যে যাহা-কিছু করে তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া ধিক্‌কার করেন, তবে তাঁহারা আমাদের বর্তমান সমাজকে বর্তমানকালোপযোগী একটি প্রধান শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকেন।

বিশেষত আমাদের দেশে সাহিত্য-সমাজ নাই এবং সমাজের মধ্যে সাহিত্যের চর্চা নাই। য়ুরোপে যেরূপভাবে সামাজিকতার চর্চা হয় তাহাতে যশস্বী লোকেরা নানা উপলক্ষে নানা সভায় উপস্থিত হন। তাঁহারা কেবলমাত্র আপন পরিবার এবং গুটিকতক বন্ধুর নিকটেই প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত নহেন। তাঁহারা নিয়তই সাধারণের সমক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা স্বদেশীয় নরনারীর নিকটবর্তী, সম্মুখবর্তী, দৃষ্টিগোচর। এইজন্য তাঁহারা যখন লোকান্তরিত হন তখন তাঁহাদের মৃত্যুর ছায়া গোধূলির অন্ধকারের মতো সমস্ত দেশের উপর আসিয়া পড়ে। তাঁহাদের বিচ্ছেদজনিত অভাব সমাজের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হইতে থাকে।

আমাদের সমাজ সেরূপ ঘন নহে। কর্তব্যপরম্পরায় আকৃষ্ট হইয়া পরিবারের বাহিরে বিচরণ করিতে কেহ আমাদিগকে বাধ্য করে না। এবং আমাদের বহিঃসমাজে

রমণীদের স্থান না থাকাতে সেখানে সামাজিকতা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশের বড়োলোকেরা আপন ঘরের বাহিরে যথেষ্ট এবং যথার্থ -রূপে পরিচিত ও নানা সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে পারেন না। তাঁহারা সর্বদাই অন্তরালে থাকেন।

মানুষকে বাদ দিয়া কেবল মানুষের কাজটুকু গ্রহণ করা সাধারণের পক্ষে বড়ো দুঃসাধ্য। উপহারের সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি স্নেহহস্ত দেখা যায় তবে সেই উপহারের মূল্য অনেক বাড়িয়া যায় এবং তাহার স্মৃতি হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। মানুষের পক্ষে মানুষ বড়ো আদরের বড়ো আকাঙ্ক্ষার ধন। মানবহৃদয় ও মানবজীবনের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাহা আমাদের নিকট উপস্থিত হয় তাহা অতি সহজে এবং সানন্দে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। যখন একটি সজীব মানবকণ্ঠ মধুরস্বরে গান করে তখন সেই গানের সৌন্দর্যের মধ্যে একটি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবহৃদয়ের জীবন্ত সম্পর্ক অনুভব করিয়া আমরা প্রবলতর আনন্দ সম্ভোগ করি— যন্ত্রের মধ্য হইতে অবিকল সেই সংগীত শ্রবণ করিলে আনন্দের অনেকটা হ্রাস হয়। তখন আমরা যন্ত্রবাদককে অথবা সংগীতরচয়িতাকে গানের ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত জড়িত করিয়া থাকি। যেমন করিয়া হউক, কর্মের সহিত কর্তাকে অব্যবহিতভাবে দেখিলে কর্মটি সজীব সচেতন হইয়া উঠে এবং আমাদের চেতনার সহিত সহজে মিশ্রিত হয়।

এইজন্য কোনো কার্য আমাদের মনোরম বোধ হইলে তাহার কর্তার সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমাদের আগ্রহ জন্মে। নতুবা আমাদের হৃদয় যেন তাহার পুরা খাদ্যটি পায় না। তাহার অর্ধেক ক্ষুধা থাকিয়া যায়।

আমাদের দেশে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন, জাতি ভিন্ন ভিন্ন পরিবার এবং অন্তঃপুর ও বহির্ভবনে বিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত হওয়াতে আমরা মানুষকে নিকটস্থ করিয়া দেখিতে পাই না; তাহার উপহার এবং উপকারগুলি দূর হইতে আমাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে— আমাদের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা কোনো-একটি সজীব মূর্তিকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে সর্বদা সজাগ রাখিতে পারে না।

আমাদের দেশের মহৎ ব্যক্তিদিগকে যাঁহারা বন্ধুভাবে জানেন তাঁহারাই আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত, এই অভাব দূর করিতে পারেন। তাঁহারাই আমাদের আনন্দকে সম্পূর্ণতা দান করিতে পারেন। তাঁহারা উপকারের সহিত উপকারীকে একত্র করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতে পারেন এবং সেই উপায়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাকে সজীব করিয়া আমাদের হৃদয়ের গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তিকে সতেজ করিয়া তুলিতে পারেন। কেবল শুষ্ক সমালোচন, কেবল সভাস্থলে ভাষার উচ্ছ্বাস প্রকাশ কারয়া কর্তব্যপালন নহে, মহাত্মা ব্যক্তির সহিত সর্বসাধারণের পরিচয়-সাধন করাইয়া দেওয়া একমাত্র

বন্ধুর দ্বারাই সম্ভব। অর্থ এবং উৎসাহাভাবে আমাদের দেশের বড়োলোকদের প্রস্তর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয় না বলিয়া মনে আক্ষেপ হয় কিন্তু তদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রস্তরমূর্তির অপেক্ষা সজীবতরভাবে আমাদের হৃদয়ে স্থাপিত করিতে পারেন তাঁহারা সে কর্তব্যকে যথেষ্ট গুরুতর মনে করেন না।

মৃত্যুর পরে এই বন্ধুকৃত্য অবশ্যপালনীয়।

সভাস্থলে মৃতবন্ধুর সম্বন্ধে আলোচনা করা অত্যন্ত কঠিন কার্য। এবং সে কর্তব্য-পালনে যদি কেহ কুণ্ঠিত হন তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু লেখায় সে আপত্তি থাকিতে পারে না। যেমন আকারে হউক আমরা প্রিয়বন্ধুর হস্ত হইতে পাব্লিক-বন্ধুর প্রতিমূর্তি প্রত্যাশা করি।

জীবনের যবনিকা অনেক সময় মনুষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মৃত্যু যখন সেই যবনিকা ছিন্ন করিয়া দেয় তখন মানুষ সমগ্রভাবে আমাদের নিকট প্রকাশ হয়। প্রতিদিন এবং প্রতিমুহূর্তের ভিতর দিয়া যখন আমরা তাহাকে দেখি তখন তাহাকে কখনও ছোটো কখনও বড়ো, কখনও মলিন কখনও উজ্জ্বল দেখিতে হয়। কিন্তু মৃত্যুর আকাশ ধূলিহীন স্বচ্ছ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরিবর্তন নাই। সেই মৃত্যুর মধ্যে স্থাপন করিয়া দেখিলে মানুষকে কতকটা যথার্থভাবে দেখা যাইতে পারে।

যাঁহারা জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন তাঁহারা বলেন, আমাদের চতুর্দিক্‌বর্তী বায়ুস্তর এই পর্যবেক্ষণের পক্ষে অত্যন্ত বাধাজনক। বিশেষত বায়ুর নিম্নস্তরগুলি সর্বাপেক্ষা অস্বচ্ছ। এইজন্য পর্বতশিখর জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের পক্ষে অনুকূল স্থান।

মানব-জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণেও আমাদের চতুর্দিকস্থ বায়ুস্তরে অনেক বিঘ্ন দিয়া থাকে। আবর্তিত আলোড়িত সংসারে উড্ডীয়মান বিচিত্র অণুপরমাণু দ্বারা এই বায়ু সর্বদা আচ্ছন্ন। ইহাতে মহত্ত্বের আলোকরশ্মিকে স্থানভ্রষ্ট পরিমাণভ্রষ্ট করিয়া দেখায়। বর্তমানের এই আবিল বায়ুতে অনেক সময় কিরণরেখা অযথা বৃহৎ দেখিতেও হয়, কিন্তু সে বৃহত্ত্ব বড়ো অপরিস্ফুট— কিরণটিকে যথাপরিমাণে দেখিতে পাইলে হয়তো তাহার হ্রাস হইতে পারিত কিন্তু তাহার প্রস্ফুটতা উজ্জ্বলতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত।

মৃত্যু পর্বতশিখরের ন্যায় আমাদিগকে এই ঘন বায়ুস্তর হইতে স্বচ্ছ আকাশে লইয়া যায়, যেখানে মহত্ত্বের সমস্ত রশ্মিগুলি নির্মল অব্যাহত ভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়ে।

এই মৃত্যুশিখরে বন্ধুদিগের সাহায্যে আমাদের জ্যোতিষ্কদিগের সহিত আমরা পরিচিত হইতে চাহি।

পরিচিত ব্যক্তিকে অন্যের নিকট পরিচিত করা কার্যটি তেমন সহজ নহে। জীবনের ঘটনার মুখ্য-গৌণ নির্বাচন করা বড়ো কঠিন। যিনি আমাদের নিকট সুপরিচিত তাঁহার কোন্ অংশ অন্যের নিকট পরিচয়সাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা বাহির করা দুরূহ। অনেক কথা অনেক ঘটনাকে সহসা সামান্য মনে হইতে পারে, পরিচয়ের পক্ষে যাহা সামান্য নহে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক ক্ষমতাশালী বন্ধু আছেন যাঁহাদের সমালোচনশক্তি নির্বাচনশক্তি গঠনশক্তি সামান্য নহে। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের প্রতিমূর্তি স্থাপনের ভার তাঁহাদের লওয়া কর্তব্য। স্বভাবত কৃতঘ্ন বলিয়াই যে আমাদের পাব্লিক অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহা নহে, সে ভালো করিয়া বোঝে না, সম্পূর্ণরূপে জানে না বলিয়াই তাহার কৃতজ্ঞতা জাগ্রত হইয়া উঠে না। মৃত ব্যক্তির কার্যগুলি ভালো করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে এবং তাঁহাকে আমাদের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিতে হইবে। লেখক বলিয়া নহে, কিন্তু স্নেহপ্রীতিসুখদুঃখে মনুষ্যভাবে তাঁহার লেখার সহিত এবং আমাদের সহস্রের সহিত তাঁহাকে সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাঁহাকে কেবল দেবতা বলিয়া পূজা করা নহে, কিন্তু স্বজাতীয় বলিয়া আমাদের আত্মীয় করিয়া দিতে হইবে।

আমরা আমাদের মহৎব্যক্তিদিগকে দেবলোকে নির্বাসিত করিয়া দিই। তাহাতে আমাদের মনুষ্যলোক দরিদ্র এবং গৌরবহীন হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যদি রক্তমাংসের মনুষ্যরূপে সুনির্দিষ্ট-পরিচিত হন, সহস্র ভালোমন্দের মধ্যেও আমরা যদি তাঁহাদিগকে মহৎ বলিয়া জানিতে পারি তবেই তাঁহাদের মনুষ্যত্বের অন্তর্নিহিত সেই মহত্ত্বটুকু আমরা যথার্থ অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারি, তাঁহাকে ভালোবাসি এব বিস্মৃত হই না।

এ কাজ কেবল বন্ধুরাই করিতে পারেন। এবং বন্ধুগণ যখন প্রস্তরমূর্তিস্থাপনে উদাসীন পাব্লিককে অকৃতজ্ঞ বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন তখন পাব্লিকও তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ আনিতে পারেন। কারণ, তাঁহারা বঙ্কিমের নিকট হইতে কেবলমাত্র উপকার পান নাই, বন্ধুত্ব পাইয়াছেন, তাঁহারা কেবল রচনা পান নাই, রচয়িতাকে পাইয়াছেন। অর্থ থাকিলে প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করা সহজ, কিন্তু বঙ্কিমকে বন্ধুভাবে মনুষ্যভাবে মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করা কেবল তাঁহাদেরই প্রীতি এবং চেষ্টা-সাধ্য। তাঁহাদের বন্ধুকে কেবল তাঁহাদের নিজের স্মরণের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যথার্থ বন্ধুঋণ শোধ করা হইবে না।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

নিরাকার উপাসনা

চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতে প্রশ্ন উঠিয়াছিল— অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ— যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, এমন যে নিত্য পরব্রহ্ম, তাঁহাকে আমরা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে থাকিয়া লাভ করিতে পারি কি না? তপোবনের অরণ্যচ্ছায়াতলে সেদিন তাহার এক সুগম্ভীর উত্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

তাঁহাকে পাওয়া যায় কি না এ প্রশ্নের ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সরল উত্তর আর কী হইতে পারে যে, আমি তাঁহাকে পাইয়াছি। যিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, যিনি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন, ইহাই আমাদের আশার কথা। ইহার উপরে আর তর্ক নাই। তর্কের দ্বারা যদি কেহ প্রমাণ করিত যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তবে তর্কের দ্বারা তাহার খণ্ডন সম্ভব হইতে পারিত, কিন্তু অনেক সহস্র বৎসর পূর্বে নির্জন ধ্যানাসন হইতে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মবাদী মহর্ষি বিশ্বলোককে আহ্বানপূর্বক এই এক মহাসাক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

সেই সত্যবাণী আজিও সমস্ত দেশকালকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত তর্কসংশয়কে অভিভূত করিয়া দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণের নিকট উত্থিত হইতেছে।

অদ্যকার ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে এ তর্ক উঠিয়া থাকে যে, নিরাকার ব্রহ্মকে কি পাওয়া যাইতে পারে? প্রাচীন ভারতের মহাসাক্ষ্যবাণী আজিও লয়প্রাপ্ত হয় নাই; সেই প্রশান্ত তপোভূমি হইতে অমৃত আশ্বাসবাক্য আজিও আমাদের বিক্ষুব্ধ কর্মভূমিতে আসিয়া উপনীত হইতেছে— এই অনিত্য সংসারের রূপ-রস-গন্ধ-ব্যূহ ভেদ করিয়া স্বাধীন আত্মার সনাতন জয়শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছে, ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্— ব্রহ্মবিৎ পরম পুরুষকে পাইয়া থাকেন— তবু আমরা প্রশ্ন তুলিয়াছি নিরাকার পরব্রহ্মকে কি পাওয়া যায়? অদ্য তেমন সবল গভীর কণ্ঠে, তেমন সরল সতেজ চিত্তে এমন সুস্পষ্ট উত্তর কে দিবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

আজ সেই প্রশ্নের উত্তরে কেবল সংশয়ধূলিসমাচ্ছন্ন তর্ক উঠিয়াছে— ইহা কি কখনও সম্ভব হয়? নিরাকার পরব্রহ্মকে কি কখনও পাওয়া যাইতে পারে?

কিন্তু পাওয়া কাহাকে বলে ?

আমরা কোন্ জিনিসটাকে পাই ? যে-সকল পদার্থকে আমরা পাইয়াছি বলিয়া কল্পনা করি তাহাদের উপরে আমাদের কতটুকু অধিকার ? আলোককে আমরা চোখে দেখি মাত্র, তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না, তবু বলি আলোক পাইলাম ; উত্তাপকে আমরা স্পর্শ দ্বারা জানি কিন্তু চোখে দেখিতে পাই না, তবু বলি আমরা উত্তাপ লাভ করিলাম। গন্ধকে আমরা দেখিও না স্পর্শও করি না তবু গন্ধ আমরা যে পাই ইহাতে কোনো সংশয় বোধ করি না।

দেখা যাইতেছে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য পাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। কোনোটা দৃষ্টিতে পাই, কোনোটা স্পর্শে পাই, কোনোটা কর্ণে শুনি, কোনোটা ঘ্রাণে লাভ করি, কোনোটা-বা দুই-তিন ইন্দ্রিয়শক্তির একত্রযোগেও পাইয়া থাকি। সংগীতকে কেহ যদি চক্ষু দিয়া পাইবার চেষ্টা করে তবে সে চেষ্টাকে লোকে বাতুলতা বলিবে এবং পুষ্পকে কেহ যদি গানের মতো লাভ করিবার ইচ্ছা করে তবে সে ইচ্ছা নিতান্তই ব্যর্থ হয়।

কেবল তাহাই নহে। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি সীমাবদ্ধ, এইজন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কোনো বস্তুকে যতটুকু পাই তাহাও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। আমরা যখন কোনো বস্তুর এক পিঠ দেখি তখন অন্য পিঠ দেখিতে পাই না, যখন বাহিরটা দেখি তখন ভিতরটা আমাদের অগোচর থাকে। অধিকক্ষণ কিছু অনুভব করিতে গেলে আমাদের ইন্দ্রিয় ক্লান্ত, আমাদের স্নায়ুশক্তি অসাড় হইয়া আসে।

কিন্তু তথাপি জড়বস্তুসকলকে আমরা পাইলাম বলিয়া সন্তুষ্ট আছি ; এবং যে বস্তুকে যে উপায়ে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাওয়া সম্ভব সেই উপায়ে সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি।

লৌকিক বস্তু সম্বন্ধেই যখন এরূপ তখন নিরাকার ব্রহ্মকে পাওয়ারই কি কোনো বিশেষত্ব নাই ? তাঁহাকে চোখে দেখিলাম না বলিয়াই কি তাঁহাকে পাইলাম না ?

এ কথা আমরা কেন না মনে করি যে, স্বরূপতই তিনি যখন চোখে দেখার অতীত তখন তাঁহাকে চোখে দেখার চেষ্টা করাই মূঢ়তা। আমরা যদি আলোককে সংগীতরূপে ও সংগীতকে গন্ধরূপে পাইবার কল্পনাকেও দুরাশা বলিয়া জ্ঞান করি তবে নিরাকারকে সাকাররূপে লাভ না করিলে তাঁহাকে লাভ করাই হইল না এ কথা কেমন করিয়া মনে স্থান দিই ?

আমরা যখন টাকা হাতে পাই তাহাকে কি আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে তুলিয়া রাখিতে পারি ? যে ব্যক্তি তাহাকে অত্যন্ত নিজের করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে সে তাহাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে, লোহার সিন্দুকে পুরিয়া রাখে, নিজের করিতে

গিয়া নিজের কাছ হইতে দূরেই তাহাকে রাখিতে হয়। কিন্তু একান্ত চেষ্টাতেও সে টাকাকে কৃপণ আপনার অন্তরের মধ্যে রাখিতে পারে না; বাহিরের টাকা বাহিরেই পড়িয়া থাকে এবং মৃত্যুকালে ধূলির সহিত তাহার কোনো প্রভেদ থাকে না। কৃপণ তবুও তো জানে টাকা আমার, টাকা আমি পাইয়াছি। বাহিরের ধনকে অন্তরে না পাইয়াও আমরা তাহাকে পাইলাম বলিয়া স্বীকার করি; আর যিনি আমাদের একমাত্র অন্তরের ধন, যিনি অন্তরের অন্তরতম, তাঁহাকে বস্তুরূপে মূর্তিরূপে মনুষ্যরূপে বাহিরে না পাইলে কি আমাদের পাওয়া হইল না? যিনি চক্ষুষশ্চক্ষুঃ, চক্ষুর চক্ষু, তাঁহাকে কি চক্ষুর বাহিরে দেখিব? যিনি শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, কর্ণের কর্ণ, তাঁহাকে কি কর্ণের বাহিরে শুনিব? যাঁহার সম্বন্ধে ঋষি বলিয়াছেন—

> ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
> ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং।
> হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌ৢপ্তো
> য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

ইঁহার স্বরূপ চক্ষুর সম্মুখে স্থিত নহে, ইঁহাকে কেহ চক্ষুতে দেখে না— হৃদিস্থিত বুদ্ধি-দ্বারা ইনি কেবল হৃদয়েই প্রকাশিত, ইঁহাকে যাঁহারা এইরূপেই জানেন তাঁহারা অমর হন— এমন-যে আত্মার অন্তরাত্মা তাঁহাকে বহির্বস্তুর মতো বাহিরে পাইতে গেলেই তাঁহাকে পাওয়া যায় না এ কথা আমরা কেন না স্মরণ করি?

যাঁহারা ঈশ্বরকে পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা কী বলিয়াছেন? তাঁহারা বলেন—

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

সূর্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রতারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎসকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কী প্রকারে প্রকাশ করিবে?

তাঁহারা বলেন—

> তমাত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
> তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।

যে ধীরেরা তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখেন তাঁহারাই নিত্য শান্তি লাভ করেন আর কেহ নহে। আর আমরা ঈশ্বরকে পাইবার কোনো চেষ্টা কোনো সাধনা না করিয়া এমন কথা কোন্ স্পর্ধায় বলিয়া থাকি যে, নিরাকার ব্রহ্মকে আত্মার মধ্যে না দেখিয়া,

মূর্তির মধ্যে, অগ্নির মধ্যে, বাহ্যবস্তুর মধ্যেই দেখিতে হইবে, কারণ তাঁহাকে আর-কোনো উপায়ে আমাদের পাইবার সামর্থ্য নাই। এ কথা কেন মনে করি না যে, একমাত্র যে উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে— অর্থাৎ আত্মার দ্বারা আত্মার মধ্যে— তাহা ছাড়া তাঁহাকে পাইবার উপায়ান্তর মাত্র নাই।

কেন করি না তাহার কারণ, আমরা তর্ক করি, কিন্তু ঈশ্বরকে চাহি না।

আমরা ব্রহ্মকে কখন চাই? যখন দেখিতে পাই সংসারের পরিমিত পদার্থমাত্রই পরিবর্তনশীল— যখন এই চঞ্চল ঘূর্ণ্যমান বিষয়াবর্তের মধ্যে একটি নির্বিকার ধ্রুব অবলম্বনের জন্য আমাদের আত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন যিনি সকল আকার বিকার এবং সীমার অতীত সহজেই তাঁহাকেই চাই। যিনি— নিত্যোঽনিত্যানাং, অনিত্য সকলের মধ্যে নিত্য, চেতনশ্চেতনানাং, সমস্ত চেতনার চেতয়িতা, তাঁহাকে সেই নিত্যরূপে, সেই চেতয়িতারূপেই পাইতে চাই। তখন এ সংকল্প মনে উদয় হইতেই পারে না যে, নিরাকারকে আমরা কৌশলপূর্বক সাকাররূপে লাভ করিতে চেষ্টা করিব। যখন কারাগারের পাষাণভিত্তি আমাদিগকে ক্লিষ্ট করে তখন নূতন প্রাচীর গাঁথিয়া আমরা মুক্তি কল্পনা করিতে পারি না। অসৎ যখন আমাদিগকে পীড়িত করে, যখন কাতর অন্তঃকরণ হইতে প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়া উঠে, অসতো মা সদ্গময়, অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, তখন কি নবতর অসত্যপাশ আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে?

আমরা ব্রহ্মকে কখন চাই? একদিন যখন উপলব্ধি করি আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের বাসনা মুহূর্তে মুহূর্তে অসৎ সংসারের ধূলিকর্দম আহরণ করিয়া আমাদের আলোকের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে; আমরা সেই নিবিড় মোহান্ধকারে মণি বলিয়া যাহা সংগ্রহ করিতেছি তাহা মুষ্টির মধ্যে ধূলি হইয়া যাইতেছে, সুখ বলিয়া যাহা আলিঙ্গন করিতেছি তাহা সহস্রশিখা জ্বালারূপে আপাদমস্তক দগ্ধ করিতেছে, জল বলিয়া যাহা পান করিতেছি তাহা তৃষাহুতাশনে আহুতি-স্বরূপে বর্ষিত হইতেছে; তখন পাপের বিভীষিকায় ভয়াতুর হইয়া যাঁহাকে ডাকিয়া বলি 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' তিনি কি আমাদেরই মতো বাসনা-প্রবৃত্তির দ্বারা জড়িত সুখদুঃখপীড়িত পুরাণ-কল্পিত তমসাচ্ছন্ন দেবতা?

আমরা ব্রহ্মকে কখন চাই? যখন আমাদের আত্মা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর ন্যায় সমস্ত সংসারকে এক পার্শ্বে সরাইয়া দিয়া বলিয়া উঠে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্, যাহার দ্বারা আমি অমর না হইব তাহা লইয়া আমি কী করিব? আমরা সংসারের যত সুখ যত ঐশ্বর্য তাহার নিকট আহরণ করি সে বলিতে থাকে, এ তো

আমার মৃত্যুর উপকরণ! সে আপন ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠে, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। মৃত্যু-পীড়িত আত্মার সেই অমৃতস্বরূপ কে?—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি।

সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম, যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

অতএব, যখন আমরা যথার্থরূপে তাঁহাকে চাই তখন ব্রহ্ম বলিয়াই তাঁহাকে চাই। তিনি যদি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ না হইতেন তবে এই অসৎ সংসার, এই অন্ধকার হৃদয়, এই মৃত্যুবীজসংকুল সুখসম্পদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে চাহিতাম না। কেন তবে আমরা তর্ক করিয়া থাকি যে, আমরা অপূর্ণ জীব এবং তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, অতএব তাঁহাকে আমরা পাইতেই পারি না। এবং সেইজন্য অসত্য অজ্ঞান এবং অন্তবিশিষ্ট আকারকে আমরা কেন তাঁহার স্থানে আরোপ করি? আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই পূর্ণস্বরূপকে আমাদের একান্তই চাই, আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র আনন্দ - একমাত্র মুক্তি। আমরা অপূর্ণ বলিয়াই আমরা অপূর্ণের পূজা করিব না; অপূর্ণের উপরে আমাদের অমর আত্মার, আমাদের অনন্ত জীবনের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিব না; আমরা এই অসৎ, এই অন্ধকার, এই মর্ত্যবিষয়পুঞ্জের মধ্যস্থলে 'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা' সাধনা করিতে থাকিব যতদিন না বলিতে পারি—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

মাঘ ১৩০৫

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

শিশু

শিশু মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের সপ্তম ভাগ-রূপে ১৩১০ সালে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণীর পরলোকগমনের পর, তিনি পীড়িতা মধ্যমা কন্যা রেণুকা ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথকে লইয়া আলমোড়া গিয়াছিলেন। শিশুর অনেকগুলি কবিতা মাতৃহীন পুত্রকন্যাদের পরিতোষের জন্য তথায় রচনা করেন। এইগুলির সহিত পূর্বরচিত শিশু-বিষয়ক ও নদী ইত্যাদি অন্যান্য কবিতা যোগ করিয়া শিশু প্রকাশিত হয়।

যে-সকল কবিতা অন্য গ্রন্থাদি হইতে শিশুতে সংকলিত হইয়াছিল তাহার কতকগুলি উক্ত গ্রন্থাদির অন্তর্ভুক্ত হইয়াই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে; 'বিম্ববতী' সোনার তরীতে; 'অভিমানিনী' 'স্নেহময়ী' ও 'ঘুম' ছবি ও গানে; 'মঙ্গলগীত' কড়ি ও কোমলে; 'সুখদুঃখ' ক্ষণিকাতে; 'সাধ' প্রভাতসংগীতে; 'স্নেহ-স্মৃতি' চিত্রায় মুদ্রিত হইয়াছে। 'নদী' রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। অনুবাদ-কবিতাবলী রচনাবলী-সংস্করণ শিশু হইতে বর্জিত হইয়াছে, অন্যান্য অনুবাদ-কবিতার সহিত একত্র সেগুলি পরবর্তী কোনো খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

প্রায়শ্চিত্ত

প্রায়শ্চিত্ত ১৩১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত পরে পুনর্লিখিত হইয়া পরিত্রাণ (১৩৩৬) নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমান খণ্ডে মূল সংস্করণ মুদ্রিত হইল।

যোগাযোগ

যোগাযোগ ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বিচিত্রা পত্রে যোগাযোগ ধারাবাহিক ভাবে (আশ্বিন ১৩৩৪ — চৈত্র ১৩৩৫) প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম দুই সংখ্যায় উপন্যাসটি 'তিন পুরুষ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয়বারে কবি ইহার 'যোগাযোগ' নাম দেন। এই উপলক্ষে বিচিত্রায় যে কৈফিয়ত প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল—

'তিন পুরুষ' নাম ধরে আমার যে গল্পটা বিচিত্রায় বের হচ্ছে তার নাম রক্ষা করতেই হবে এমন কোনো দায় নেই। কাঁচা থাকতে থাকতেই ও নামটা বদল করব বলে স্থির করেছি। পাঠক-দরবারে তার কারণ নির্দেশ করি।

নবজাত কুমারকুমারীদের নাম দেবার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ এসে থাকে, অবকাশমত সে অনুরোধ পালন করেও এসেছি। কারণ এতে কোনো দায়িত্ব নেই। ব্যক্তিসম্বন্ধে মানুষের নাম তার বিশেষণ নয়, সম্বোধন মাত্র। লাউয়ের বোঁটা নিয়ে লাউয়ের বিচার কেউ করে না, ওটাতে ধরবার সুবিধে। যার নাম দিয়েছি সুশীল তার শীলতা নিয়ে আমার কোনো জবাবদিহি নেই। সুশীল-ঠিকানায় পত্র পাঠালে শব্দের সঙ্গে প্রয়োগের অসংগতিদোষ নিয়ে ডাকপেয়াদা কাগজে লেখালেখি করে না, ঠিক জায়গায় চিঠি পৌঁছোয়।

ব্যক্তিগত নাম ডাকবার জন্যে, বিষয়গত নাম স্বভাবনির্দেশের জন্যে। মানুষকেও যখন ব্যক্তি বলে দেখি নে, বিষয় বলে দেখি, তখন তার গুণ বা অবস্থা মিলিয়ে তার উপাধি দিই— কাউকে বলি বড়োবউ, কাউকে বলি মাস্টারমশায়।

সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্যরচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হল গোড়াকার তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বেসর্বা, সেখানে গুণধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। মনস্তত্ত্বঘটিত বইয়ের শিরোনামায় যখনই দেখব 'স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর ঈর্ষা', বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা-দ্বারাই নামটি সার্থক হবে। কিন্তু 'ওথেলো' নাটকের যদি ওই নাম হত পছন্দ করতুম না। কেননা এখানে বিষয়টি প্রধান নয়, নাটকটিই প্রধান। অর্থাৎ আখ্যানবস্তু, রচনারীতি, চরিত্রচিত্র, ভাষা, ছন্দ, ব্যঞ্জনা, নাট্যরস, সবটা মিলিয়ে একটি সমগ্র বস্তু। একেই বলা চলে ব্যক্তিরূপ। বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ পাই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্মপ্রকাশজনিত রস পাই। বিষয়কে বিশেষণের দ্বারা মনে বাঁধি, ব্যক্তিকে সম্বোধনের দ্বারা মনে রাখি।

এমন একটা-কিছু অবলম্বন করে গল্প লিখতে বসলুম যাকে বলা যেতে পারে বিষয়। যদি মূর্তি গড়তেম একতাল মাটি নিয়ে বসতে হত। অতএব ওটাকে 'মাটি' শিরো-নামায় নির্দেশ করলে বিজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে বাধত না। বিজ্ঞান যখন কুণ্ডলকে উপেক্ষা ক'রে তার সোনার তত্ত্ব আলোচনা করে তখন তাকে নমস্কার করি। কিন্তু কনের কুণ্ডল নিয়ে বর যখন সেই আলোচনাটাকেই প্রাধান্য দেয় তখন তাকে বলি বর্বর। রসশাস্ত্রে মূর্তিটা মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটাও বিষয়ের চেয়ে বড়ো। এইজন্যে বিষয়-টাকেই শিরোধার্য করে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না। বস্তুত রসসৃষ্টিতে বৈষয়িকতাকে বড়ো জায়গা দেওয়া উচিত হয় না। যাঁরা বৈষয়িক প্রকৃতির পাঠক তাঁদের দাবির জোরে সাহিত্যরাজ্যে হাটের পত্তন হলে দুঃখের বিষয় ঘটে। হাটের মালিক বিষয়বুদ্ধিপ্রধান বিজ্ঞান।

এ দিকে সম্পাদক এসে বলেন, সংসারে নাম রূপ দুটোই অত্যাবশ্যক। আমি ভেবে দেখলুম, রূপের আমরা নাম দিই, বস্তুর দিই সংজ্ঞা। সন্দেশ যেখানে রূপ সেখানে তাকে বলি 'অবাক চাকি', যেখানে বস্তু সেখানে তাকে বলি মিষ্টান্ন। সম্পাদকমশায়ের সংজ্ঞা হচ্ছে 'সম্পাদক', এখানে অর্থ মিলিয়ে আদালতে হলফ করে বলতে পারি শব্দের সঙ্গে বিষয়ের ষোলো আনা মিল আছে। কিন্তু যেখানে তিনি বিষয় নন, রূপ, অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও একমাত্র, সেখানে কোনো একটামাত্র সংজ্ঞা দিয়ে তাঁকে বাঁধা অসম্ভব। সেখানে তাঁর আছে নাম। সেই নামের সঙ্গে মিলিয়ে শত্রু মিত্র কেউ তাঁর যাচাই করে না। পিতামাতা যদি তাঁকে 'সম্পাদক' নামই দিতেন তবে নাম সার্থক করবার জন্যে সম্পাদক হবার কোনো দরকারই তাঁর থাকত না।

গল্প জিনিসটাও রূপ ; ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন। আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামে দোষ নেই। কেননা ও নামে গল্পের কোনো ব্যাখ্যাই করা হয় নি।

সম্পাদকমশায় যখন গল্পের নামের জন্যে পেয়াদা পাঠালেন তাড়াতাড়ি তখন 'তিন পুরুষ' নামটা দিয়ে তাঁকে বিদায় করা গেল। তার পরক্ষণেই নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন করে নিয়ে কানে কানে মুহূর্তে মুহূর্তে বলতে লাগল : যদেতৎ অর্থং মম তদস্তু রূপং তব। আমার সঙ্গে তোমাকে সম্পূর্ণ মিলে চলতে হবে। 'ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা' ইত্যাদি। কাহিনী বলে, তার মানে কী হল ? নাম বলে, বাক্যে ভাবে আজ থেকে আমাকে সপ্রমাণ করে চলাই তোমার ধর্ম। কাহিনী বলে, রেজিস্টার বইয়ে কর্তার তাড়ায় সম্মতি সই করেছি বটে, কিন্তু আজ আমি হাজার

হাজার পাঠকের সামনে দাঁড়িয়েই সেটা বেকবুল যেতে চাই।

কর্তা বলেন, তিন পুরুষের তিন-তোরণ-ওআলা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এই আমার একটা খেয়ালমাত্র ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই। সুতরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচবে না।

অতএব সর্বসমক্ষে আমার গল্প আজ তার নাম খোওয়াতে বসেছে। আমরা তিন সত্যের জোর মানি; বিচিত্রার পাতায় নাম সম্বন্ধে দুইবার সত্যপাঠ হয়ে গেছে। তিনবারের বেলায় মুখ চাপা দেওয়া গেল।

আর-একটা নাম ঠাউরেছি। সেটা এতই নির্বিশেষ যে গল্পমাত্রেই নির্বিচারে খাটতে পারে। সরকারি জিনিসমাত্রেরই মতো সে নামে চমৎকারিতা নেই। নাই-বা রইল। জাপানে দেখেছি, তলোয়ারের ফলকটার উপরে কারিগর যখন তার কারু-কলার আনন্দ ঢেলে দেয় খাপটাকে তখন নিতান্ত নিরলংকার করে রাখে। গল্প নিজেই নিজের পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন, নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নকিবগিরি করতে না পাঠায়।

'তিন পুরুষ' নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল 'যোগাযোগ'।

'কিস্তা' জাহাজ

শ্যামের পথ। ৪ অক্টোবর ১৯২৭

—'নামান্তর', বিচিত্রা, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ

আধুনিক সাহিত্য

আধুনিক সাহিত্য গদ্যগ্রন্থাবলীর পঞ্চম ভাগ রূপে ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়।

'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত ও ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসের সাধনায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে সংকলিত হইবার সময় রচনাটির (তেমনি আধুনিক সাহিত্যে সংকলিত অন্যান্য অনেক প্রবন্ধের) বহু অংশ বর্জিত হয়। এই বর্জিত ভাগের প্রধান অংশগুলি গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত হইল।

'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধের সূচনাতেই ('আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে বর্জিত) রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

'গত বর্ষ শেষ হইবার অনতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালের জন্য আমাদের মধ্য হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছেন।

'যে-সকল রাজ্যে মহত্ত্ব বিরল নহে সেখানে কোনো যশস্বী লোকের অন্তর্ধান হইলে

সমস্ত দেশ শোক করিতে থাকে। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে শুভ দৈববশে কদাচিৎ ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি, জীবনের কার্য সমাধা করিয়া যখন তাঁহারা সংসারক্ষেত্র হইতে অন্তরিত হন তখন এই জড়তাপন্ন দরিদ্র দেশ তাঁহাদের অভাব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

'কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। লেখনী সহজেই লিখিতে চাহে যে, অদ্য সমস্ত বঙ্গদেশ বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগদুঃখে শোকাতুর। যদি সত্যই বঙ্গদেশের সেই বেদনাবোধ থাকিত তবে আজিকার এই চিরবিচ্ছেদের মধ্যেও সান্ত্বনার রশ্মি প্রকাশ পাইত।

'অল্পদিনের মধ্যে আমাদের অনেকগুলি শোকের কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমে রাজেন্দ্রলাল মিত্র চলিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি তাঁহাকে ভালো করিয়া বিদায়সম্ভাষণ করিল না। সেই নির্ভীক মনস্বী পুরুষ দেশের জন্য তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানবিস্তার এবং লোকহিতের জন্য যাহা কারয়াছিলেন বিষয়ী লোক আপনার বৈষয়িক উন্নতি আপন স্বার্থসাধনের জন্য এত চিন্তা এত চেষ্টা এত সংগ্রাম করিতে পারে না। যে ক্ষেত্রেই ইংরেজ-বাঙালির মধ্যে বিরোধ ঘটিত সেইখানেই রাজেন্দ্রলাল দুর্বল স্বদেশের পক্ষ লইয়া বীরগর্বে অগ্রসর হইতেন; যদি স্বদেশী বিদেশী কাহারও সাহায্য না পাইতেন তথাপি অটল সাহসে একাকী দণ্ডায়মান হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি যুদ্ধে চিরকাল অপরাঙ্মুখ এবং অপরাজিত ছিলেন। এইরূপে অশ্রান্ত নিরলস থাকিয়া অহর্নিশি কঠিন পরিশ্রমে দেশের জন্য তিনি যে জীবন অকালে বিসর্জন করিলেন, দেশ তাঁহার সেই দুর্মূল্য জীবনের অবসানে অকৃত্রিম শোকের একবিন্দু অশ্রু ব্যয় করিয়াছিল কি না সন্দেহ।

'রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ রচনা ইংরেজিতে। বিবিধার্থসংগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও বহুপূর্বের কথা। এই কারণে, যদিও তাঁহার নাম দেশবিখ্যাত ছিল তথাপি তিনি সর্বসাধারণের নিকট অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে সে কথা বলা যাইতে পারে না।

'বিদ্যাসাগর সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করিয়া একাকী দুর্ধর্ষ তেজে দুঃসাধ্য কার্য করিয়া গিয়াছেন। কাহারও স্তুতিনিন্দা কাহারও সহায়তার কোনো অপেক্ষা রাখেন নাই। যখন সহস্র লোকের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তখনও তিনি একক, যখন সহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন তখনও তিনি একক। সুমহৎ সুদুর্ভর কার্যভারসকল তিনি চিরজীবন অসামান্য সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সহিত একাকী বহন করিয়াছেন।

বঙ্গভাষার প্রথম স্তর তিনি নির্মাণ করিয়াছেন, বিধবার দুঃখমোচনের জন্য নিষ্ঠুর সমাজের সহিত তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়াছেন, দেশের বিদ্যাশিক্ষা স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধন করিবার ভার লইয়া তিনি কৃতকার্য হইয়াছেন এবং এই অলস অকর্মণ্য অনুদার দেশে আপনাকে একনিষ্ঠ পরহিতব্রত অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ বদান্যতার উজ্জ্বলতম আদর্শস্থল করিয়া তুলিয়াছেন— আর, যে বঙ্গদেশ তাঁহার জীবনের রক্তে জীবন পাইয়াছে সে আজ বহুকষ্টে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপলক্ষে দুই-চারিবার সামান্য ব্যর্থ চেষ্টা দেখাইয়াই আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে।

'আজ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও আমরা সভা ডাকিয়া সাময়িক পত্রে বিলাপসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আপনার কর্তব্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাহার অধিক আর কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। প্রতিমূর্তি-প্রতিষ্ঠা বা কোনোরূপ স্মরণ-চিহ্ন-স্থাপনের প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। উপর্যুপরি বারম্বার অকৃতজ্ঞতা ও অনুৎসাহের পরিচয় দিলে ক্রমে আর আত্মসম্ভ্রমের লেশমাত্র থাকিবে না, এবং ভবিষ্যতে প্রবন্ধ লিখিয়া শোকের আড়ম্বর করিতেও কুণ্ঠিত বোধ করিতে হইবে।

'উপকার গ্রহণ করিবার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার শক্তিও বাড়িতে থাকে। আমাদের দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও সেরূপ দাঁড়ায় নাই যাহাতে আমরা কোনো মহৎ লোকের দৃষ্টান্ত বা কার্য অন্তরের মধ্যে যথার্থরূপে পরিপাক করিয়া লইয়া তাহার ফল উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের কানের কাছে ক্রমাগতই বলা আবশ্যক, তোমার এতখানি উপকার করা হইল, তুমি এতটা লাভ করিলে, তোমার এতখানি পথ নিষ্কণ্টক হইল, অমুক তোমার এতবড়ো সুহৃদ। এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে মন্থন করিয়া কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা হৃদয়ের উপরিভাগে ফেনিল করিয়া তোলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে কোনোরূপ স্থায়ী পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে কতকটা বাষ্প বিসর্জন করিয়া কোথাও কোনো চিহ্নমাত্র না রাখিয়া তাহা বিলীন হইয়া যায়।

'যে দেশের এমন দুরবস্থা সেই দেশেই মহৎ লোকের নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জনের আবশ্যক সর্বাপেক্ষা অধিক। সহায়তা নাই, কৃতজ্ঞতা নাই, অনুকূলতা নাই, কেবল আপনার অন্তরের অপ্রতিহত ধৈর্য ও উপবাসসহিষ্ণু অকাতর অনুরাগে চিরজীবন একাকী বসিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

'সেইজন্য যে কয়েকটি মহাত্মা আমাদের দেশের কাজে জীবন বিসর্জন করিয়া

গিয়াছেন তাঁহাদিগকে মিশরের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে গুটিকতক নিঃসঙ্গ পিরামিডের মতো দেখিতে হয়। এই মৃত সমভূমির মধ্যে তাঁহাদের সমুন্নত মহিমা দ্বিগুণ দেদীপ্যমান হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সুবিশাল বিষাদ হৃদয়কে বাষ্পাকুল করিয়া তোলে। হায়, এতবড়ো জীবন যাহার নিকট নিঃশেষে সমর্পিত হইয়াছে সে জানিতেও পারিল না তাহার কী সৌভাগ্য এবং সে চিরদিনের জন্য কতখানি লাভ করিল।

'ভাবসম্পদকে আমরা এখনও যথার্থ সম্পদরূপে গণ্য করিতে শিখি নাই। সাহিত্যরস যে আমাদের জীবনের খাদ্যপানীয়ের ন্যায় অত্যাবশ্যক তাহা এখনও আমরা সম্যক অনুভব করি না। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনী শক্তি মাতৃভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙালির জীবনের মজ্জার মধ্যে যে প্রবেশ করিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভা-উৎসের ভাবপ্রস্রবণ হইতে বাঙালি যে নূতন জীবনরস প্রাপ্ত হইয়াছে, বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্বে যেরূপ ছিল বঙ্কিমের আবির্ভাবের পরে বাঙালির জীবনের গঠনে যে তদপেক্ষা এক নূতন বৈচিত্র্যের সঞ্চার হইয়াছে তাহা এখনও আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

'এই স্থলে যদি আমি প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নিজের জীবনের সম্বন্ধ আলোচনা করি তবে ভরসা করি শ্রোতৃগণ আমার সেই প্রগল্‌ভতাকে অহমিকা জ্ঞান করিয়া অপরাধ লইবেন না। আজিকার এই শোকের দিনে বঙ্কিমের নিকট কেবল স্বজাতির নহে নিজের নিজের বিশেষ কৃতজ্ঞতাঋণ স্বীকার করিবার জন্য আবেগ উপস্থিত হয় এবং তাহা দমন করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বোধ করি না।

'সৌভাগ্যক্রমে আমরা বাল্যকালে বাংলা ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। স্বল্প ইংরেজি যাহা শিখিতাম তাহার মধ্য হইতে হৃদয়ের পোষণযোগ্য তৃপ্তিজনক কোনো রস আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ তৃষ্ণা যথেষ্ট ছিল। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, একত্র বাঁধানো বিবিধার্থসংগ্রহ, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বাংলা রবিন্‌সন ক্রুসো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্যরায়ের জীবনচরিত, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের গ্রন্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম। তখন বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা অল্প ছিল এবং বালকদিগের পাঠের অযোগ্য গ্রন্থও অনেক বাহির হইত। এবং আমরা অপরিতৃপ্ত আগ্রহের সহিত ভালোমন্দ সকল গ্রন্থই নির্বিচারে পাঠ করিতাম। তরুণ হৃদয়ের সেই স্বাভাবিক ক্ষুধা-উদ্রেকের সময় বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন যে নূতন আস্বাদ, নূতন আনন্দ, নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলাম তাহা কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।'

'রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল'[১] এই মন্তব্যের পরেই সমালোচক-বঙ্কিম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'সাহিত্যের পক্ষে যাহা-কিছু অযোগ্য, যাহা-কিছু অনাবশ্যক, যাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা বা অক্ষমতা প্রকাশ পাইত তাহাকে তিনি কদাচ মার্জনা করিতেন না। এই-সমস্ত স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি তিনি এমন কঠোর আঘাত এমন সুতীব্র বিদ্রূপ প্রয়োগ করিতেন যে, অনেক সময় তাহা অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে হইত; অনেক সময় মনে হইত এই-সকল ক্ষীণজীবীদের প্রতি বঙ্কিমের প্রবল বাহুর আঘাত যথাযোগ্য নহে। বিশেষত তখনও বাংলা লেখার শৈশব-অভ্যাসগুলি দূর হয় নাই, লেখকেরা তখনও বঙ্কিমের নূতন রাজত্বের কঠিন নিয়মসকল ভালো করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই, সে-অবস্থায় সহজেই অনেক ত্রুটি মার্জনা করিয়া দোষকে কম করিয়া দেখিয়া এবং গুণকে বাড়াইয়া তুলিয়া সাধারণত উৎসাহ এবং প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা হয়। বঙ্কিমের রাজদণ্ড সেরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই। তিনি নির্দয়ভাবে ঠক বাছিতে গিয়া গাঁ উজাড় করিবার জো করিয়াছিলেন।

'কিন্তু বঙ্কিমের এই নিষ্ঠুরতা— উচ্চ লক্ষ্য, অটল সংকল্প এবং মহৎ পৌরুষের নিষ্ঠুরতা। বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁহার প্রবল অনুরাগ তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে নির্মমভাবে ছেদন করিয়া ফেলেন। যাঁহার আদর্শ অত্যন্ত উন্নত তাঁহার বিচার অনুরূপ কঠিন।

'নিজের বাগানের প্রতি যে মালীর যথার্থ অনুরাগ আছে, ছোটোখাটো কাঁটাগুল্ম-জঙ্গলকে সে তীক্ষ্ণ কোদালি দিয়া সবলে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যে-সকল ক্ষুদ্র তৃণগুল্মজঙ্গল অনাদরে জন্মে তাহাদিগকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। কারণ, তাহারা দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, গুণে না হউক সংখ্যায় প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, ভালোয় মন্দয় এমন একাকার হইয়া যায় যে নির্বাচন করা বড়োই কঠিন হইয়া উঠে। তখন ভালো জিনিস আপন জন্মভূমি হইতে প্রাণধারণ-যোগ্য যথেষ্ট রস পায় না, ক্রমশ শীর্ণ হইয়া আসে।

'এই কারণে, মন্দ রচনা সাহিত্যের বিচারালয়ে যেরূপ দণ্ড পায়, যে রচনা মন্দ নহে কিন্তু ভালোও নহে, যাহাতে কোনো ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই, কোনো সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় নাই, তাহাও প্রায় অনুরূপ দণ্ডের যোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। উভয়ের প্রতিই নির্বাসনের আদেশ প্রচার হইয়া থাকে।

১ দ্রষ্টব্য পৃ. ৪০৩, ছত্র ২৭-২৮।

'কিন্তু এই কঠিন কার্যের ভার লইতে অনেক সুযোগ্য লেখক কুণ্ঠিত হন। তাহার দুই প্রধান কারণ আছে, এক তো কাজটা বড়োই অপ্রিয়, দ্বিতীয়ত অন্যের অপ্রিয় হইতে হয়।

'লেখকের পক্ষে অপ্রিয় হওয়া একটা মহৎ ক্ষতি। কারণ, লেখা বুঝিতে বুদ্ধির যেমন আবশ্যক প্রীতির আবশ্যক তদপেক্ষা অল্প নহে। প্রথম হইতে পাঠকের মনটি যদি অনুকূল থাকে, অন্তত প্রতিকূল না থাকে, তবে ভাবের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা তাঁহার পক্ষে অনেকটা সহজ হয়। গোড়াতেই বিমুখ হইয়া বসিলে সহস্র তর্কের দ্বারা সৌন্দর্য প্রতিপন্ন করা যায় না। এই জন্য প্রাচীন কবিরা অপর্যাপ্ত নম্রতার দ্বারা পাঠকের মন আর্দ্র করিয়া রচনা আরম্ভ করিতেন— তাঁহারা শ্রোতামাত্রকেই সুধীজন এবং সুধী-মাত্রকেই ক্ষীরগ্রাহী হংস এবং কেবলমাত্র আপনাদিগকে অভাজন বলিয়া প্রচার করিতেন এবং বোধ করি যথোচিত ফললাভ করিয়া মনে মনে হাসিতে ছাড়িতেন না।

'কিন্তু যে লেখক সমালোচনা করেন তাঁহার পক্ষে এই নম্রতা রক্ষা করা বড়ো কঠিন। পাঠকেরা একেবারে বদ্ধপরিকর হইয়া অস্ত্রশস্ত্র বাঁধিয়া তাঁহার লেখা পড়িতে আরম্ভ করেন, এমন-কি অধিকাংশ সময়ে পাঠ না করিয়াই অস্ত্রক্ষেপণ করিতে থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে অবলা সরস্বতীর হস্তে গদা নাই, কেবল একটি বীণা আছে মাত্র।

'এই কারণে যে-সকল লেখক রচনার দ্বারা অনিশ্চিতমতি পাঠকজাতির মনো-রঞ্জনের উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন, সমালোচন-কার্যে অগ্রসর হইতে তাঁহাদের অভিরুচি হয় না। রীতিমত এ কার্যে প্রবৃত্ত হইলে চিত্তও অনেকটা বিক্ষিপ্ত হয়। এইজন্য যে দেশে সাহিত্যচর্চা অধিক সে দেশে প্রায়ই লেখক এবং সমালোচক -সম্প্রদায় স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

'আমাদের দেশে এখনও সেই কার্যবিভাগের সময় আসে নাই— এবং বঙ্কিম যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন সেই সময় আরও সুদূরবর্তী ছিল। সেইজন্য রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যই তিনি বীরের ন্যায় একাকী গ্রহণ করিলেন।'

বর্তমান মুদ্রণের ৪০৪ পৃষ্ঠার ১০ ও ১১ ছত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত অংশটুকু 'সাধনা'য় অন্তর্নিবিষ্ট ছিল—

'বঙ্কিম যেদিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন সেদিন হইতে এ পর্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। সাহিত্যের প্রতি এখনকার সমালোচনার কোনো

প্রভাব নাই। সাধারণে এখনকার সমালোচনা কেবল বিজ্ঞাপনস্তম্ভ সজ্জিত করিবার আয়োজন-স্বরূপে দেখে। যথার্থ রসবোধ এবং সূক্ষ্ম বিচার প্রকাশ পায় এমন সমালোচনা বহুকাল দেখা যায় নাই। গ্রন্থসমালোচনার ভার অনেক সময়ে অযোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং অনেক কৃতবিদ্য লেখকও অত্যুক্তি কাল্পনিকতা এবং অবান্তর প্রসঙ্গে তাঁহাদের সমালোচনা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন ; গ্রন্থের অন্তর্গত প্রকৃত সাহিত্যপদার্থকে প্রাধান্য না দিয়া তাহার আনুষঙ্গিক নীতি অথবা অন্য কোনো তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়া পাঠকের চিত্তকে যথার্থ সাহিত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করেন। অন্য হিসাবে তাহার গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সমালোচনার হিসাবে তাহার মূল্য নাই। তাহাতে পাঠকদের মনে রসবোধ বা নির্বাচনশক্তির চর্চা হয় না।

'সেইজন্য এখনকার সাহিত্যে বিস্তর স্বেচ্ছাচারিতা এবং ইতর ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এখনকার কোনো রচনা কোনো যথার্থ শ্রদ্ধেয় সমালোচকের হস্তে কোনো-রূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় না— সকলেই স্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছেন এবং সাহিত্যক্ষেত্র জঙ্গলে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যের মধ্যে সংযমের, সৌন্দর্যের, শিষ্টতার এবং উচ্চ আদর্শের আবশ্যক কেহ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন না, স্বাভাবিক বিচারশক্তির সহিত নিরপেক্ষভাবে দণ্ডপুরস্কার বিধান করিবার কেহই নাই, পত্রে এবং সংবাদপত্রে উৎসাহ অত্যন্ত মুক্তহস্তে বিতরিত হইয়া থাকে এবং রাজকোষের শূন্য অবস্থায় কাগজের নোট যেরূপ অজস্র অথচ অনাদৃত হইয়া উঠে এই-সকল প্রাচুর্যবিশিষ্ট সমালোচনাও সাধারণের নিকট সেইরূপ প্রায় বিনামূল্যে বিক্রীত হয়।

'এই বর্তমান দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া কাহারও প্রতি দোষারোপ করা আমার অভিপ্রায় নহে। বিশেষত এ দোষের অংশ যখন আমাদিগের সকলকেই বহন করিয়া লইতে হইবে তখন ইহার মধ্যে নিজের সান্ত্বনা বা শ্লাঘার কারণ কিছুই দেখি না। কিন্তু এই অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্যসিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার অভাবে সে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই। ইহাও বুঝিতে পারিবেন, বঙ্কিম যখন আমাদের সাহিত্যতরীর কর্ণধার হইয়াছিলেন তখন তরণী কেন এমন আশ্চর্যবেগে অগ্রসর হইয়াছিল, আর আজই বা কেন সে যথেচ্ছা ভাসিয়া যাইতেছে এবং নানা বাতাসে ঘুরিয়া মরিতেছে। আমাদের কাহারও সে ক্ষমতা নাই, সে সাহস নাই, সে প্রতিভা নাই। আমরা যদি বা স্ব স্ব শক্তি-অনুসারে কেহ কেহ কোনো কোনো বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি, কিন্তু বর্তমানের গতিকে নিয়মিত করা, সমস্ত সাহিত্যকে চালনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বঙ্গদর্শন তখনকার

সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের মর্মস্থলে শ্রীস্বরূপে বিরাজ করিতেছিল এখন সে স্থান শূন্য। সেইজন্য এখনকার সাহিত্যের বিশেষ কোনো আকারপ্রকার দেখা যায় না; তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু তাহার রূপ নাই; তাহার কোনো লক্ষণ নাই, আদর্শ নাই, বিবেকশক্তি নাই, তাহার পক্ষে সকল পথই সমান। সংসারযুদ্ধে বঙ্গসাহিত্যের সারথি কৃষ্ণ যেন আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

'সাহিত্যক্ষেত্রে কৃষ্ণের সহিত আমি আজ বঙ্কিমের তুলনা করিলাম। বঙ্কিমের মহাগ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্র' পাঠ করিলে লেখকের সহিত লেখকের আদর্শ-চরিত্রের সাদৃশ্য স্বতই মনে উদয় হয়।'

'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে আধুনিক সাহিত্যে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করিয়াছেন; বর্তমান প্রবন্ধেও বলিতেছেন—

'বঙ্কিম যেখানে ইষ্টকের উপর ইষ্টক স্থাপন করিয়া সমুন্নত সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন, এখনকার কোনো হৃদয়াধিক্যবিশিষ্ট লেখক সে স্থলে প্রচুর বাষ্পোচ্ছ্বাস-যোগে বেলুন নির্মাণ করিয়া একেবারে মেঘরাজ্যে ছাড়িয়া দিতেন— কিন্তু সে বেলুন যতই উচ্চে উঠুক না কেন তাহা ভিত্তিহীন, তাহা কিছু কালের জন্য সাধারণের কৌতূহলজনক, কিন্তু বাসযোগ্য নহে, এবং সেই বেলুনযোগে যিনি আপন যশকে ঊর্ধ্বে উড্ডীন করিয়া দিতেন, একদিন আকস্মিক পতনে অপমৃত্যুর জন্য সে যশকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত।

'বঙ্কিম গীতার উপদেশ-অনুসারে কেবলমাত্র আপনার কর্ম করিয়া গিয়াছেন, ফললাভের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। তিনি নিজে কৃষ্ণকে পরিপূর্ণ ভক্তি করিতেন, অথচ আধুনিক কৃষ্ণভক্তদিগকে প্রসন্ন করিবার কোনো চেষ্টা করেন নাই; তিনি কৃষ্ণের দেবত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, অথচ বহুযত্নে বহু সাবধানে কৃষ্ণচরিত্র হইতে সমস্ত অলৌকিক অংশ দূর করিয়া দিয়াছেন; আমাদের দেশের লোকের যে অন্ধভক্তি এবং নির্বিচার অতিবিশ্বাসের দিকে প্রবণতা আছে বঙ্কিম তাঁহার সমস্ত রচনায় কোথাও তাহার পোষণ বা সমর্থন করেন নাই, বরং প্রতিপদে তাহাকে আঘাত করিয়া গিয়াছেন।'[২]

'যুক্তিবিচারকে প্রাধান্য না দিয়া বঙ্কিম যদি নিজেই গুরু সাজিয়া দাঁড়াইতেন, অনুসন্ধান-দ্বারা সত্যের দিকে পথ নির্দেশ না করিয়া তিনি যদি নিজেকেই ধ্রুবতারা

২ বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৪০৬, ৭ম ও ৮ম ছত্রের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।

বলিয়া প্রচার করিতেন, দেশের লোকের মনের গতি বুঝিয়া তিনি যদি অন্ধবিশ্বাস এবং অলৌকিকবাদকে আপন পক্ষভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, তবে এই দেবানুগৃহীত বঙ্গদেশে অনায়াসেই তিনি একজন নূতন অবতার হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। তবে তাঁহার অসংখ্য উন্মত্ত শিষ্যগণ এমন নিবিড় ব্যূহরচনা করিয়া আজ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত যে, আমরা সাহিত্যভক্তগণ আর সহজে আমাদের গুরুর সমীপবর্তী হইতে পারিতাম না।'[৩]

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনো কালে বিস্মৃত না হন'[৪] এই মন্তব্যের পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

'বঙ্কিমের প্রতিভা যদি আমাদের পথ খনন করিয়া না দিত তবে আমরা এতদিনে শিশুপাঠ গ্রন্থের প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগ তৃতীয়ভাগ শেষ করিয়া বড়োজোর চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ভাগে গিয়া উপনীত হইতাম। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইত না। আজ আমাদের কোনো লেখা যদি বয়স্ক লোকের পাঠযোগ্য, শিক্ষিত লোকের সমাদরযোগ্য, বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদযোগ্য হইয়া থাকে, কোনো রচনার একটি অংশও যদি সর্বদেশে ও সর্বকালে স্থায়ী হইবার উপযোগী সুসম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে, তাহা অনেকটা পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসাদে।'

বর্তমান মুদ্রণের ৪১০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছত্রের অনুক্রমে (পরবর্তী অনুচ্ছেদের পূর্বাবধি) 'সাধনা'য় মুদ্রিত ছিল—

'আমাদের যে অন্তঃপুরে সূর্যকিরণ এবং বায়ু -প্রবেশ নিষেধ সেখানে তিনি নিখিলবিশ্বের আনন্দপ্রবাহ সমীরিত করিবার পথ করিয়া দিয়াছেন, এবং যে বাঙালি-হৃদয় অনেক বয়স পর্যন্ত অন্তরের মধ্যে অপরিচিত দুর্বোধ বিদেশীয় সাহিত্য সম্পূর্ণ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া চিরজন্মের মতো অপরিপুষ্ট উপবাসকৃশ এবং হীনবল হইয়া থাকে তাহার দ্বারদেশে তিনি খাদ্য উপনীত করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমরা অপরাপর জাতির নিকট চিরদিন ঋণ গ্রহণ করিয়া অবশেষে কথঞ্চিৎ সুদ-সমেত তাহা পরিশোধপূর্বক যাহাতে নিজের নিকট আত্মসম্মান এবং পরের নিকট শ্রদ্ধার অধিকারী হইতে পারি এমন সুবিধা তিনি করিয়া দিয়াছেন।'

৩ পৃ. ৪০৬, ১৯শ ও ২০শ ছত্রের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।

৪ পৃ. ৪০৯, ১ম ছত্র দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট বিভিন্ন সময়ে যে উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধশেষে তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন—

'অধিক দিনের কথা নহে; ইতিপূর্বেই যে সভায় আমি সাধারণের সমক্ষে[৫] প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সভাপতি থাকিয়া আমাকে পরম সম্মানিত এবং উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তখন কে কল্পনা করিয়াছিল তাহার অনতিকাল পরে পুনশ্চ এই সাধারণ সভায় দাঁড়াইয়া তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গদেশের হইয়া আমাকে শোক প্রকাশ করিতে হইবে। কে জানিত আমার সহিত তাঁহার সেই শেষ ঐহিক সম্বন্ধ। একদিন আমার প্রথম বয়সে কোনো নিমন্ত্রণসভায় তিনি নিজকণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন,[৬] সেই আমার জীবনের সাহিত্যচর্চার প্রথম গৌরবের দিন। তাহার পরে সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদরসহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন; সে সৌভাগ্য অন্য লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল এবং সেই সমাদরবাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল যে, আজ তাহা লইয়া সর্বসমক্ষে গর্ব করিলে ভরসা করি সকলে আমাকে মার্জনা করিবেন। কিন্তু সেই পুরস্কার যে তাঁহার হস্ত হইতে আমার শেষ পুরস্কার হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। সেই-সকল উৎসাহবাক্য সাহিত্যপথযাত্রার মহামূল্য পাথেয়স্বরূপে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত হইল; তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারিব না।'[৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন অনুরুদ্ধ

৫ চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে পঠিত 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', সাধনা, ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক। দ্রষ্টব্য দশমখণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী, পৃ. ৩৭৯-৪০৩।

৬ দ্রষ্টব্য 'জীবনস্মৃতি' প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৫২। 'বউঠাকুরানীর হাট' পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ সে-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে— এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন-কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আভাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।

—সূচনা, 'বউঠাকুরানীর হাট', রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ

৭ পৃ ৪১০, বর্তমানে যেখানে প্রবন্ধ শেষ হইয়াছে তাহার পরেই মুদ্রিত ছিল।

হইয়াছিলেন ; তিনি "সভা করিয়া" বঙ্কিমের জন্য শোক প্রকাশ করিতে অস্বীকৃত হন।[৮] রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের সাধনায় 'শোকসভা' প্রবন্ধ লিখিয়া নবীনচন্দ্রের আপত্তির উত্তর দেন। এই প্রবন্ধটি বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

'রাজসিংহ'-সমালোচনার (সাধনা, ১৩০০ চৈত্র) সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

'চষা মাঠের মাঝখানে ভাঙা পথ বাহিয়া পালকি চড়িয়া চলিতে চলিতে বঙ্কিমবাবুর নূতন সংস্করণ 'রাজসিংহ' পড়িতেছিলাম। নববসন্তের আতপ্ত মধ্যাহ্নবায়ু উদ্দাম কৌতূহলভরে মাঠের অপর প্রান্ত হইতে হুহুঃ শব্দে ছুটিয়া আসিয়া পালকির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই অকস্মাৎ এই অলক-অঞ্চল-বিরহিত চাপকান-পরিহিত অধ্যয়নরত পুরুষমূর্তি দেখিবামাত্র সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে অবজ্ঞা ও নৈরাশ্য প্রকাশ-পূর্বক পালকির অপর দ্বার দিয়া ক্ষিপ্রবেগে নিষ্ক্রমণ করিতেছিল। মাঝে মাঝে যখন গ্রামের নিকটে আসিতেছিলাম আমার গ্রন্থপাঠের সহিত বনের ছায়া, পাখির গান এবং আম্রমুকুলের গন্ধ মিশ্রিত হইতেছিল। অখণ্ড অবসর ছিল— এবং কল্পনাকে বাধা দিবার জন্য না ছিল জনতা, না ছিল অট্টালিকা, না ছিল অবরুদ্ধ রাজপথের ধূলি-মিশ্রিত বিচিত্র কোলাহল।

'ছবি অথবা কোনো সুন্দর শিল্পদ্রব্য পাইলে মানুষ সেটিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে ধরিয়া গ্রীবা হেলাইয়া দেখে— চোখের উপরে যেখানে শতসহস্র জিনিস ভিড় করিয়া আসিয়াছে সেখান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া মাঝখানে অনেকটা ব্যবধান রাখিয়া সেটিকে স্বতন্ত্র সমগ্রভাবে দেখিতে চাহে। সাহিত্যের সুন্দর জিনিসগুলিও তেমনি কিঞ্চিৎ দূরে ধরিয়া দেখিবার যোগ্য। নহিলে আমার মন এবং তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে কল্পনাদূতীর ঘন ঘন আনাগোনা করিবার পথ থাকে না।

৮ সভা-শ্রাদ্ধ গড়াইতে গড়াইতে এখন ইংরাজের অনুকরণে "শোকসভা" পর্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর জন্য "শোক-সভা" হইবে, রবিবাবু শোক-প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহার সভাপতিত্ব করিতে আমি আহূত হইয়াছিলাম। আমি উহা অস্বীকার করিয়া লিখিলাম যে, সভা করিয়া কিরূপে শোক করা যায়, আমি হিন্দু তাহা বুঝি না··· এ-সকল কথা শুনিয়া রবিবাবু স্বয়ং লিখিলেন যে আমার সভাপতিত্বের ছায়ায় তিনি তাঁহার শোক-প্রবন্ধ উক্ত সভায় পাঠ করিতে চাহেন।··· "শোক-সভা" সম্বন্ধে আমার উপরি-উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া রবিবাবুর "সাধনা"তে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ··· আমাদের শোক কালো ফিতায় দেখাইবার জিনিস নহে। আমাদের শোক বড় নিভৃত ও পবিত্র। উহা সভা করিয়া একটা তামাশার জিনিস করা আমি মহাপাতক মনে করি। —নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', পঞ্চম ভাগ

'এইজন্য মাঠের মধ্যে আমার রাজসিংহ পড়িবার বড়ো সুযোগ ঘটিয়াছিল। বইখানি আমার হাতে ছিল বটে— কিন্তু আসল ব্যাপারটি বাঁধানো গ্রন্থের কালো মলাটের কারাপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত মাঠ এবং সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিতেছিল। বঙ্কিমবাবু যেন এই দিগন্তপ্রসারিত ধূসর মৃত্তিকাপটের উপর তাঁহার বইখানি ছাপাইয়া ওই মধ্যাহ্নরৌদ্রের সোনার-জল-করা অনন্ত নীলাকাশের মলাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন।

'কত দিনের ব্যবধান, কত দূরের কথা, এ মানুষেরাই বা কোথায় এবং এই-সকল ঘূর্ণাবর্তসংকুল বেগগামী প্রবল ঘটনাপ্রবাহই বা আমরা ম্যুনিসিপালিটির পুরপালিত বঙ্গসন্তান কোন্‌খানে দেখিতে পাইব! কোথায় বা সেই মোগলের বিলাসতরঙ্গিত দিল্লি, কোথায়-বা সেই রাজপুতানার অনুর্বর মরুভূমি ও দুর্গম গিরিমালা যাহার কঠিন স্তনের বিরল স্তন্যরসে রাজপুত সিংহশাবকেরা নির্জনে লালিত হইতেছিল! সুবিশাল প্রান্তর এবং অবারিত আকাশ নহিলে কি ঘনহর্ম্যপীড়িত অবকাশবিহীন ট্রামরথচক্রমুখরিত কলিকাতায় এ-সমস্ত কল্পনাপট প্রসারিতভাবে ধারণ করিবার স্থান আছে?

'সেইজন্যই মনে করিতেছি সৌভাগ্যক্রমে রাজসিংহ গ্রন্থখানি কলিকাতায় প্রথম আমার হস্তগত হইবামাত্রই অপহৃত হইয়া যায়। চৌরের উদ্দেশে গালি পাড়িবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেটা পাছে আমার কোনো নিকট আত্মীয় অথবা প্রিয় আত্মীয়ার গায়ে বাজে এই ভয়ে ধৈর্যরক্ষাপূর্বক বিরত ছিলাম, আজ তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জনা করিলাম।

'কলিকাতায় অঙ্গচালনার অনবসর এবং আহার্যসামগ্রীর প্রাচুর্যবশত ক্ষুধামান্দ্য ঘটে, এইজন্য পরিতৃপ্তির সহিত কোনো খাদ্যের স্বাদগ্রহণ করা যায় না। কেবল শারীরিক নহে, সেখানে মানসিক অম্লরোগেরও বড়ো প্রাদুর্ভাব। এত খবর, এত কথা, এত বক্তৃতা মনের মধ্যে অবিরল বর্ষিত হইতেছে— মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ অবকাশ লইয়া স্থির শান্তভাবে কোনো কথা পরিপাক করিবার অবসর এত অল্প, উদার কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে মানসিক অঙ্গচালনা করিবার উপলক্ষ এত দুর্লভ যে, মনের ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যায়, ঝাল টক চাটনি ভালো লাগে, কিন্তু ভালো জিনিসের ভালোরূপ রসগ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। পল্লীগ্রামের আকাশ এবং অবকাশের মধ্যে আসিলে ক্ষুধা সঞ্চয় হয়, প্রত্যেক জিনিসের পরিপূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায় এবং ভুক্ত রস রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বাস্থ্যস্ফূর্তি সঞ্চার করে।

'সেইজন্য মাঠের মধ্যে যখন রাজসিংহ পড়িলাম সমস্ত বইখানি এমন নিঃশেষ

করিয়া উপভোগ করিতে পারিলাম। আমার মনে পড়িতে লাগিল, অল্প বয়সে যখন রবিবারে স্কুলের ছুটির দিন অন্তঃপুরের নির্জন ছাদে বসিয়া কপালকুণ্ডলা পড়িয়াছিলাম তখন কেমন লাগিয়াছিল— কোথাকার এক পথবিহীন বনচ্ছায়াঘন কল্পনালোক হইতে উদ্‌ভ্রান্ত সৌন্দর্যসমীরণ আসিয়া নগরবাসী বালকের বিস্মিত হৃদয়কে পুলকিত ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। মনে পড়িতে লাগিল, যখন মাসে মাসে বঙ্গ-দর্শনে খণ্ড খণ্ড করিয়া 'বিষবৃক্ষ' 'চন্দ্রশেখর' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাহির হইতেছিল তখন মাসে মাসে আনন্দের আগ্রহে অন্তঃকরণ কিরূপ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। চারাগাছ যেরূপ প্রতি রাত্রি -অবসানে নূতন ব্যগ্রতার সহিত সূর্যালোক পান করিতে থাকে, মাসান্তে বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়ে সেইরূপ ঔৎসুক্যের সহিত মুকুলিত অন্তরের প্রত্যেক উন্মুখ অগ্রভাগের দ্বারা আনন্দরশ্মি গ্রহণ করিতে থাকিতাম। তখন এত বই পড়ি নাই এবং সমালোচনা যাহা পড়িতাম তাহাও বঙ্গদর্শন হইতে। আজ তাহার ডবল বয়সে নির্জনে রাজসিংহ পড়িয়া সাহিত্যের সহিত সেই আমার প্রথম কৈশোর-প্রণয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল।

'মনে করিলাম এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা-কিছু লিখিয়া ফেলি। কিন্তু সমালোচনা লিখিতে হইবে মনে করিলেই ভয় হয়। একটা তো আগাগোড়া ফাঁদিয়া বসিতে হইবে— একটা তো নূতন কথার অবতারণা করিতে হইবে। গ্রন্থের মধ্য হইতে এমন একটা-কিছু আবিষ্কার করিতে হইবে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকার এবং পাঠকবর্গ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন।

'রাজসিংহের মধ্যে সে প্রকারের অপরূপ রহস্য অবশ্যই কিছু আছে, তাহার সন্ধানের ভার আমি বিজ্ঞ সমালোচকদের উপর রাখিয়া দিলাম। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহি আমার হৃদয়ে যে সাহিত্যরসপিপাসা আছে এ গ্রন্থ পাঠে তাহার কতটা পরিতৃপ্তি হইল।

'এক হিসাবে সে কাজটা সহজ, এক হিসাবে শক্তও বটে। আলোচ্য গ্রন্থের কোনো-এক অনালোকিত গোপন প্রান্ত হইতে কোনো একটা তত্ত্বকথা যদি সমূলে উৎপাটিত করিয়া আনা যায় তবে সেইটাকে অবলম্বন করিয়া সংগত এবং অসংগত অনেক কথা বলিয়া লওয়া সহজ হয়।

'কিন্তু ভালো লাগিল এ কথাটা বড়ো শীঘ্র শেষ হইয়া যায়, সেটাকে একটা রীতিমত প্রবন্ধাকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোলা সকল সময়ে সুসাধ্য বোধ হয় না।

'আবার, যখন ভালো লাগে তখন কেন ভালো লাগে, কেমন করিয়া ভালো লাগে, তাহার চেতনা থাকে না— উচ্ছ্বসিত সংক্ষিপ্ত হর্ষধ্বনি ছাড়া মুখ দিয়া আর-

কিছু বাহির হয় না। সমালোচনা করিতে হইলে সেই অচেতন আনন্দকে নিতান্তই খোঁচা দিয়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিতে হয়।

'আমি নিজেকে জেরা করিয়া অবশেষে একটা নূতন উপমা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেইটা দিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিব মনে করিতেছি। লিখিতে লিখিতে যদি আরও কিছু মনে পড়ে তো পরে বলিব।

'সাহিত্যরণরঙ্গভূমে কোনো মহারথী ভীমের মতো গদাযুদ্ধ করেন, আবার কেহ বা সব্যসাচী অর্জুনের মতো কোদণ্ডে ক্ষিপ্রহস্ত। কেহ বা প্রকাণ্ড ভার লইয়া পাঠকের মস্তকের উপর নিপাতিত করেন, কেহ বা মুহূর্তের মধ্যে পুচ্ছবান অসংখ্য লঘু শর-সমূহে উক্ত নিরুপায় নিঃসহায় ব্যক্তির একেবারে মর্মস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলেন।

'সাহিত্যকুরুক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবু সেই মহাবীর অর্জুন। তাঁহার বিদ্যুদ্‌গামী শরজাল দশ দিক আচ্ছন্ন করিয়া ছুটিতেছে— তাহারা অত্যন্ত লঘু, কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে মুহূর্তকাল বিলম্ব করে না।'

১৩০৫ সালের আশ্বিন মাসের ভারতী পত্রে 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩০৫ সালের মাঘ মাসের ভারতী পত্রে 'নিরাকার উপাসনা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, উহাকে পূর্বোক্ত 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধের অনুবৃত্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে; বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে উহা মুদ্রিত হইল। 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধের ভারতীতে প্রকাশিত কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে বর্জিত অংশ[১] এখানে উদ্‌ধৃত করা যাইতে পারে—

'ইহা স্বাভাবিক। দেবতাকে যদি নিজের মতো করিয়াই গড়ি তবে এক কালের গড়া দেবতাকে লইয়া আর-এক কালের তৃপ্তি হইতে পারে না। তবে দেশকালপাত্র-ভেদে নব নব বিকার দেবচরিত্রে প্রবেশ করিবেই। অথচ এই-সকল বিকার সত্ত্বেও যে আমাদের ভক্তির হ্রাস হয় না সে আমাদের মানসিক জড়ত্ব এবং সে আমাদের দুর্গতির এক কারণ।

'ভক্তি আমাদিগকে ভক্তিভাজনের দিকে অগ্রসর করে, অলক্ষিতভাবে সেই আদর্শে আমাদের মনকে গড়িয়া তোলে। এইজন্য যে-সকল উদ্ধত লোক আপনার চেয়ে কাহাকেও বড়ো বলিয়া জানে না তাহারা বাহিরে অহংকারে স্ফীত হয়, কিন্তু ভিতরে তাহার প্রকৃতি আপন সংকীর্ণ কারাগারে বদ্ধ থাকে।

১ পৃ. ৫১৯, ২৫শ ছত্রের পর।

'আমরা উল্‌টা দিকে যাই। দেবতার আদর্শে নিজেকে গড়িবার চেষ্টা না করিয়া নিজের আদর্শে দেবতাকে গড়িয়া তুলি। এবং ভক্তিপ্রবণ-স্বভাব-বশত সে দেবতাকে ভক্তিও করি। তাহাতে ভক্তিপ্রবৃত্তির চালনা-বশত সুখ পাই সন্দেহ নাই, কিন্তু ভক্তির চরম সফলতা হইতে বঞ্চিত হই।

'পাখি তাহার স্বাভাবিক মাতৃসংস্কার-বশত একটা পাথরের ডিম পাইলেও আগ্রহ-সহকারে তা দিতে বসে, তাহাতে তাহার ডিমে তা দিবার স্বাভাবিক ব্যাকুলতা -নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু সে তা-দেওয়া হইতে শাবক জন্মে না।

'উপাসনা করিবার একটা ফল, উপাসনা করিবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি করা— আর-একটি চরম ফল, যাঁহার উপাসনা করি তাঁহার আদর্শের দিকে আপনাকে নিয়ত প্রসারিত করা। সেই নিয়ত প্রসারণে যেমন আনন্দ তেমনি উন্নতি। অতএব যদি ইহা সত্য হয় যে, মানুষ, ঈশ্বরকে মানুষিকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত করিয়া দেখিতে পারে না, তবে দ্বিগুণ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে এমন-সকল সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধারণা করা উচিত যদ্দ্বারা তাঁহার আদর্শ পার্থিব আদর্শের মতো খাটো হইয়া না যায়। তাঁহাকে অসীমস্নেহময় বলিলেও, যদি বা মনে মনে মাতৃস্নেহের সহিত তাঁহার স্নেহের তুলনা না করিয়া থাকিতে পারি না, তথাপি আমাদের স্নেহের আদর্শ যতই উৎকর্ষ লাভ করুক স্নেহময় বিশেষণকে অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু যদি একটা বিশেষ কাহিনীদ্বারা তাঁহার স্নেহের আদর্শকে বদ্ধ করি, যদি বলি তিনি বনের ব্যাধকে গুজরাটের রাজা করিয়া দিয়াছিলেন, তবে লোকবিশেষের কাছে তাহা আদরণীয় হইতে পারে, কিন্তু অপর লোকের কাছে তাহা অন্যায় পক্ষপাত বলিয়া হেয় হইতে পারে। যে লোক গুজরাটের রাজত্ব চায় দেবতার স্তবপক্ষপাতধর্ম তাহার কাছে রমণীয়, কিন্তু যে তাঁহাকে চায় সে জানে সাধনার দ্বারা তাঁহার অক্ষয় স্নেহ অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি, রাজত্বে নহে, মকদ্দমা-জয়ে নহে, সাংসারিক উন্নতিতে নহে। অতএব ঈশ্বরকে যদি স্নেহময় বলিয়া জানি, তবে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তাঁহার স্নেহের লাঘব দেখি না। কিন্তু তাঁহাকে যদি কবিকঙ্কণের চণ্ডী বলিয়া জানি তবে আমার মনে স্নেহের যে আদর্শ আছে তাহা অপেক্ষাও তাঁহাকে অনেক কম করিয়া জানি। যদি সেইরূপ কম করিয়া জানি তথাপি বেশি করিয়া ভক্তি করি, তবে সে ভক্তি বন্ধ্যা হয়।'

'যুগান্তর' (সাধনা, ১৩০১ চৈত্র) প্রবন্ধের সূচনায় 'সমালোচকের কাজ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'যাহারা বালি ধুইয়া হীরা বাহির করে তাহারা অনেক কাল বিস্তর বালি ঘাঁটিয়া এক টুকরা হীরার সন্ধান পায়। গ্রন্থ-সমালোচকের ভাগ্যেও হীরা সহজে মেলে না; সেইজন্য বহুকাল বিস্তর নীরস এবং নিষ্ফল পরিশ্রমের পর যেদিন একখানা যথার্থ গ্রন্থ হাতে আসে সেদিন আনন্দবেগে গ্রন্থকারকে মনুমেণ্টের উপর তুলিয়া দিয়া জয়জয়কার করিতে ইচ্ছা করে।

'কিন্তু সমালোচকের কাজটা এমনি যে, তাহাকে পদে পদে আপন উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া চলিতে হয়, যখন কৃতজ্ঞচিত্তে নুন খাইতেছি তখনও এই কথা মনে রাখিতে হয় কেবলই গুণ গাহিলে চলিবে না, যদি দোষ থাকে তাহাও গাহিতে হইবে।'

এই প্রকার "উচ্ছ্বাস-সম্বরণ"এর দৃষ্টান্ত 'আধুনিক সাহিত্য' -আলোচনায় বহু বর্তমান। প্রবন্ধগুলির মাসিকপত্রে মুদ্রিত পাঠ হইতে আর-কিছু দৃষ্টান্ত সংকলিত হইল—

'আমাদের এই সমালোচ্য [আর্যগাথা] গ্রন্থখানিতে কোনো কোনো গানে ইংরাজি প্রথার ভাষা আমাদের কানে খারাপ লাগিয়াছে। ইংরাজি ভাব গ্রহণ করিয়া আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিতে দোষ নাই কিন্তু এমন অনেক-গুলি ভাব আছে যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, সেগুলি বাংলায় বর্জনীয়।—

"চেয়ো না বিরাগে মাখি হিম আঁখি তুলি মোর পানে"

ইংরেজিতে cold শব্দের সহিত যে-একটি অপ্রিয় ভাবের যোগ আছে বাংলায় তাহা নাই এবং হইতেও পারে না। সেইজন্য হিম-আঁখি শব্দটা কানে বিজাতীয় বলিয়া ঠেকে। ইংরাজিতে love এবং hate দুই বিপরীতার্থক শব্দ। স্থানভেদে hate শব্দের স্থলে বাংলায় ঘৃণা বিদ্বেষ বিরাগ প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতে পারে। আর্যগাথায় স্থানে স্থানে ঘৃণা শব্দের অপপ্রয়োগ হইয়াছে।

পাষাণে বাঁধিব প্রাণে, অশ্রুপথে দিব বাঁধ—
নীরবে হৃদয়ে পড়ি কাঁদুক মনের সাধ।
কাঁদিব না দীনাহীনা— কঠোরা তাপসী ঘৃণা
দিব তিক্ত ঢালি তারে— ক্ষমো দেব অপরাধ।

শেষ দুটি ছত্রের অর্থ বুঝাই কঠিন। বোধ করি ইহার অর্থ এইরূপ— আমি দীন-হীনার ন্যায় কাঁদিব না, কঠোরা তাপসীর ন্যায় হইয়া ঘৃণারূপ তিক্ত পদার্থ তাহাকে

ঢালিয়া দিব। বাংলা ভাষায় বীভৎসতা অথবা হীনতার প্রতিই ঘৃণা প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু কবি এ স্থলে ঔদাসীন্য উপেক্ষা অথবা বিরাগ অর্থে ঘৃণা ব্যবহার করিয়াছেন। 'দিব তিক্ত ঢালি তারে'— ইহাতে বাংলার প্রয়োগনীতি রক্ষিত হয় নাই।

'কোনো কোনো গানের পদ এতই বিপর্যস্তভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, তাহার অর্থগ্রহ চেষ্টাসাধ্য হইয়া পড়ে—

> কে পারে নিবারিতে হৃদয়ের বেদনা—
> সে বিনে নিজকরে দিয়াছে যে তাহারে।
> হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
> কে বারে যে তারে গেছে প্রাণে ঘিরি সে বিনে।

গানের ভাষায় এরূপ অসরলতা দোষ মার্জনীয় নহে।

'গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে কবি স্কচ ইংরাজি এবং আইরিশ গানের যে-সকল অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাষা অনেক স্থলে অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়াছে। সেগুলি এ গ্রন্থে স্থান না পাইলে ক্ষতি ছিল না।'[১০]

—'আর্যগাথা', সাধনা, ১৩০১ অগ্রহায়ণ

'বড়ো ভালো লাগিল, এ কথাটি যতই অকৃত্রিম হউক, কথাটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এতটুকু কথা লইয়া সম্পাদকি করা চলে না— তাই ওই কথাটাকে বড়ো করিয়া তুলিয়া কিছু স্থান জুড়িতে হইবে— নহিলে পদমর্যাদা রক্ষা হয় না।

'যদি ইচ্ছামত চলিবার স্বাধীনতা থাকিত তবে কবির বচন হইতে অনর্গল উদ্‌ধৃত করিয়া মাঝে মাঝে কেবল "বাহবা" বসাইয়া দিতাম— তাহাতে আমাদের কোনো ক্ষমতা প্রকাশ হইত কি না, জানি না; কিন্তু ভাব প্রকাশ হইত।'[১১]

[মন্দ্র সমালোচনা] 'শেষ করিবার পূর্বে 'কুসুমে কণ্টক' কবিতাটি সম্বন্ধে আমরা আপত্তি জানাইয়া রাখিতে চাই। ইহা বিশুদ্ধ কণ্টকমাত্র, ইহার মধ্য হইতে সুকোমল-সুন্দর কুসুমটিকে কই দেখা যাইতেছে! কবির নিকট হইতে আমরা এরূপ সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রত্যাশা করি নাই।

' 'রাধার প্রতি কৃষ্ণ' কবিতাটি এ গ্রন্থে স্থান পাইবার যোগ্য হয় নাই।'[১২]

—'মন্দ্র', বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ কার্তিক

১০ পৃ. ৪৮৫, ৩য় ছত্রের পর।

১১ পৃ. ৪৮৯, তৃতীয় এবং চতুর্থ অনুচ্ছেদের অন্তর্বর্তী।

১২ পৃ. ৪৯০, প্রবন্ধশেষে।

[শুভবিবাহ] 'বইয়ের মধ্যে যে দুটি-একটি ত্রুটি আমাদের চোখে পড়িয়াছে তাহাতে আমরা আশ্চর্য হইয়াছি। আশ্চর্য হইবার কারণ এই যে, মোটের উপর সমস্ত বইয়ের মধ্যে বানাইবার কোনো প্রয়াস দেখা যায় না, এইজন্য তাহার ব্যতিক্রম যদি কোথাও ঘটিয়া থাকে তবে সেটা আঘাত করে। বিন্দিদাসীর ভাষা লেখিকা ঠিকমত প্রকাশ করেন নাই, তাহা তিনি বানাইতে গেছেন এবং ভুল করিয়াছেন। এই ভাষায় রাঢ়দেশ এবং পূর্ববঙ্গের খিচুড়ি পাকাইয়া গেছে। মেয়েদের মুখে কোনো কোনো জায়গায় হঠাৎ সাধুভাষা এবং ইংরেজি কথা চলিয়া গেছে। এ সম্বন্ধে পুরুষ-সমালোচকের পক্ষে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। আজকালকার বাংলা বই পড়ার দিনে মেয়েদের মুখে হয়তো অনেক সংস্কৃত কথা চলিয়া গেছে— হয়তো তাহারা কখনো কখনো "বদল" না বলিয়া "পরিবর্তন" বলিলে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই, কিন্তু "অ্যাপ্রেন্টিস" ইংরেজি কথাটা যে প্রচলিত হইয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। অবশ্য দৈবাৎ কোনো একজন ইংরেজি-না-জানা মেয়ের পক্ষে এ কথাটা জানা সম্ভব, কিন্তু সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে কথায়-বার্তায় এমন অপ্রচলিত কথাটা ব্যবহার করা কি স্বাভাবিক ?'[১৩]

—'শুভবিবাহ', বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ আষাঢ়

'সুতরাং এখনও বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র ইতিহাসের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই চেষ্টাই তাঁহার প্রধান গৌরব। কেবল চেষ্টা নহে; তিনি যে প্রণালীতে কাজ করিয়াছেন এবং মনের যে ভাবটি রক্ষা করিয়াছেন তাহা বাঙালি পাঠকদিগের শিক্ষাবিধানের পক্ষে মহামূল্য।'[১৪]

'ভগবদ্‌গীতায় ফললাভকে তুচ্ছ করিয়া কার্যের গৌরব কীর্তিত হইয়াছে; আমাদের বর্তমান সমালোচ্য [কৃষ্ণচরিত্র] গ্রন্থেও কী প্রমাণ হইয়াছে বা না হইয়াছে তাহাকে অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, যে মূলমন্ত্রে এই গ্রন্থখানি প্রাণশক্তি লাভ করিয়াছে তাহাকেই শিরোধার্য করিয়া লইব।'[১৫]

—'কৃষ্ণচরিত্র', সাধনা, ১৩০১ মাঘ

'এইজন্য বর্তমান প্রবন্ধলেখক যখন বাল্যাবস্থায় বিহারীলালের কাব্যসৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া লইয়াছিল এবং তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্ত

১৩ পৃ. ৪৯৪, প্রবন্ধশেষে।

১৪ পৃ. ৪৫১, সর্বশেষ অনুচ্ছেদের পূর্বে।

১৫ পৃ. ৪৪৭, ৮ম ছত্রের পর।

হইয়াছিল সে তখন 'বঙ্গসুন্দরী'র সহজ ছন্দকেই আদর্শ করিতে পারিয়াছিল, 'সারদামঙ্গল' তাহার আয়ত্তের অতীত ছিল।[১৬]

—'বিহারীলাল', সাধনা, ১৩০১ আষাঢ়

'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের রচনাবলী-সংস্করণে, 'সিরাজদ্দৌলা' (১।২) ও 'ঐতিহাসিক চিত্র' এই প্রবন্ধত্রয় নূতন সন্নিবিষ্ট হইল। আধুনিক সাহিত্যে প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' ও 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধদ্বয়ের প্রসঙ্গক্রমে ও অনুবৃত্তিরূপে এই খণ্ডের পরিশিষ্টে 'শোকসভা' ও 'নিরাকার উপাসনা' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের স্বতন্ত্র সংস্করণের অন্তর্গত 'ডি প্রোফণ্ডিস' প্রবন্ধ, সমালোচনা গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছিল ; 'সমালোচনা' রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের (দ্বিতীয় খণ্ড) অন্তর্গত হইয়াছে— এইজন্য এখানে মুদ্রিত হইল না।

আধুনিক সাহিত্যে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে,'সঞ্জীবচন্দ্র' ১৩০১ সালের পৌষ মাসের সাধনায়, 'বিদ্যাপতির রাধিকা' ১২৯৮ সালের চৈত্র মাসের সাধনায়, 'ফুলজানি' ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সাধনায়, 'আষাঢ়ে' ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে, 'সিরাজদ্দৌলা' (১) ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীতে, 'সিরাজদ্দৌলা' (২) ও 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' ১৩০৫ সালের শ্রাবণ মাসের ভারতীতে ও 'জুবেয়ার'১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যান্য প্রবন্ধের প্রকাশকাল ইত্যাদি গ্রন্থপরিচয়ে প্রসঙ্গত উল্লিখিত হইয়াছে।

১৬ পৃ. ৪২০, ২২শ ছত্রের পর।

তুলনীয় পৃ. ৪৩২, কবিতা-উদ্‌ধৃতির পরবর্তী অনুচ্ছেদ ; জীবনস্মৃতি, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৯৫, ১৪৪ ; 'গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা'র 'বিজ্ঞাপন' (নিম্নে উদ্‌ধৃত) ; 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র (১৩০৩) 'ভূমিকা' (নিম্নে উদ্‌ধৃত) ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, 'কড়ি ও কোমল'এর সূচনা।

'ইহার সহিত বাল্মীকিপ্রতিভা-নামক একটি গীতিনাট্য সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া গেল। কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের রচিত সারদামঙ্গল-নামক কাব্য পাঠ করিয়া উক্ত গীতিনাট্যের ভাব আমার মনে উদয় হয়। এমন-কি দুই একটি গানে সারদামঙ্গলের অনেকগুলি পদ প্রায় অবিকৃতভাবেই রক্ষিত হইয়াছে, এজন্য বিহারীবাবুর নিকট আমি ঋণী আছি। ১০ই চৈত্র, ১২৯৯।'

—গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা, বিজ্ঞাপন

'বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য লেখকের বাল্যরচনা। ৺বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের রচিত সারদামঙ্গল কাব্য হইতে ইহার কতক কতক ভাব এমন-কি ভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলাম— সেজন্য কবির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। কলিকাতা। ১৫ আশ্বিন, ১৩০৩।'

—কাব্যগ্রন্থাবলী, ভূমিকা

বর্ণানুক্রমিক সূচী